"শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম"

বা

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

মাসিক-পত্রিকা।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

"যার যেই মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে 'বিশ্বম্ভর' সেই অবতার॥"

"সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত

১ম সংখ্যা। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৫৯। সন ১৩২০, মাঘ। { ১ম বর্ষ।

লেখকগণের নাম।

শ্রীমৎ কেশবানন্দ অবধূত।
" গোবিন্দানন্দ "
" প্রণবানন্দ "
" নিত্যানন্দ "
" মহেশ্বরানন্দ "
" হরিপদানন্দ "
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন, বি,এল
" সতীশচন্দ্র ঘোষ।
" উপেন্দ্রনাথ নাগ, এল, এম, এস।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু।
" ধর্ম্মদাস রায়, বাণীকণ্ঠ।
" প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, বি, এল।
" প্রতাপচন্দ্র সেন, এম, এ, বি, এল।
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ চন্দ্র পাইন, বি, এ।
" দাশরথি মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন।
" রামচন্দ্র নাগ।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গুপ্ত।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
" কৈলাশ চন্দ্র সিংহ।
" রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্য-তীর্থ, ন্যায়তীর্থ, বেদান্ততীর্থ।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
" জনৈক ব্রহ্মচারী, তত্ত্বার্ণব বেদান্তশেখর-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী
" নৃত্যগোপাল গোস্বামী।
শ্রীমতী গণেশজননী দেবী প্রভৃতি।

বিষয়।

সম্পাদক—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

কালীঘাট,
মহানির্ব্বাণমঠ
হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসমেত ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি নিবেদন :—

শ্রীশ্রীদেবের নর-লীলার মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রীভগবানের তত্ত্বরস-আস্বাদন করাই এই "নিত্য-ধর্ম্ম" পত্রিকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা-প্রচার দ্বারা যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হওয়া সম্ভব তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সমাগত সাধু-ভক্তগণের পরিচর্য্যা ও শ্রীশ্রীদেবের সমাজের নিত্যপূজার ব্যয় সাহায্য ও এই পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতম-উদ্দেশ্য। অতএব শ্রীশ্রীদেবের ভক্তগণ সকলেই স্ব স্ব লেখনী-ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ ভাবানুযায়ী এই পত্রিকায় তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করেন, এবং সকলেই এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া সদনুষ্ঠানে ব্রতী হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

লেখকগণের প্রতি :—

মানব মাত্রেই সেই একই জগজ্জীবন জগদীশ্বরের সন্তান সুতরাং রাগ, দ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, জাতি, কুল, উচ্চ, নীচ প্রভৃতি অবিদ্যা-প্রসূত ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া জীব যাহাতে সেই লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে এই পত্রিকায় তাহাই যেন লক্ষ্য রাখেন। এই পত্রিকায় রাজ-নীতি-চর্চ্চা-সম্বলিত অথবা জাতি-বিশেষের, ব্যক্তি-বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিন্দাব্যঞ্জক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না।

সমালোচকের প্রতি :—

আমাদের এই পত্রিকা 'ধর্ম্ম-পত্রিকা'। ধর্ম্মভাবের ভাবুক লেখকগণ বিশেষতঃ ঐভাবের কবিগণ বিশেষ কোন কারণে ভাষার নিয়মাদি পালন করিতে পারেন না। ধর্ম্মালোচনায় উৎসাহ দিবার জন্য আরও কোন কারণে আমরা অল্প শিক্ষিত এমন কি অশিক্ষিত বালক বালিকা বা রমণীর লিখিত বা কথিত ধর্ম্ম প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিব। বিদ্যামদে উন্মত্ত, শিক্ষাভিমানী জনগণের সহিত ভাষাজ্ঞান বিষয়ে আমরা স্পর্দ্ধা করি না। তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে "জয়পত্রী" লিখিয়া দিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ~~সুতরাং তাহাদের প্রতি প্রার্থনা, অনুরোধ এই যে আমাদের ধর্মমণ্ডিতে যেন কেহ এই পত্রিকার লেখাগুলির সমালোচনা না করেন, অন্যথা আমাদের মর্য্যাদা, সম্মান ও স্বার্থের হানিজন্য আমরা আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব।~~ তবে আমাদের প্রকাশিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ সঙ্গত প্রতিবাদ বা সন্দেহ মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের পত্রিকাতেই প্রকাশ করিতে পারেন; যত অপ্রীতিকরই হউক আমরা উহা প্রকাশ করিয়া সঙ্গত উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ইতি।

সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

"শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম"

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় মাসিক পত্রিকা।

"সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম ॥"

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"

১ম সংখ্যা। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৫৯। সন ১৩২০, পৌষ। { ১ম বর্ষ।

শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্র।

[নিত্যগীতি হইতে উদ্ধৃত।]

সহস্রদল কমলে নিত্য নিরঞ্জন,
শ্রীগুরুদেব আমার নয়ন রঞ্জন।
শ্রীগুরু সচ্চিদানন্দ, শ্রীগুরু দয়াল,
নিরঞ্জন, নারায়ণ, শুদ্ধ, নিরমল,
সর্ব্বত্রে তিনি ব্যাপিত, সর্ব্বতত্ত্বে বিরাজিত,
তাঁহার কৃপাতে হয় আত্ম নিরূপণ,
তাঁহার কৃপাতে হয় আত্ম দরশন।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা তিনি, পরম কারণ,
সগুণ নির্গুণ, ব্রহ্ম সত্য সনাতন,
শ্রুতিতে তিনি কীর্ত্তিত, আছেন অবধারিত,
বেদব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম তাঁহার স্ফুরণ,
তাঁহার স্ফুরণ দিব্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান
তাঁহা হইতে স্ফুরিত পুরাণ সকল,
সকল উপপুরাণ সুপ্রেম অমল,

আগম নিগম তন্ত্র, চৈতন্যদায়ক মন্ত্র,
তাঁহা হইতে স্ফুরিত সকল বিধান,
স্ফুরিত সকল স্মৃতি সকল প্রমাণ।

সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজঃ
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ,
উপনিষদ বেদান্ত, সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত
তাঁহার শ্রীপদাম্বুজে করয়ে বন্দন।

ভূলোকে, গোলোকে তিনি, তিনি সর্ব্বলোকে,
তাঁহারি দর্শন করি তাঁহার আলোকে,
ভক্তিতে তাঁর মহিমা, সুপ্রেম তাঁর সুসমা,
অনুপমা আদ্যাশক্তি তাঁতে বর্ত্তমান,
(তিনি) প্রত্যক্ষপরম দেব অনন্ত মহান্।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্,
গুরোঃ পরতরো নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ,
শ্রীগুরু অনন্ত দেব, শ্রীগুরু পরম শিব,
চিন্ময় ঐ সহস্রারে, তাঁহার আসন,
কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র তাঁহাতে মগন।

—*—

শ্রীশ্রীগুরুস্তবগীতি।

জয় জয় গুরু, কল্পতরু ত্বংহি শিব-শঙ্কর।
ত্বংহি ঈশ ত্বংহি মহেশ ত্বংহি ষোড়শ ভাস্কর।

ত্বংহি দেব অনাদিরাদি,
ক্ষিতিস্ত্বং বহ্নিস্ত্বং মরুত্ত্বং আদিঃ
হরিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চি ত্বমেব,
সত্ত্ব-রজ-তম গুণাকর॥

ত্বমিন্দু ত্বমর্ক বিশ্বব্যাপক,
বিশ্বপালক বিশ্বনাশক,
বিশ্বেশ্বর বিশ্বতারক,
নিরঞ্জন নিত্য নির্ব্বিকার।

চরণে নূপুর ভ্রমর গুঞ্জন,
বিল্বদল জবা সচন্দন,
আহা মরি মরি কিবা সুশোভন,
জগ-জন-মনোহর।

কটিদেশে বাস দিক্‌বসন,
শমদমক্ষমা বিভূতি ভূষণ,
গলে দোলে মালা অতি অনুপম,
করে শোভে অভয় বর।

শিরে সুরধুনী করে কলকল,
ধক্‌ধক্ ধকে ললাটে অনল,
হাসি খল খল, আঁখি ঢল ঢল,
(গুরু) জ্ঞানানন্দ ভাবে বিভোর।

ভক্তগণ মাঝে হেলিয়া দুলিয়া,
ভাবাবেশে ভোলা নাচে বিনোদিয়া,
তাতা থৈ থৈ তাথেয়া তাথেয়া,
প্রেমে তনু গর গর।

নিবেদি চরণে সনির্ব্বন্ধে,
চির পিপাসিত শ্যামানন্দে,
দীন দয়াময় করুণাপাঙ্গে,
কণামাত্র প্রেম বিতর।

—*—

শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রাণি।

(শম্ভুনাথ বেদান্তসিদ্ধান্তবিরচিত)।

জগদীশমনাদিমনন্তগুণং
পরমেশ্বরমাদিমনীশ্বরকং।
অবিনাশিনমেকমপূর্ব্বনিধিং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকং॥১

গুরুদেব! তুমি জগদীশ্বর, তুমি অনাদি।
প্রভুহে! তোমার গুণের অন্ত নাই। তুমি

পরমেশ্বর। তুমিই আদি পুরুষ। দেব! তুমি অনীশ্বর। (তোমার আবার ঈশ্বর কে?) তুমি যে স্বয়ংই পরমেশ্বর! হে নিত্য-দেহধারি! তোমার ত বিনাশ নাই। তুমিই একমাত্র পুরুষ (পরব্রহ্ম)। (তুমিই ত বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ং?) হে চিন্তামণি! তুমি অপূর্ব্বনিধি। ভবভয়বারণ! এ দাসের (দাসীর) প্রণাম গ্রহণ কর॥ ১

মুনিযক্ষসুরাসুরনাগনরৈ
রভিবন্দিতকোমলপাদযুগং।
বিধিবিষ্ণুশিবৈরপি বন্দনীয়ং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকং॥২

প্রভুহে! যক্ষ, সুর, অসুর, নাগ, নর এমন কি বিধি বিষ্ণু শিব পর্য্যন্ত তোমার ঐ সুকোমল পাদপদ্ম যুগল বন্দনা করিয়া থাকেন। হে ভব-ভয়-হারি! দাসের (দাসীর) প্রণাম গ্রহণ কর॥ ২

বিধিমচ্যুতমীশমনন্তজগং
প্রবিনাশনপালনজন্মকরং।
ভুবি সর্ব্বশরীরিমনোহধ্যুষিতং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকং॥ ৩

গুরুদেব! তুমিই ব্রহ্মা তুমিই বিষ্ণু, তুমিই শিব। এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, পালন ও নাশ, তুমিই করিয়া থাক। এই জগৎবাসী সমস্ত জীবের মনেই তোমার অধিষ্ঠান। হে ভবভয় নাশিন! তোমাকে নমস্কার॥ ৩

অরবিন্দমনোহরপাদযুগং
নখরাজিবিনিন্দিতকোটীবিধুং।
শতসূর্য্যবিরাজিতশুদ্ধতনুং
প্রণমামি গুরুং ভব তারণকং॥ ৪

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! তোমার পদযুগল পরম রমণীয় অপূর্ব্ব পদ্ম তুল্য। তোমার নখসমূহে কোটী কোটী চন্দ্র বিরাজমান। তোমার শুদ্ধ শরীরে শতসূর্য্যের দীপ্তি বিদ্যমান। ভবতারণ! তোমাকে প্রণাম করি॥ ৪

ক্রমশঃ—

মন্তব্য।

মূর্খোবদতি বিষ্ণায় ধীরোবদতি বিষ্ণবে।
উভয়ত্র সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

ধনমদ বিদ্যামদ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা একেবারে অসম্ভব। "দীন হও, দরিদ্র হও, মূর্খ হও, পাপী হও, হতাশ হইও না। শ্রীভগবানের দয়ায় বঞ্চিত হইবে না।" এই তত্ত্ব প্রচার ও জীবের অহঙ্কার অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিবার জন্যই বুঝি জগতে "রামকৃষ্ণ পরমহংস" প্রমুখ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঐ মহাত্মাগণ কেহ কেহ নিরক্ষর সাজিয়া জগতে আসিয়া জগৎকে বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পরমহংস মহাশয়ের কথাগুলি পর্য্যন্ত নাকি অশুদ্ধ ছিল।

"ঘোলটাং" "আরাপত" (ঐরাবত) প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষা তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। শ্রীভগবান ভক্তের ভাব চাহেন, আর কিছু চাহেন না। (God looks at the heart not at the lips.) ইহাই বুঝাইবার জন্যই বুঝি এই মহাপুরুষের অবতার। ভক্তলেখনী নিসৃত ভগবদ্বিষয়িনী সমস্ত কথাই পরম উপাদেয়, ইহাই প্রচার জন্য ভক্তগণের রচিত অশুদ্ধ ভাষাযুক্ত স্তবাদিও আমরা প্রকাশিত করিব। শ্রীচৈতন্য দেবকে কোন

একটী ভক্ত একটী ভক্তি আখ্যায়িকা লিখিয়া সংশোধন করিবার জন্য দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একটু হাসিয়া, উহা ফেরৎ দিয়া বলিলেন; "ভক্তের লেখায় ভুল হয় না।" শ্রীশ্রীমৎঅবধূত জ্ঞানানন্দ দেবেরও তাহাই মত। দাক্ষিনাত্যে কোন এক দেবালয়ে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ শ্রীগীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার উচ্চারণ বা ভাষা একেবারেই অশুদ্ধ হইত। যাহারা শুনিত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ কিন্তু আপন আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া পাঠ করিতেন এবং অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতেন। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁহে বাপু, শ্রীগীতা পাঠে তোমার এত আনন্দ হয় কিসে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, গীতার অর্থ আমি সব বুঝি না, তবে যখন পাঠ করি আমার মানস চক্ষের সমক্ষে সেই কুরুক্ষেত্র আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই অর্জ্জুন-রথে সেই নব জলধর শ্যামসুন্দরের উদয় হয়, তাতেই আমার এত আনন্দ হয়।" শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমিই গীতার অর্থ ঠিক বুঝিয়াছ।"

সম্পাদক।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের উপদেশাবলী।

স্বর্ণ যদি না থাকিত তাহা হইলে স্বর্ণালঙ্কারও থাকিত না। পরমেশ্বর যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে এই সৃষ্টিও থাকিত না। ১।

কোন বিষয় প্রমাণ করিবার প্রধান অবলম্বন স্বীয় শুদ্ধ জ্ঞান এবং দর্শন। জ্ঞান দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত হইতেছে তাহাত সপ্রমাণ হইতেছেই। তাহা অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা অনুভূতি দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে তাহা কোন প্রকার তর্ক দ্বারাই অন্যথা হইবার নহে। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অনেক ভক্ত জ্ঞানী তাঁহাকে অনুভূতি দ্বারাও জানিয়া থাকেন। সেই জন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন তর্ক করা অনুচিত। তাঁহার বিদ্যমানতা যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহাদের কৃষ্ণ সাধন প্রণালী ক্রমে নিজগুরুর নির্দ্দেশানুসারে সাধন করা উচিত। তদ্বারা তাঁহারা তাঁহার বিদ্যমানতাও বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিতেও সক্ষম হইবেন। কৃষ্ণ অবধারণ করিবার উপায় অবলম্বন না করিয়া, কৃষ্ণ দর্শন করিবার উপায় অবলম্বন না করিয়া, যাঁহারা কৃষ্ণের অস্তিত্ব এবং কৃষ্ণদর্শন সম্বন্ধে তর্ক করেন তাঁহাদের বুদ্ধিও পরিমার্জ্জিত হয় নাই এবং তাঁহাদের দিব্য জ্ঞানও স্ফুরিত হয় নাই। যে শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা এবং শুদ্ধ প্রেম দ্বারা অবধারণ করিতে হয় তাঁহাকে বৃথা তর্ক দ্বারা কি প্রকারে অবধারণ করিতে পারা যাইতে পারে।

নানা প্রকার নিরাকার, নানা প্রকার সাকার এবং নানা প্রকার আকার। আত্মাও নিরাকার, মনও নিরাকার এবং বুদ্ধিও নিরাকার। অথচ ঐ তিন নিরাকার এক প্রকার নহে। ঐ তিন, তিন প্রকার নিরাকার। মানসিক অনেক বৃত্তি আছে। সেই সকল বৃত্তির প্রত্যেক বৃত্তিই নিরাকার। সেই সকল বৃত্তির প্রত্যেকটীই নিরাকার; অথচ তাহারা সকলেই এক প্রকার নিরাকার নহে তাহা

সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। তবে তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মকে কেবল নিরাকার বলিবার জন্যই ব্যস্ত কেন? নানা শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। সেইজন্য তিনি সাকার হইতে পারেন নাও বলিতে পার না। অনেক শাস্ত্রেই বিশেষতঃ নানা পুরাণে তাঁহাকে সাকার বলা হইয়াছে, এবং তিনি যে সাকার তাহা তাঁহার শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ করাও হইয়া থাকে। সেই জন্য অবশ্যই তিনি সাকারও বটেন।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম নিত্য। তাঁহার নামব্রহ্মও নিত্য। সেই শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মও সত্য, তাঁহার নামব্রহ্মও সত্য। কারণ সেই ব্রহ্মের নামও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনাদি স্বীকার করিলে তাঁহার নামও অনাদি স্বীকার করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব কথিত তত্ত্ব উপদেশ আস্বাদন।

[শ্রীশ্রীদেব যে যে বাক্য অবলম্বনে নিম্নোক্ত উপদেশগুলি বলিয়াছিলেন তাহা যথাযথ উল্লেখ করা আমার ন্যায় সামান্য স্মৃতি-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব সুতরাং এইগুলি তাঁহার বচনাবলীর সার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।]

(১) মায়া জড়, পুরুষ চৈতন্য। সেই চৈতন্য পুরুষ মায়াকে লইয়া এত কাণ্ড করেন। চৈতন্য শূন্য হইলে, মায়ার কিছুই করিবার শক্তি থাকে না। মায়া যেন একখানি তরবারি চৈতন্য যেন একজন যোদ্ধা। যোদ্ধা তরবারির সাহায্যে কত কাণ্ড করিতে পারে; কিন্তু যোদ্ধা বিহীন হইলে, তরবারি ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে মাত্র; তাহার স্বয়ং কিছুই করিবার শক্তি নাই।

(২) প্রশ্ন—অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দের পূর্ণ অবতার হওয়া কিরূপে সম্ভব? অংশে পূর্ণ কিরূপ?

উত্তর—আম্রবৃক্ষ প্রকাণ্ড। উহাতে অনেক আম্রফল ধরিয়াছে। প্রত্যেক ফলের অষ্টির (আঁটির) মধ্যে ঐরূপ একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। প্রত্যেক আম্র, বৃক্ষের অংশ। কিন্তু রোপণ করিলে প্রত্যেক আম্র হইতেই ঐরূপ অবিকল একটী প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ হওয়া সম্ভব; ইহারই নাম অংশে পূর্ণ। শ্রীভগবানের অংশে পূর্ণ অবতারও ঐরূপ, একের পৃষ্ঠে একটী শূন্য দিলে দশ হয়। দশ অর্থাৎ দশটী এক। একপূর্ণ-ব্রহ্ম যোগমায়ারূপী শূন্যের যোগে শত শত পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন। শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের বহুসংখ্যক পূর্ণরূপ ও এইরূপে হইয়াছিল।

একটী প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ জ্বালা যায়; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রথম প্রদীপের শক্তির কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় না এবং নূতন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ গুলিও শক্তিতে কোন অংশে প্রথম প্রদীপ অপেক্ষা কম নহে। সেইরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান হইতে অনন্ত পূর্ণ অবতার হইলেও তিনি যেরূপ অক্ষয় অব্যয় তাহাই থাকেন; পরন্তু সকল অবতার গুলিই এককালে সমান অক্ষয় ও অব্যয়।

(৩) প্রশ্ন—শিবোঽহং, সোঽহং কিরূপ?

উত্তর—জীব তুমি বাহ্যের দাস, প্রশ্রাবের দাস, কামের দাস, ক্রোধের দাস—আর

কৃষ্ণদাস, শিবদাস হইতে কষ্ট বোধ হয়? লজ্জা বোধ হয়? ঃঃ

[দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দেব বলিতেন "সব শালাই যদি শিব হয়, তবে নন্দী হবে কোন শালা?"—প্রকাশক]

[জীব যতদিন অহঙ্কার রূপ মহা বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ না করে তত দিন শিবদাস কৃষ্ণদাস হইতে লজ্জাবোধ করে। জীব যখন পরম সৌভাগ্যের উদয়ে শ্রীনিত্যানন্দচরণে আশ্রয় লইয়া তৃণাদপি মন্ত্রের সাধক হইতে পারে তখনই তাহার ঐ রোগের অবসান হয়। তখন সে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সোঽহং তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে সিংহের ছেলে সিংহ সমজাতীয় না হইলে, ভক্তি প্রেম সম্ভব হয় না। "গজ মক্ষিকায় প্রেম না সম্ভবে" [শিশির বাবু]

জীব যেন সূচের আগার জল বিন্দু আর শিব যেন অসীম অনন্ত মহাসমুদ্র। শিব যেন প্রকাণ্ডদেহ গঙ্গাজল রাশি আর জীব যেন প্রস্রাব বিন্দু (মলিন দূষিত জল বিন্দু)।

(৪) স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া যেরূপ ছদ্মবেশই অবলম্বন করুন না কেন, পতিব্রতা রমণীর যেমন তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব থাকে না। তাঁহাকে যেমন আর ফাঁকি দিবার যো নাই; তদ্রূপ শ্রীভগবান যেরূপ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াই জগতে আসুন না কেন, ভক্তের নিকট তাঁহার লুকাইবার যো নাই। ভক্ত তাঁহাকে চিনিবেই চিনিবে।

ঃঃ আমার মনে হয় শ্রীশ্রীদেব একদিন ঐ কথা প্রসঙ্গে যেন আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে 'শিবোঽহং' 'সোঽহং' বলা সহজ কথা নহে। যিনি বিশ্বরূপ হইতে পারেন তিনিই ঐ কথা বলিতে পারেন। জীব শিব নয় শিবের দাস ইত্যাদি। [শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

[নিবিড় অরণ্যে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও ভক্ত মধু-কর তাহার সন্ধান করিবেই করিবে। প্রকাশক]

(৫) শ্রীভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হন, ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিবা মাত্র, তাঁহাদের ইচ্ছা হয় যে অতি উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, উচ্চৈঃস্বরে জগৎ বাসীকে বলিয়া দেয়—সুসংবাদ দেয়।

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

—*—

অভেদ তত্ত্ব।

প্রকৃতি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য হিন্দু ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য উপাসনার ব্যবস্থা। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য উপাসনার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিলেও সকলেরই উপাস্য দেবতা যে মূলতত্ত্বে একই বস্তু একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সে বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্র ভূরি ভূরি প্রমাণ ও অনুশাসন প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। অপরিনত নবীন সাধক যাহাতে এই অভেদ তত্ত্ব বিষয়ে ভ্রমে পতিত না হন, তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন যুগে আবির্ভূত শ্রীভগবানের অবতারগণ ও মহাপুরুষ সকল যথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু জীব স্বভাবতঃই ভ্রান্ত; ভ্রান্তিই তাহার প্রকৃতিসিদ্ধদোষ, তাই বুঝি শাস্ত্রের এই প্রভূত চেষ্টা সত্ত্বেও সংসারের চক্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকগণের মধ্যেও এই ভেদ বুদ্ধি দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে আবির্ভূত শ্রীমৎরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই অভেদ তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্য অতি সরল যুক্তি ও ভাষায় বলিতেন;—একই মাছ কেহবা ঝোলে খায়, কেহ বা অম্বলে খায়, কেহবা ভাজা

খায়" ইত্যাদি অর্থাৎ একই ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদন মাত্র। শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দদেব এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন;— "একই স্বর্ণের কেহ বা কঙ্কণ, কেহ বা বলয়, কেহ বা হার, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।" অর্থাৎ অলঙ্কার সকলের রূপতঃ ভেদ লক্ষিত হইলেও স্বরূপতঃ সম্পূর্ণ অভেদ; একই সুবর্ণ। সেই রূপ কালীকৃষ্ণ, শিবরাম প্রভৃতি শ্রীভগবানের রূপতঃ প্রভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বরূপে সেই একই সচ্চিদানন্দ। গৃহস্থের মধ্যে যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ পিতা, কেহ মাতা কেহ ভ্রাতা বা বন্ধু, কেহ স্বামী ও কেহ বা পুত্র বলে। সম্বন্ধ ও ব্যবহারে ভাব ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কর্ত্তা সেই একই। রামপ্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণও "মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী, যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী। ওরে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সব আমার ঐ এলোকেশী" প্রভৃতি উপাসনা সঙ্গীত দ্বারা ও অভেদ তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত সংসারে জীব-হৃদয়ে ভেদ বুদ্ধির অভাব নাই।

অভেদ তত্ত্ব বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র, শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতারগণ এমন কি মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার একত্র সংগ্রহ করিতে বাসনা করিয়াছি। অগ্রে পুরাণ শাস্ত্র মত প্রকাশ করিয়া পরে অন্য অন্য শাস্ত্রাদির আলোচনা করা যাইবে। সম্প্রদায় বিশেষের মতে সাত্ত্বিক রাজসিক, ও তামসিক ভেদে পুরাণ ও তন্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। আমরা তজ্জন্য উক্ত তিন প্রকার শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথম অধ্যায়।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥

"বৃহন্নারদীয় পুরাণ"

যো ব্রহ্মরূপী জগতাং বিধাতা
তদেব পাতা হরিরূপ ভাগয়ঃ।
কল্পান্ত রুদ্রাখ্য তনুশ্চ বিশ্বং
সংগৃহ্য শেতে তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মরূপে যেই দেব ব্রহ্মাণ্ড বিধাতা,
হরিরূপে হন পুনঃ জগতের পাতা;
কাল শেষে রুদ্ররূপে বিশ্বসংহরণ,
ভক্তি ভরে করি আমি তাঁহার ভজন।

শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং
হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাং।
সংকল্প-পূর্ব্বাত্মক-মূর্ত্তিহেতুং
বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥

শিবভক্ত হৃদে যিনি শিব অবতার,
হরিদাস প্রাণমাঝে হরি রূপ যাঁর;
নিজ ইচ্ছা মূলে যাঁর মূর্ত্তির গ্রহণ,
বরেণ্য দেবের সেই লইনু শরণ।

যঃ কেশীহন্তা নরকান্তকশ্চ,
ভুজাগ্রমাত্রেণ দধার গোত্রং।
ভুভার বিচ্ছেদ-বিনোদ-কামং
নমামি দেবং বসুদেব সূনুং ॥

কেশী দৈত্য সংহারক নরক বিঘাতী,
অঙ্গুষ্ঠে ধরিলা গিরি, কমলার পতি;
ভুভার-হরণ খেলায়, আনন্দ অপার,
সেই বাসুদেব পদে নমি বার বার।

হয়গ্রীবোঽসুরং জিত্বা বেদানুদ্ধৃতবান্ পুনঃ।
মৎস্যরূপেন যো দেবস্তমস্মি শরণং গতঃ ॥

হয় গ্রীব বধি কৈলা বেদের উদ্ধার ;
মৎস্যরূপী সেই দেবে করি নমস্কার ॥

দধার মন্দরং পৃষ্ঠে ক্ষীরোদেঽমৃত মন্থনে।
দেবতানাং হিতার্থায় তং কূর্ম্মং প্রণমাম্যহং ॥

দেবতার হিতলাগি প্রভু নারায়ণ,
দয়া করি কূর্ম্ম রূপ করিলা গ্রহণ ;
ক্ষীরোদ মন্থনে কৈলা মন্দর ধারণ,
ভক্তি ভরে করি তার চরণ বন্দন।

দংষ্ট্রাঙ্কুশেন যোঽনন্ত সমুদ্ধৃত্যার্ণবাদ্ধরাং।
তস্থাবেবং জগৎ-কৃৎস্নং তংবরাহং নমাম্যহং ॥

অদ্ভুত বরাহরূপ ধরি জগন্নাথ,
অতল সাগর তলে করি দন্তাঘাত,
উদ্ধারি ধরায়, পুনঃ করিলা স্থাপন ;
প্রেম ভরে ভজি আমি তাঁহার চরণ।

প্রহ্লাদং রক্ষিতুং দৈত্যং শিলাপ্রকঠিনোরসং।
বিদার্য্য হতবান্ দৈত্যং তংনৃসিংহং নমাম্যহং ॥

প্রহ্লাদের তরে নর-সিংহ অবতার,
অদ্ভুত রূপ ধরি হিরণ্য-সংহার ;
শিলাসম সুকঠিন সেই দৈত্যকায়,
ভেদন করিলা প্রভু, নমি তাঁর পায়।

লব্ধাবৈরোচনাদ্ভূমিং পদ্ভ্যাং দ্বাভ্যামতীত্য যঃ
আব্রহ্মভুবনং ক্রান্তং বামনং তং নমাম্যহং ॥

বিরোচন-পুত্র বলী ছলের কারণ,
অপূর্ব্ব বামনরূপ ধরি নারায়ণ ;
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করি আক্রমণ,
করিলা করুণা, ভজি তাঁহার চরণ।

হৈহয়স্যাপরাধেন চৈকাবিংশতি সংখ্যয়া।
ক্ষত্রিয়ানাজঘানৈব জামদগ্ন্যং নমাম্যহং ॥

হৈহয়ের অপরাধ স্মরি পরমেশ,
জমদগ্নিসুত দেহে করিয়া আবেশ ;
একবিংশ বার কৈল ক্ষত্রিয় সংহার,
ভক্তিভরে কর যোড়ে, পায়ে নমি তাঁর।

আবির্ভূতশ্চতুর্দ্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ।
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিংভজে ॥

দয়া করি পরমেশ হরিতে ভূভার,
নিজ দেহে চারি অংশে নর অবতার ;
কপিগণ সহ কৈল রাক্ষস-নিধন,
দাশরথি রামচন্দ্র ভজ মোর মন।

মূর্ত্তিদ্বয়ং সমাশ্রিত্য ভূভারমপহৃত্য যঃ
মূষলেন হলাগ্রেণ তং রামং সততং ভজে ॥

ধরাদুঃখ জগন্নাথ করিবারে দূর,
রামকৃষ্ণ রূপে কৈলা করুণা প্রচুর ;
মূষলে হলের অগ্রে অসুর দমন,
সতত ভজরে সেই কমল নয়ন।

ভূম্যাদি-লোক-ত্রিতয়ং সংহৃত্যাত্মানমাত্মনা।
পশ্যন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে তমীশানম্ ভজাম্যহম্ ॥

ত্রিলোক সংহার কর্ত্তা পরমাত্মা হয়ে
যোগিগণ আত্মারূপে সদাদৃষ্টি রয়ে,
তিনিই মঙ্গলময় জগতের গুরু,
তাহারে ভজিলে পাই মোক্ষ কল্পতরু।

যুগান্তে পাপিনোঽশুদ্ধাং ছিত্বা তীক্ষ্ণাসিধারয়া
স্থাপয়ামাস যো ধর্ম্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহং ॥

যুগশেষে তীক্ষ্ণ অসি করিয়া গ্রহণ,
অশুদ্ধ পাপীর শির করিলা ছেদন ;
সত্যাদি যুগের সৃষ্টি ধর্ম্মের স্থাপন,
মন প্রাণ সঁপি ভজ সেই নারায়ণ।

আত্মন্যাত্মানমাধায় যোগিনঃ গতকল্মষাঃ।
পশ্যন্তি যং জ্ঞানরূপং তমস্মি শরণং গতঃ ॥

নিষ্পাপ শরীর যত যোগী মহাজন,
আত্মায় করিয়া নিজ আত্মার স্থাপন,
জ্ঞানরূপ মহাদেবে করিছে দর্শন ;
ভক্তি-ভরে নিনু মুই তাঁহার শরণ।

সাংখ্যাঃ সর্ব্বত্র পশ্যন্তি পরিপূর্ণাত্মকং হরিম্।
তমাদিদেবমজরং জ্ঞানরূপং নতোঽস্ম্যহম্ ॥

নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে-যত-সাংখ্য-যোগিগণ,
পরিপূর্ণ শ্রীহরির করেন দর্শন ;
অনাদি অজর সেই দেবের স্বরূপ,
ভক্তিভরে নমি আমি সেই জ্ঞানরূপ।

অজ্ঞা ভজন্তি বিশেশং পাষাণাদিষু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র-সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমং

প্রতিমাদি-পূজাতত্ত্বে যত মূঢ় জন,
সর্ব্বব্যাপী জগদীশে হ'য়ে বিস্মরণ,
শিলাদিতে শুধু করে প্রভুর ভাবনা ;
পরম পুরুষে সেই করিনু বন্দনা।

কর্ম্মাণি যস্য রূপাণি তপাংসিচ মহাত্মনঃ।
জ্ঞানরূপঃ সদাকাম্যস্তমীশং সততং ভজে ॥

কর্ম্মকাণ্ড-রূপে যিনি জগতে প্রকাশ,
জ্ঞানরূপী মহাদেব জ্ঞানের বিকাশ;
জীবের সমীপে যিনি কামনার ধন,
সেই পরমেশে মুই করিব ভজন।

সর্ব্বতত্ত্বময়ং শান্তং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরং।
সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ং ॥

সর্ব্বতত্ত্বময় দেব প্রশান্ত-মূরতি,
স্বেচ্ছায় সৃজিলা এই জগৎ-সংহতি ;
সহস্র-সহস্রশির যাঁর বিশেষণ,
ভাবময় প্রভু মোর সুধন ভজন।

যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং জগৎ-স্থাবরজঙ্গমং।
দশাঙ্গুলং যোঽত্যতিষ্ঠৎ তমীশমজরম্ ভজে ॥

ভূত ভবিষ্যৎ আর যত বর্ত্তমান,
স্থাবর জঙ্গম আদি জগৎ প্রমাণ,
দশাঙ্গুল অতিক্রমি যাঁহার স্থাপনা,
অজর ঈশ্বরে সেই করিনু ভজনা।

আদি-সর্গে-মহাবিষ্ণুঃ স্বপ্রকাশোজগন্ময়ঃ।
গুণভেদমধিষ্ঠায় মূর্ত্তিত্রয়মবাপ্তবান্ ॥

সৃষ্টির আদিতে প্রভু মহাবিষ্ণু নাম,
স্বপ্রকাশ বিশ্বময় হরিগুণধাম ;
সত্ত্ব-রজ-তম গুণ করিয়া গ্রহণ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্র মূর্ত্তি করিলা ধারণ।

যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথা মুনে।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥

জগৎব্যাপক হরি প্রভু বিশ্বম্ভর,
অভেদ শকতি সনে শুন মুনিবর ;
অঙ্গারে দাহিকাশক্তি যেরূপ প্রকাশ,
শক্তি আর শক্তিমান একত্র বিকাশ।

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহৈন্দ্রীতি চাপরে ॥

ব্রাহ্মীতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি মায়েতিচ তথাপরে।
প্রকৃতিশ্চ পরাচেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥

সেয়ংশক্তিঃ পরাবিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী।
ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্যব্যবস্থিতা ॥

সেই পরাশক্তি কভু ধরে উমানাম,
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী বাস বিষ্ণুধাম ;

গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী,
ভদ্রকালী, মাহেশ্বরী, মহেশগৃহিণী ;
চণ্ডিকা, কৌমারী, ব্রাহ্মী কেহ বা বারাহী,
কেহ ঐন্দ্রী, কেহ বিদ্যা, বৈষ্ণবী ভারতী ;
কেহ বলে তিঁহ মায়া অবিদ্যারূপিণী,
পরমা প্রকৃতি তাঁরে বলে ঋষিমুনি,
নারায়ণপরাশক্তি জগতব্যাপিনী,
সৃজন, পালন আর সংহারকারিণী।

পরংব্রহ্মাভিধানস্তু যস্মিন্ নির্ম্মলতেজসি।
প্রোচ্যতে হ্যুপচারেণ বাচা মানসগোচরে ॥
স দেবঃ পরমঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বাদিগুণ-ভেদতঃ।
মূর্ত্তিত্রয়ং সমাপন্নঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ॥

বাক্য-মনদ্বারা যাঁর না হয় ধারণা,
পরব্রহ্ম নামে যাঁর না হয় বর্ণনা ;
পরম বিশুদ্ধ দেব তেজঃ স্বরূপ,
সৃষ্টি আদি তরে ধরে তিন-গুণ-রূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

প্রকাশক শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।

এই জগৎ চিচ্ছক্তি-অভাবেই জড় ও মর হয়। সেই শক্তির ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি, এবং সেই শক্তির বর্ষণ-কর্ষণ কিরূপে হয় বুঝিতে হইলে সেই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগন্মাতা আদ্যা প্রকৃতিকে ধারণা-স্তম্ভে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপ শক্তিমান চিদানন্দ বা জ্ঞানানন্দ-ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতে হয়। চিদর্থে জ্ঞান এবং আনন্দার্থে স্ফূর্ত্তি যথা—

প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ।

আত্ম-বোধ, ২৩ ॥

অর্থাৎ যেমন প্রকাশই সূর্য্যের গুণ, শৈত্যই জলের গুণ, উষ্ণতাই অগ্নির গুণ, তেমনি সৎ (সত্ত্বা), চিৎ (জ্ঞান), আনন্দ (স্ফূর্ত্তি) ও নিত্য-নির্ম্মলতা আত্মার গুণ।

সুতরাং সেই পরমাত্মা, চিদানন্দ বা জ্ঞানানন্দ, জীবাত্মার জ্ঞান-গোচর না হইলে তাঁহার জাগতিক বিবর্ত্তন-পদ্ধতির সিদ্ধান্ত-কল্পে জীব-বুদ্ধির মীমাংসা সমীচীন নহে। কিন্তু জীবের পক্ষে জ্ঞানানন্দ লাভ করা বড়ই দুরূহ-ব্যাপার ; কারণ তিনিইত শক্তির শক্তিমান। চিদর্থে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে। আবার চিদর্থে আত্মাকেও বুঝাইতেছে। যথা—

ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতম্।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যোহ্যেকশ্চিদাত্মকঃ ॥
(অপরোক্ষানুভূতি, ৫৮।)

অর্থাৎ গুণত্রয়-বিনির্ম্মিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন-অবস্থাই মিথ্যা। এই অবস্থা ত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ আত্মাই নিত্য। সুতরাং বুঝা যায় যিনি চিদানন্দ তিনিই নিত্য বা জ্ঞানানন্দ এবং তিনিই পরমাত্মাস্বরূপ শক্তিমান। সেই জ্ঞানানন্দ পরমাত্মা যোগমায়া-দ্বারা সর্ব্বদা সমাবৃত থাকেন বলিয়া জীবাত্মার সহজ-সাধ্য নন। যথা—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ং ॥

(গীতা, ৭ম অঃ, ২৫) ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-ছেন ;—"হে পার্থ! আমি যোগমায়া-দ্বারা সমাবৃত থাকি বলিয়া সাধারণের নিকট

প্রকাশমান নহি। সেই জন্য মূঢ়গণ আমার অব্যয়স্বরূপ জানিতে পারে না।”

মায়াবরণে তিনি এত উচ্চস্থানে থাকেন যে কোন কোন ভ্রান্ত দেহী তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় স্থান লক্ষ্য মাত্রেই সন্তুষ্ট চিত্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বীকার করতঃ তাঁহার স্বরূপলাভে বীতস্পৃহ হইয়া আপন আপন জীবনের অমূল্য সময় অজ্ঞতায় নষ্ট করিয়া থাকেন। এমন কি শাস্ত্রে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে সুরগণও তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। যথা—

“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥” (ঋক্ বেদ ১ম মঃ,)॥

অর্থাৎ “সুরগণ বিষ্ণুর সেই পরমপদ (সর্ব্বোচ্চ স্থান) আকাশস্থিত চক্ষুর ন্যায় (চক্ষু এখানে গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় স্থান) সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।” কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু ভক্তিমান সাধক তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি অনুরাগ-অভিলাষবলম্বনে শনৈঃ শনৈঃ ব্যোমপথ ভেদ করতঃ চিদাকাশে গিয়া পৌছিতে পারেন, তবেই তিনি জ্ঞানানন্দ-লাভে কৃতকার্য্য হন। যোগমায়া শক্তি নিজেই তখন সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দেন। শক্তি নিজেই তখন জীবের জীবত্ব ধ্বংস করিয়া গোলোকদ্বার মুক্ত করিয়া দেন। ঐ অনুরাগবশেই জীবাত্মা প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন। ঐ অনুরাগেই প্রেমের উৎপত্তি। প্রেমেই হ্লাদিনীশক্তি আত্মবিহ্বলা। সুতরাং অনুরাগ দ্বারা যিনি শক্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারেন, তাঁহার জ্ঞানানন্দ-লাভ সুদূরপরাহত। শক্তি-অভাবে যেমন জগতের সমুদয় বস্তুই জড় হইতে পারে, সেইরূপ শক্তি-অভাবে জীবাত্মাও জড় হইতে পারেন। জীবাত্মার ধ্বংস না থাকিলেও জীবাত্মার নিষ্ক্রিয়াবস্থাই জড়ত্ব। শক্তি আত্মাকে চালিত না করিলে আত্মার জড়ত্ব, জীবত্ব ভোগ হয় না। মন-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া অনুরাগী হইতে পারিলে তবে শক্তি আত্মাকে সক্রিয় করিয়া জ্ঞানানন্দধামে চালিত করিতে পারেন। আত্মোন্নতিক্রিয়া যে জীবাত্মায় নাই তাহা নিষ্ক্রিয়াবস্থা বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। মন-বুদ্ধি দ্বারা জীবের আত্মোন্নতি হইতে পারে না। কেন না মন-বুদ্ধি জড়। জড়ের দ্বারা আত্মার কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। যথা—

“আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়ানিচ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে॥
(আত্মবোধ ২৭)।

অর্থাৎ “দীপ যেমন ঘটাদিকে প্রকাশ করিতে পারে, ঘটাদি দীপকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জড়েন্দ্রিয় বুদ্ধ্যাদি আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না।” তথা আরও প্রকাশ পাওয়া যায় যে আত্মারও বিকার নাইএবং বুদ্ধিরও বোধ নাই। যথা—

“আত্মনোবিক্রিয়ানাস্তি বুদ্ধের্ব্বোধনজাত্বিতি।
(আত্মবোধ, ২৫।)

অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; যে, মন-বুদ্ধি দ্বারা আত্মার কার্য্য সাধিত হয় না; জ্ঞানরূপিণী শক্তি দ্বারাই আত্মা চালিত হন; শুদ্ধ ‘আত্মা’ কেন, জগৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সকলই শক্তি দ্বারা বেগবান হইয়া চালিত হন। এবং প্রকৃতি দ্বারাই সৃষ্ট ও পুষ্ট হন। প্রকৃতিই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া স্বধর্ম্ম সাধন করেন এবং জগতকে রক্ষা করিয়া স্বকর্ম্ম পালন করেন। তিনি শক্তি বর্ষণ করিয়া সৃজন করেন এবং কর্ষণ করিয়া পালন করেন।

অর্থাৎ চিচ্ছক্তি ঘর্ষণ করিয়া জগতকে সৃজন করেন এবং জগৎ হইতে সার বস্তু কর্ষণ করিয়া জীবাত্মাকে রক্ষা করেন। শক্তি ওতোপ্রোত ভাবে জীবাত্মায় সংসৃষ্ট থাকিয়া জীবাত্মাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি বল-সঞ্চয়ের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা রূপে জীবাত্মাকে পরিশ্রান্ত করেন ও খাদ্য রূপে জীবাত্মার পুষ্টি সাধন করেন এবং নিদ্রারূপে জীবাত্মার ক্লান্তি দূর করেন। যথা—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণা-রূপেণ সংস্থিতা ;
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃপ্তিরূপেণ সংস্থিতা ;
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ;
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"চণ্ডী।

এইরূপে প্রকৃতি স্বার্থগত ভাবে জীবাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। আবার জীবাত্মা প্রকৃতি দ্বারাই বিবর্ত্তন-স্রোতের ক্রীড়নক হইয়া বারংবার ভবসমুদ্রে পড়িয়া ভাঁটাবৎ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-রক্ষা কল্পে প্রকৃতি ইহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন। প্রকৃতি শক্তিস্বরূপিণী বটেন কিন্তু সৃষ্টি-প্রকরণে বহুরূপী হইয়া আবার জীবাত্মাকে বিভীষিকাও প্রদর্শন করেন। জীবাত্মার এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার আবার শক্তিই একমাত্র কারণ। ভক্তিবশে শক্তিই দিব্যজ্ঞান দ্বারা জীবাত্মাকে নির্ম্মল করিয়া জ্ঞানানন্দের দর্শন-পথ মুক্ত করিয়া দেন। এই জন্যই তিনি ধন্যা। কারণ তিনিই চৈতন্যরূপী জ্ঞান দ্বারা জীবাত্মার জীবত্ব নষ্ট করিয়া জ্ঞানানন্দ বা চিদানন্দ উপভোগ করান। জ্ঞানই চৈতন্য। যথা—

"উচ্ছিষ্টংসর্ব্বশাস্ত্রাণিসর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যক্তংচেতনাময়ং ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র, ৫২ ॥)

অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন "হে দেবি! সর্ব্ব শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং যাবতীয় বিদ্যাই পণ্ডিতগণের মুখে মুখে আছে কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ অব্যক্তরূপী যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।"

ক্রমশঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর,
তপত-কাঞ্চনকায়।
নাচিয়ে নাচিয়ে, নিজগুণ গেয়ে,
ঢলি পড়ে গোরা রায়।

রাধা-ভাবে হরি, আপনা পাসরি,
নয়নে বহিছে বারি।
ত্যজিয়ে মুরলী, দিয়ে করতালি
হরি হরি বলে হরি ॥

ডাকে উচ্চ-রবে, কে প্রেম লইবে,
এসহে আমার কাছে।
প্রাণ গদাধর, ধর প্রেম ধর,
বিলাও ভকত মাঝে ॥

প্রেমেতে মাতিয়ে, ভুবন ভুলা'য়ে,
বিভোর হইয়ে নাচে।
চরণে নূপুর, মরি কি মধুর,
রুনু রুনু রুনু বাজে ॥

চলিত কোঁচায়, কিবা শোভা পায়,
জগজন-মনটলে।
হেরি রূপরাশি, যেন কোটী শশী,
নয়ন চকোরে ভোলে॥

গলে গুঞ্জ-হার, মরি কি বাহার,
মৃদুল মৃদুল দোলে।
দিক করে আলা, ফরে ঝল মলা।
ভুলায় ভকতদলে॥

শ্রীমুখ-সরোজে, কি শোভা বিরাজে,
তাহাতে মৃদুল হাসি।
কত অলি-বৃন্দ, পেয়ে মকরন্দ,
আনন্দে জুটিল আসি॥

শিখি-পুচ্ছ উড়ে, হয়ে নত চূড়ে,
চরণ পাবার আশে।
তাহে গুঞ্জ ফল, করে ঝল ঝল,
মেঘেতে বিজলী হাসে॥

কি চাঁচর কেশ, মনোহর বেশ,
কুণ্ডল শোভিছে কানে।
বারেক যেজন, হেরে সে বদন,
পাসরে আপন প্রাণে॥

নদীয়া নাগরি, আয় ত্বরা করি,
ডুবিগে গৌরাঙ্গ-হ্রদে
প্রেম-সরোবরে, রসিক নাগরে,
ধরিতে চরণ ছেঁদে॥

হৃদয় ডুবিল, পরাণ মজিল,
কি ল'য়ে গৃহেতে যাব;
কুল মান দিয়ে, চরণে বিকা'য়ে,
গোরাগত-প্রাণা হব॥

হরি নাম ল'য়ে, হরি-গুণ গেয়ে,
ফিরিব ভবের মাঝে।
দুটী বাহু তুলি, হরি হরি বলি,
তুষিব হৃদয়-রাজে॥

গণেশ-হৃদয়ে, সদয় হইয়ে,
সতত দিওহে দেখা।
যেন শেষ-দিনে, তোমা হেন ধনে,
ভুলি না ভুলি না সখা!

শ্রীমতী—

রংপুর।

নব-জীবন।

যখন পরিণাম না ভাবিয়া আপাতমধুর সাংসারিক সুখ-সম্ভোগে আত্মা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিলাস-ব্যসনে সতত প্রবৃত্ত ছিলাম, তখন একবারও ভাবি নাই, ইহার আশানিবৃত্তি হইতে কি প্রকার ভয়ঙ্কর ফল প্রসূত হইবে। প্রথমতঃ সুগন্ধি-বিলেপন-ভ্রমে-তীব্র জ্বালাময় বিষাক্ত পদার্থে বিলাস-রাগ করিয়া প্রাণ-সুশীতল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই বেশ অনুভব করিলাম ইহা শরীরের শান্তি-বিধায়ক সৌগন্ধময় শীতল পদার্থ নহে; শারীরিক জ্বালাবিশিষ্ট অশান্তিময় পদার্থ। ইহার তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্য পার্থিব ভ্রান্তিসঙ্কুল উপায়-সকল একে একে অন্বেষণ করিয়াও যখন অকৃত-কার্য্য হইয়া আরও জ্বলিয়া পুড়িয়া জীবনে হতাশ

হইতেছিলাম, তখন একদিন কে যেন আচম্বিতে আমায় বলিয়া দিল:—"মূর্খ! এ উপায়-অবলম্বনে কি আর এ জ্বালার শান্তি হইবে? এ জ্বালার নিবৃত্তি করিতে পার্থিব সমস্ত অনিত্য-কৌশল, সমস্ত অনিত্য-উপায় ব্যর্থ হইবে। তবুও জ্বলুনির নিবৃত্তি হইবে না—'জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে।' ইহার উপর কেবল এক-প্রকার অব্যক্তশক্তির অপ্রতিহত প্রভাব; তাহারই এক নাম নির্ম্মলশান্তি বা চৈতন্য-শক্তি। এই শক্তিরই বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় অত্যল্প-সময়-মধ্যেই সাংসারিক সমস্ত জ্বালার নিবৃত্তি হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। কেবল ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই অনায়াসে তাহা লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সময় থাকিতে থাকিতে এই শক্তি লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, অহনিশি কেবলই তাঁহার অন্বেষণ করিতে থাকেন সুধু তাঁহারাই সফলতা-লাভে সমর্থ হইয়া, নির্ম্মল শান্তি-সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন, নতুবা বিপুল-বিত্ত, সুধা-ধবলিত সৌধমালা, বিলাস-ব্যসন, আভি-জাত্যের অভিমান, সাময়িক-বন্ধুর সাদর-সম্ভাষণ, পত্নীর প্রেম, পুত্রকন্যার আনন্দ-কোলাহল, রূপ-যৌবন, পাণ্ডিত্য এবং উপাধির অভিমান, এ সকলই জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিক-জ্যোতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষণিক-আনন্দ দান করিতেছে বটে—কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই আবার নিরানন্দরূপ নৈশ অন্ধকারে সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। হইতে পারে অনেকেই সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ ভাবিয়া, সুধু তাহারই সেবায় অহোরাত্র জীবন-পাত করিতেছে—জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে—তথাপি শান্তিসলিল-সিঞ্চনের কোনই ব্যবস্থা করিতেছে না। ওহো! তাহারা কি ভ্রান্ত! কেন না ছলে, বলে, কৌশলে, দস্যুতা, চৌর্য্য এবং চাটুবৃত্তি অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পুত্রকলত্রাদি-দ্বারা পরিবৃত হইয়া, ক্ষণিক আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করিতে পারে না। উল্লিখিত সম্পদলাভে সমর্থ হইয়াও সময় সময় মনে হইবে কি যেন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ চেষ্টা সত্ত্বেও সেই অপূর্ণতার নিদান আবিষ্কৃত হইবে না; কেবল আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু নিবৃত্তি হইবে না। তোমার সমধর্ম্মীর নিকট যাইয়া যেখানে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেইখান হইতেই ঐ একই উত্তর পাইবে। তাহার কোনই ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইবে না।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি একমাত্র চৈতন্য-শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবেই উহার পূর্ণতা হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই শক্তি লাভ করিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন? উত্তর—সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। সৎগুরু ব্যতীত অন্য কেহ সে শক্তি তোমাকে দিতে পারেন না। বলিতে কি অন্য কেহ সেই শক্তির নিকট পৌছিতেও পারিবে না। দূর হইতেও কোন দিন তাহার আভাদর্শন করিয়াছে কি না তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। শক্তিময় সৎগুরুই সেই শক্তির প্রকাশক এবং প্রচারক। যুগে যুগে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন হইতেছে, সেইখানেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া, সেই শক্তি বিতরণ করতঃ তত্তৎ দেশের দুর্ব্বল নরনারীহৃদয়ে নববলের সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। তিনিই ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, আগম-নিগম-তন্ত্র-প্রবক্তা শিব। সৎগুরু ইঁহাদেরই শক্তির প্রবাহ; অর্থাৎ ইঁহারাই—ধর্ম্মের গ্লানি দূর, দুষ্কৃতি-দমন, সাধুদিগের ত্রাণ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ

গুরুরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার-হরণ করিতেছেন। এখন বিষম সমস্যা উপস্থিত। আমার ভাগ্যে এরূপ দুর্লভ সৎগুরু মিলিবে কি না? ইহা অসম্ভব; আমি এমন কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে যাহার মাহাত্ম্যে এ হেন দুর্লভ-রত্ন-লাভে সমর্থ হইব? লাভ হইতে পারে; আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান এবং ভক্তির সাহায্যে, দৃঢ়তা-অবলম্বনে, সর্ব্বথা সাধুতার অন্বেষণ করিলে দুর্লভ বস্তুও সুলভ হয়। ইহা কাল্পনিক নহে, ধ্রুব-সত্য। আমিও বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিলাম ইহা যৌক্তিক বটে। তদনন্তর যেখানে যাহার নিকট যাই সেটী আর মিলে না। প্রত্যহ খুন্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। হুজুগে পড়িয়া কত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, পেশাদার গুরু প্রভৃতির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম কিন্তু কেহই যেন সরল নহে; সকলেই যেন আমারই মত দু'চার বিষয়ে দুর্ব্বলতা ভোগ করিতেছে; কেহ বা দুর্জ্জয় কামনার আগুনে পুড়িতেছে; কেহ বা স্বার্থের বিলোল-কটাক্ষ করিতেছে, কেহ বা মান, প্রতিপত্তি, জাত্যভিমান প্রভৃতিতে স্ফীত-বক্ষ। কেহ বা পাণ্ডিত্যের ধ্বজা উড়াইয়া জগৎকে তৃণজ্ঞান করিতেছে; এবং কেহ বা স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস অন্যের নিকট প্রচার করিতে যাইয়া ধর্ম্মান্তরের নিন্দাবাদ করিতে ব্যস্ত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আরও ক্রমশঃই হতাশ হইয়া পড়িতেছিলাম। ইত্যবসরে—জানি না কোন পুণ্য ফলে—একদা রংপুর নবাবগঞ্জের কোন ঔষধালয় হইতে ক্ষেপা বাউলের সুরে একটি গীত বহুবর্ষের মানসিক অবসাদ অপনোদন করিয়া আমায় বলিয়া দিল "তুমি যাঁহাকে সতত অন্বেষণ করিতেছ, দেখ গিয়ে সেই অধর মানুষ হুগলী-সহরের চকবাজার আলো করিয়া বসিয়া আছেন।" কতদিন কত গান শুনিয়াছি —কই, কখন এমন আকর্ষণেত পড়ি নাই। কি এক অজ্ঞাত-শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই যেন ডাক্তার-খানায় প্রবেশ করিলাম। বেলা তখন অনুমান ৪॥৹টা রবিবার—গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলাম কয়েকটী নিষ্কলঙ্ক-মূর্ত্তি তথায় আসীন। তাঁহাদের আনন্দঢল-ঢল মুখচ্ছবি দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহারা সংসারের পাপ-তাপ এবং প্রলোভনের অতীত হইয়া নিষ্কলঙ্ক ফুলের মত অর্ঘ্যরূপে বিভুচরণে উৎসর্গীকৃত। প্রসঙ্গরূপে আমার অতীত-সুখ-স্মৃতির সহিত জড়িত রাখিবার জন্য তাঁহাদের নাম এখানে প্রকাশিত হইল:—শ্রীযুক্ত নৃত্য-গোপাল গোস্বামী এবং ডাঃ বিশ্ববন্ধু মজুমদার এল্, এম্, এস্। তাঁহারা এই স্মরণীয় দিনে, আমার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যেন তাঁহারা প্রভুর শ্রীচরণ-রেণু হইয়া এই অধম লেখকের সর্ব্বক্ষণ শিরোভূষণ হইয়া থাকুন। হে দেব! হে অনন্ত-শক্তিময় গুরো! আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে?

ডাক্তার বিশ্ববন্ধু এবং নৃত্য দাদার উত্তেজনায় সেই দিনই আমি ডাক্তারের নিকট হইতে ৫টী মুদ্রা ধার করিয়া হুগলী-সহরের সেই অধর মানুষকে ধরিবার জন্য রাত্রি প্রায় ৭॥৹টার সময় রঙ্গপুর হর পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে রঙ্গপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই ট্রেণ ছাড়িল। সমস্ত রাত্রি হুগলী-সহর, চকবাজার ভাবিতে ভাবিতে উষার ক্ষীণ-হাসির সঙ্গে আমার ক্ষীণ-আশা মিশ্রিত করিয়া সারাঘাটে উপস্থিত হইলাম। এবং যথাসময়ে ফেরি-ষ্টিমার-যোগে পদ্মা পার হইয়া দামুকদিয়া ঘাটে দার্জ্জিলিং মেল ট্রেণে আরোহণ করিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ ছাড়িল। পোড়াদহ এবং রাণাঘাট জংশনের সহিত অত্যল্প সময় মাত্র

সংপর্ক রাখিয়া বেলা অনুমান ৯॥• টার সময় নৈহাটী-জংশনে উপনীত হইলাম। (আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে নৈহাটী জংশনে দার্জ্জিলিং মেল-ট্রেণ থামিত।) তদনন্তর অজ্ঞতার জন্য হুগলী-ঘাট-ষ্টেশনের টিকেট ক্রয় না করিয়া ব্যাণ্ডেলের ১খানি টিকেট ক্রয় করিলাম। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্যাণ্ডেলের ট্রেণ আসিলে তাহাতে আরূঢ় হইয়া পতিত-পাবনী ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়াই হুগলী ঘাট-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং কালবিলম্ব না করিয়া অন্যান্য যাত্রীর দেখাদেখি আমিও অবতরণ করিলাম। টিকেটখানা দিয়া নীচে নামিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তারপর কিছু-দূর যাইতে না যাইতেই সম্মুখে একজন লোক দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; "ভূদেব বাবুর বাগান-বাড়ী কোথায় ?"

সে তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। আমার সঙ্গে ডাক্তার বাবুর একখানা প্ল্যান ছিল। তাহাতে ধোপাপাড়া এবং মোগলপুর লেনের নামোল্লেখ থাকায়, তাহাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তখন সে বলিল,— "মহাশয়! আপনি রাস্তা-ভুল করিয়াছেন। ধোপাপাড়া-লেন ষ্টেশনের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।" আমি তাহার এই শেষ উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ উত্তর পশ্চিম-দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই, ধোপাপাড়া-লেন প্রাপ্ত হইলাম। ধোপাপাড়া-লেন ধরিয়া পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ যাইতে যাইতে অনেক কষ্টে আশ্রমের পশ্চাৎভাগের দরজার নিকট উপস্থিত হইবামাত্রই হরি বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তারপর আমি হলের ভিতরে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলে কিছুক্ষণ পরেই আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া অনেকেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া কানাকানি করিতে লাগিলেন। আমি তথাকার সকলেরই অপরিচিত—কাজেই আমি রঙ্গপুরের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে কেহই আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া,আমাকে হয়ত সকলেই কোন বিরুদ্ধবাদীর গুপ্তচর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তদ্ধেতু তাঁহারা আমার গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অনবরত আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "না মহাশয়! এত আর পান্থ-নিবাস নহে যে পথিকগণ এখানে অবস্থান করিতে পারিবেন।" কেহবা বলিতে লাগিলেন, "এটী একটি সাধুর আশ্রম তাঁর শরীর বড়ই অসুস্থ, তিনি অধিকাংশ সময় কোলাহল-শূন্য স্থানে থাকেন। আমরাই তাঁহার দর্শন পাই না, অন্যেরত দূরের কথা।" তৎকালে যদিও এই সকল বাক্যবিন্যাস হইতে-ছিল তবুও আমি আশা পরিত্যাগ করিলাম না। দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট রহিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরেই জনৈক বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণী আসিয়া সকলকে জ্ঞাপন করিলেন যে, রঙ্গপুর হইতে ডাক্তার যাহাকে পাঠাইয়াছে ঠাকুর তাহাকে থাকিতে বলিলেন। এই বিজ্ঞাপনীর সঙ্গে সঙ্গেই সব * নীরব—নিথর। তখন আমার স্নান-আহারের আয়োজন এবং আদর-অভ্যর্থনার পালা পড়িল। আমি শ্রীশ্রীদেবের এই আদেশের ভিতর দিয়াই তাঁহার অসীম করুণা

* বোধ হয় আমার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্যই অন্তর্যামী ভগবান ভক্তদের ভিতর দিয়া এই সকল বাধা ঘটাইতেছিলেন। যখন বুঝিলেন ঠিক থাকিতে পারিব তখনই ঐ আদেশ। (লেখক।)—

এবং অন্তর্যামীত্ব অনুভব করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। এবং মনে মনে স্বীয় সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। কিন্তু এই আনন্দের ভিতর দিয়া উৎকণ্ঠার একখানি কাল মেঘ আসিয়া আবার সব ঢাকিয়া ফেলিল। যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই ইহা আরও ঘনীভূত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে দেখি, যে যেখানে যেভাবে ছিল, সে সেখান হইতে সেই ভাবে ঠাকুরের ঘরের দিকে ছুটীতেছে। আমাকেও একজন ডাকিলেন "মহাশয়! আসুন।" আমিও দ্বিরুক্তি না করিয়া কৌতুহল-পরবশ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলাম ঠাকুরের ঘরের দরজা খোলা হইয়াছে; ভক্তগণ সসম্ভ্রমে নিঃশব্দে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণত হইলাম। এবং কিয়ৎকাল পরে মস্তক উত্তোলন করতঃ যাহা দেখিলাম তাহা পার্থিব জগতে দুর্লভ। সেরূপের তুলনা নাই। আমার দুর্ব্বল-ভাষা তাহা বর্ণনায় অক্ষম; সুতরাং বর্ণনাতীত। সার্থক-নয়ন তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ নির্নিমেষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিবা আকর্ণবিস্তৃত আনন্দ-ঢুলু-ঢুলু-পঙ্কজ-নয়নদ্বয়। একে ঈষৎ রক্তিম সর্ব্বাঙ্গীন আভা তাহাতে আবার অরুণ-বসন সংযোজিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। পঙ্কজানন হইতে অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী নির্গত হইয়া উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। কাহাকেও বা স্বাগত-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কুশল এবং পান-ভোজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে আমার উপর সুদৃষ্টি নিপতিত হইল। যেন আমি তাঁহার কত পরিচিত; কত আপনার। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শারীরিক মঙ্গল ত? বাটীর সকলে ভাল আছেন ত? গোঁসাই বিশ্ববন্ধু এবং অন্যান্য সকলের কুশল ত?" আমি উল্লিখিত প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর দিয়া নীরব হইতেছি এমন সময়ে আবার প্রশ্ন হইল—"আপনার আহার হয়েছে ত?" শ্রীশ্রীদেবের তৎকালীন এই অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অলৌকিক ভাব দর্শনে বোধ হইল যেন আমি সুধা-হ্রদে নিমজ্জিত রহিয়া এক একবার অগণ্য-তারকাবেষ্টিত সুধানিধির বদন-সুধা পান করিতেছি। আর মনে মনে চিন্তা করিতেছি "দর্শনে এত আনন্দ না জানি স্পর্শনে বা কত।" এই রূপজ্যোতিতে বিদগ্ধ না করিয়া কৌমুদী নিশার কৌমুদী-রাশির ন্যায় স্নিগ্ধতা উপভোগ করায়; ইহার অমল-জ্যোতি শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায়। যে ভাগ্যবান পুরুষ এই রূপ একবার দর্শন করিয়াছেন তিনি পাপতাপপূর্ণ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া নির্ম্মল শান্তির অঙ্কে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে পারেন। আর এই ভোগে যিনি বঞ্চিত তাঁহার ন্যায় দীন অতি বিরল; তাঁহার দুর্লভ মানব জন্ম বুঝি নিষ্ফল। তাই, ভ্রান্ত জীব! এখনও বলিতেছি মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠ; সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। এবং তাঁহারই আদেশে শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য এবং শৈবের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারিয়া ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম্ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বলিয়া নবজীবন লাভ কর।

প্রায় এক ঘন্টাকাল অতীত হইল। অনুমান ৬০।৭০ জন ভক্তকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া সকলকেই বিশ্রামার্থ বাহিরে আসিতে আজ্ঞা করিলেন; কেবল একজন ভক্ত ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তথায় থাকিলেন। আমি

শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সমাসীন জটাজুটধারী বিভূতি-ভূষিত এবং গঞ্জিকা-সেবী সন্ন্যাসী ঠাকুর না জানি ভক্তবৃন্দের কতই বা ভীতি-উৎপাদক ; কিন্তু এক্ষণে দর্শন-মাত্রেই আমার মন হইতে সে ধারণা বিদূরিত হইল। জটাজুটধারী এবং বিভূতিভূষিত নহেন। গঞ্জিকা-সেবন ত দূরের কথা তাম্রকূটের পর্য্যন্ত সম্পর্ক নাই। কেবল সন্ন্যাসের চিহ্ন কষায়-বসন-পরিহিত। আর দেখিলাম আড়ম্বর-শূন্য ; স্বভাব-সুন্দর, সৌম্য-মধুর অত্যুজ্জ্বল গৌর-মূর্ত্তি। অধিকন্তু তদীয় উপদেশাবলী, দেশকালপাত্রভেদে সর্ব্বদেশের উপযোগী। এই জন্যই বোধ হয় অধিকাংশ শিষ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী। অধিক আর কি লিখিব, শ্রীশ্রীদেবের সৌম্য-মধুর-মূর্ত্তি এবং পীযূষ-পূরিত বাক্যাবলী যে কোন দিন দর্শন এবং শ্রবণ করে নাই, তাহার মানব-জন্মই বিফল। বলিতে কি ভাই। শ্রীশ্রীদেবের আড়ম্বরশূন্য অপরূপরূপ আর অমৃত-ময়-বাক্যাবলী অত্যল্প সময় মধ্যেই আমার হৃদয় আকর্ষণ করিল। আমার বহুদিনের পোষিত শুষ্ক জড়বিজ্ঞান তদীয় উপদেশামৃত-বন্যায় ভাসিয়া গেল। তখন আর আমাতে আমি রহিলাম না। তৎকালীন আমার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার একজন বন্ধু (সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার দে সরকার) বলিয়াছিলেন,—"ও ভাই! তোর এ নব জীবন।"

আশ্রমের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণনা করিব ; সকলই যেন আমার নিকট বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কোথাও বা সুরবালকসদৃশ আনন্দদ বালকগণ পুষ্পিত-বৃক্ষে জল সেচন করিতেছেন ; কোথাও বা কদলীপত্র সংগৃহীত হইতেছে ; কোথাও বা শাকশজীর জমিতে জঞ্জাল নিরাকৃত হইতেছে ; এবং কেহ কেহ বা গঙ্গা হইতে পূতবারি আনয়ন করিতেছেন। শুনিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বি, এস, সি, পরীক্ষা দিয়াছেন, কেহ বা বি, এ, পড়িতেছেন। আশ্রমে একজন সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাকে খুব স্পষ্টবাদী বলিয়াই বোধ হইল। তাঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশোর্দ্ধ, তাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই আমার শুদ্ধাত্মা শিব-ভক্ত নন্দীর কথা মনে পড়ে। আমার এখনও সেই ধারণা।

উপসংহারে আমার হৃদয়ের আরও দুই একটী আবেগ লিপিবদ্ধ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। যদি পাঠকপাঠিকাগণ আমার আবেগময়ী বাণীকে অন্ধবিশ্বাস বলেন, তবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই ; বরং ঐ প্রকার অন্ধতাই আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রীদেবকে যখনই দর্শন করিতে গিয়াছি তখনই আমার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কখন বা সুধা-ধবলিত ভগবান চন্দ্র-চূড়ের ন্যায়, কখন বা অরুণরাগে রঞ্জিত তপঃপরায়ণ কমলযোনি পিতামহের ন্যায় ; কখন কখন বা এতদুভয় হইতে আরও কিছু বিভিন্ন অপরূপ ছটা। তাঁহার বীণা-বিনিন্দিতসুমধুর কণ্ঠস্বর সর্ব্বজন-প্রীতিকর। আমাদের দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত বিগত ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের প্রথম-সপ্তাহ-মধ্যেই আমরা সেই অপূর্ব্ব-রূপমাধুরী এবং অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণীর সহিত বাহ্যসংস্পর্শশূন্য হইয়াছি।

হে পরম-কারুণিক জ্ঞানদ পিতঃ!
"আর কি এ পোড়া আঁখি এছার জনমে
দেখিবে সে পাদুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নে মণি ?" (মধু)

শ্রীকালিচরণ দে, রংপুর

মিলন-আবাহন।

(১)

হৃদয়ের দ্বারদেশে, লজ্জানম্র সকরুণ আঁখি,
কে তুমি অতিথি?
বিরহের পার হতে, এসেছ গো মিলনের দেশে,
(ওগো মোর) জীবনের সাথী?
কতদীর্ঘ বরষার রাতে, গুরু গুরু ঘনঘোর
মেঘের গর্জ্জনে,
মিশায়েছে হৃদয়ের দুরু দুরু বিরহ-বেদন
আকুল-পরাণে।
বরষায় অশ্রুনীরে, প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গ ভেসেছিল;
বিরহ-বিহ্বল
আমিও সে অশ্রুসনে, তোমার লাগিয়া কত
ঢেলিছি গো নয়নেরি জল।

(২)

দূরে গেছে ঘন-আবরণ; প্রকৃতি রূপসী আজ
সাজিয়াছে ভাল;
বিরহের অবসান; জালিয়াছে প্রেমের বাসরে
মিলনের আলো;
মুছে গেছে দুঃখ-অশ্রুরেখা, ফুল হাসি-ভরা-মুখে
হাসিছে মধুর;
বিহঙ্গ-কাকলী-সনে মিশায়েছে হৃদয়ের ভাষা
মরমের সুর;
রূপসীর ভরা অঙ্গে উছলিছে ঢল ঢল
যৌবনের তরঙ্গ-চঞ্চল;
কৌমুদী-স্বপন-ঘোরে এলায়েছে শ্যাম-তনু,
ভাসায়েছে শ্যামল অঞ্চল।

(৩)

এসুখ-শারদ-রা'তে, প্রকৃতির রূপকুঞ্জে, পশি
হৃদয় আমার
প্রণয়-কুসুম-ভারে সাজায়েছে দিব্য অর্ঘ্য-ডালা
দিতে উপহার;
প্রেমের আসারে ধৌত, বাসনার ফুল্ল-শতদলে
রচেছে আসন।
হেরিব বাঞ্ছিত মোর, এস তুমি অসীম সুন্দর,
সাধনার ধন।
উন্মুক্ত নির্ম্মল আজ হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার মোর;
গেছে অন্ধকার
মৃদুল-চরণ-পাতে, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মত
এসো গো আমার—
(তুমি শ্যাম প্রাণের আধার)

মাষ্টার বি, এ.

শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র।

পরম ভাগবত শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র পুরুষোত্তম-বাসী; পতিব্রতারমণীসঙ্গে শ্রীভগবানের সুমধুর লীলারস আস্বাদন করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করেন। শ্রীগীতা, শ্রীভাগবত তাঁহার কণ্ঠভূষণ, এ দিকে ভিক্ষায় উপজীবিকা। স্বভাব পরম শান্ত-শিষ্ট; শ্রীগোবিন্দের প্রেমা-স্বাদনে প্রাণ সর্ব্বদাই গদ-গদ। শ্রীগীতারস-আস্বাদনকালে পার্থ-সারথী শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখে নিসৃত—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যেজনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং" ॥

অর্থাৎ যে ভক্ত জগতের সমস্ত চিন্তা প্রত্যাহার করিয়া কেবল আমার চিন্তা সার করিয়া আমার উপাসনা করে, আমি তাহার সংসারযাত্রা ও দেহযাত্রার সমস্ত উপহার বহন করিয়া দিই।" এই শ্লোকটীর দিকে একদিন সাধুবরের লক্ষ্য পড়িল। লীলাময় আজ পণ্ডিতবরকে পাইয়া এক নূতন খেলার অবতারণা করিলেন। পণ্ডিতের মনে সন্দেহ হইল। তিনি বিচার করিতে লাগিলেন শ্রীভগবান কি সত্য সত্যই স্কন্ধে করিয়া ভক্তের আবশ্যকদ্রব্য বহন করিয়া বাড়ী দিয়া যান? তাও কি কখন হয়? তা নয়। তিনি অপর কাহাকেও প্রেরণা করিয়া তাহার দ্বারা পাঠাইয়া দেন। সুতরাং শ্রীগীতা-গ্রন্থে নিশ্চয়ই এই শ্লোকটী ভুল আছে। এই বলিয়া উক্ত শ্লোকটী কলম দিয়া কাটিয়া "বহাম্যহং" স্থানে "দদাম্যহং" লিখিয়া রাখিলেন। শ্রীব্রজকিশোর কি আর স্থির থাকিতে পারেন? এক সঙ্গে শ্রীগীতামাহাত্ম্য-প্রচার ও ভক্তবরকে কৃপা করিবার অবসর পাইলেন। হঠাৎ একদিন এরূপ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে মিশ্রমহাশয় সেদিন ভিক্ষায় বাহির হইতে পারিলেন না, উপবাসী রহিলেন। পরদিন ঝড় বৃষ্টি কিছু শান্ত হইলে মিশ্র মহাশয় ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এদিকে পরম দয়াল ভক্তের জীবনধন শ্রীরামকৃষ্ণ দু'টী ভাই ব্রাহ্মণ-বালকের বেশ ধারণ করিয়া স্কন্ধে দুটী মহাপ্রসাদের ভার লইয়া মিশ্রবরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকদ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রসাদের ভার মিশ্রপত্নীর নিকট নামাইয়া বলিলেন—"মা! মিশ্র ঠাকুর এই মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন, গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণী বালকদ্বয়ের অপরূপরূপ-দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন; এবং বাৎসল্য রসে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। বলিলেন—"বাছারে আমার! একি? তোরা বলিস্ কি? মিশ্রঠাকুর কি উন্মাদ হ'য়েছেন? তোদের কাঁধে এই ভার দিতে তাঁর একটুও কষ্ট বোধ হলো না? তিনি এত নিষ্ঠুর কিরূপে হ'লেন?" তারপর বালকদ্বয়ের শরীর দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি! তোমাদের গায়ে প্রহারের দাগ কেন?" বালকদ্বয় বলিল "মিশ্র ঠাকুর মেরেছেন।" ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" বালকদ্বয় বলিল—"তা জানিনে। আমরা কেবল তাঁহার নিকট ছিলাম, এই মাত্র দোষ।" ব্রাহ্মণী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন;—"বলিস্ কি বাপ! তোদের কথা যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে। মিশ্র এত নিষ্ঠুর, একথা যে আমার বিশ্বাস করবার যো নাই। তিনি যে গোবিন্দের একজন পরম ভক্ত। তোদের কথা দূরে থাক্, একটি কীটের গায়েও তিনি আঘাত করেন না। বাপরে তোদের চাঁদমুখ দেখ্‌লে পাষাণময় মানবেরও প্রাণ স্নেহরসে ভেসে যায়; আর মিশ্র তোদের মেরেছেন? শুধু মারা নয়! এই সোণার দেহে রক্তপাত ক'রে দিয়েছেন? বলিস্ কি বাপ? আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে?" ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় কহিল; "সত্য বলছি মা। মিশ্র ঠাকুরই আমাদের মেরেছেন। একটী তীক্ষ্ণ লোহার কাঁটা দিয়ে আমাদের গায়ে আঁচড় দিয়েছেন। সত্য সত্য মা! আমরা মিথ্যা কথা বলিনি।" এই বলিয়া বালকদ্বয় চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণীর অতিশয় অভিমান ও ক্রোধের উদয় হইল। ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। মিশ্র ঠাকুর যথাসময়ে গৃহে আসিলেন। সেই দুর্দ্দিনে কোন স্থানে ভিক্ষা মিলিল না। বিমর্ষ-

বদনে ব্রাহ্মণীর নিকট গিয়া দেখেন, তিনি ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছেন—নিকটে প্রচুর প্রসাদ-সম্ভার। মিশ্র ঠাকুর ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণী ক্রোধে অধীরা হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-বালকদ্বয়ের মহাপ্রসাদ আনয়নের বিষয় সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া ব্রাহ্মণ অমনি নিস্পন্দ, নির্ব্বাক হইলেন; কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন;—"কল্যাণি? তুমি কি বল্‌ছ; আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। কই আমি ত কাওকে প্রসাদ দিয়ে পাঠিয়ে দিই নি। কই আমি ত কোন বালককে লৌহশলাকা দিয়ে আঘাত করিনি। সাধ্বি, তুমি বল কি?" ব্রাহ্মণীর ক্রোধ দূর হইল। তিনি ক্ষণিক চিন্তার পর বলিলেন—"স্বামিন্, মিথ্যা নয়! স্বপ্ন নয়! ঐ দেখ প্রসাদ-সম্ভার। বালক দুটি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্লে যে মিশ্র-ঠাকুর লৌহশলাকা দিয়ে আমাদের গা কেটে দিয়েছেন।" ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া পরে সজলনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে "বুঝেছি, বুঝেছি! হা গোবিন্দ!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে প্রাণের প্রাণ শ্রীগোবিন্দকে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের বাহ্য-চৈতন্য লাভ হইল। নয়ন-ধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। দেহে সমস্ত সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশিত হইল। গদগদ স্বরে শ্রীগীতার শ্লোক পরিবর্ত্তনের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"ব্রাহ্মণি! তুমিই ধন্যা। তোমারই জন্ম সার্থক, চক্ষু সার্থক! হা গোবিন্দ! তোমার এত দয়া! তোমার গীতার লেখা সত্য সত্যই "বহাম্যহং" "বহাম্যহং"। দয়াময়! কৃপানিধে! ভক্তপ্রাণ! ভক্তই তোমার পিতা, ভক্তই তোমার মাতা, ভক্তই তোমার সখা, ভক্তই তোমার সর্ব্বস্ব! আবার তুমিও ভক্তের সর্ব্বস্ব! নাথ! হৃদয়বল্লভ! কৃপা কর, রক্ষা কর! ক্ষমা কর! প্রভো! এ অবিশ্বাসী, পণ্ডিতাভিমানী ক্ষুদ্র জীব কি তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে?" ব্যাপার বুঝিয়া ব্রাহ্মণীরও প্রেমের বন্যা ছুটিল। অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি অপূর্ব্ব অলঙ্কারে সাধ্বী ভক্তরমণীর শরীরে পরম রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইল। অপূর্ব্ব যুগল মিলনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সুমধুর-যুগল-প্রেমের আস্বাদন করিতে লাগিলেন। অমনি উভয়ের কণ্ঠ পরস্পর বাহুযুগলে আবদ্ধ, একসঙ্গে গঙ্গা যমুনার প্রবাহ! কি অদ্ভুত দৃশ্য! একটু শান্ত হইয়া উভয়ে পরম প্রীতি-সহকারে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন এবং উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কিছুকাল ইহজগতেই শ্রীগোলোকধামের পরমানন্দ সম্ভোগ করিলেন। অবশিষ্ট জীবন এ জগতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনানন্দে অতিবাহিত করিয়া জীবন-শেষে প্রেমময়ের নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক যুগলকিশোরের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ধন্য মিশ্র! ধন্য মিশ্রপত্নি! সার্থক তোমাদের দাম্পত্য-মিলন! সার্থক তোমাদের দেহ ধারণ! সার্থক তোমাদের ভক্তি-সাধনা! আশীর্ব্বাদ কর যেন এ ক্ষুদ্র জীব তোমাদের ভক্ত-বৎসল, প্রেমময়ের ভক্ত-সঙ্গে, প্রেমলীলার মহাসমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া যায়। তোমাদের আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র ভরসা॥

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

সব্‌সিয়ান্‌কো-একবাৎ।

জ্ঞান-স্বরূপিনী আনন্দময়ীর কৃপা হইলে জীবের অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হইতে থাকে। জগদম্বার এইরূপ কৃপা, পাত্র বিচার করে না, জাতি বিচার করে না, দেশ বিচার করে না। সাধক ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ করুন, আর আমেরিকাতেই জন্মগ্রহণ করুন, এই প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের কৃপা পাইতে থাকেন,—একই প্রণালীতে তাঁহাদের অবিদ্যাসূত্রের ছেদন হইয়া থাকে। আবার আনন্দময়ীর বরপুত্রস্বরূপ মহাপুরুষগণেরও প্রায় একই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের বিশেষ-বিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষগণ যে দেশেই আবির্ভূত হউন না কেন, যে ধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করুন না কেন, মূলে সেই একই তত্ত্ব, একই কথা, একই সম্ভোগ, একই উপদেশ। একই কারিকরের প্রস্তুত পাঁচটি এক রকমের ঘড়ি যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিলেও দ্বিপ্রহরের সময় একসঙ্গে টং টং করিয়া বারটা বাজিতে থাকে সেইরূপ ঐ সকল মহাপুরুষ জ্ঞানরাজ্যের একই স্তরে উপস্থিত হইবামাত্র একই প্রকারের অনুভূতি লাভ করেন; এবং তাঁহাদের বদনরূপ যন্ত্র হইতে একই সুরের বাদ্য বাজিয়া উঠে। ঐ দেখুন! তাল করিয়া শুনুন—নানক, কবির, লুথার, জোরাষ্টার, সকলেই একসুরে তান ধরিয়াছেন। এই জন্য বুঝি গুপ্তাবতার শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন "সব্‌সিয়ান্‌কো একবাৎ।"

ম্লেচ্ছ-কুলরত্ন একটী শ্বেতকায় জ্ঞানপিপাসু সাধক দয়াময়ের কৃপায় জ্ঞানরাজ্যের কোন বিশেষ স্তরে উপস্থিত হইয়া যে সুরে বাজনা বাজাইয়া গিয়াছেন, কান পাতিয়া শুনিলে সে সুর হিমালয়-শিখরের সুর, জাহ্নবী-যমুনা তীরের সুর বলিয়া ভ্রম হয়। ঠাকুর তোমার বলিহারি ভেল্কি!

1. He that followeth me walketh not in darkness, saith the Lord!

শ্রীভগবান বলিলেন!—
"যেই জন করে মম-পথানুসরণ,
অজ্ঞান-আঁধারে নাহি পড়ে সেইজন।"

2. Verily, sublime words make not a man holy and just; but a virtuous life maketh him dear to God.

বড় কথা, শাস্ত্র-কথা কহিলে কি হয়?
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কভু ভুলিবার নয়।
অকপট-হৃদে কর ধর্ম্ম- অনুষ্ঠান,
তবেত হবেন তুষ্ট প্রভু ভগবান।

3. If thou didst know the whole Bible by heart, and the sayings of all the philosophers, what would it all profit thee without the love of God and His grace?

বেদ-স্মৃতি-ন্যায়-যোগ-শাস্ত্র-সমুদয়,
কণ্ঠস্থ করিলে হবে কিবা ফলোদয়?
বিশ্বাসভকতি আর বিনা প্রেমধন,
সেই "নন্দলালা" ভাই, নামিলে কখন।

Vanity of vanities; all is vanity except loving God and serving Him alone.

সব বৃথা, সব বৃথা, সকলই অসার।
হরি-সেবা, হরি-প্রেম শুধু সারাৎসার।

This is the highest wisdom; by despising the world, to seek the kingdom of Heaven.

মায়াময় এ সংসার করি পরিহার,
বৈকুণ্ঠ-লাভের তরে কাঁদে মন যার,
সেই ত চতুর সেই জ্ঞানীর প্রধান,
তুচ্ছ করি এ জগতে ভজে ভগবান।

Call often to mind the proverb, "The eye is not satisfied with seeing nor the ear filled with hearing"

"ন জাতু কামঃ কামীনাং উপভোগেন
শাম্যতি"

মনে রেখ ভাই সব, সাধুর বচন,
সম্ভোগে কভু না হবে বাসনা দমন।
(আগুনে করিলে ঘৃত-আহুতির দান,
আগুন না নিবে, বাড়ে দ্বিগুণ-প্রমাণ।)

All men naturally desire to know; but what doth knowledge avail, without the fear of God?

জ্ঞানের পিপাসা হয় মানব-স্বভাব,
জ্ঞানরূপী ভগবান অনন্ত-প্রভাব।
সেই ভগবানে যেবা ভয় নাহি করে,
পণ্ডশ্রম তার জ্ঞান সংসার ভিতরে।

Indeed a humble peasant that serveth God is better than a proud philosopher who studies the course of the heavens, but neglects himself.

দিন আনে দিন খায় দরিদ্র-কৃষক,
সরল বিশ্বাসী সেই ঈশ্বর-সেবক,
সেও ধন্য, সেও শ্রেষ্ঠ জগত-মাঝারে,
ধন-জ্ঞান-অভিমানী না চিনে তাহারে,
অভিমানী জ্ঞানী ব'লে করে অহঙ্কার,
আত্মতত্ত্বে হেলা করি যায় ছারেখার।

Cease from an excessive desire of knowing, for therein thou shalt find much distraction and delusion.

বহুজ্ঞান তরে ভাই ক'রোনা প্রয়াস,
বিষয়ের জ্ঞানে কভু মিটেনা পিয়াস,
বহুজ্ঞানে হয় এক বিপরীত রোগ,
আসলে না হয় কিছু, বাধে গোলযোগ।

Be not high-minded but rather acknowledge thy ignorance.

জ্ঞানমদে উচ্চশির কভু নাহি হবে,
"জানিনা, বুঝিনা কিছু" এই ভাব লবে।

This is the highest and most profitable lesson, truly to know and to despise ourselves.

সত্যজ্ঞানলাভতরে করহ যতন,
পাপস্মরি অনুতাপ কর অনুক্ষণ;
ইহাই প্রকৃত-শিক্ষা, সত্য উপদেশ,
এই পথে চল ভাই, পাবে পরমেশ।

To have no opinion of ourselves and to think always well and highly of others, is great wisdom and high perfection.

আপনাকে ভাব সদা সামান্য মানব,
অপরে মহৎ বলি কর অনুভব,
"অমানী মানদ" মন্ত্র কর অনুষ্ঠান,
এইত জ্ঞানের সার সাধনা প্রধান।

We are all frail; but thou must think no one frailer than thyself.

সবাই দুর্ব্বল মোরা, সকলে [illegible]ন,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হরিরূপায় অধীন,
আপনাকে বড় বলি কভু না ভাবিবে ;
"তৃণাদপি" মন্ত্র মনে সদাই স্মরিবে।

Who has a stronger conflict than he who strives to overcome himself ?

সেইত প্রকৃত যোদ্ধা, বীর-চূড়ামণি,
অহঙ্কার সনে যেই যুঝিছে আপনি !

The humble knowledge of one's self is a surer way to God than a deep search after knowledge.

বিষয় জ্ঞানের তরে করিলে যতন,
কভু না মিলিবে হরি অমূল্য রতন।
বিনীত হইয়া কর আপন বিচার,
সুপথ মিলিবে, পাবে চরণ তাঁহার।

How many perish in the world through knowledge, who care little for the service of God ?

হায়, হায় কতজীব জ্ঞানের গরবে,
পরমেশে ভুলি শুধু আসে যায় ভবে।

He is truly great who has great charity.

সেইত মানুষ ভবে, সেই ত মহান্,
দীনজনে করে যেই অকাতরে দান।

He is truly great who is little in his own eyes, and makes no account of height in honour.

তাঁহাকেই বলি আমি মহাত্মা সুজন,
আপনা সামান্য যেই ভাবে অনুক্ষণ।

ধনবিদ্যা কুল আর মহত্ব সম্মান,
অনিত্য অসার বলি করে তুচ্ছ জ্ঞান।

He is truly wise who counts all earthly things but dung that he may win God.

প্রকৃত তাঁহার জ্ঞান রতনের সার,
পার্থিব বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা যাঁহার।
বিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান করি করে পরিহার,
হরিলাভ একমাত্র বাসনা তাঁহার।

And he is truly learned who does the will of God and renounces his own will.

সেই ত প্রকৃত শিক্ষা করিয়াছে লাভ,
ছাড়িয়াছে যেইজন জীবের স্বভাব।
"আমি" "আমি" বোল যেই করেছে বর্জ্জন,
"তুমি" "তুমি" মহামন্ত্র করেছে সাধন।

The more a man is humble in himself and subject to God, so much the wiser will he be in all things and the more at peace.

বিজয়-রতন যত করিবে অর্জ্জন,
ততই লইবে তুমি হরির শরণ,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত জ্ঞানের ভাণ্ডার,
তোমার হৃদয় তার হইবে আধার,
পরম শান্তির কোলে লভিবে বিশ্রাম,
অপার করুণাময় সেই গুণধাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা ।

"—সর্ব্বধর্ম্ম ময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম—" [শ্রীচৈতন্যভাগবত ।]

"—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ।" [৪।১১, গীতা ।]

(এই) প্রভুর পরম-বানী, ভক্তি-চৈতন্য দায়িনী,
তাহা, 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে' উজ্জ্বল প্রমাণ,—
সকলের এই বাণী দিব্য আলম্বন ॥" [নিত্যগীতি, ৩০ ।]

২য় সংখ্যা । } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৫৯ । সন ১৩২০, ফাল্গুন । { ১ম বর্ষ ।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বীজ ক্ষুদ্র । কিন্তু তাহাতে অব্যক্তভাবে বৃহৎ বৃক্ষই ব্যাপ্ত । শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিলে এই বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র । কিন্তু তিনি অব্যক্তভাবে নিজে মহা বৃহৎ হইয়াও, নিজে ব্রহ্ম হইয়াও সেই ক্ষুদ্র বিশ্বেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । তিনি সেই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াও নির্লিপ্ত । তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত অথচ অব্যক্ত বিগ্রহবান অপরূপ রূপ । চকমকি বা অরণিতে অগ্নি বিলীন রহিয়াছে অথচ সেই পাথর বা অরণি অগ্নির সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত । সেই পাথর বা অরণি উষ্ণও নহে, সেই পাথরে বা অরণিতে দাহিকা শক্তিও প্রকাশিত নহে । মহাপ্রলয়ে সেই কৃষ্ণ-ব্রহ্মে সকলেই বিলীন থাকে অথচ সেই ব্রহ্ম কিছুর সহিতই লিপ্ত থাকেন না । তিনি সম্পূর্ণ সেই সকলের সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকেন ।

শ্রীকৃষ্ণব্রহ্ম—জ্ঞেয়, শ্রীকৃষ্ণব্রহ্ম—দুর্জ্ঞেয়, কৃষ্ণব্রহ্মই অজ্ঞেয়। নানা শাস্ত্রানুসারে। দয়াময়। তিনি তাঁহার ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া আপনি আপনাকে জানান। সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা যাইতে পারে। যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন, যিনি কেবল জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সহজে তাঁহাকে জানিতে পারেন না বলিয়াই তিনি দুর্জ্ঞেয়। জ্ঞানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় এ বিশ্বাস যাঁহার নাই তাঁহার পক্ষে সেই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। সেই জন্যই তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে জ্ঞেয়ও হইতে পারেন। কতকগুলি ব্যক্তির পক্ষে তিনি জ্ঞেয়, কতকগুলি ব্যক্তির পক্ষে তিনি দুর্জ্ঞেয়, কতকগুলি ব্যক্তির পক্ষে তিনি অজ্ঞেয়। **তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই দুর্জ্ঞেয়, তিনিই অজ্ঞেয়।**

জগতে অনেক আস্তিক আছেন। সকল আস্তিকেরই, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রকার মতও নহে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বিবেচনার তিনি জ্ঞেয়, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বিবেচনায় তিনি দুর্জ্ঞেয়, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বিবেচনায় তিনি অজ্ঞেয়। কোন কোন প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রমতে সেই পরমেশ্বর বাঞ্ছাকল্পতরু, সেই জন্যই তিনি কোন বিশ্বাসী আস্তিকের বাঞ্ছা এবং বিশ্বাসানুসারে জ্ঞেয়, সেই জন্যই তিনি কোন বিশ্বাসী আস্তিকের বাঞ্ছা এবং বিশ্বাসানুসারে দুর্জ্ঞেয়, সেই জন্যই তিনি কোন বিশ্বাসী আস্তিকের বাঞ্ছা এবং বিশ্বাসানুসারে অজ্ঞেয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধপ্রেমিকের পক্ষে পরম-প্রেমাস্পদ; সেই শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধভক্তের পক্ষে পরম ভক্তিভাজন। এই প্রকার শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণসেবায় বিশেষ আনন্দ; সেই জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বলাই সঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিলে কি আনন্দ হয় তাহা তিনিই জানেন। মনে সকাম বা অশুদ্ধ-ভক্তি থাকিতে কৃষ্ণ-সেবায় অধিকার হয় না। শুদ্ধভক্তই প্রকৃত সেবক। কৃষ্ণসেবকই পরম পবিত্র,—কৃষ্ণসেবকই পরম উদার,—কৃষ্ণসেবকই পরম মহাত্মা; কৃষ্ণসেবকই পরম কৃষ্ণানন্দ লাভ করিয়াছেন। **কৃষ্ণসেবার অনন্ত ফল। কৃষ্ণসেবকের সে সকল ফলেও উপেক্ষা। কৃষ্ণসেবক কোন প্রকার ফলকামী নহেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই লাভ, তাঁহার সেবাভক্তি নিরুপমা।**

"তুমি সে আমার কে ?"

বঁধু, বলে' দাও তুমি সে আমার কে ?
নামটি স্মরিতে আপনা হারাই
পরাণ উথলে যে।
কত জনম ধ'রে, তোমাকেই যেন
খুজে ছিল মম প্রাণ ;
এ জনমে তাই তোমারে হেরিয়া
হইয়াছি হতজ্ঞান !
তুমি, জান কি না জান বোঝ কি না বোঝ
সে কথা জান গো তুমি,
তুমি, আমার সকলই প্রাণের পুতলি,
এই শুধু জানি আমি।
তোমায় কি আর জানাব বঁধু !
তুমি সে আমার, জীবন আধার
তুমি সে প্রাণের মধু।
যখন সংসারে যুঝিয়া যুঝিয়া,
বিষম তাপিত হই,
তোমার, নামটি কেবল স্মরিয়া তখন
আনন্দে ডুবিয়া রই।
আমার, ছিল যত আশা-বাসনা—
সব নিলে টেনে, কি জানি কি ক'রে
নাহি আর কোন কামনা।

পরাণ আমার যা' কিছু চাহিত
তোমাতেই সব পেয়েছে,
তাই, আর সব ছেড়ে বড় সাধে, সখা !
(তোমার) চরণে লাগিয়া রয়েছে।
তোমায় কি আর আমি দিব,
তুমি সে আমার সুখের স্বরগ,
তুমি সে আমার শিব।
চির অশান্তির তুমি শান্তিধারা ;
প্রাণের অমৃতাসার ;
তোমায় দিবার কি আছে আমার,
বিনা এ বেদনা ভার ?
তুমি, সখা ! কিবা আর চাও ;
হৃদয়ের স্বামী হইয়া কেন গো,
আপনি ভিখারী হও।
সব কেড়ে নিয়ে "দাও" ব'লে পুনঃ
বাড়াও কেন গো যাতনা ?
কিছু নাই আর, জেনেছ ও'সব,
ও কথাটি আর তুল'না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ

আশার কথা।

আজকাল মনীষিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন পৃথিবীব্যাপী একটা ঝঙ্কার উঠিয়াছে যে সার্ব্বজনীন 'সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম' * চাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া এবং কতকগুলি যুক্তিহীন (?) অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অধুনা সর্ব্বদেশীয় শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তৃপ্তি পাইতেছেন না। এক উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমতের জন্ম তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে :——এমন এক ধর্ম্মরূপ

* এক অনাদি সনাতন নিত্যধর্ম্ম ব্যতীত জীবের ধর্ম্মপিপাসার স্ফটিক জল আর কি হইতে পারে ? সার্ব্বজনীন-সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মে—লেখক এ স্থলে তাঁহারই উল্লেখ করিতেছেন। নিঃ, সং।

মহামহীরুহের তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছেন যাহার শান্তিপ্রদ ছায়াতলে বসিয়া সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সমবেতভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারেন। তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন অধিকাংশ ধর্ম্মমতের সহিত অনেক অসার আবর্জ্জনা সংযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অনেকেই ঐ অসার অংশকেই সার ভাবিয়া বৃথা পণ্ডশ্রম করত নিজেরাও বিড়ম্বিত হইতেছেন এবং অন্যকেও বিড়ম্বিত করিতেছেন। ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্মও প্রশ্রয় পাইতেছে। গোঁড়ামি, ভণ্ডামি প্রভৃতি অনেকগুলি উপসর্গ ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই যে উপসর্গ, এই যে ধর্ম্মের গ্লানি,—ইহাতে জীবের সর্ব্বনাশ হইতেছে। সাধু ও ভক্ত মহাত্মা-গণ এইরূপ দেখিয়াই নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন এবং আকুল-অন্তরে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

'হে পরমদয়াল! তুমি আর একবার এস। ধর্ম্মের কিরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; উপধর্ম্মের অত্যাচারে তোমার সন্তানগণ কিরূপ প্রপীড়িত হইতেছে দেখ। তুমি না আসিলে আর কে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবে? কে তোমার ভ্রান্ত-বিড়ম্বিত সন্তানগণকে উপধর্ম্মের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবে? তুমি শ্রীমুখে বলিয়াছ যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতকারিদিগের বিনাশ জন্য স্বয়ং মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হই। তোমার এই অভয়বানী সফল কর। এস সর্ব্বমঙ্গলময়! জগতের অধর্ম্ম অমঙ্গল দূর করিয়া পরম মঙ্গলপ্রদ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়সমুদ্ভূত সনাতন উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমত সংস্থাপন কর। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও অপধর্ম্মের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিত হইতেছি। এস দয়াময় আমাদিগকে পরিত্রাণ কর!' যখন যখন এই প্রকার সাধুদিগের প্রাণের আহ্বান শ্রুত হয় যখন, যখনই জগতে এইরূপ একটা ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয় তখনই জগতের সেই অভাব পূরণের জন্য শ্রীভগবান তদনুরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া এ জগতে আসিয়া থাকেন এবং দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এইরূপ আহ্বান ও ক্রন্দনের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান একবার শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জগতের সকল ধর্ম্ম-মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত গীতোক্তধর্ম্ম পরম শুভাশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁহার ভ্রান্ত সন্তান গণকে দান করিয়াছিলেন। কালে যখন গীতার সেই অত্যুৎকৃষ্ট নিষ্কাম-কর্ম্মবাদ লোকে ভুলিয়া গিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও পশুহননাদি সংসৃষ্ট যাগ যজ্ঞাদিতে মাতিয়া উঠিল তখন আবার ঐরূপ প্রাণের আহ্বান ও ক্রন্দনের রোল উত্থিত হওয়ায় পরম কারুণিক শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীবুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিংসাদি প্রতিষেধক "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধধর্ম্মবাদ প্রচার করিলেন। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এই পরমমঙ্গলপ্রদ দয়ার ধর্ম্ম ক্রমে লোপ পাইয়া বৌদ্ধতান্ত্রিক নামে এক উপধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। এই বৌদ্ধতান্ত্রিকযুগে ধর্ম্ম যখন ভগবৎসম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ ভগবৎবিষয়ক ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গবেষণা ও প্রেমভক্তি-শূন্য হইয়া কতকগুলি অভিচারাদি কর্ম্ম সমষ্টিতে পরিণত হইল তখন আবার শ্রীভগবান জীবদুঃখ দূর করিবার জন্য সংসারে আসিতে বাধ্য হইলেন! সে বার সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীশঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই পরম জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন ও ধর্ম্মবিপ্লবকারীগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতবাদ

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাহা প্রচার করিলেন তাহা একটা নূতন মতবাদ নহে উহা বেদান্তদর্শনেরই মতবাদ। বেদান্তদর্শনই সর্ব্বদর্শনের শ্রেষ্ঠ এবং মানবের জ্ঞানগবেষণার ও চিন্তাশীলতার চরম ফল। বেদান্তদর্শনের আলোচনা ও জ্ঞান আলোচনা একই কথা। যে যুগে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে যুগে জ্ঞানালোচনার বিশেষ অভাব হইয়াছিল। তখন ভারতের গৌরব-রবি জ্ঞান-বিজ্ঞানমূর্ত্তি ঋষিগণ অন্তর্হিত হইয়াছেন।* যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া ভারত তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, সেই অন্ধকার যুগের সেই সময় সূত্রপাত; যে মোহজালে আবৃত হইয়া ভারত আজ এইরূপ অধঃপতিত, জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিয়া সেই মোহ দূর করিবার জন্যই শ্রীশঙ্করের মোহমুদগর,—সেই বৈদান্তিক মতবাদ। বেদান্তালোচনার অর্থই জ্ঞানালোচনা। জনগণকে জ্ঞান-পথের পথিক করিবার জন্যই জগদ্‌গুরু শঙ্করের অবতার। হায়! যদি আমরা শঙ্কর-প্রদর্শিত পন্থা হইতে বিচ্যুত না হইয়া জ্ঞান-গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকিতাম তাহা হইলে কি আর আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা হইত? ইংরাজগণের ভারতবর্ষে আগমনের সময় আমাদের দেশ যেরূপ ঘোর তমসাবৃত ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত ও ব্যথিত হইতে হয়। ঐ সময় অস্মদেশের কয়েকজন অধ্যাপক পণ্ডিত ব্যতীত দেশের সাধারণজনগণ এমনকি উচ্চশ্রেণীর ভদ্রমহোদয়গণেরও বিদ্যালোচনার সীমা শিশুবোধ-পাঠ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশের বিদ্যাচর্চ্চার ঐরূপ দুরবস্থাই ছিল। পরে ইংরাজরাজ যখন ভারতে স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া এদেশীয়গণের বিদ্যাবুদ্ধির দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন তখন তাঁহাদের কৃপায় আমাদের বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চার পথ পরিস্কৃত হইল। অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার অপসৃত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও যুক্তি-তর্কের সুপ্রভাত দেখা দিল। আজ যে আবার ভারতবাসী জ্ঞানচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইয়া আপনার দেশের গুপ্ত জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; আজ যে আবার ভারতবাসী জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে দণ্ডায়মান হইতে সাহস পাইতেছে ইহা যে ইংরাজরাজের অনুগ্রহপ্রসূত পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোচনার ফল, সে বিষয় অস্বীকারের উপায় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। তৎপূর্ব্বের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। এই ব্যাস-বাল্মীকির দেশে, এই বুদ্ধ-শঙ্করের জন্মভূমিতে এই ঘোর অজ্ঞানতা এই ভীষণ মোহান্ধকার কিরূপে যে অধিকার লাভ করিয়াছিল তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। যাই হ'ক শঙ্কর প্রদর্শিত জ্ঞানপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া জীব যখন অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিল তখন শ্রীভগবান দেখিলেন মহা বিপদ। আমি বার বার অবতীর্ণ হইয়া জীবকে দেশকালপাত্রোপযোগী সারধর্ম্ম শিক্ষা দিলাম কিন্তু জীব তাহা ধারণা করিতে পারিল না। অচিরকালমধ্যেই মৎকথিত মতবাদের সহিত নিজেদের ভ্রান্তি বিজড়িত মত সকল সংমিশ্রিত করিয়া নানারূপ উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া কষ্ট পাইতেছে। তিনি ভাবিলেন একবার অহিংসারূপ দয়ার ধর্ম্ম দিলাম তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না অদ্বৈতবাদ-রূপ জ্ঞানের ধর্ম্ম দিলাম তাহা হইতেও ভ্রষ্ট হইল। আচ্ছা এবার যাইয়া প্রেমের ধর্ম্ম দিব,—ভক্তির অনুষ্ঠান শিখাইব। এই প্রেমভক্তির ধর্ম্ম সহজসাধ্য ও সর্ব্বথা আনন্দপ্রদ। দেখি জীব

এই প্রেমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে কি না? এই দুর্ব্বল কলিজীবের পক্ষে ইহাই উপযোগী। এই ভাবিয়া তিনি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে * অবতীর্ণ হইলেন। যাগ-যজ্ঞ, জ্ঞানকাণ্ডের কঠোরতা হইতে অব্যাহতি দিয়া সঙ্কীর্ত্তনমূলক প্রেমের ধর্ম্ম আচণ্ডালে বিতরণ করিলেন। প্রেমভক্তিরূপ দিব্য-মদিরা আস্বাদন করিয়া জীব একবার মাতিয়া উঠিল। প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। (ক্রমশঃ) শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

ভক্ত-কাহিনী।

গোবর্দ্ধন গ্রামের দৃশ্য অতি সুন্দর। চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর কুঞ্জবনে বেষ্টিত।—ঠিক মধ্যস্থলে শ্রীমন্দিরে নাথজীর (শ্রীকৃষ্ণের) শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। সরোবরস্থ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শ্রীমন্দির, গ্রামটীকে যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরের চূড়ায় পতাকা, পত্ পত্ শব্দ করিয়া যেন নাথজীর গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। নাথজীর শ্রীমূর্ত্তি অতীব মনোহর; দেখিলেই লোকের ভক্তি-প্রেম উথলিয়া উঠে। ত্রিজগতের নাথ নাথজীর শ্রীচরণে সোণার নূপুর, কণ্ঠে আপাদবিলম্বিত চিকণ বনমালা,—কৌস্তভভূষিত বক্ষস্থল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; তাহাতে আবার হাসি হাসি মুখ, চক্ষু দুটী প্রেমে ঢল ঢল; নাসায় নোলক, মস্তকে সুচারু চিকুর-রাশি এবং কটিতটে পীতবাস;—দেখিলেই বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী সকলেরই মন ভুলিয়া যায়।

গ্রামবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। নাথজীর শ্রীমন্দিরের নিকটেই একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ; পতিব্রতা ব্রাহ্মণীও ত্রিজগৎপতির সেবানুরতা। কেহ কখন ব্রাহ্মণীর মুখে উচ্চ কথাটী পর্য্যন্তও শুনে নাই। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ নাই, কেবল গোবিন্দ নামে একটী দশ বৎসরের বালক।

গোবিন্দ, গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তরে খেলা করিয়া বেড়ান। সদানন্দ ও প্রেমানন্দ নামে তাঁহার দুইজন সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোবিন্দ মাঠে খেলা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গিদের কেহ উপস্থিত হয় নাই। গৃহে গৃহে গৃহদেবতার আরতি আরম্ভ হইল; শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে গ্রাম গ্রামান্তর এবং বিজন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তবুও গোবিন্দ একাকী বেড়াইতে লাগিলেন। তখনও সঙ্গিদের মধ্যে কেহ আসিল না। ক্রমে ক্রমে তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন। গোবিন্দ কখনও একা থাকিতে ভালবাসিতেন না। সঙ্গিদের মধ্যে কেহ না আসায় কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ নাথজীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। নাথজীর মৃদুমধুর-হাসি-বিকশিত মুখখানির দিকে চাহিয়া আরতি দেখিতে দেখিতে গোবিন্দের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত প্রেমানুরাগ উথলিয়া উঠিল এবং নাথজীর ভুবনমোহন ভাব দর্শনে গোবিন্দের প্রাণ মদনমোহন-রূপসাগরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল। গোবিন্দ তখন নাথজীর বিগ্রহমূর্ত্তি

* Cf. চৈঃ, চঃ, আদি ৪র্থ,—"রাগমার্গ-ভক্তি &c."। ভাঃ ৩।৯।১১ নিঃ, সং।

ভুলিয়া গেলেন ; তাঁহার মনে হইল যেন সম্মুখে একটী প্রিয়দর্শন জীবন্ত বালক মনভুলান-বেশে দাঁড়াইয়া আছে। গোবিন্দ, বিবশচিত্তে ঐ বালককে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিলেন ; আর মনে মনে ভাবিলেন আজ হইতে এই নাথজীর সহিত খেলা করিব। আরতি শেষ হইলে মন্দির হইতে দর্শকেরা একে একে নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিল ; পূজারিও প্রস্থান করিল। সকলেই চলিয়া গেল,—কিন্তু থাকিলেন কেবল নাথজীর প্রেম-মুগ্ধ গোবিন্দ। গোবিন্দ দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি ঝুকি মারিতেছিলেন; দেখিলেন, নাথজী ও তিনি ভিন্ন আর কেহ সেখানে নাই। নির্জ্জনে নাথজীকে পাইয়া প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া গোবিন্দ বলিলেন "নাথজী! তুমি ভাই আমার সঙ্গে আজ খেলা করিবে? আমরা দু'জনে রাত্রিতে মাঠে খেলা করিগে, চল। নিশ্চয় বল্‌ছি তোমায় কখনও আমি মার্‌ব না—তোমার সঙ্গে কখন ঝগড়া কর্‌ব না।" ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের হৃদয়ের ধন হরি, গোবিন্দের সরলতা ও হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া আর অধিক কাল স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি মন্দির হইতে সাড়া দিলেন "হাঁ ভাই চল, দুজনে খেলা করিগে।"

প্রভো! তুমি বালকের অকপট প্রেম চিরকালই ভালবাস। তুমিই ধ্রুবের প্রাণের ডাকে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া বনমাঝে মোহনসাজে দেখা দিয়াছিলে। তুমিই না, প্রভো। ভালবাসায় প্রতিদিন গোচারণ করিতে যাইতে? প্রহ্লাদ যখন তোমার নামে মাতিয়া "হরি," "হরি" বলিয়া আত্মহারা হইত, তুমিই না তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে? আজ তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গোবিন্দ তাহার পিতা, মাতা ও জগত ভুলিয়া তোমাকে খেলা করিতে ডাকিলেন। প্রেমের ডাক তোমার বড় মধুর বোধ হয়, তাই গোবিন্দ যখন তোমায় খেলা করিতে ডাকিলেন—তুমি আর থাকিতে পারিলে না। জগৎ-স্বামি! কতরূপে যে তুমি এ জগতে কত খেলা খেলিতেছ, তাহা কে বুঝিবে?

নাথজী মোহনবেশে হাস্য করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইলেন। তাঁহারা উভয়ে মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়া সেই মাঠে খেলা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন নাথজীকে মারিবেন না কিম্বা গালি দিবেন না, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন ; খেলা করিতে করিতে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হইল. গোবিন্দ অমনি চড়াৎ করিয়া নাথজীর গালে একটী চড় মারিলেন ও বলিলেন—"কেমন, আর কখনও আমাকে রাগাবি?"

ত্রিজগতের নাথ নাথজী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমিত বলেছিলে ভাই আমায় কখনও মার্‌বে না, তবে মার্‌লে কেন?" নাথজীকে কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দের হৃদয় গলিয়া—গেল করুনার সঞ্চার হইল ; বলিলেন—না ভাই, রাগ করিস্ নে, তোকে আমি বড়ই ভালবাসি, আর মার্‌ব না।" তাহার পর সেদিনকার মত তাহারা উভয়ের নিকট হইতে উভয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিদায় লইলেন। ধন্য প্রভু তোমার ভক্তের প্রতি ভালবাসা!

ভক্ত ও ভক্তের ঠাকুর এইরূপে প্রতিদিন খেলা করিতে লাগিলেন। একদিন সদানন্দ ও প্রেমানন্দ আসিল, তাহারা বলিল "ভাই গোবিন্দ, আর তোরে দেখতে পাইনে কেন?" গোবিন্দ বলিলেন "আমি আর একটি ছেলের সহিত রোজ খেলা করি। সে ভাই বেশ ছেলে মার্‌লেও কিছু বলে না, কেবল কাঁদে ; সে কাঁদলে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।" সদানন্দ বলিল, "ভাই সে ছেলেটি কোথায় থাকে?

গোবিন্দ বলিল "নাথজীর মন্দিরে।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় তাহারা দেখিল সেই জগৎবাসীর চিত্তচোর নাথজী আসিতেছেন। তাহারা নাথজীর নিকটে দৌড়িয়া গেল; প্রেমানন্দ বলিল—"হাঁরে, তুই কাদের ছেলে? তুই নিশ্চয়ই চোর।" নাথজী (স্বগতঃ) বলিলেন "সেটা বড় মিথ্যা কথা নয়, চোর নামটা আমার গেল না। আমাকে লোকে ননীচোরা, বসনচোরা বলে বটে।" সদানন্দ নাথজীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল "কথা কচ্ছিস্ না যে? তুই এখান হইতে চলিয়া যা' নইলে তোকে আমরা মারব।" নাথজী বলিলেন "না ভাই, আমাকে মেরনা। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলা করব।" সদানন্দ নাথজীকে মারিবে, গোবিন্দ একথা শুনিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। যদিও গোবিন্দ নিজে নাথজীকে মারিতেন ও গালাগালি দিতেন কিন্তু তাই বলিয়া অন্য কেহ তাহার সম্মুখে নাথজীকে মারিবে ইহা তাঁহার সহ্য হইল না! তিনি ক্রোধে সদানন্দ ও প্রেমানন্দকে বলিলেন "তোরা আর আমার সঙ্গে খেলা করতে আসিস্‌নে। এখান হইতে এখনি চলে যা। সদানন্দ ও প্রেমানন্দ গতিক বুঝিয়া ভয়ে পলাইল। গোবিন্দ ও নাথজীর সেদিন ডাণ্ডাগুলি খেলা আরম্ভ হইল। গোবিন্দের খেলার পালা আসিল, নাথজী হারিলেন, খাটিবার ভয়ে যেন পলাইতে লাগিলেন, গোবিন্দও ধরিবার জন্য পিছু পিছু দৌড়িলেন। ভক্তের প্রাণধন হরি ভক্তের হাত হইতে পলায়ন করা কঠিন দেখিয়া অবশেষে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে গিয়া নয়ন-মন-মুগ্ধকর অনির্ব্বচনীয় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে দাঁড়াইলেন। মন্দিরের দ্বার তখনও খোলা হয় নাই। গোবিন্দ বাহির হইতে নাথজীকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, পরে তিরস্কারও করিতে লাগিলেন। একটু পরে পূজারি দ্বার খুলিল গোবিন্দ অমনি বেত্রহস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং একটি গুলি নাথজীর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "কেমন, আর কখন পালিয়ে আস্‌বি?" এই বলিয়া হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা নাথজীকে মারিবার উপক্রম করিলে পূজারিরা প্রহার করিয়া তাহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। গোবিন্দ তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন "আমার দাণ্ডা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে লুকাইলে এবং লোকদ্বারা আমায় নিগ্রহ করিলে ইহার প্রতিশোধ না লইয়া আর জল গ্রহণ করিব না।" পূজারিরা নানাবিধ ভোগ প্রস্তুত করিল। কিন্তু মন্দিরের অধিকারীর উপর নাথজীর প্রত্যাদেশ হইল "গোবিন্দ" নামে যে বালকটি আমার সহিত খেলা করিতে আসিয়াছিল, তুমি কেন তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছ? তুমি তাহাকে যত আঘাত করিয়াছ সকল আঘাতই আমার অঙ্গে লাগিয়াছে। সে যে আমার পরম ভক্ত; সে অভিমানে বাড়ী যায় নাই, উপবাস করিয়া আছে। তাঁহাকে লইয়া আইস; সে যদি এখানে না আসে তাহা হইলে আমি অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিব না।" এই প্রত্যাদেশে সকলে চমকিয়া উঠিল। তখনই সকলে গোবিন্দকে খুঁজিতে বাহির হইল। পূজারিগণ জানিত না যে ভক্ত ও ভক্তবৎসল অভিন্নহৃদয়। ভক্ত কাঁদিলে প্রভু কাঁদেন ভক্ত নাচিলে প্রভু নাচিয়া উঠেন, ভক্তের সেবা করিলে প্রভুর সেবা হয়। ঘরে, বনে, মাঠে নানাস্থানে খুঁজিয়া অবশেষে গোবিন্দের অনুসন্ধান পাইল; একগাছা বেত্র হস্তে নাথজীর পুকুরের ঘাটে গোবিন্দ বসিয়া আছেন দেখিতে

পাইলেন। পূজারিগণ তখন সকলে বিনয়পূর্ব্বক বলিল—"নাথজী তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের পাঠাইয়াছেন। তোমাকে না দেখিয়া তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই; তুমি রাগ করিয়াছ বলিয়া তিনি উপবাস করিয়া আছেন। অতএব তুমি আমাদের সঙ্গে এস।" গোবিন্দ বলিলেন "তা' হবে না; নাথজী খেলা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। আমি যখন মন্দিরে গেলাম, লোকদ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিয়াছে। নাথজী আজ আসুক, তাকে বেত দিয়া পিটিব। তবে তা'র যেমন কাজ তেমনই শাস্তি হবে।" ব্রাহ্মণগণ দেখিল, গোবিন্দ আজ প্রেম-কোপানলে আত্মহারা। তাহারা বলিল, নাথজী বলিয়াছেন—"তিনি তোমার নিকট হারিয়াছেন এবং পুনরায় তিনি তোমার সহিত খেলা করিতে আসিবেন।" নাথজী হার মানিয়াছেন শুনিয়া গোবিন্দ মন্দিরের দিকে গেলেন। গোবিন্দের দুই হাতে দাণ্ডা ও গুলি সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত। তারপর গোবিন্দ নাথজীর সম্মুখে গিয়া পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন "কেমন নাথ! আর এমন করবি? হার মানলে তাই রক্ষা; নইলে তোমাকে আমি কি সাজা দিতাম তা বলতে পারিনে।" গোবিন্দ নাথজীর শ্রীমুখ মলিন দেখিয়া অন্তরে বড়ই বেদনা পাইলেন, বলিলেন "ভাই, তুমি খাও নাই কেন? তোমার মলিন মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে; "এস দুজনে এক সঙ্গে খাই।" অনন্তর ভক্তজনমনোমোহন, কাঙ্গালের প্রাণধন নাথজী, মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া দুইজনে একত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন দুজনের মুখে আর হাসি ধরে না। আনন্দের ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে গোবিন্দ বিকাইয়া গেলেন। গোবিন্দ মন্দির হইতে বাহির হইলেন; নাথজীও শ্রীমূর্ত্তিতে মিশাইয়া গেলেন। গোবিন্দের মহিমা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

হে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু! ধন্য তোমার ভক্তের প্রতি ভালবাসা! তোমার ভক্তগণসহ তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীনিত্যপূজা

অধিবাস ও আবাহন।

[প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী]

"রসো বৈ সঃ।" (১) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলা-কৈবল্য-রস * আস্বাদন মানসে যুগলভাবে রসরাজ ও মহাভাবময়ীরূপে প্রকাশিত হন্। মহাভাবময়ী আত্মশক্তির-সহিত নানা রঙ্গভঙ্গীতে ক্রীড়া করিয়া তিনি স্বকীয় স্বরূপ উপলব্ধি করেন; প্রকৃতিতে রমণ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণহৃদয়ে বিলাস করিয়াই তিনি আত্মারাম ও স্বপ্রকাশ। রসময়ী প্রকৃতিই তাঁহার 'স্ব' এবং 'আত্মা' † মহাভাব মূরতি-প্রকৃতিরাণী রসরাজের রসলালসা

* 'লীলা-কৈবল্য-রস' অর্থে লীলৈকরস হইলে দোষের কারণ নাই। কৈবল্য, সর্ব্বাবস্থার পরবর্ত্তী অনবস্থা; ইহাই সর্ব্বশ্রুতিসার-সিদ্ধান্ত। নিঃ সং।

† প্রকৃতিই কি স্বরূপ? নিঃ সং। (১) শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ ও রসরূপ। লেখক।

মিটাইবার জন্য অনন্তকাল ধরিয়া নিত্য নব নব ভাবে নব নব সাজে কতই না বৈচিত্র্য প্রকটিত করিতেছেন কিন্তু রসসুধানিধির প্রেমপিপাসা ত তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য ভঙ্গীতে কিছুই মিটিলনা। রসবিলাসিনী প্রকৃতিরাণী তাঁহার প্রাণবল্লভের সেবার জন্য কি না মনোমোহনবেশে সজ্জিতা হইয়াছেন কিন্তু ভুবনমোহন ত কিছুতেই ধরা পড়িলেননা। প্রকৃতিরাণী নিত্যকাল তাঁহাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পুরিয়া রাখিবার জন্য কত না ফাঁদ পাতিয়াছেন কিন্তু অধরচাঁদ যেন কিছুতেই ধরা দিয়া প্রকৃতিরাণীর আপনার হইতে চাননা; ধরিতে ধরিতে কোথায় চলিয়া যান! লীলারত্নাকর এই লুকোচুরি নিত্যকালধরিয়া রসময়ীর সঙ্গে খেলিতেছেন। তিনি ধরা দিয়াও ধরা দেন না; এই ধরা দেওয়া না দেওয়ার মধ্যে কি মাধুর্য্য তাহা সেই পরমপুরুষ ও তাঁহার পরাপ্রকৃতিই আস্বাদন করিতেছেন। আবার রসানন্দময়ী যখন তাঁহার হৃদয়চাঁদকে পূর্ণভাবে আপনার করিতে না পারিয়া অভিমানিনী সাজিয়া স্বাধীনভর্ত্তৃকাবেশে তাঁহার পরাণবঁধুয়াকে একেবারে বিস্মৃত হইতে চান তখনই সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান নিতান্ত অপরাধীর মতন "দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্ *" "মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্" বলিয়া কাতর করুণভাবে কতই না প্রেমভিক্ষা করেন। এমন কি দাসখত পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়া রসময়ীর শ্রীচরণরেণুতে সর্ব্বাঙ্গভূষিত করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। প্রকৃতি-রাণীকে কখনও নিজের প্রেমে উন্মাদিনী করিয়া তোলেন আবার কখনও বা নিজে রসময়ীর ভাবে বিভোর হইয়া রসসাধনার লাগি' মাধবীতলে তাঁহার রাঙ্গাচরণ যোগীর মত ধ্যান করেন। বুঝিবা এমন করিয়া প্রকৃতিরাণীর রসবিলাসে আত্মহারা না হইলে তিনি নিজকে বুঝিতে, ধরিতে ও আস্বাদন করিতে পারিতেন না। জ্ঞানানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যপ্রেম, পরমাহ্লাদরূপা পরাপ্রকৃতিতে রমমান হইয়া অনাদিকাল হইতে আস্বাদন করিতেছেন ও রসময়ী পরাশক্তির সহিত ভেদাভেদভাবে সম্বন্ধ প্রতি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত করিতেছেন। প্রেমময়ীর অনুগমন করিয়া রসরাজের রসলীলাস্বাদনের যোগ্য হইবার ও তাঁহার সঙ্গে রসলীলায় ডুবিবার অধিকার আছে বলিয়াই জীবের এত গৌরব! রসিকশেখরের ভোগসাধনতৎপরা হইয়া যিনি তাঁহার চন্দনপঙ্কলিপ্ত চরণে আত্মনিবেদন করিতে প্রয়াসী হন, যিনি তন্ময়া হইয়া তাঁহার রমনোপযোগী করিয়া নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সাজাইয়া কুলত্যাগিনী হন, যিনি হৃদয়ের নিভৃতস্থানে প্রেমবিলাসীর বিলাসকুঞ্জ রচনা করিয়া তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় উৎকর্ণভাবে পথপানে চাহিয়া থাকেন, সেই রসরঙ্গিনীই ধন্যা. তাঁহার ভাগ্যের সীমা নাই, তাঁহার গৌরবের ইয়ত্তা নাই। যিনি রসভাবিতমতি হইয়া নিজের আমিত্বের ভিতর কেবলমাত্র অসীম বিশ্বের প্রাণস্বরূপ সেই সর্ব্বরূপরসগন্ধস্পর্শশব্দঘন শ্রীমূরতির প্রকাশ দেখেন; যিনি প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যও প্রত্যেক ভাবের ভিতর "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এই ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনিই রমনানন্দলাভে সক্ষম, তাঁহার মত গরবিনী আর কে আছে? প্রেমপ্রাণাধিদেবীর সহজভাবে মগ্ন হইয়া প্রাণ

* শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "হে রাধে! তুমি তোমার পাদপল্লব আমার মস্তকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর।" এবং "হে রাধে! তুমি তোমার করুণ মান পরিত্যাগ কর।" লেখক।

মনসর্ব্বস্ব দিয়া এই বিশ্বের সর্ব্বব্যাপারে শ্রীরসরাজের সেবাব্যতীত অন্য কিছুতেই জীবের প্রাণ পূর্ণ পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেনা, জীব যে প্রকৃতিরাণীর সঙ্গে ভিন্নাভিন্নরূপে সেই পরপুরুষেরই প্রকাশক্ষেত্র। রসে তাঁহার প্রকাশ রসে তাঁহার নৃত্য ও লীলাখেলা এবং রসেই সেই মহাপ্রাণের মহাভাবে নিমগন! রস জীবের উপজীব্য এবং রসেই তাহার পরিপূর্ত্তি; রসব্যতীত তাহার নিজের অস্তিত্বই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। রসই সাধনা, এবং রসই তাহার সাধ্য। রসের প্রতিষ্ঠা আত্মত্যাগে, তাই আত্মত্যাগ প্রেম;—প্রেমের পূর্ণপরিণতি মহাভাবে ডুবিবার জন্য জীব অনাদিকাল হইতে আকুলিবিকুলি করিতেছে।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের রসসাধনায় আত্মতৃপ্তির লেশ ও বিদ্যমান থাকিবে না, থাকিবে কেবল কামগন্ধশূন্য প্রেমানন্দময় শ্রীশ্রীনিত্যতৃপ্তি। জ্ঞান ও প্রেম তাঁহারই, কিম্বা তিনিই; এই জ্ঞান ও প্রেম যাহার ভিতর দিয়া যতখানি আস্বাদন করিতে পারিতেছেন তিনি তত মহাভাবের অধিকারী; যিনি নিজের সর্ব্বস্ব লীলারসময়ের তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত করিতে পারিয়াছেন তিনি ত সেই সর্ব্বাত্মস্নপন-রসসায়রে স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছেন! তিনি প্রেমে নিজকে শ্রীনিত্যগোপালের নিত্যদাসী বলিয়া অভিমান করিতে পারিয়া কি না সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন? শ্রীনিত্যগোপালময়ী হইয়া তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম দিয়া তাঁহার সেবা কতই না মধুর। ইহা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু যিনি মহাভাবের উপাসনা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃতিরাণীর সঙ্গে যুক্ত হইতে চান, যিনি মহাভাবময়ীর অনুগা না হইয়া 'অহং' বুদ্ধি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, প্রেমের পথে পথিক হইয়া যিনি শ্রীনিত্যগোপালের রসলীলার যন্ত্র শ্রীরাস-ক্রীড়াধিদেবীর আলিঙ্গনে নিজের পুরুষার্থ সিদ্ধিলাভে চরিতার্থ হইতে অভিলাষী, যিনি প্রেমের পন্থানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীনিত্যগোপালের আসনে নিজেকে বসাইতে চান ও তাঁহার রসের প্রচার না করিয়া প্রকৃতিরাণীর ভিতর দিয়া নিজেকে প্রচারিত দেখিতে চান, তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? রাবণ, একমাত্র শ্রীশ্রীরামচন্দ্রেরই প্রাণপ্রিয়তমা শ্রীশ্রীসীতাদেবীকে আত্মতৃপ্তির জন্য স্বীকার করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। "ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা, অহং।" ব্রহ্মশক্তি ভক্তিদেবী চিরদিন শ্রীনিত্যগোপালের বাঞ্ছাপূরণে সক্ষমা ও লালসাময়ী। ভোক্তৃত্বাভিমানে মত্ত হইয়া নিজের প্রকৃতিস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, যিনি রাসবিলাসিনীর দাস্যভাব তুচ্ছ করিয়া রমণ হইবার অভিলাষী, শ্রীরাধারাণীকে রমণীভাবে ভোগেচ্ছু রায়াণের মত তাহাকে ক্লীব হইয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র শ্রীনিত্যগোপালই পর-পুরুষ; তাঁহার 'অহং' ই নিত্য অব্যয় ও অক্ষয়, আমাদের 'অহং' ত তাঁহার 'অহং' এবং প্রতিবিম্বমাত্র! ধনমদ, বলমদ ও ভোগতৃষ্ণায় মত্ত শুম্ভনিশুম্ভ অখণ্ডরসবল্লভা সেই শ্রীশ্রীশিবসুন্দরের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীকে আপনার ভোগ্যা করিতে গিয়াই ত অসুরাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি শ্রীভগবানকে আত্মতৃপ্তির বাসনায় ভজনা করেন তিনি কামানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া নীরসহৃদয় হইবেন সন্দেহ নাই; আর যিনি আসুরিক 'অহং' ভুলিয়া গিয়া শ্রীনিত্যগোপালেকে নিজহৃদয়ে ও জনব্যাপারে প্রতিষ্ঠীত দেখিতে চান তিনি প্রেমে অমর হইয়া সেই রসময়ের রসলীলায় ডুবিবেন, ভাসিবেন ও রসতরঙ্গে নৃত্য করিবেন।

নিত্যগোপাল! প্রেমময়! তুমি শ্রীমুখে আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য

বলিয়াছিলে যে আমরা তোমারই বিকাশ। বাস্তবিক তুমিই একমাত্র রমণ এবং আমরা তোমারই সেবায় জীবনমন দিয়া কৃতার্থ হইব; আমাদের 'অহং' ত তুমি, আমাদের প্রতিষ্ঠা ও ত তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়ে আসন বিস্তার করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কে তোমার জ্ঞান ও প্রেমে সঞ্জীবিত করতঃ আপনার কর, আমরা যেন অন্তরে বাহিরে তোমার মদনমোহনরূপের ঝলক দেখিয়া তোমার সেবায় ধন্য হই; আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' ছাপাইয়া যেন তোমার পরিপূর্ণানন্দময় 'অহং' এর প্রকাশ হয়; আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন তোমার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয় ও আমরা যেন তোমার কথা বলিতে গিয়া, তোমার লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া তোমার ঋষিমুনিসেবিত আসনে নিজকে বসাইতে প্রয়াসী না হই।"

"ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।" রাসবিলাসি! কবে আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলি তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের লালসা মিটাইবার জন্য রাসমণ্ডল রচনা করিয়া তোমার চতুর্দ্দিকে হাতে হাত ধরিয়া সমন্বয়ভাবে ও একতানে তোমার রসলীলার গান গাইতে গাইতে নৃত্য করিবে? প্রাণময়! প্রাণে, বুদ্ধিতে ও অহঙ্কারে তোমার জয় ঘোষিত হউক। আমাদের বলিতে যা' কিছু আছে তা' সবার ভিতর দিয়া তুমিই প্রকাশিত থেক। হে শুদ্ধসত্ত্বতনু! আমরা যেন নির্ম্মলস্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে তোমার ঐ ভুবনভুলান শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুগললীলারস আস্বাদন করিতে পারি। অহৈতুক-প্রেমময়! তুমি কবে তোমার প্রাণপ্রিয়তম আমাদের হৃদয়ে বিলাস করিয়া নিজে আত্মানন্দে * ডুবিবে ও জগতকে তোমার প্রেম লহরীতে নাচাইবে? পরাণবন্ধু! আমাদের তুমিই সব, তুমি নিজ প্রেমে আমাদের ঐ রাঙ্গাচরণে স্থান দিয়াছ, তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ ব্যতীত আমাদের অন্য সম্বল নাই। "নান্ত-র্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্," † যদি অন্তরে বাহিরে তোমার প্রেমরূপ ধরিতে না পারিলাম, যদি তোমার রসসমুদ্রে তনুমন ঢালিয়া নিত্যকালের জন্য তোমার না হইলাম রসসাগর! তবে ত তোমার সেবা পূর্ণভাবে হইল না। আমাদের সকল তোমার, তুমি নিজে জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আমাদের ভিতর দিয়া আস্বাদন করিতে চাহিতেছ ইহা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি তাই আজ আমাদিগকে তোমার লীলা বর্ণনে প্রণোদিত করিতেছ। তুমি আমাদের কর্ত্তৃত্বের মূলে থাকিয়া ইঙ্গিত করিতেছ আবার শ্রোতারূপে তুমি তোমারই জ্ঞানানন্দ আস্বাদন করিতে বাসনা করিয়াছ। জ্ঞানানন্দামৃতরস আমাদের মুখ দিয়া পান করিতে কেন তোমার এত লোভ? উচ্ছিষ্ট কেন তোমার এত আদর! ছিঃ ঠাকুর! একি তোমার সাজে? আমরা ত তোমার দাসী, তুমি যে আমাদের পরাণবন্ধু, আমাদের কি এমন করিয়া সোহাগে সোহাগিনী করা তোমার মানায়? চরণধূলিকে তোমার শ্রীঅঙ্গে চন্দনবৎ লেপন করা কি তোমার বড় গৌরবের বিষয়? ছিঃ, এ'তে যে লোকসমাজে তুমি চিরনিন্দনীয় হইয়া থাকিবে! তুমি পরাশক্তির হৃদয়ানন্দ, আমরা ত' তোমার দাসীরও যোগ্য নই তা'তে কি আমাদের নিয়া তোমার এত খেলা শোভা পায়? বুঝিয়াছি, তুমি প্রেমময়, তোমার বক্রকুটিল

* শ্রীভগবান সর্ব্বদাই আত্মপ্রেমে থাকেন। সর্ব্বদাই আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন। [নিঃ সং।]

† শ্রীভগবান যদি অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত না হইলেন তবে কঠোর তপস্যার সার্থকতা কি? সর্ব্বধর্ম্মের লক্ষ্য একমাত্র তিনি। লেখক।

প্রেমে প্রেমহীনা অনাথিনীকেও প্রেমালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া হৃদয়ের রাণী করিবার অভিলাষী হইয়াছ। বলিহারি যাই তোমার প্রেমের বিচিত্র গতি! হিয়ার মাণিক! তুমি যে রসরাজরূপে আমাদের হৃদয়ে চিরবিরাজিত আছ, সেই মনোমোহন রূপ যেন আমরা ধরিতে, ছুঁইতে ও সেবা করিতে পারি। পদ্মপলাশলোচন! আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার ঐ রক্তোৎপলদলরঞ্জনচরণ সেবনে কৃতার্থ হই, তোমার সেবা ব্যতীত যেন অন্যাভিলায মনেও স্থান না পায়. আমরা যেন তোমার প্রেমের মধুরিমা প্রাণে প্রাণে আস্বাদন করিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া শ্রীশ্রীনিত্যপূজার অধিকারী হইতে পারি; অহঙ্কার, অভিমান ও পুরুষবুদ্ধি যেন আত্ম-বলিদানে প্রতিবাদী না হয়। দোহাই নিত্যগোপাল! আমাদের তুমিই সব। "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।" জয় নিত্যগোপাল, জয় প্রাণগোপাল, বাক্যে তোমার জয়, পাণিপাদে তোমার জয়, উপস্থ-পায়ুতে তোমারই জয়, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকে তোমার জয়, রূপ-রস-গন্ধস্পর্শ-শব্দে তোমারই জয়,আমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারে তোমারই জয়,! গোপাল! কবে আমরা তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া তোমার স্বভাব-ললিত হাস্য নিরীক্ষণকরতঃ তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাইব ও তোমার আদরে আদরিণী হইব? চরাচরবিশ্বের সর্ব্বভাবেই তোমার শ্রীমুখপদ্মের মাধুর্য্য দেখিয়া কবে তোমার লীলাকৈবল্যের সাথী হইব? ক্রীড়াময়! নটবর! সবই যে তোমার রসলীলার লাগি' অপূর্ব্বসাজে নিজ অঙ্গ সাজাইয়া তোমার অঙ্গনা-বেশে দাঁড়াইয়া আছে, ভেদাভেদ, শ্লীল অশ্লীল পাপপুণ্য, এমন কি সর্ব্ববিধদ্বন্দ্বেই যে একমাত্র তোমারই রসলীলা ব্যক্ত ইহা আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন কবে করাইবে? বঁধু! তুমি তোমার বিশ্বপ্রাণাকর্ষী প্রেমের উচ্ছ্বাসে আমাদিগকে পরাভব করিয়াছ। অবিশ্বাসী প্রাণ'ত এত পাইয়াও তোমার সরল স্বাভাবিক প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া তোমাকে আপনার বুঝিয়া নিজকে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলনা। 'অহং' এর প্রতি তাহার কত মায়া! হে চিরসুন্দর! তোমার সরলব্যবহার দেখিয়া তোমার কাছে কোন বাসনা নিয়া উপস্থিত হইবার কথা মনে হইলেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হই; আমাদের চাহিবার, বলিবার ও জানিবার কিছুই নাই কেবল এইমাত্র জানি তুমি আমাদের ও আমরা তোমার। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার রসলীলা! শ্রীশ্রীনিত্যগোপালার্পণমস্তু।

শ্রীশরৎকুমার ঘোষ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধু-র্জয়তি।

শ্রীশ্রীনিত্যপদে।

"কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

হে আমার জীবন সম্বল! তুমি কোথায় লুকাইয়াছ! তোমায় ছেড়ে জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমার সকল সুখ ও শান্তির আলয় তুমি। এই উত্তপ্ত বালুকাময় সংসার-মরীচিকায় আমাকে ফেলিয়া তোমার প্রসন্ন শ্রীমুখ কোথায় লুকা'লে? তোমার অদর্শনে আমার সকলই গিয়াছে। আমার উত্তম, সাহস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা কিছুই নাই। তোমায় ছাড়িয়া দগ্ধ উদর পোষণ করিয়া এই

দেহ ভার যে এখনও বহন করিতে হইতেছে ইহা অপেক্ষা আর দুঃদৃষ্ট কি হইতে পারে? আর কাহার নিকট প্রাণ জুড়ান কথা শুনিব? কে বিপদে অভয় দিবে? কে শোক তাপে শান্তি দিবে? হে অনাথশরণ! তোমার বিরহে আমার অনেক সময় ভ্রমময়ী দশা উপস্থিত হয়। কি উপায় করি? আমার মনঃ-তরীতে তুমিই কর্ণধার। উত্তালতরঙ্গ সমাকুল ভবার্ণবে কাণ্ডারীবিহীন মনঃ-তরী আর কি রক্ষা পায়? আবার এ নৌকায় ছয়টা দস্যু উঠিয়া পড়িয়াছে। ভয়ে, ভজন-সাধন দুইটী দুর্ব্বল দাঁড়ী পলায়ণ করিয়াছে। এইবার বুঝি নৌকা ডুবে; আমার সকল আশা সকল অভিলাষ ভাসিয়া যায়। কালস্রোতে না জানি কোথায় চলিয়া যায়!

হে প্রাণরমণ! তোমার দয়ার অন্ত নাই। তুমি দয়া করিবার সময় পাত্রাপাত্র বিচার কর নাই। নতুবা আমার ন্যায় অপাত্র তোমার দয়া কিরূপে পাইবে? হে অহেতুক কৃপাসিন্ধো! তোমার দয়ার কথা স্মরণ করিলে আমি আত্মহারা হইয়া যাই। এ জীবনে তোমার মধুর কীর্ত্তন, শ্রীসংকীর্ত্তন মাঝে তোমার অনুপম নর্ত্তন আর শুনিতে ও দেখিতে পাইব না। সে দিন তোমার তিরোধানবার্ত্তা অশনি পাতের ন্যায় আমাকে জীবন্মৃত করিল, সে দিন কি বিষম দুর্দ্দিন। সেই বিষম আঘাতে এখনও যে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছি সে কেবল আমি পাপিয়ান বলিয়া।

আমরা অনাথ হ'লাম এত দিনে।
প্রাণের প্রাণ জ্ঞানানন্দ নাথ বিনে॥
কে আর কাঁদিবে পতিত দেখিয়া,
চরণদানে জুড়াইবে হিয়া,
হরিনাম সুধা যাচিয়া যাচিয়া;
বিলাবে পাতকী দীনে॥
সংকীর্ত্তন মাঝে আর কে নাচিবে,
হরি হরি বলি দুবাহু তুলিবে,
প্রেমানন্দে কি আর ভকত মাতিবে;
হৃদয় রতন বিনে॥
কোথায় যাইলে পাইব তাহারে,
অন্তরের ধন লুকা'ল অন্তরে,
কাঙ্গাল মাধব কাঁদিছে কাতরে;
কে রাখে দুর্দ্দিনে॥

হে নয়নের মণি! তোমার অদর্শনে আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি। দয়াল! আর কতকাল আঁধারে থাকিব? আমার হৃদয় আলো কর। শুনিয়াছি ভাগ্যবান ভক্তের নিকট তোমার নিত্য প্রকাশ। যাহারা ভাগ্যবান তাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান। আমাকে "দেখার মত" ডাক শিখাও, না হয় দয়া করে দেখা দাও। প্রভো! দুইএর একটা কর। তোমার বিরহরূপ কাল-ভুজঙ্গের বিষজ্বালা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

"আমায় শমন-দমন নিলে বাঁচি।
না হয় শমন নিলে তাও বাঁচি॥
আমি নিলে বাঁচি মলে বাঁচি।
না হয় দুএর একটা হলে বাঁচি॥"

হে অগতির গতি! আজি এ বিষাদের মধ্যেও কি জানি কেন আনন্দের মৃদু আলোক দেখিতে পাইতেছি! আজি তোমার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম" দর্শন দিয়াছেন। আজি মনের দুঃখ উঘারিয়া প্রকাশ করিবার ও সহানুভূতি পাইবার স্থল মিলিল। শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্মের জয় হউক! লীলাময় তোমার নামের জয় হউক!! তোমার ভক্তের জয় হউক!!!

ভক্তকৃপাভিক্ষু শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু,
বেরিলি।

বাসনা।

সখা !

তোমারে লইয়া, আঁধার নিবিড়,
বিপিনও আমার ভাল ;
নাহি চাহি আমি, রম্য হর্ম্য গেহে,
প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ-আলো।
পাই যদি তোমা, হে হৃদয়-নাথ !
ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ করি ;—
মহিমায় তব, আঁখির পলকে,
কোটী কোটী ইন্দ্র গড়ি।
তুচ্ছ সে ব্রহ্মত্ব, যোগি-ঋষিগণ
প্রলুব্ধ যাহার তরে ;
পাইলে তোমারে, বাসনা-অনলে
কে আর পুড়িয়া মরে ?
পাইতে তোমারে, যদি হে সতত,
আকুল বাসনা জাগে ;
বল তবে নাথ ! কোন্ হতভাগা,
দরশ তোমার মাগে ?
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, রহিয়াছে তব
বিশাল প্রেমের রাজ্য ;
সকলের স্থান, হয় সেথা, নাথ !
শুধু বুঝি আমি ত্যাজ্য ?
সামীপ্য, সাযুজ্য, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ,
কিছু নাহি চাহি আমি।
শুধু এস নাথ ! বিনোদিয়া বেশে
হৃদয়ে, হৃদয়-স্বামি !
এ পাপ-পঙ্কিল, হৃদে যদি হয়,
অসম্ভব তব আসা ;
তবে, নাহি কাজ আসি', প্রেম-বিন্দু দানে,
পূর্ণ কর মম আশা।
দাও, ভেঙ্গে দাও এ মায়ার খেলা,
কতকাল খেলিয়াছি ;
মোহিত হইয়া, তোমার খেলায়,
তোমারেই ভুলিয়াছি।
ক্রমাগত নাথ ! বিপথে চলিয়া,
আসিয়াছি বহু দূরে ;
শ্রান্ত ক্লান্ত মন, তাপিত পরাণ,
মরুভূমে ঘুরে ঘুরে।
নিরাশ আঁধারে, অবসাদে আজ,
পড়িয়াছে তোমা মনে ;
ডেকে লও—নাথ ! ডেকে লও কাছে,
এ তাপিত মূঢ় জনে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

ধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম শব্দটি সংস্কৃত "ধৃ" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৃ, অর্থে ধারণ করা। সুতরাং এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচার করিলে উহাতে ইহাই বুঝায় যে, যাহাতে জীবগণকে ভবসাগর-পতন হইতে রক্ষা করে, যাহাতে জীবের অধোগতি নিবৃত্ত করে তাহাই "ধর্ম্ম !" আবার "ধর্ম্ম" অর্থে গুণ। প্রত্যেক বস্তুরই এক এক বিশেষ গুণ থাকে। শ্রীভগবানে

ভক্তি, জীবের প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ বা ধর্ম্ম। তাঁহার আদেশ পালনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই উভয় অর্থেই উক্ত শব্দটি সকল দেশে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক এমন কোন মহামূল্য দ্রব্য আছে কি না যদ্দ্বারা জীবের অধঃপতন নিবৃত্ত হইয়া আত্মার উদ্ধারসাধিত হয়।

ধর্ম্ম-জগতে মহাপুরুষ-নামধেয় যত যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের স্থাপনা বা সংস্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের উপাসনাই জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অহঙ্কারী কতকগুলি জীব আছেন তাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা-পদ্ধতি স্বীকার করা দূরে থাকুক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহেন। যদিও ঐ সকল লোকের সহিত এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া অমূল্য সময়ের অপচয় করা ধার্ম্মিকগণ আবশ্যক মনে করেন না তথাপি বর্ত্তমান তামসযুগে এই সকল লোকের সংখ্যা বড় কম নহে বলিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে সরলবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ অনেক ভক্তের হৃদয়ে কঠিন আঘাত প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে এস্থলে দু একটি কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিক্ষামদে উন্মত্ত জীবগণ "ধর্ম্ম" বিশ্বাস করুন বা না করুন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান কালের ইংরাজ প্রভৃতি কয়েকটি জাতি সাংসারিক ও সামাজিক চরম (?) উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে উন্নতি-বিষয়ে তাঁহারাই আদর্শ পুরুষ। সেই সুসভ্য ইংরাজ প্রভৃতি জাতিগণের প্রধান প্রধান মনীষিদিগের বিচার প্রণালী দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যিনি যে বিষয়ে বিশেষ সুদক্ষ (Expert) সেই বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে তাঁহারই মত লওয়া উচিত ও সেই উপদেশই প্রকৃত উপদেশ। যথা চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে ডাক্তারের নিকট; আইন বিষয়ে উকীলের নিকট পরামর্শ লওয়াই সঙ্গত ও একান্ত বিধেয়। এই নির্ভরশীলতা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইতে পারেন না। বিচারালয়ে বিচারকালে,—চিকিৎসা বিশারদ যদি খুনকে খুন না বলেন, বিচারপতি তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই অদ্ভুত নির্ভরশীলতা না থাকিলে ইংরাজ-জাতি এত সুশৃঙ্খলতায় রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ইহা হইতে সত্যই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি উন্নতি করিতে চাও তবে নিজে সর্ব্বজ্ঞ না হইয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষজ্ঞের বাক্যে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস কর।

ভাই ধর্ম্ম-বিমুখ তার্কিক! বল দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জনে যত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার কত অংশের অংশ পরিশ্রম করিয়াছ? ঈশ্বর আছেন কি না? ধর্ম্ম কি? জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছ? যদি প্রকৃত কথা বল তবে বোধ হয় উত্তরে বলিতে হইবে "কিছুই করি নাই।" অথচ মহাবিজ্ঞের ন্যায় কত যুক্তি-তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম উড়াইয়া দিতে চাও, ঈশ্বর উড়াইয়া দিতে চাও। ওকালতি পাস করিয়া চিকিৎসক নাম লইতে যাওয়া কি সঙ্গত? আর ঐ দেখ বেদব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণ, যীশু-লুথার-মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ; বুদ্ধ-চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ সকলে সমস্বরে ঈশ্বর বিষয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে কি বলিতেছেন শুন। ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মের জন্য মন-প্রাণ ও দেহ উৎসর্গ করিয়া কি উপলব্ধি করিয়াছেন দেখ!

আমাদের বোধ হয় বিবেকশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে পার্থিব ধন, মান, ঐশ্বর্য্যে স্থান অধিকার করিলেও ধর্ম্ম-জগতের পরামর্শ দিবার আমি কেহই নহি। ধর্ম্মরাজ্যে আমি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ব্যতীত কিছুই নহি। যদি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চাও তবে ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ কর। ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির সম্যক আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে জগতের সমস্ত মানবই এককালে এক পরিবারভুক্ত ছিল। ইংরাজী ভাষার মাতা-পিতা-দুহিতা প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষার অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। এইরূপ পারস্য ও আরব দেশীয় ভাষার শব্দেও উক্ত ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষার অবিকল সাদৃশ্য দেখা যায় (১)। অতএব যখন নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে এই সমগ্র মানবজাতি অতি পুরাকালে একই পিতা-মাতার একই পরিবারভুক্ত ছিল তখন এই বুদ্ধি বৃত্তি বিবাদের চরম উৎকর্ষের দিনে আবার কি সমগ্র মানবজাতির এক পরিবার ভুক্ত হইবার আশা করা যায় না? জগতের এই সুখের দিনের উদয় হইলে, ভ্রাতৃপ্রেমের সাধন করিলে বোধ হয় ধরাধাম স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে বোধ হয় মানব-জগৎ উচ্চ নীচ প্রভৃতি জাত্যভিমান ভুলিয়া গিয়া পরস্পরে এক পিতা-মাতার সন্তান বলিয়া প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে।

(১) See Maxmuller's "History of Language" and Trench's "Study of words and selected glossary."

তাহা হইলে সামান্য স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জীবন নরহত্যা প্রভৃতি ঘোর পাপ কার্য্য জগৎ হইতে পলায়ন করিবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমরা বুঝি এই অবিদ্যা-পরিণত-ধামে এই স্বর্গ-সুখ আকাশ-কুসুম সদৃশ। কিন্তু তথাপি সৎবিষয়ের সংকল্পও পুণ্যপ্রদ, এই হেতুতে উক্ত বিষয়ের কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে।

আমরা বেশ লক্ষ্য করিয়াছি যে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে অপার্থিব প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য দেখা যায়, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি আলোচনার জন্য গঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সে বিমল আনন্দের লেশ মাত্রও সম্ভব নহে। পার্থিব বিষয় বিমল সুখদানে অক্ষম।

আমরা এ স্থলে দেখিব জগতের সমস্ত মানবের কোন সাধারণ ধর্ম্মাবলম্বনে পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সেই পরম জনক বা পরমা জননীর আরাধনা করিতে পারা অসম্ভব কি না।

জগতে অসংখ্য উপধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেগুলি জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মে অন্তর্নিবিষ্ট। বর্ত্তমান জগতে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান এই তিন প্রধান ধর্ম্ম বিদ্যমান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বর্ত্তমানে কিছু স্বতন্ত্রভাব ধারণ করিলেও মূলে ইহা হিন্দু ধর্ম্ম। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা গুলি পরিহার করিয়া আমরা দেখিব উক্ত কয়েকটি প্রধান ধর্ম্মের মূলে কোনও পার্থক্য আছে কি না। এবং উক্ত কয়েকটি ধর্ম্মে কি কি সাধনা পরিলক্ষিত হয়। তা'রপর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উদ্দেশ্য কি তাহারও ব্যাখ্যা এবং মীমাংসা করিবার ইচ্ছা রহিল। সাবজনীন ভাবই বর্ত্তমান যুগের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। এইকালে সম্প্রতি যে যে মহাত্মা

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের"ই পক্ষপাতী। সুতরাং স্পষ্টই বোধ হইতেছে বর্ত্তমান কালে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়"ই প্রচলিত ধর্ম্ম হইবে; এবং উহা প্রচারের জন্যই বোধ হয় প্রভূতশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণ এমন কি কেহ কেহ বলেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান ছদ্মবেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎবাসীর পরম সৌভাগ্যের উদয় করিয়া দিয়াছেন!

আমরা কোন ধর্ম্ম বিশেষের নিন্দা করিতে আদৌ ইচ্ছা করি না। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির কি মত তাহারই যথাযথ উল্লেখ ও বিরোধীস্থান গুলির সাধ্যমত আবশ্যকীয় মীমাংসা শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবের মতানুসারে প্রকাশ করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন ঈশ্বরকে যে চায় সে পায়। আবার যীশুখ্রীষ্ট ও বলিতেছেন "চাও পাইবে," "দ্বারে আঘাত কর দ্বার খুলিবে" (Ask it shall be given, knock it shall be opend.) উপদেশটি বড়ই মধুর ও বিশেষ উপকারী। বাস্তবিকই যে যাহা জানিতে না চায় সে তাহা জানিবে কিরূপে? বিদ্যালয়ে না গেলে লেখাপড়া হইবে কিরূপে? আগ্রহ কই? চেষ্টা কই? জলের অভাব আছে কি? পিপাসা কই? পূজনীয় ভক্তবর শিশিরবাবুরও সেই অনুভূতি—"যেইমাত্র প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে (শ্রীভগবান) আছে আছে ভাব অমনি হয়েছে"। পরমহংসদেব বলিতেন, "জলে ডুবিলে যেমন প্রাণটা আকুলি ব্যাকুলি করে শ্রীভগবানের জন্য যখন প্রাণ সেইরূপ ব্যাকুল হইবে তখন শ্রীভগবান লাভ হইবে"। এখন বুঝিয়া দেখ ভাই শুষ্ক তার্কিক! ভগবানের জন্য প্রাণে কি ব্যাকুলতা হয়েছে?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আমেরিকাবাসী একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক * প্রথম বয়সে নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর মানিতেন না, ধর্ম্ম মানিতেন না কিন্তু তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র ছিলেন এবং জগতের মঙ্গলের জন্য অন্তরের সহিত চেষ্টা করিতেন। শ্রীভগবানের চিহ্নিত দাসগুলি জগতের যে অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করুন না, যে অবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে থাকুন না কেন, সময় উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীভগবান তাঁহাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নিজের কোলে টানিয়া লন। এই মহাত্মারও সময় উপস্থিত। ইহার প্রাণ অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিব মান, সম্ভ্রম, ধন, ঐশ্বর্য্যে, সেই অমূল্য শান্তি-ধনের অভাব পূরণ করিতে পারিল না। প্রাণ যেন সর্ব্বদাই কি চায়। এ দিকে ঈশ্বর নাই, ধর্ম্ম নাই এই অজ্ঞানমোহিত সংস্কারে তাঁহার প্রাণে বিষম জ্বালা হইয়া উঠিল। পরলোক নাই;—তবে মৃত্যুর পর কোন জগতে সুকর্ম্ম জনিত শান্তি সম্ভোগ করিবেন? ঈশ্বর নাই;—তবে কে কর্ম্মফল দাতা হইবে? ধর্ম্ম নাই;—তবে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য কি? পুণ্য কার্য্যের, জগতের মঙ্গল কার্য্যেরই বা আবশ্যকতা কি? ইত্যাদি উদ্বেগে তাঁহার প্রাণে ভীষণ অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হইল। জীবন ভার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। সংকল্প করিলেন মৃত্যুর আলিঙ্গন লাভ করিয়া এই "অস্থিত পঙ্কের" অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। পিস্তল প্রস্তুত হইল, কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইল, একবার দুইবার তিন বার কিন্তু সাধ্য কি? "রাখে কৃষ্ণ মারে কে"। তিন বারই ব্যর্থ হইল। সাহেবের প্রাণে প্রার্থনা ছিল, "যদি ঈশ্বর সত্য হও, ঈশ্বর থাক, ধর্ম্ম থাকে, তবে এইবার আমাকে রক্ষা কর।" ধন্য সাহেব! ধন্য তোমার পিপাসা! এইরূপ পিপাসা হইলেই

* Dr. T.

তো হিমাদ্রি-শিখরের তুষার গিশ্রিতা পূতসলিলা গঙ্গার স্নিগ্ধবারি পানে উৎকট পিপাসার চিরশান্তি হইবার সূত্রপাত হয়। আর ধন্য দয়ার নিধি লীলাময় শ্রীভগবান! তোমার এত দয়া না হইলেঃকি তোমার ভক্তগণ সংসারের অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ, অপ্সরানিন্দিত-রূপবতী-পূর্ণযুবতীসঙ্গ প্রভৃতি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নকন্থাপরিহিত হীনতম ভিক্ষান্নজীবী হইয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দলাভে লালায়িত হয়? সাহেবের মরা হইল না, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কি অদ্ভুত! আকাশপটে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত বাইবেলের একটি উপদেশ সাহেবের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত। শরীর শিহরিয়া উঠিল। সাহেব পিস্তল ফেলিয়া দিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মূক ও জড়বৎ হইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের নূতন জীবন লাভ হইল। তাঁহার বুঝি "দীক্ষা-সংস্কার" হইল। ধন্য জগদীশ! ধন্য তোমার দয়া! বাইবেলে সাহেবের রুচি হইল। প্রাণে যেন "আছে আছে" ভাবের সঞ্চার হইল। সাহেব প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। বিশ্বাসরূপ অমূল্য বীজ সাহেবের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথম রোপিত হইল! বীজ অঙ্কুরিত হইল। শ্রীভগবানের কৃপাবারিসিঞ্চনে অঙ্কুর হইতে অনন্ত-শাখা-প্রশাখা-সম্বলিতা ভক্তি-লতার বিকাশ হইল। বাইবেল পুস্তক সাহেবের কণ্ঠ-ভূষণ হইল। ধর্ম্ম লইয়া সাহেব উন্মত্ত। বর্ত্তমানে কোন কোন সময়ে দশ সহস্র শ্রোতা সাহেবের ধর্ম্ম-কথা শ্রবণে উদগ্রীব। ভাই নাস্তিক! ইহা অপেক্ষা দয়া জগতে আর কি হইতে পারে? নাস্তিক, তুমি যদি যথার্থ বুঝিতে চাও, জানিতে চাও, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ আছেন কি না, বুঝিবার জন্য যদি প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে, তবে ঐ সাহেবের শিক্ষা গ্রহণ কর। নির্জ্জন স্থানে গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাতর প্রাণে ইহা বলিয়া প্রার্থনা কর, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই জীব-জগতের ভর্ত্তা যদি কেহ থাক, তবে দয়া করিয়া আমার হৃদয়ে বিশ্বাস দাও, ভক্তি দাও। তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।" দেখিবে ভাই, তৎক্ষনাৎ কে যেন পশ্চাৎ হইতে তোমার অঙ্গস্পর্শ করিবে, প্রেমময় পরম দয়ালের পবিত্র স্পর্শে বিশ্বাস বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইবে, তোমার "পরম দীক্ষা" লাভ হইবে। ইহা হইতে আর অধিক সুবিধা কি হইতে পারে? ইহাতেও যদি প্রবৃত্তি না হয়, তবে ভাই তোমার যুক্তিতর্ক লইয়া তুমি থাক। পরের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া অধিক কর্ম্মফল সঞ্চয় করিও না।

নানক, যীশু বসু, বাসু প্রভৃতি জগতের সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্য একবাক্যে প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে শ্রীভগবান আছেন! সুতরাং উন্নতি প্রয়াসী মানব মাত্রেরই সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। যিনি শিক্ষামদে উন্মত্ত হইয়া উক্ত মহাজনগণের সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চান, তাহাদিগের সহিত অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া কেবল একটি কথা বলিতে চাই যে, ভাই হে! যে জ্ঞানমদে তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, সেই জ্ঞান রাজ্যে যিনি তোমাকে চর্ব্বন করিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাসী। যে নিউটনের দুই একটি উচ্ছিষ্ট জ্ঞান-কণা ভক্ষণ করিয়া তুমি তোমাকে এত গর্ব্বিত মনে করিতেছ, তিনি এক জন পরম ধার্ম্মিক ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত নিজ ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য যিনি বাজারের মিষ্টান্নের মধ্যে গুড় খাইয়া থাকেন, অত্যুচ্চ বিচারাসনের শোভা-সম্পাদনকারী এরূপ বঙ্গবাসী

হিন্দুসন্তানের এখনও অভাব নাই। একই পিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত, একই শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের একই উপাধি-ভূষিত, এক বৃন্তের দুটি ফলের ন্যায় দুটি ভাইএর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাস, একভাই একান্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসী, অপর ভাই ঘোর অবিশ্বাসী, ইহাও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ কি বলিতে পার? তুমি না পার দয়াময়ের কৃপায় আমরা পারি। যা'কে তা'কে বলিবার আবশ্যক নাই।—যে চায় সে পায়। * এখন এস ভাই ধার্ম্মিক! আমরা ধর্ম্মসঙ্গত তর্ক আরম্ভ করি। নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন জন্য আরও দুই একটি তর্ক উত্থাপন করা'র পর আমরা শ্রীভগবানের সুমধুর লীলারাজ্যে প্রবেশ করিব।

যদি ঈশ্বর থাকেন তবে সত্য-কথন, পরোপকার, পরহিংসানিবৃত্তি প্রভৃতি মহৎগুণের অনুশীলন করিয়া আমরা এই জগতের প্রভূত উপকার করিব এবং দয়াময়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব! আমাদের জীবন শেষে শ্রীভগবান যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে কি অনুষ্ঠান করিয়াছ? আমি তখন সাহসের সহিত বলিতে পারিব, "ঠাকুর! তোমার প্রেরিত অথবা তোমারই রূপান্তরিত কোন না কোন মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত আমি ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে আর কি অধিক করিবার সম্ভব? ঈশ্বর যদি না থাকেন তথাপি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য আমার কিছু অনিষ্ট না হইয়া বরং জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইল। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, হে জীব! তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে পার না। সমাজ তোমাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না। প্রকৃতি তোমার স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করিবে না। তুমি নাস্তিক বলিয়া, তুমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া, জগতের কোন সমাজই তোমার চৌর্য্যবৃত্তি পরদারাপহরণ নরহত্যা প্রভৃতি সহ্য করিবে না। তোমাকে উপযুক্ত শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। আবার যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তোমার লাভ না আমার লাভ?

যদি ঈশ্বর থাকেন ও সেই সঙ্গে তিনি জানেন যে ধর্ম্মজগতে যত মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মস্থাপনা বা সংস্কার করিয়া গিয়াছেন তুমি কাহাকেও বিশ্বাস কর নাই, বরং তাচ্ছিল্য করিয়াছ, তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছ, নিজে অসিদ্ধ হইয়া কটু যুক্তি শিক্ষা দ্বারা সরলপ্রাণ কত জীবের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তখন তোমার কি দুর্দ্দশা হইবে ভাবিয়া দেখ। আর এক কথা তুমি আস্তিকই হও, আর নাস্তিকই হও, তোমাকে মরিতে হইবে। মৃত্যুকালে যখন রক্তের তেজ একেবারে শান্তভাব ধারণ করিবে, প্রাণ যখন সেই নিদানকালে তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি ঈশ্বর থাকেন, তখন তুমি কি উত্তর দিবে? কিন্তু আস্তিক তখন ধর্ম্মজগতের মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করিতে পারিবে। অতএব ভাই ধার্ম্মিক! আমাদের মূল মন্ত্র হউক "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" বঞ্চিত হই আমাদের দোষ নাই, কারণ আমরা সামান্য।

* বর্ত্তমান জগতে উচ্চ শিক্ষিত ধর্ম্মবিশ্বাসী যথেষ্ট সাহেব আছেন। কি বিজ্ঞান শাস্ত্র, কি অঙ্কশাস্ত্র, সকল বিষয়েই তাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত। জগতের মধ্যে তাঁহারা সমাজের শিরোমণি। আবশ্যক হইলে পরে নাম দেওয়া যাইবে।

ধর্ম্মজগতের সমস্ত মহাজন যখন একবাক্যে বলিতেছেন যে শ্রীভগবান আছেন, তিনি দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান, উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং তাঁহার লাভই জীবের পরম পুরুষার্থ, তখন এস আমরা সকলে সমপ্রাণে তাহাই বিশ্বাস করিয়া পথের অনুসন্ধান করি। লভ্য বস্তু এক, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এখন পথ! আপাতদৃষ্টিতে বোধ হইতেছে, পথ অনেক। এমন কি অজ্ঞান অন্ধকারে মন আচ্ছাদিত থাকিলে সময়ে সময়ে হয়ত ইহাও বোধ হয় যে কোন কোন পথ বুঝি বিপরীতমুখী। কিন্তু মহাজনগণের উপদেশানুসারে জানা যায়, তাহা প্রকৃত নহে, পথগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। অজ্ঞানজনিত অন্ধকারবশতঃ ঐরূপ বোধ হয়। প্রকৃত পক্ষে সকল পথের চরম সীমায় সেই একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিরাজমান। ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই সচ্চিদানন্দ সম্ভোগের উপায় মাত্র। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চরণযুগল শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া এই ক্ষুদ্র জীব সেই ভিন্ন ভিন্ন পথের একতা সম্পাদনে যত্নবান হইতে ইচ্ছুক। ধার্ম্মিক ও ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রকাশক শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

কালো।

জান কি ভাই! আমি কালো কেন ভালবাসি, কেন কালার কথা কইতে আমার রসনা নৃত্য করে, কেন কালবরণ দেখতে আমার চক্ষু অনিমিষে চাহিয়া থাকে, কেন চাঁদ পূর্ণ হইলে কাল চিহ্ন বক্ষে ধরে, কেন ফল শুখিয়ে গেলে কালো হয়, কেন তান্ত্রিকগণ কাল অপরাজিতার এত গৌরব বাড়িয়েছেন, রাবণ-বধকালে রামচন্দ্র শ্বেত-পদ্মে রক্ত-পদ্মে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কালো কমল দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করা হইল তখন দেবী রামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন। কেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তুলসী অর্থাৎ কাল তুলসীর এত মহিমা? আমার বোধ হয় কালো বই জগতে কিছুই ভাল নাই। ভাল নাই বলিয়া আদিদেব ও আদ্যাদেবী সাকারে কাল বরণ ধারণ করিয়াছেন। আগে কালো পরে গোরা; এ পুরুষ-তত্ত্বেও দেখি, প্রকৃতি-তত্ত্বেও দেখি। দশমহাবিদ্যার দশ ছবি অনেকেই দেখিয়াছেন; দেখুন দেখি, তা'তে কি আগে কালো পরে গোরা নয়? কালী, তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাত্মিকা। কালী, তারা উভয়েই কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু সর্ব্বশেষে কমলা গৌরবর্ণা। তাই দেখ প্রকৃতি-তত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, আগে কালো, পরে গোরা। সৃষ্টি-তত্ত্বেও তাই। আগে কালো, পরে গোরা। মহাপ্রলয়ে নিবিড় অন্ধকারে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, নক্ষত্র নাই, ঘোর কাল বরণে জগৎ ঢাকা। পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে জ্যোতি; তা হলেই দেখ, আগে কালো, পরে আলো, সেই জন্য এখনও চক্ষু মুদিলে কাল বরণে জগৎ ঢাকা দেখিতে পাই, কিন্তু যাঁরা যোগী, তাঁরা কালোর মধ্যে জ্যোতি দেখিতে পান; তাও যোগদ্বারা, কিন্তু চক্ষু বুজ্‌লেই যে কালো দর্শন! এতে যোগ-অযোগ নাই; এই কালোর দর্শন স্বাভাবিক-ক্রিয়া। পুরুষ-তত্ত্বেও দেখি আগে কালো, পরে গোরা; নিত্যধাম গোলকে নিত্য

রূপ নিত্যানন্দময়, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, বর্ণে কালো। বৃন্দাবনেও সেই রূপ! কিন্তু সেই কালোই কলিযুগে গুপ্তবৃন্দাকানন এই নবদ্বীপ ধামে গোরা হইয়াছিলেন। তাই বলি আগে কালো তার পর গোরা। কিন্তু গোরা দেখলেন গোড়ায় আমি কালো (অর্থাৎ মূলে তিনি কালবর্ণ), তাই বুঝে গোরা হইয়া সদাই কালোবরণে মিশিতে চাইতেন। তা'র প্রমাণ, নীলাচলে, বৃন্দাবনে কালো তমালকে জড়াইয়া ধরিতেন; যমুনার জল কালো ব'লে তাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন; অবাক্ হইয়া কালো ময়ূরের নৃত্য দেখিতেন; কালো মেঘের দিকে চাহিলে তাঁহার চক্ষে দর দর ধারা বহিত, কাল সার হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন; বৃন্দাবনে কাল ব্রজবালক দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না, অপলকে সেই বালকের মুখ খানি দেখিতেন; এমন কি পুলকে সেই বালককে বক্ষে ধরিয়া নৃত্য করিতেন। নীলাচলে সেই গৌরাঙ্গদেব কালোর প্রেমে বিভোর হইয়া কালো বরণে মন মাতাইয়া সমুদ্রের কালো জলে ডুবিয়া ছিলেন; ধীবরেরা জালে করিয়া তুলিয়াছিল; লবণ সাগরের কালো জল হইতে উঠিয়া প্রেমের গোরা শ্যাম-সাগরে মিলাইল। তাই বলি কালোর বুঝি তুলনা নাই, নইলে কেন সকলে কালোতে মিশাইতে চায়? গঙ্গার তুল্য শ্বেত-প্রভাপূর্ণ পবিত্র জল আর নাই, কিন্তু সেই গঙ্গা কালোবরণ হইতে উদ্ভূতা হইয়া শ্বেতবর্ণ শিবের কালো জটায় ছিলেন; কিন্তু ভগীরথের বাসনাপূর্ণ করার জন্য শেষে সাগরের কালো জলে তাকে মিশাইতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, অর্থাৎ মেয়েলি কথায় প্রচলিত আছে "সর্ব্ব দোষ হরে গোরা,"। অন্য অঙ্গসৌষ্ঠব না থাকিলেও কন্যা যদি গৌরবর্ণা হয়, তা হ'লে কেহ নিন্দা করিতে পারে না। কিন্তু সেই গৌরবর্ণা কন্যার চক্ষুর মণীদুটি যদি কালো না হ'য়ে কটা হয় তা হ'লে কেউ কি দেখিতে ভাল বাসে? কেশগুলি যদি কটা হয় তা হ'লে কি শোভা পায়? যতই সুন্দর হো'ক, কালো আমার নিত্য সুন্দর! সৃষ্টির আদিতেও কালো, প্রলয়েও কালো, কালোতে গোরা মিশিয়ে যায়, কালতে সাদা মিশিয়ে যায় কিন্তু কালো কিছুতে মিশায় না। কালো দেখায় আমি সকলবর্ণের রাজা। তাই রাই বিনোদিনী কালোর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কালাচাঁদকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শত বৎসর কালোর বিরহ সহ্য করিয়া তন্ময়-ভাবে, "আমি কৃষ্ণ" "আমিই কালো" এই বুলি বলিতে বলিতে ব্রজলীলার পরিণাম রাধাকৃষ্ণ একঅঙ্গ হইয়াছিলেন "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর," তাই বুঝি মহাভক্ত কবি স্বর্গীয় মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় লিখিয়াছিলেন:—

"কাল বই, ভাল বই,
সদাই বলে রাই,
মা গো তোর মেয়ের কাছে
কালরই বড়াই জানে বড়াই।

কাল কুসুম পেলে পরে,
মালা গেঁথে পরস্পরে,
যতনে পরাই সাধ পুরাই।
আমরা ত জানি ভালরূপ,
কিশোরীর কাল ভালরূপ,
কালর নিন্দায় বিষমবিরূপ,
সেধে মন ফিরাই, বড় ডরাই।
সখীর কোন অসুখ হ'লে,
আমাদের সখীমহলে,
কালর গুণ গাই কুতুহলে,
প্যারীকে শুনাই, নইলে হারাই,
কাল কাল কি হ'য়েছে,

কালার ভাবে রাই রয়েছে,
আমাদের মতি লয়েছে
সাধ্য কি ফিরাই, আছে ধরাই।

শ্রীধর্ম্মদাস রায় গুণাকর।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব।

"যজ্ঞব্রত-তপদান-জপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিস্ফলং নাত্র সংশয়ঃ॥"

গুরু-গীতা।

[ইদানীং দেখিতে পাই অনেকেই শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে অল্প হউক কিম্বা অধিক হউক সংকীর্ণভাব পোষণ করেন। প্রকৃত গুরুতত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রতি আমার এই উক্তি নহে। তবে নিজচক্ষে বহুস্থলে ঐ সংকীর্ণতা দেখিয়াছি সেই জন্যই ঐরূপ উল্লেখ করিলাম। অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, নরাকার পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ পরমদেবতা দয়াময় শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা একটি প্রবন্ধাকারে সাধারণের নিকট প্রকাশ করি। অদ্যকার এই প্রবন্ধ সংগ্রহ আমার সেই উদ্যমের ফল। ইহাতে নিজের মত আমি কিছুই দিই নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটী শাস্ত্র হইতে ইহা একটী সংগ্রহ মাত্র। এই প্রবন্ধ পাঠে যদি নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব একজনও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন তবে আমি ধন্য হইব। আমার ভাষা অমার্জ্জিত তবে তাঁহারই মহিমা গাহিতে বসিয়াছি ভক্ত মহজ্জনের নিকট এই মাত্র বক্তব্য।]

মনীষিগণ সমাধিকালে যাঁহাকে আকাশবৎ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানে চিন্তা করেন; যিনি নিত্যানন্দময়, প্রসন্ন, দোষহীন, সর্ব্বেশ্বর, নির্গুণ, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, একমাত্র ধ্যানগম্য, প্রপঞ্চশূন্য ও বিশ্বের একমাত্র কারণ স্বরূপ; সেই অজর, মুক্তিদাতা, বিভু গুরুদেবকে বন্দনা করি।

অনাত্মবিদ্যোপহতায় সংবিদ
স্তম্মূল-সংসার-পরিশ্রমাতুরাঃ।
যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা যমাপ্নুয়ু
র্বিমুক্তিদো নঃ পরম গুরুর্ভবান্॥ ৮।২৪।৪৬

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ অনাত্মা, অবিদ্যায় যাহাদিগের আত্মজ্ঞান অচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং যাহারা অবিদ্যামূলক সংসার-পরিশ্রমে কাতর, তাঁহারা এই সংসার যাঁহার কৃপায় অবিদ্যা অপসৃতা হইয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ আপনি পরমগুরু হইয়া আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন।

"নমামি শ্রীগুরুং নিত্যগোপালং পরমেশ্বরং।
দীনবন্ধুং কৃপাসিন্ধুং পরব্রহ্ম স্বরূপকম্॥"

দয়াময়, স্নেহময়, পতিতপাবন, অভক্ত-বৎসল, পাপীর বন্ধু, অগতির গতি, বিদ্যার পতি, জ্ঞানেশ্বর গুরুদেবের কৃপায় আজ তাঁহারই তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার মানস করিয়াছি। যাঁহাকে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র নিচয়ে নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে ভক্তগণ, প্রেমিকগণ, জ্ঞানিগণ ভক্তিতে, প্রেমে সম্ভোগ করিতে গিয়া, জ্ঞানে অবধারণ-প্রয়াসে সীমা প্রাপ্ত হন নাই, সনকাদি মুনি, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই, মূঢ় আমি

সেই পরতত্ত্ব গুরু-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিবার কি স্পর্দ্ধা করিতে পারি? আশা করি কোথাও ভ্রম প্রমাদ করিয়া থাকিলে সুধিগণ সংশোধন করিয়া আমায় উপকৃত করিবেন। তাঁহারই গুণে আজ তাঁহারই কথা লিখিতেছি। তাঁহার ও তদীয় ভক্ত মহাত্মাগণের অহেতুকী করুণা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র ভরসা।

গুরু, এই শব্দের অর্থ বর্ণন করা যাইতেছে। যখনই কোন শব্দার্থের যোজনা করিতে হয় তখনই তাহার সর্ব্বদিক সর্ব্বভাব লইয়া দেখা প্রয়োজন। গুরু শব্দের সাধারণ অর্থটী কি? যাহা অতি মহান;—ইহাই সাধারণ অর্থ! 'যাহা অপেক্ষা মহান, আর কিছুই নাই।' গুরুভার বলিতে বুঝি 'অতি ভার বিশিষ্ট'; গুরুভোজন বলিলে বুঝি 'অধিক ভোজন'। এইরূপ দেখা যায় সাধারণ ভাষায় গুরুশব্দে মহত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য করে। সকলের অপেক্ষা মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ কি? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি মহান যিনি, তিনিই গুরু; তিনিই পরব্রহ্ম তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান। কেন না অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম মহান্ ও শ্রেষ্ঠ। তিনি যখন সগুণভাবে লীলা করেন, তখন যত কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎগুণ, সকলই তাঁহাতে সম্ভব হইয়া থাকে। আমরা কতটুকু সূক্ষ্মতার কল্পনা করিতে পারি? তুলনায় "সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি," কিম্বা কেশাগ্রের শত ভাগ;—তার শত ভাগ, এইরূপ সূক্ষ্মতার ভাব প্রকাশ করি। কিন্তু ব্রহ্ম "অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান," তিনি উভয় দিকেই মহান্। যে কোন ভাবে ধরা যায় তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি সূক্ষ্ম বস্তু সকলের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তিনি বৃহৎ বস্তু সকলের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। সেই "গুরুকৃষ্ণের" বিভূতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" ইত্যাদি

"যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥"

"গৃণাতি বেদ-দ্বারোপদিশতি সত্যানর্থান্ স গুরুঃ স চ সর্ব্বদা নিত্যোঽস্তি"। শ্রুতিঃ॥

যিনি সত্যস্বরূপ বেদ ব্রহ্মের উপদেশ দেন তিনিই গুরু। সেই গুরু সর্ব্বদা নিত্যভাবে বর্ত্তমান আছেন।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তৎ তৎ একরাচ্ছত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম॥"

গৃণাতি বেদদ্বারোপদিশতি সত্যানর্থান্ স গুরুঃ স চ সর্ব্বদা নিত্যোঽস্তি। ইতি শ্রুতিঃ॥

যিনি সত্যস্বরূপ বেদব্রহ্মের উপদেশ দেন তিনিই গুরু। সেই গুরু সর্ব্বদা নিত্যভাবে বর্ত্তমান আছেন।

গুরুগীতানুসারে,—

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎরুকারস্তেজ উচ্যতে
অজ্ঞানধ্বংসকরং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার। 'রু' শব্দের অর্থ তেজ। অতএব যিনি তেজদ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করেন তাঁহারই নাম গুরু। সুতরাং সেই গুরুদেবই ব্রহ্মস্বরূপ সংশয় নাই।

অপর—গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্যদাহকঃ।

উকারঃ বিষ্ণুরব্যক্ত স্ত্রিতয়াত্মাগুরুস্মৃতঃ॥

"গুরু" এই শব্দের মধ্যে চারিটী বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ, উ, র, উ। এই চারি অক্ষরের মধ্যে 'গ' সিদ্ধিপ্রদ, 'রেফ্' সর্ব্বপাপহারক, এবং উ বিষ্ণুস্বরূপ। ইহাই 'গুরু' শব্দের অর্থ। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।
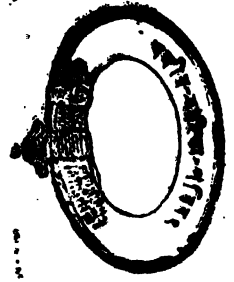
শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র ।

"—সর্ব্বধর্ম্ম ময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম—"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত ।]

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ।"

(এই) প্রভুর পরম-বাণী, ভক্তি-চৈতন্য দায়িনী,

(তাহা) 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে' উজ্জ্বল প্রমাণ,—

সকলের এই বাণী দিব্য আস্বন ॥"

[নিত্যগীতি, ৩০ ।]

১ম বর্ষ । } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৫৯ । সন ১৩২০, চৈত্র । { ৩য় সংখ্যা ।

তুমি

তুমি,

নিত্য-নিরঞ্জন, লীলা রসময়,

নিত্যগোপাল প্রাণানন্দম্ ।

ভকত-প্রাণধন সুর-নর-বন্দন.

শমন-গঞ্জন পদম্ ॥

অপরূপ ভাতি, চিদ্‌ঘন জ্যোতি,

সুন্দর মূরতি মধুরম্ ।

চরণ-নখরে, চন্দ্রমা বিহরে,

যোগিজন-হৃদয়-বিলাসম্ ॥

প্রেম-পারাবার, গুরু সারাৎসার,

জ্ঞানরূপী জ্ঞানানন্দম্ !

হে রাজাধিরাজ ! দেহি পদাম্বুজ,

(আমি) ভকতি বিহীন তব দাসম্ ॥

সত্য-সনাতন, পূর্ণ হে পরম,

অনাদি-নিলয়-বীজম্ ।

শান্তি-নিকেতন, ভব-ভয়-ভঞ্জন,

ভুবনমোহন বেশম্ ॥

* "চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর" গানটীর সুরে গাহিতে হইবে ।

হে জীবত্রাণ, নয়নাভিরাম!
চিন্ময় পরম শিবম্।
মহাযোগীশ্বর, হে জগদীশ্বর!
ভূতভাবন ভূতেশম্ ॥
গাহে ভূমণ্ডল, হে ব্রহ্মগোপাল!
(আমি) অজ্ঞ বুঝিব কিবা গুণম্।
দেবাদিদেব, হে দেবদেব!
দীন অধম মাগে পদম্ ॥

ভূলোকে দ্যুলোকে শশী-সূর্য্য-আলোকে
তোমারি বিভূতি প্রকাশম্।
নাহি হে সম্বল, স্তুতি-ভকতি-বল,
(আমি) যাচি তব কৃপাহি কেবলম্ ॥
চাহি কৃপাকণা, তুলনা জানিনা,
তব সম তুমি হে মাধবম্।
ভবরোগ নাশ, হে শ্রীনিবাস!
(তব) শ্রীনাম স্মরণে জীবানন্দম্ ॥

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত
জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(ক)

কেহ বুঝিয়া অন্যায় কার্য্য করেনা। ১ ॥

যে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করে, সে ব্যক্তি তাহা অ-বুঝিয়াই করে। ২ ॥

যে ব্যক্তির জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ৩ ॥

জ্ঞানীর কোন প্রকার অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই। ৪ ॥

জ্ঞানীর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাব আছে। সেইজন্য তিনি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আপনার মতবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও তাহা তিনি করিতে প্রবৃত্ত হন না। তিনি কোন ব্যক্তিকে সে কার্য্য করিতে সম্মতি পর্য্যন্ত প্রদান করেন না। ৫ ॥

অনুরোধে কোন কার্য্য করাও পরাধীনতা। ৬ ॥

(খ)

সকল জীবই পরাধীন। ১ ॥

শ্রীভগবান কেবল স্বাধীন। ২ ॥

স্বাধীনার্থে নিজাধীন। শ্রীভগবান অন্যের অধীন নহেন। অনেক ভক্ত-মহাত্মার মতে কেবলমাত্র তিনিই স্বাধীন। অতএব তাঁহাকেই নিজাধীন বলা যায়। কিন্তু কতিপয় ভক্তিগ্রন্থে শ্রীভগবানকে ভক্তাধীন বলা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কি মীমাংসা করা যাইবে? অনেক শাস্ত্রেই শ্রীভগবানকে কৃপাময় বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ নানা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ভক্ত মহাপুরুষদিগের প্রতি অত্যন্ত কৃপা। (সেইজন্য) তিনি নিজ ইচ্ছায় সেই সকল ভক্ত মহাপুরুষ দিগের প্রতি তাঁহার কৃপাতিশয্যবশতঃ ভক্তাধীনও হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজভক্তদিগের প্রতি কৃপাতিশয্যবশতঃ তিনি ইচ্ছা করিলেই ভক্তাধীন হইতে পারেন। ৩ ॥

(গ)

শৈশবে মাতা-পিতার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারা যায় না। জীবের, জীবনের যৌবনকালেই, মাতাপিতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহা

বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। সন্তানের, তাঁহাদের সম্বন্ধে, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। মাতাপিতাকে সন্তান যত বুঝিতে পারেন, ততই তাঁহার নিজ মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হয়। বিশেষতঃ শিশু অথবা বালক আপনাকে নিজ-পিতা-মাতার-অংশ নিজ-পিতা-মাতা জানে না। তাহার পিতা-মাতা এবং সে অভেদ জানে না। যে অবস্থায় সেই শিশু বা বালক নিজ পিতামাতার সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করে, তখনই তাহার স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি হয়। তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞান বশতঃই শ্রদ্ধাভক্তি হয় স্বীকার করাও যায়। তুমি যে নিজ পিতামাতার সহিত অভেদ তাহা তোমার বোধ আছে, অথচ তোমার পিতা-মাতার প্রতি কি বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশেষ ভক্তি ও বিশেষ প্রেম নাই? ঐ সকল তাঁহাদের প্রতি তোমার অবশ্যই আছে। তবে ব্রহ্মের সহিত আপনাকে অভেদ যাঁহার বোধ আছে, তবে তাঁহার সেই ব্রহ্ম এবং নিজে অদ্বৈত এ বোধ বা জ্ঞান থাকায়, তাঁহার সেই ব্রহ্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশেষ ভক্তি ও বিশেষ প্রেম থাকার প্রতিবন্ধক কি? সেইজন্যই বলি, **অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেম এই তিনই পরমেশ্বরের প্রতি থাকিতে পারে।** সেইজন্যই শিবাবতার আত্মজ্ঞানী অদ্বৈত শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্॥"

কালী

জয় মা আনন্দময়ী জগৎ-জননী।
তুমি গৌরী শিবরাণী আমার জননী॥
তুমি মা 'আনন্দ', তুমি 'জ্ঞান'-স্বরূপিনী।
জ্ঞানানন্দময়ী কালী ভবেশ ভাবিনী॥
গুরুদেবে মূলশক্তি জীব-নিস্তারিণী।
প্রেম-ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী শান্তি-সঞ্চারিণী॥
অভয়া বরদা শ্যামা ত্রিকালব্যাপিনী।
মহাযোগী-শিব সঙ্গে সে মহাযোগিনী॥
অনাদি-আদি সে ব্রহ্মে তুমি মহাশক্তি।
ব্রহ্মময়ী আদ্যা সে অনাদ্যা পরাশক্তি॥
তুমি মা করিছ নাশ-সৃজন পালন।
তুমি আছ, তাই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান॥
ব্রহ্মসনে ব্রহ্মময়ী আনন্দে বিহর।
নির্গুণ, সগুণ কভু, যেবা ইচ্ছা ধর॥
নিরাকার ব্রহ্মসনে কালী নিরাকারা।
মহাযোগে সদা রতা সতী সারাৎসারা॥
কভু বা সাকারা মা গো কভু সদাকারা!
সদাশিব-বিমোহিনী ভক্তচিত্ত-হরা॥
দশভুজা, চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা বালিকা।
গৌরী, শ্যামা, উমা, রমা তুমি মা কালিকা
তুমি শিব, তুমি কৃষ্ণ, রাধা রাসেশ্বরী।
তুমি গড্, তুমি আল্লা, তুমি রাম, হরি॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি, শঙ্করে শঙ্করী।
বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী শক্তি কমলা সুন্দরী॥
সর্ব্বদেবে শক্তিরূপা তুমি মহাশক্তি।
জ্ঞানস্বরূপিনী তুমি, তুমি প্রেম, ভক্তি॥
ব্রহ্মবিদ্যা, পরাবিদ্যা, জীব-নিস্তারিণী।
আত্মতত্ত্বে সর্ব্বতত্ত্বে তুমি গো জননী॥

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ধর্ম্ম স্বরূপিণী।
সকলে সন্তান তব তুমি মা জননী॥
সর্ব্বধর্ম্মে নিত্যধর্ম্মে তুমি বিরাজিত।
তোমাতেই সর্ব্বধর্ম্ম আছে প্রতিষ্ঠিত॥

জাগো ওমা! মহাশক্তি হৃদয়ে সবার।
সনাতন নিত্যধর্ম্ম করহ প্রচার॥
চরণ-সরোজে তব রহু মম আশ।
এই ভিক্ষা দয়াময়ি! কহে নিত্যদাস॥

ওঁ তৎ সৎ। শ্রীহরিপদানন্দ অবধূত

নিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

সাধারণতঃ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে "নিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" কি? ইহা কি কোন নূতন মত বা নূতন ধর্ম্ম? ইহা কি কোন নূতন প্রচার? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই প্রকার সন্দেহ নিরাকরণের জন্য আমরা "নিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" কথাটীর যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এই মত বা এই ধর্ম্ম যে আমরা জগতে নূতন প্রচার করিতেছি না, এই মত বা এই ধর্ম্ম যে জগতে অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে, এই মত বা এই ধর্ম্ম যে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম শাস্ত্রেই ব্যক্ত অথবা গুপ্ত ভাবে নিহিত আছে, তাহা আমরা জনসাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এতদুদ্দেশ্যেই এই "শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" মাসিক পত্র প্রচারের সূচনা, এতদুদ্দেশ্যেই আমাদের দয়াল গুরুদেব যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ বিরচিত সন্দর্ভাবলির শ্রীপত্রে অথবা গ্রন্থাকারে ক্রমশঃ প্রকাশ।

'নিত্য' শব্দ—'নি'-ধাতু 'ত্যন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। 'নিত্য'—শব্দের অর্থ,—নিরন্তর, জন্মমৃত্যু-রহিত, চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, ধ্রুব, সনাতন, শাশ্বত, কালত্রয়-ব্যাপী, সর্ব্বযুগব্যাপী, ও অক্ষয়। সুতরাং নিত্যধর্ম্মের অর্থ,—অনাদি, চিরবিদ্যমান, অবিনশ্বর, ত্রিকাল ও সর্ব্বযুগব্যাপী, শাশ্বত, সনাতনধর্ম্ম।

'সমন্বয়' শব্দ—'সম্'-পূর্ব্বক, 'অনু' পূর্ব্বক 'ই' ধাতু 'অল্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। 'অন্বয়' অর্থে সম্বন্ধ। সমন্বয় অর্থ—'সংযোগ' মিলন বা একীকরন। সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' অর্থে,—সর্ব্বধর্ম্মের সংযোগ বা মিলন।

যাহা নিত্যধর্ম্ম তাহাই পরমধর্ম্ম; তাহাই সর্ব্বধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের সমষ্টি, নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের সংযোগ বা মিলন। নিত্যধর্ম্মে সর্ব্বধর্ম্ম সদা বিদ্যমান আছে। নিত্যধর্ম্মে অনাদি অনন্তকাল হইতেই, নিত্যধর্ম্মে ত্রিকালেই—সর্ব্বযুগেই, 'সর্ব্বধর্ম্ম' বিদ্যমান আছে। তবে, সর্ব্বধর্ম্মের কোন কোন ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্মে কখন কখন ব্যক্ত হইয়া উঠে, কখন কখন বা অব্যক্ত থাকে। যখন যে ধর্ম্মের প্রকাশ হইবার প্রয়োজন হইতেছে বা হইবে, তখন সেইধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম হইতেই প্রকাশিত হইতেছে বা হইবে। সেইজন্য নিত্যধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সেইজন্য নিত্যধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের সমষ্টি, সেইজন্য নিত্যধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের সংযোগ বা মিলন। যেরূপ শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল প্রভৃতির সমষ্টি বৃক্ষ, যেরূপ শাখা-প্রশাখা-পত্র, পুষ্প-ফল প্রভৃতির সংযোগ বা মিলন বৃক্ষ, তদ্রূপ জগতের নানাধর্ম্মের, জগতের সর্ব্বধর্ম্মের সমষ্টি নিত্যধর্ম্ম; তদ্রূপ জগতের নানাধর্ম্মের, জগতের সর্ব্বধর্ম্মের সংযোগ বা মিলন নিত্যধর্ম্ম।

সেইজন্য নিত্যধর্ম্মকে সর্ব্বধর্ম্ম, সেইজন্য নিত্যধর্ম্মকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, সেইজন্য নিত্যধর্ম্মকে সর্ব্বধর্ম্মের সমষ্টি সংযোগ বা মিলন বলা যাইতে পারে। সেইজন্য জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত কোন ধর্ম্মের বিরোধের কারণ নাই।

উদ্ভিদ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ (Botanists) বলিয়া থাকেন বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প একই মূলতত্ত্বের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। পত্র যে মূল তত্ত্বের বিকাশ, পুষ্পও সেই মূল তত্ত্বেরই বিকাশ। অথচ স্থূলদৃষ্টিতে পত্র ও পুষ্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে হয়; বস্তুতঃ উহা এক। বিভিন্ন ধর্ম্ম, এক নিত্যধর্ম্ম-বৃক্ষের অংশ; আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও উহারা এক। যে মূল-তত্ত্বে পুষ্পাদি নির্ম্মিত, তাহাকে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ vegetable cell বা উদ্ভিজ্জ কোষ বলেন। বৃক্ষের কাণ্ড-শাখা-মূল-পত্র-পুষ্প-ফল সমস্তই এই cell বা কোষ হইতে বিকশিত। এই Cell বা কোষ বিবিধ বর্ণ, লঘুতা, কাঠিন্য প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শাখা-পুষ্প পত্রাদিতে পরিণত হইয়াছে। তদ্রূপ বিবিধ দেশের, বিবিধ সংস্কার ও অধিকারীর উপযোগী হইয়া এক নিত্যধর্ম্মই বিবিধ ভাবে বিকশিত রহিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রয়োজন-বশেই এক নিত্যধর্ম্মকেই ভিন্নরূপে বিকশিত করিয়াছেন। প্রশান্ত সমুদ্রের বক্ষে যে অগাধ জলরাশি, উহাই সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পাকারে গগণ-সঞ্চারী মেঘে পরিণত হইতেছে; উহাই অভ্রভেদী হিমালয়-শিখরে কঠিন তুষাররূপে পরিণত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিবশে সমুদ্রবক্ষেই স্বরূপতা লাভ করিতেছে। তুষারের কাঠিন্য, জলের তারল্য ও মেঘের বাষ্পীয় ভাব, বিভিন্ন হইলেও ঐ তিন মূলে এক। বিভিন্নদেশ, কাল ও অবস্থায় ঐ একেরই তিন প্রকার বিকাশ। জ্ঞানে, ঐ তিনকে তিন না বলিয়া একই বলিতে হয়। তদ্রূপ দেশ, কাল ও মানবজীবনের অবস্থাভেদে একই নিত্যধর্ম্ম ভিন্নভাবে বিকশিত রহিয়াছেন; মনে হয় যেন সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম্ম, বস্তুতঃ তাহা নহে। জীব যখন সংস্কারের অতীতাবস্থা অর্থাৎ গুণাতীতাবস্থা লাভ করে, তখন ঐ এক নিত্যধর্ম্মই যে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসম্প্রদায়ে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে। জ্ঞান না হইলে যেমন এক Cell বা কোষই বৃক্ষের সর্ব্ব অংশ বুঝিতে পারা যায় না, জ্ঞান না হইলে যেমন তুষার, বাষ্প প্রভৃতি এক জলেরই বিবিধ প্রকার বিকাশ বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে এই নিত্যধর্ম্মের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ত্ব, এই নিত্যধর্ম্মের বিবিধ প্রকার বিকাশত্বও বুঝিতে পারা যায় না। জ্ঞানীর মীমাংসা অভ্রান্ত! এজন্য নিত্যধর্ম্মের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এইজন্য সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বধর্ম্মের গুণাতীতাবস্থা সম্পন্ন জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিকদিগের একই তানের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম যেরূপ নিত্য, তদ্রূপ তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। ব্রহ্মের সকলই নিত্য। ব্রহ্মের শক্তি নিত্য, ব্রহ্মের গুণ নিত্য, ব্রহ্মের কর্ম্ম নিত্য, ব্রহ্মের নাম নিত্য, ব্রহ্মের রূপ নিত্য, ব্রহ্মের লীলা নিত্য, ব্রহ্মের সাকারত্ব নিত্য, ব্রহ্মের আকারত্ব নিত্য, ব্রহ্মের নিরাকারত্ব নিত্য, ব্রহ্মের সাকার আকার ও নিরাকারের অতীত অজ্ঞেয় তুরীয়াতীতত্বও নিত্য; ব্রহ্মের অবতারত্ব নিত্য; ব্রহ্মের সর্ব্ব নাম নিত্য, ব্রহ্মের সর্ব্ব রূপ নিত্য, ব্রহ্মের সর্ব্ব প্রকার বিকাশ নিত্য, ব্রহ্মের সর্ব্ব প্রকার বিভূতি নিত্য, ব্রহ্মের জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্ম সকলই নিত্য। ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই অনিত্য নহে, কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং নিত্য। যাহা নিত্য তাহাই ব্রহ্ম। সুতরাং ধর্ম্মও ব্রহ্ম।

যাহা নিত্য তাহা সত্য; সেই জন্য নিত্য-ধর্ম্মও সত্য। যাহার কারণ নাই তাহা নিত্য। নিত্যধর্ম্মের কারণ নাই, সেইজন্য নিত্যধর্ম্ম নিত্য। যাহার কারণ নাই তাহার উৎপত্তিও নাই, যাহার উৎপত্তি নাই তাহাই অজ। সেইজন্য নিত্যধর্ম্মও অজ, কারণ নিত্যধর্ম্মের কারণ এবং উৎপত্তি নাই। উৎপত্তি যাহার হয় নাই তাহার বিনাশও নাই, তাহাই অমর বা অবিনাশী। সেই জন্য নিত্যধর্ম্মও অমর বা অবিনাশী, কারণ নিত্যধর্ম্মের বিনাশ নাই। নিত্যের কি কখন বিনাশ হইতে পারে? নিত্যধর্ম্ম নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী বলিয়া তাহার পূর্ব্বে অপর কোন ধর্ম্মই ছিল না; এইজন্য নিত্যধর্ম্ম আদি। নিত্যধর্ম্মের আদিতে কোন ধর্ম্ম হয় নাই, এইজন্য নিত্যধর্ম্ম অনাদি। যাহা আদি-অনাদি-নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী তাহাই অনন্ত। নিত্যধর্ম্ম আদি অনাদি-নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী বলিয়া অনন্ত। সেইজন্য অনন্তধর্ম্মের সমষ্টি নিত্যধর্ম্ম। যাহা নিত্য তাহা সত্য; তাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহার রূপান্তর হয় না এবং তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনও নাই। নিত্যধর্ম্ম নিত্য বলিয়া তাহা সত্য; তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহার রূপান্তর হয় না এবং তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনও নাই।

সেই নিত্যধর্ম্ম, ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তও অব্যক্ত হন। যখন ব্রহ্ম ব্যক্ত হন তখন নিত্যধর্ম্মও ব্যক্ত হন, আবার যখন ব্রহ্ম অব্যক্ত তখন নিত্যধর্ম্মও অব্যক্ত। যখন ব্রহ্ম সগুণ সক্রিয় হন তখন নিত্যধর্ম্মও সগুণ সক্রিয়, আবার যখন ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন নিত্যধর্ম্মও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়। যেমন বীজের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বৃহৎ বৃক্ষ আছে, যেমন বীজের মধ্যে কত শাখা, কত প্রশাখা কত পত্র, কত পুষ্প, কত ফল প্রভৃতি অব্যক্ত ভাবে আছে, যখন যেটীর প্রকাশ হইবার প্রয়োজন তখন সেইটী প্রকাশিত হইতেছে বা হইবে; তদ্রূপ নিত্যধর্ম্মে, জগতের শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল প্রভৃতি স্বরূপ নানাধর্ম্ম বা সর্ব্বধর্ম্ম অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে; যখন যে দেশে যে ধর্ম্মের প্রয়োজন, তখন সেই দেশে সেই ধর্ম্মই প্রকাশিত হইতেছে বা হইবে। নিত্যধর্ম্মের সেই সব প্রকাশও, নিত্যধর্ম্মের ন্যায় আদি-অনাদি-অনন্ত-নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী। যেরূপ একই বৃক্ষের নানা শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহা হইতে নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ জগতে এক নিত্যধর্ম্মের অন্তর্গত নানাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, একই নিত্যধর্ম্ম হইতে জগতে নানাধর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে। সেই সব ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্মে অব্যক্তভাবে ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যধর্ম্মের অংশ নিত্যধর্ম্ম। (যেমন শাখা প্রশাখা প্রভৃতি বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, কোনটীই অবৃক্ষ নহে।) তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যধর্ম্মের ন্যায় আদি-অনাদি-অনন্ত-নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী। নিত্যধর্ম্মের ন্যায় সেই সব ধর্ম্মেরও কোনটীরই হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, কোনটীরই রূপান্তর হয় না এবং কোনটীরই কোন প্রকার পরিবর্ত্তনও নাই; কারণ তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যধর্ম্মের ন্যায় নিত্য ও সত্য। এইজন্য জগতে যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে—তাহার প্রত্যেকটীই সত্য ও নিত্য-স্বরূপ সনাতন পরমেশ্বর লাভের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম, এইজন্য জগতের সর্ব্ব ধর্ম্ম যাহা বিদ্যমান আছে, যাহা প্রকাশিত হইতেছে এবং যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে তাহার প্রত্যেকটীই ধর্ম্মবিশ্বাসি-

গণের বিশ্বাস ও মান্য করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ধর্ম্মই পরমেশ্বর লাভের এক একটী উপায়। প্রত্যেক ধর্ম্ম-দ্বারাই পরমেশ্বর লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহার যে ধর্ম্মে রুচি, তিনি বিশ্বাসের সহিত সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই ধর্ম্মদ্বারাই শ্রীভগবান লাভ করিতে পারিবেন। ক্ষুধা এক, খাদ্য নানা। প্রত্যেক খাদ্য দ্বারাই ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইতে পারে। যাহার যে প্রকার খাদ্যে রুচি, তিনি সেই প্রকার খাদ্যদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারেন। উদ্দেশ্য,—ক্ষুধা নিবৃত্তি। ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলেই হইল! ধর্ম্ম লাভেই শ্রীভগবান লাভ হয়। শ্রীভগবান স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি যে কথা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মান্য করা উচিত, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের শিরোধার্য্য। সেইজন্য **ঈশ্বর সম্বন্ধে যিনি যেমতে আছেন তাঁহার সেই মতের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।** সর্ব্বধর্ম্মদ্বারা—সর্ব্বতত্ত্বারা—সর্ব্বপন্থা দ্বারা, সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতিদ্বারা, সকামনিষ্কাম সর্ব্বপ্রকার ভাব দ্বারা—সর্ব্বপ্রকার সাধন প্রণালী দ্বারা—সর্ব্বপ্রকার উপাসনাদ্বারা—সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনাদ্বারা—সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ দ্বারা—সর্ব্বপ্রকার যোগদ্বারা—সর্ব্বপ্রকার ভক্তি ও প্রেমাত্মক ভাব দ্বারা—দিব্যজ্ঞান দ্বারা—ভগবৎ বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মদ্বারা—সর্ব্বপ্রকার পূজা দ্বারা—সর্ব্বপ্রকার বন্দনা দ্বারা—সর্ব্বপ্রকার জপদ্বারা—সর্ব্বপ্রকার স্বাধ্যায় দ্বারা—শ্রীভগবানের স্বরূপ অবলম্বনদ্বারা—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার রূপ অবলম্বন দ্বারা—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার শক্তি অবলম্বন দ্বারা—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার বিভূতি অবলম্বন দ্বারা—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অবলম্বন দ্বারা শ্রীভগবানের সকল অবতার অবলম্বন দ্বারা—শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রকার নাম অবলম্বন দ্বারা—সাকার-আকার-নিরাকার এবং ঐ তিনের অতীত তুরীয় ভগবান অবলম্বনদ্বারা—সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজাতি, সর্ব্বভাবে, শ্রীভগবানের ভজনা করিতে পারেন। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৪।১১।]

অর্থাৎ যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই ভাবে ভজনা বা অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বভাবে আমারই ভজনমার্গ অনুবর্ত্তন করিতেছে।

যে কোন দেশে, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন ভাবে, শ্রীভগবানের যে কোন নামে, যে কোন রূপের যে কোন প্রকারে অর্চ্চনা করেন, সে সমস্ত নাম ও রূপ শ্রীভগবানেরই। তাঁহার অনন্তনাম, অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তকার্য্য, অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্তধর্ম্ম। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে আর অধিক অগ্রসর হইলাম না।

যদি কেহ জগতের সর্ব্বধর্ম্মের উদ্দেশ্য, জগতের সর্ব্বধর্ম্মের একতা, জগতের সর্ব্বধর্ম্মের পরস্পরের অভেদত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন; যদি কেহ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়—রূপ-স্বরূপের সমন্বয়—সাকার-আকার-নিরাকারের সমন্বয়—এক ও বহুর সমন্বয়—জ্ঞান-ভক্তি প্রেমের সমন্বয়—বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব—বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব, বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব,—জীবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, বৈরাগ্যতত্ত্ব—যোগ-লয়-নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়, বিবিধতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন

তবে মদীয় গুরুদেব যোগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রণীত বিবিধ তত্ত্বোপদেশ এবং বিবিধ গ্রন্থাবলির আলোচনা করিলেই সরল কথায়—সহজ ভাষায়—জগতের সর্ব্বধর্ম্মের মত—জগতের সর্ব্বশাস্ত্রের মত—জগতের সর্ব্বধর্ম্মের পরস্পরের আশ্রয়ত্ব, পরস্পরের অভেদত্ব, পরস্পরের একত্ব উপলব্ধি করিয়া অবাক্ হইবেন, স্তম্ভিত হইবেন এবং আনন্দে পরিপ্লুত হইবেন।

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

জ্ঞান ও ভক্তি।

এক-শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁহারা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ভক্তিকে একটু অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁহারা জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয় জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের কোনটীই অবহেলা কিম্বা উপেক্ষার জিনিষ নয়; ইহাদের একটী বাদ দিলে অপরটী অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। * সাধন-মার্গে জ্ঞান, ভক্তির সহায় এবং ভক্তি, জ্ঞানের সাহায্যকারী। জ্ঞানের চরমাবস্থায় সাধক যে অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হয়েন, পরাভক্তিতেও সেই অদ্বৈতভাব আনয়ন করে। জ্ঞান যেমন সমস্ত মায়া-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া সাধককে অদ্বৈতভাবভূমিতে লইয়া যায় এবং এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তার উপলব্ধি করাইয়া সাধককে ব্রহ্মের সহিত এক করাইয়া দেয়, পরাভক্তি এবং শুদ্ধ প্রেমও সাধককে প্রেমাস্পদের সহিত তন্ময় ও এক করিয়া তোলে। † ভক্তির চরমাবস্থায় ভগবানকে লাভ করা যায় এবং তাঁহার সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। সাধনপথে ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। তাহারা একে অন্যের সহায়। জ্ঞান হইলে ভক্তি হয়, ভক্তি হইলে জ্ঞান হয়। পরমারাধ্য যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ বলিয়াছেন,—"আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী একই ব্যক্তি। আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী অভেদ। যাঁহার জ্ঞান আছে, তাঁহারই ভক্তি আছে ‡ যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই জ্ঞান আছে। আমাদের মতে ভক্ত অজ্ঞানী নহেন, জ্ঞানীও অভক্ত নহেন।"

* "ভক্তিরপি জ্ঞান-বিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্ব-সামান্যাৎ। জ্ঞান-বিশেষে ভক্তি-শব্দ-প্রয়োগঃ কৌরব-বিশেষে পাণ্ডব-শব্দবদ্বোধ্যঃ।" ভক্তি ও জ্ঞান-বিশেষ। পাণ্ডব যেমন কৌরব-বিশেষ হইতে ভিন্ন নহে ভক্তি ও তদ্রূপ 'জ্ঞান' হইতে ভিন্ন নহে। বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যপীঠক ৩২ সিদ্ধান্ত। নিঃ সং

† "অদ্বৈত-জ্ঞানসম্পন্ন আত্মারামের ন্যায় আত্মারাম পরমভক্তও নিরঞ্জন শান্ত ও প্রকৃতির অতীত।...সেই আত্মারাম পরমভক্ত যখন পরাভক্তিযোগে ভগবানের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হন তখন তিনি নিজের স্বতন্ত্রতা দর্শন করেন না।" ভক্তিযোগ দর্শন ১৩ পৃঃ।

‡ গীতার মতে জ্ঞানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ৭।১৬

সিদ্ধান্ত দর্শন, ২য় ভাগ, ১ম সিদ্ধান্ত। পার্থিব জগতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখিতে পাই, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার সম্বন্ধে আমাদের সমস্তই জানিতে ইচ্ছা হয়। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন তাঁহার ভগবানকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা হয়। নিজপ্রেমাস্পদের রূপ গুণ ও ঐশ্বর্য্য কাহার নিকট না ভাল লাগে? নিজ প্রেমাস্পদের শক্তি সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির বিষয় কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়? প্রেমাস্পদের যাহা কিছু সকলই আমাদের নিকট সুন্দর ও প্রীতিকর মনে হয়। এই জন্য প্রেমাস্পদের যাহা কিছু আছে সকলই আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। আবার যিনি ভগবানকে জানেন তিনি কি তাঁহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন? সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি ও প্রেম স্বভাবতই আমাদের প্রাণ আকর্ষণ করে। ভগবানের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি ও প্রেমের পরিচয় পাইলে কে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? পার্থিবরূপ, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, পার্থিব বিভূতি ও পার্থিব প্রেম দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। ভগবানের রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি ও প্রেম দেখিলে কি আমরা স্থির থাকিতে পারি? এমন অতুলনীয় ও প্রাণ-বিমোহন রূপ আর কাঁহার আছে? এতগুণ আর কাঁহার ভিতর পাওয়া যায়? এত ঐশ্বর্য্য এত বিভূতি, এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত স্নেহ, এত করুণা আর কাঁহাতে সম্ভবে? তাই বলিতেছিলাম যে, ভগবানকে জানিলে তাঁহাকে স্বতই ভাল বাসিতে, ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে। ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি একই শ্রেণীর জিনিষ। যখন মানুষ ভগবানের মাধুর্য্য রূপ দর্শন করে, তখন ভগবানের প্রতি হৃদয়ে প্রেমের স্ফুরণ হয়। যখন মানুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন করে, তখন তাঁহা হইতে শুদ্ধ ভক্তিরই বিকাশ হয়। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ বলিয়াছেন যে অর্জ্জুনের শ্রীভগবানের প্রতি প্রথমতঃ সখ্য-প্রেম ছিল, বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর তিনি ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়াছিলেন।

মহাভাগবত পুরাণান্তর্গত ভগবতীগীতায় পার্ব্বতী হিমালয়কে ব্রহ্ম বিজ্ঞান উপদেশ কালে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানাৎ সঞ্জায়তে মুক্তির্ভক্তি জ্ঞানস্য কারণম্।

জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়, জ্ঞানের কারণ ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥১।২।৭

অস্যার্থ—ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অধ্যাত্ম-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডীয় সপ্তম অধ্যায় মতে,—

ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য; ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী॥

অর্থাৎ ভক্তি জ্ঞানের জননী, ভক্তি মোক্ষপ্রদায়িনী।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তি হইতে জ্ঞান হয়। নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় শ্লোকে দেখিতে পাইব জ্ঞান হইতে ভক্তি হয়।

ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

প্রমাণৈস্তদ্ সদাচারৈস্তদভ্যাসৈঃ নিরন্তরম্।
বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ॥

অস্যার্থঃ—ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্র, সাধুবর্গের আচার এবং সাধুগণানুষ্ঠেয় বিষয়ের মুহুর্মুহুঃ অভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে তৎপর উত্তমা ভক্তি প্রাপ্তি হয়।

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,–

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরমশ্রেষ্ঠ মদ্বিষয়িনী ভক্তি লাভ করেন। আমি যাদৃশ এবং যাহা, তাহা একান্ত ভক্তিযোগে প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হন; তদনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তিতে কিছু মাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। শুকদেব পরমজ্ঞানী, পক্ষান্তরে তিনি অসাধারণ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। ব্রজগোপীগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মহাজ্ঞানী ও যোগসিদ্ধ ছিলেন, দ্বাপরে ব্রজগোপীরূপে নারীদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ছিলেন। ব্যাসদেব অসাধারণ জ্ঞানী হইয়াও ভক্ত ছিলেন। শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান-স্বরূপ ছিলেন, তথাপি তাঁহার অনন্যসাধারণ ভক্তি ছিল। শঙ্কর-বিরচিত মনোহর স্তোত্রগুলি এই বিষয়ে প্রমাণ। ভগবানের অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজ্ঞানী হইয়াও শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধ প্রেম ও মহাভাবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্রূপ ও সনাতন গোস্বামী, শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রভৃতি অসাধারণ ভক্তি সম্পন্ন হইয়াও অদ্বিতীয় জ্ঞানী ছিলেন।

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে,—

He knoweth God who loveth God: for God is love. যিনি ভগবৎ-প্রেমিক তাঁহারই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে কারণ ভগবানই প্রেম।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ বলিয়াছেন,—

"আত্মজ্ঞানের সহিত আত্মপ্রেমের বিরোধ নাই। আত্মজ্ঞানের সহিত আত্মপ্রেমের অনৈক্য নাই। আত্মজ্ঞান ব্যতীত আত্মপ্রেমের বিকাশ হয় না; যে অবস্থায় আত্মজ্ঞান অব্যক্ত থাকে, সে অবস্থায় আত্মপ্রেমও অব্যক্ত থাকে।" আত্মজ্ঞানের প্রকাশে আত্মপ্রেম প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মপ্রেম দ্বারা আত্মাকে সম্ভোগ করা যায়। সেই সম্ভোগসময়ে আত্মজ্ঞান বিষয়ে মনোযোগ থাকে না। সেই সম্ভোগসময়ে আত্মজ্ঞান বিষয়ে মনোযোগ না থাকিলেও সেই আত্মজ্ঞানের লোপ হয় না।

(ভক্তিযোগ দর্শন ১৬শ অধ্যায়।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১২শ অধ্যায়ে ভক্তের যে সকল লক্ষণ, ২য় অধ্যায়ে জ্ঞানীরও সেই সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও ধারণা যে, জ্ঞান নীরস ও শুষ্ক বস্তু। বাস্তবিক তাহা নহে। জ্ঞান ও আনন্দ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান। পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মময়ী; সেই জ্ঞানশক্তিরই একনাম আদ্যাশক্তি ও অনাদ্যাশক্তি। জ্ঞানশক্তির অপর নাম চিৎশক্তি। তন্ত্রে সেই চিৎশক্তিরই নাম কালী শক্তি। বৈদিক আনন্দকেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধাশক্তি বলা হইয়াছে। চিৎশক্তি কালী, আনন্দময়ী। 'চিৎ' অর্থে 'জ্ঞান'; 'জ্ঞান'শক্তি, 'আনন্দ-

রাধাশক্তির' অন্তরবাহে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ। জ্ঞানশক্তি, আনন্দ-শক্তিময়ী। জ্ঞানশক্তি, আনন্দ-শক্তির জীবন। চিৎশক্তির অংশ আনন্দ নয়, কিন্তু চিৎশক্তি আনন্দময়ী। একই জ্ঞানশক্তি নানা শক্তির সমষ্টি। যেমন একই শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যেমন একই শরীর অস্থি, মাংস ও শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি; অস্থি, মাংস ও শোণিত একই শরীরের তিন অংশ হইলেও, তিন, তিন প্রকার জিনিষ; তদ্রূপ একই জ্ঞানশক্তির নানা শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এক জ্ঞানশক্তির নানা প্রকার শক্তি নানা বিকাশ মাত্র। জ্ঞান-শক্তি যেমন নিত্য, তদ্রূপ তাহার শাখা-প্রশাখা সমস্ত শক্তিও নিত্য। প্রেম ভক্তি শক্তিদ্বয়ও জ্ঞানশক্তির দুই শাখা। প্রেম ভক্তিও নিত্য।"

(সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার।)

রাধা হ্লাদিনীশক্তি। আবার তিনি চিন্ময়ী। তাই বলিতেছিলাম 'জ্ঞান' ও 'আনন্দ' পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। জ্ঞানের ভিতর আনন্দ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, আবার আনন্দের ভিতর জ্ঞানও ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। কৃষ্ণ ও কালী অভেদ। জ্ঞানশক্তিও হ্লাদিনী শক্তি একে অন্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ। তাই রাধাও কৃষ্ণ পরস্পর জড়িত। উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া আছেন।

জ্ঞান ও ভক্তি অতি দুর্ল্লভ জিনিষ। গুরুকৃপা ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করা কঠিন। সদ্গুরুর কৃপায় জ্ঞান ও ভক্তির স্ফুরণ হয়। জ্ঞান এবং ভক্তি অনুভব ও উপলব্ধির জিনিষ। শুধু শাস্ত্র পাঠে জ্ঞান হয় না। শাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য * লাভ হইতে পারে, বিচক্ষণতা জন্মিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের অনুভূতি ও উপলব্ধি হওয়া কঠিন। † শ্রীগুরুদেব জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন; এ জন্যই গুরুগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন। বি, এল।

* "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ &c., ৪।১৯ শ্রীগীতা। নিঃ সং

† যথাযথ শাস্ত্রালোচনার বিশেষ ফল উক্ত হইয়াছে "শাস্ত্রই ভগবচ্চরণে দৃঢ় বিশ্বাস করিবা'র এক প্রধান উপায়।" (নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা) নিঃ সং।

অবতার প্রসঙ্গ।

প্রথম সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় "ভক্তোপদেশ আবাহন" নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, "শ্রীভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হন, ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিবামাত্র তাঁহাদের ইচ্ছা হয় যে অতি উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, উচ্চৈঃস্বরে জগৎবাসীকে বলিয়া দেয়—সুসংবাদ দেয়।" এই স্থানে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীভগবান জগতে আসিলেই ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন কিন্তু অভক্তগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। বিশ্বাসী তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন—আত্ম সমর্পণ করেন; অবিশ্বাসী তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যান ও অনেক সময় তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন। ভক্ত তাঁহাতে ভগবত্তার অনেক প্রকাশ দেখিতে পান ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠেন অভক্ত তাঁহার দোষদর্শনই করিয়া থাকেন। ভক্ত চক্ষুষ্মান; অভক্ত অন্ধ। অথচ তর্কের সময় নানা প্রকার কোলাহল করিয়া বলেন,—"কই আমরাও ত' দেখিয়াছি, ভগবত্তার বিকাশ ত' কিছুই দেখিতে পাইনা।" তাহার উত্তরে যদি বলা যায়,—"তুমি অন্ধ কি প্রকারে দেখিবে?" তবেই চটিয়া লাল। কত কুতর্ক জাল বিস্তার করিয়া বলিবে—"কই ভগবানের এক্ষণে অবতার হইবার কথা শাস্ত্রেত কিছু দেখা যায় না।" যেন অনন্ত শাস্ত্রই তাঁ'র কণ্ঠস্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৬ শ্লোকে ভগবানের অসংখ্য অবতার হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়;—

"অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ হরেরদ্ভুত কর্ম্মণঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ঐ প্রকার শ্লোক, শিবগীতা এবং ভগবতী-গীতাতেও আছে। পরমোদার মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥"

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত, শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও মহাকালিকার অবতার সম্বন্ধে ঠিক উক্ত প্রকার শ্লোক নিবদ্ধ আছে। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"কোন্ ব্যক্তির কখন কোন্ রোগ হইবে তাহার উল্লেখ কোন গ্রন্থেই নাই। সেই জন্য কি তাহার কোন প্রকার রোগ হইলে তাহা অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করিতে হইবে? নয়নে রোগ এবং তৎসংক্রান্ত লক্ষণ সকল দেখিলেই বা সেই রোগ কি প্রকারে অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করা যাইবে? ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক স্বভাব চরিত্র, ভগবানের অসাধারণ গুণ সকল যে কোন ব্যক্তিতে দেখিবে তাঁহাকেই তোমার ভগবান বলিয়া স্বীকার করা উচিত, তাঁহাকেই তোমার ভগবান বলিয়া পূজা অর্চ্চনা করা উচিত।" "কোন নরদেহ, কোন নারীদেহ কিম্বা কোন

প্রাণিদেহ হইতে অসামান্য, অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক এবং অদ্ভুত নানা কার্য্যের, নানা শক্তির, নানা গুণের এবং নানা ভাবের প্রকাশ দেখিলে, সেই দেহে ভগবদাবির্ভাব অস্বীকার কি প্রকারে করিবে ?"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১০।৩৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে
শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ
র্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥"

অর্থাৎ যে সকল অতুল আতিশয্যসম্পন্ন বীর্য্য জীবের পক্ষে অসম্ভব সেই সকল বীর্য্য দর্শন করিয়া দেহিগণের মধ্যে আপনার অবতার জানিতে পারা যায়।* এ গুলি কি শাস্ত্রবাক্য নয় ?

ভক্তগণ ভগবানকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যখন জগতের জীবকে জানাইতে চাহেন যে 'শ্রীভগবান জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব পাপী তাপী কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয়, ঐ অভয়চরণে শরণ নে—আর তোদের ভবের ভয় থাকবে না।' তখন ঐ অবিশ্বাসী অভক্তগণ কুতর্কের কোলাহল তুলিয়া ভক্তের ঐ আহ্বানবাণী সাধারণ জীবের শ্রুতিগোচর হইতে দেয় না। হায় দুর্ভাগ্যগণ! ভবপারের কর্ণধার যখন তোমাদের পার করিবার জন্য তাঁহার চরণ-তরণী লইয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান তখন তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাওনা, কেহ দেখাইয়া দিলেও সংশয়ের রঙ্গীন চস্‌মা চক্ষে দিয়া তাঁহাকে অন্যরূপ দেখিয়া থাক। তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া নিজেরাই বঞ্চিত হও। তোমরা আরও বলিয়া থাক,—"উহারা (অর্থাৎ ভক্তগণ)

* অ+দ='আ' হয়। এই সূত্রের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া আছে। উল্লিখিত উদাহরণের ন্যায় অপর বহু পদ ঐ সূত্রানুসারে সাধিত হইতে পারে। তদ্রূপ শাস্ত্রে অবতারের লক্ষণ সকল বলিয়া, কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত আরও অবতার হইতে পারেন এবং তাহা হইতেছেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া" অর্থাৎ অনন্ত অবতার। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নর। তাঁহারা নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হন। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, জীব বিষ্ণু হইবে না বলিয়া "বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বং" বলিয়াছেন। বিষ্ণুত্ব লাভে জীব বিষ্ণুর ন্যায় হন। কিন্তু শ্রীভগবান নারায়ণ। তিনি নর হইয়াছেন। তিনি নররূপী নারায়ণ। যোগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন,—"সাধারণ সাধু, নদীর স্বাভাবিক স্রোত—অবতার বন্যা। তিনি ভাল মন্দ বিচার করেন না, উত্তম অধম বিচার করেন না, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বিচার করেন না, পাপী অপাপীর বিচার করেন না। সমস্তই ভাসান।" একাধারে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণ বৈরাগ্য এবং অসাধারণ দয়ার বিকাশ শ্রীভগবান ব্যতীত অন্যে সম্ভব নহে। শ্রীভগবান একই সময়ে, একই দেশে, বিভিন্ন ভাবাপন্ন বিভিন্ন প্রাণীর সমভাবে চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন। প্রত্যেকেই মনে করে আমার চেয়ে আর কাহাকেও

ভগবত্তার বিকাশ দেখিতে পাইলেন আর আমরা পাইনা কেন?" কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তোমরা কিরূপে দেখিতে পাইবে? অবিশ্বাসের লৌহ-আবরণে তোমাদের চক্ষু আবৃত সুতরাং সে দিব্যবিকাশ কি প্রকারে দেখিবে? ভক্তের কাছে তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দেন, অবিশ্বাসীর কাছে তিনি আত্মগোপন করেন। ভগবানকে যে যেরূপে ভাবে, সে সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়। অবিশ্বাসী যেরূপ হৃদয়-ভাব লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান তিনি তাঁ'র নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হন। অবিশ্বাসীকে তিনি ধরা দিবেন কেন? গাভী তাহার নিজ বৎসকে পীযুষধারা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করে কিন্তু অন্য কেহ দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করিলে ঐ বৎসকে অবলম্বন করিয়া ঐ গাভীর নিকট হইতে দুগ্ধ প্রাপ্ত হয়! তদ্রূপ বৎসরূপী ভক্তগণকে অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানকে লাভ ও সম্ভোগ করিতে হয়। শ্রীভগবানের কৃপাকল্পলতিকার ফলই এই দুর্লভ ভক্ত সঙ্গ। যখনই ভগবান এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখনই তাঁহার নিজজন ও প্রিয়-ভক্তগণই তাঁহাকে চিনিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে চিনিতে বা বুঝিতে কস্মিন্ কালে কখনও পারে নাই। সাধরণ-জীব, ভক্তগণের ও তাঁহার পার্ষদগণের মুখে শুনিয়াই তাঁহাকে ভজনা করিয়াছেন। সকলেই যে তাঁহার বিভূতি দেখিয়া তাঁহাকে চিনে তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, গদাধর, স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দরায় প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তই তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। ঐরূপ অনেক ভক্তকেই তিনি ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি দেখাইয়াছিলেন; উঁহাদের সাক্ষাতেই তাঁহার মহাপ্রকাশ হইয়াছিল। সকলেই কি সে মহাপ্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিল? ভক্তগণের কথাতে বিশ্বাস করিয়াই তাৎকালিক সরল বিশ্বাসী জনসাধারণ, তাঁহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তখন যদি ভক্তগণের সাক্ষ্য বাক্যে ভগবত্তা প্রমাণিত হইয়া থা'কে তবে এখনই বা তাহা না হইবে কেন? শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তগণের কথাপ্রমাণে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে এখন কোনও ভক্ত যদি কোন ব্যক্তিতে ভগবানের বিকাশ দেখিয়া তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন তবে তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহ কেন? তখনকার ভক্তগণ সব সত্যবাদী ছিলেন আর এখনকা'র ভক্তগণ মিথ্যাবাদী এ কথা বলিতে পার না। কেননাঃ ভক্তগণ চিরকালই সরল ও সত্যবাদী। প্রবঞ্চনা প্রতারণা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তখনকার ভক্তগণ অভ্রান্ত আর এখনকার ভক্তগণ ভ্রান্ত এ কথাও বলিতে পার না। বলিলে তোমরাই উপহাসাস্পদ হইবে। কেননা যে যুগে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঋষিযুগ নহে। সে আজ মাত্র চারিশত বৎসরের কথা। সুতরাং তখনকার ভক্তগণ সকলেই ঋষি ছিলেন এবং ঋষি বাক্য অভ্রান্ত, এ যুক্তির দোহাই দিতে পার না। যদি বল

মেশী ভালবাসেন না। এই চিত্তাকর্ষণ শ্রীভগবান ব্যতীত অন্যে সম্ভব নহে। যখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার ভাবে সর্ব্বদেশই ভাবিত হয়। অনেক সিদ্ধমহাপুরুষও সেই সময় ধরায় আগমন করেন। সেইজন্য অনেক সময়ে প্রত্যেক সিদ্ধমহাপুরুষকেই এক একটী শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া মনে হয়। নিঃ, সঃ।

তখনকার ভক্তগণের মধ্যে পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা ও বিচার না করিয়া সহসা কাহাকেও ভগবান বলিয়া প্রচার করেন নাই। এ কথার উত্তর এই যে এখনকার ভক্তগণের মধ্যে কি পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনগণের অসদ্ভাব আছে? এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুশাস্ত্রদর্শী এবং বহু বিষয়ে পারদর্শী। এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের জ্ঞানগবেষণার ও চিন্তারাজ্যের যে পরিধি ছিল তাহা এক্ষণে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রতিভা প্রাকৃত ও জড়-বিজ্ঞান-রাজ্যের বহু অন্ধকারময় স্থলে প্রবেশ করিয়া রত্নরাজি আহরণ করিতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? তারপর তখনকার যুগে লোকের ভক্তি বিশ্বাস অধিক ছিল। ভক্তির কথা, ভগবানের কথা, অতীন্দ্রিয়ানুভূতির কথায় তখনকার লোক বরং বিশ্বাস স্থাপন করিতেন; এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানালোকোদ্ভাসিতচিত্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল কথায় একেবারেই বিশ্বাসস্থাপন করিতে চাহেন না। বিশেষতঃ অতীন্দ্রিয়ানুভূতির কথা আদৌ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই প্রত্যক্ষবাদী; কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহারা তাহার অস্তিত্ব হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। এই অবিশ্বাসের যুগে, এই প্রকার প্রত্যক্ষবাদের প্রবল ঝটিকার মধ্যে থাকিয়াও যাঁহারা কোন ব্যক্তিকে ভগবান বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা চাক্ষুষ প্রমাণ না পাইলে কখনই ঐরূপ করিতেন না। এখনকার বিদ্বজ্জনগণ অন্ধবিশ্বাসী নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণে যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, যুক্তিদ্বারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই জন সমাজে প্রচার করেন। তদ্ভিতর বিষয় প্রচার করিতে তাঁহারা নিজেরাই কুণ্ঠিত হন। সেইজন্য ইহাঁদের কথা আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

এল, এম, এস।

দয়াল ঠাকুর

[নিঃ সং—সার্ব্বজনীন নিত্যধর্ম্মের প্রচারই এই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহার গুণ লীলা সনাতন নিত্যধর্ম্মের বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলিয়া উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবিত,—উক্ত ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে—]

সেই মহাপুরুষের গুণ-গরিমা প্রচার উদ্দেশেও এই পত্রের অবতারণা, তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের দ্বারে আজ আমি অযাচিত ভাবে দণ্ডায়মান। তাঁ'র পরিচয় প্রার্থনা করিলে আমি প্রথমেই এইমাত্র বলিব—তিনি "মোদের দয়াল ঠাকুর।" যিনি সুখে-দুঃখে-শোকে-তাপে কখন আশ্রিতকে ছাড়েন না, তিনি দয়াল ছাড়া আর কি? তাঁহাকে শুধু গুরু আখ্যা দিয়া যিনি নিরস্ত হইয়াছেন আমার নিশ্চয় ধারণা তিনি তাঁহার বিশেষ পরিচয় পান নাই। আমি ভুক্তভোগী, তাই বিশিষ্টভাবে তাঁ'কে চিনিয়াছি ও আজ স্পর্দ্ধার সহিত তাঁ'র বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম

হইতেছি। যদি তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও দীক্ষা দান করিয়া থাকেন, সে পুরুষধন্যকে আমি বারবার ধন্যাদপি ধন্যজ্ঞানে নমস্কার করি—তিনি তাঁহাকে গুরুরূপে জানিয়া মানবজনম সফল করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দয়াল আমাদের বলিয়াছেন,—

"গুরু চৈতন্য পুরুষ। গুরুকে ইষ্টদেব বলে। ইষ্ট যিনি তিনি কখন অনিষ্ট করেন না। চৈতন্য পুরুষ গুরুর প্রত্যেক উপদেশ চৈতন্যময়। তিনি যাহাকে সচৈতন্য করিবেন ইচ্ছা করেন, সে তাঁ'র উপদেশে সচৈতন্য হয়। ঐ প্রকার গুরু-চৈতন্যের কোন উপদেশই শিষ্যের অনিষ্টজনক হয় না। ঐ প্রকার গুরুর, শিষ্যের প্রতি সকল উপদেশই শিষ্যের উপকার করে, অনুপকার করে না।"

তিনি যদি কাহারো গুরু হইয়া থাকেন, তিনি সৌভাগ্যক্রমে গুরুরত্ন লাভ করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে পারিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কত অনাদর, কত অযত্ন যে আমরা দিবানিশি প্রদর্শন করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সর্ব্বদাই আজ্ঞাপালনে বিরত হইয়া কুপথগামী হইয়াছি, কিন্তু চরণপাশে "ভীত নীরব অপরাধী সম" দণ্ডায়মান হইলে সে মুখমণ্ডলের বিমল কিরণরাশি, আদর সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে জীবন আলোকিত করিয়া দিত। যেন মনে হইত কোন দিব্য আলোক-সিন্ধুতে মগ্ন হইয়া জগতের সব ভুলিয়া গেলাম। তাই আজ পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিলে অনুতাপের সহিত কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে:—

"চির আদরের বিনিময়ে সখা!
চির অবহেলা পেয়েছ,
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দু'হাত পসারি'
ধরে' টেনে' কোলে নিয়েছ।"

জীবনে প্রভুর কখন বিষন্ন বদন দেখি নাই। সদাই হাস্যবদন—যেন প্রফুল্লতার জলন্ত-মূর্ত্তি, সঞ্জীবন-রসায়ন, অমিয়ধার। কি পরিচিত কি অপরিচিত সকলেই সম্মুখে কিছুক্ষণ যাপন করিলে বলিতে বাধ্য হইতেন, প্রভু আমাকে কত ভাল বাসিলেন। আচ্ছা! একেবারে এক সময়ে সমান ভালবাসা সকল হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে যিনি পারিতেন তিনি কে? যদি কেহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আমি জোরের সহিত পুনরায় না বলিয়া থাকিতে পারিব না—**"তিনি মোদের দয়াল ঠাকুর"** আহা! সে ভালবাসার কথা আজ স্মরণপথে আসিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। সে আদরের সম্ভাষণ, সে সকরুণ অভ্যর্থনা, সে অপরিমেয় ভালবাসার এক টানা সমভাব যখন ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করি চক্ষে আর জল ধরে না। মনে হয়, ছুটে' গিয়ে একবার নবদ্বীপের দিকে যাই, না হুগলীতে যাই, না কালীঘাটে যাই। কোথায় আর একবার সেই অপূর্ব্বরূপমাধুরী দর্শন করিয়া আরও একটু তাঁহার পথে অগ্রসর হইয়া আসি। সে অযাচিত ভালবাসা আর আজ কোথায় পাইব? কে আর অন্ধ আতুর-জনকে "আয় পাপী আয় বিনামূলে পার করিব" বলিয়া পতিত জনের প্রাণে আশার সঞ্চার করিবেন?

মনুষ্য মাত্রকেই দৈবদুর্বিপাকে কখন না কখন সন্দেহে আন্দোলিত হইতে হয়। উক্ত

[illegible] দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকেও একসময় [illegible] এই অবাঞ্ছিত দোলাতে দুলিতে হইয়াছিল। কতদিন পাপের বন্ধুত্বে মজিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই। আত্মাপাগল [illegible] কথা—তাঁহার কথা স্মরণে আসিলে [illegible] প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু দয়াল তিনি—অধম ত্রাতা তিনি—পাপীর বন্ধু তিনি—স্থান দিয়াছেন একবার অভয়চরণে, ভুলিতে কি পারেন? আমি ভুলিলে তিনি ভুলিবেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে অজ্ঞাতসারে এমন শক্তিসঞ্চার করিয়া কুটিল কুপথ হইতে বাঁচাইয়া তাঁ'র দিকে ফিরাইলেন,সে কথা যখন পরে বুঝিলাম, তাঁ'কে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আমার হৃদয় মন তুষ্ট করিব বলিতে পারি না। তাঁ'কে শুধু গুরু বলিলে আমার সঙ্কীর্ণ হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করে না। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর,—একথা শোনা আছে। কিন্তু সে শাস্ত্রবচনের সার্থকতা না বুঝিতে সক্ষম হইয়া ব্যক্তিগত অনুভূতির দাস হইয়া বলিতে চাই—**তিনি গুরু আমার—ইষ্ট আমার—দয়াল আমার।** তিনি আমার কোথায় নন? বৃন্দাবনে দেখি তিনি সঙ্গে, কাশীতে দেখি সম্মুখে দণ্ডায়মান; মথুরায় দেখি সহাস্য বদনে আকাশমার্গ হইতে বৃন্দাবন যে স্বধাম, এইটি অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। চন্দ্রে-সূর্য্যে-জলে-স্থলে সদা সর্ব্বত্রই তাঁ'র অস্তিত্ব, ছলেবলে-কৌশলে প্রকটিত করিতেছেন। এ হেন প্রাণভরা ধন আমার কি জগৎভরা নন? কষ্টে দুঃখে, জ্বালামালায়, কঠোর তাড়নে মুহ্যমান হইতে দেন না যিনি, তিনি কি আমার ভগবান, সেই হৃদয়ের দেবতা নন্? এই অনুভূতি তাঁ'র আশ্রিত প্রায় সকলের ভাগ্যে কোন-না-কোন দিন, কোন-না-কোন স্থলের জন্য, কোন-না-কোন ভাবে একবারও ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজ আমরা তাঁহাকে আর স্বশরীরে দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু প্রাণের ধন সর্ব্বদাই আমাদের মত দুষ্টের ইষ্ট হইয়া প্রাণে প্রাণে অনুভূতির সঞ্চার করিতেছেন। তাঁ'র কাছে বসিয়া আর সেরূপ মিষ্ট কথা শুনিতে পাইব না সত্য, কিন্তু যে কথা গুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও কর্ণে বর্ণে বর্ণে ধ্বনিত হইতেছে এবং মর্ম্মস্থল উদ্বেলিত করিতেছে। কত কথা কত রকমে কহিতেন, শিশুবুদ্ধি আমরা সামান্য জ্ঞানে সেই কথা গুলির সার্থকতা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আমার বেশ মনে পড়ে নবদ্বীপে যখন তিনি ছিলেন, আমি শ্রীচরণদর্শনাভিলাষে যাইয়া কয়েক দিন তথায় অবস্থান করি। সেটা হ'ল বর্ষাকাল। একদিন গঙ্গার একটানা স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে অনেকদূর গিয়া পড়ি, আর কিছুদূর যাইলে জীবনের হানি হইত। কিন্তু অকুলকাণ্ডারী কি এক অদ্ভুত শক্তির দ্বারা যেন একটী বক্রটান দিয়া তটস্থ করিয়া দিলেন। বিস্ময় বিহ্বল হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমে আসিবার পর প্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় ভাসিতেছিলে?" আমি যেমন মনে আসিল বলিলাম,—"স্রোতে গা ভাসান দিয়াছিলাম।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"কোন্ স্রোতে আবার ভাসিতে হইবে কে জানে?" এই বিশ্বে জীবনলীলা অনুসন্ধিৎসুগণকে আমি আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না এ প্রভু মোদের অন্তর্যামী বই আর কি? স্রোতে ভাসিলাম তাঁকে না জানাইয়া—কিন্তু তাহা জানিয়া বসিয়া আছেন। আর এই যে স্রোতে

তাঁদার রহস্য প্রসঙ্গে কোন্ স্রোতের নির্দ্দেশ করিলেন কেহ কি বলিতে পারেন? এ সেই আমার জীবনের ভীষণ পরীক্ষার স্রোত—সন্দেহ দোলায় দোলার স্রোত, কুপথে যাইবার প্রলোভন স্রোত। এ স্রোত একটানা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, আজ দয়া করিয়া ফিরাইলেন তাই বুঝিতে পারিলাম কূলে উঠিয়াছি। এইরূপ কত পথহারাকে পথ দেখাইলেন কে তাঁ'র ইয়ত্তা করিতে পারে? তাই আর সেই অকুলকাণ্ডারীকে "আমার দয়াল ঠাকুর" না বলিয়া কি করিয়া বাঁচি! আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এরূপ রহস্যময় ঘটনা যে কত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন তিনি "দয়াল ঠাকুর মোদের"। তাই প্রাণ ভরিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি, তাঁ'র প্রকৃত দয়া আমি অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। গীতার সেই কথাটী—"দুষ্টের বিনাশ হেতু ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, যুগে যুগে আমি আসিয়া থাকি"—আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রতিফলিত হইতেছে। এই বাক্যে আজ আমার খুব বিশ্বাস হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে এ কথার তাৎপর্য্য অনুভব করিতেছি। ইহার অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই, কেননা এ সব হ'ল অনুভূতির কথা। নবজীবন লাভ করিয়া আজ ভরসা পাইয়াছি—প্রাণে তাঁ'কে বসাইতে ও জগৎকে ডাকিয়া শুনাইতে —তিনি মোদের "দয়াল ঠাকুর"—পাপীর বন্ধু। মনে মনে তাঁ'র চিন্তা একদণ্ড করিলেও প্রত্যক্ষতা লাভ হইবেই হইবে এ আমার একান্ত বিশ্বাস। ঠাকুর! তোমার কত দয়া আমাদের প্রতি, তুমি প্রাণে প্রাণে জাগরিত রহিয়াছ। আমরা তোমাকে দিবানিশি প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। অলক্ষ্যে থাকিয়াও প্রাণের মাঝে সাড়া দিয়া বলিতেছ, "আমার চিন্তা করিলে আমাকে পাইবে।"

প্রভু তুমি যে সর্ব্বময়। তোমাকে চিনিবার লোক, সব যুগে চিনিয়াছেন ও চিনিবেন। যখন জগৎ "তোমার" চরণে লুটাইবে, তখন আমাদের চিরদিনের সাধ পূর্ণ হইবে। হে দয়াময়! দয়া করিয়া যখন পথে দাঁড় করাইয়াছ —তোমার দিকে যেন সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে— যেন জগতের অনন্ত প্রলোভনাবর্ত্তনে ডুবিয়া তোমার বিশ্বমন্দিরের পতাকার লক্ষ্য না হারাই। এই তোমার রাজীবচরণে একান্ত প্রার্থনা। আমাদিগকে শ্রীচরণের চিরদাস করিয়া রাখ। আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্বদাই শির নত করিয়া তোমার চরণে এই নিবেদন করিতে পারি :—

"যদি, প্রলোভন মাঝে ফে'লে রাখ,
তবে, বিশ্ব-বিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি!
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধুভব,
নিষ্ফল-কলরব মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শান্ত-মূরতি ধরি,
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা অলিকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ সত্য-সূর্য্য রূপে
পথহারা হ'তে দিও নাক।
আশার ছলনে যদি হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন সুধা
বিতরি, এ বিপদে ডাক॥"

(রজনীকান্ত সেন)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভক্তের তন্ময়ভাব

[বালকের রচনা।]

(১)

সে দিন ভয়ানক এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহম্মদের জামাতা ভক্ত আলির উরুতে শত্রুর একটা বল্লম আসিয়া ভয়ানকভাবে বিঁধিয়া গিয়াছে কিন্তু বিঁধিতে যত না কষ্ট হইয়াছে খুলিবার কষ্ট যে তা'র চেয়ে অনেক বেশী। খুলিতে না পারিলে ক্ষতস্থান পচিয়া খসিয়া পড়িয়া একটী অমূল্য ভক্ত-জীবনের অবসান করিবে—উপায় কি? মহামতি হজরত মহম্মদ দেখিলেন, "মাত্র একটী উপায় আছে, যখন ভক্ত আলি নামাজ পড়িতে বসিবেন সেইতো প্রকৃষ্ট সময়। ভক্তের প্রাণতো তখন আর পার্থিব তুচ্ছ বিষয়ের ধারও ধারে না; তখন তাহা এক অপূর্ব্ব স্বর্গলোকে ইষ্টদেবতার চরণের তলে জীবনের সমস্ত আশা, ভরসাও ভক্তি, তৃপ্তি, কামনা সব উপুড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। সেই সত্যসুন্দর মঙ্গলময় ব্যতীত সে তো তখন আর কিছুই জানে না। সেই তন্ময়তার সময় বল্লম খুলিয়া লইলে সে টেরও পাইবে না।" মহম্মদের কথানুযায়ী কাজের জন্য নমাজের সময়ের অপেক্ষা করিয়া সকলে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে নমাজের সময় আসিল, আলি গভীরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে আবিষ্ট হইয়া ইষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন—তখন তিনি বাহিরের সমস্ত দৈন্যকে দূর করিয়া দিয়া হৃদয় দেবতার প্রসাদলাভের জন্য সমস্ত দেহমন ঢালিয়া দিলেন—বাহিরের জগতের কোনও খবরই আর তাঁহার কাছে মায়াজাল রচনা করিতে পারিতেছিল না। মহম্মদের উপদেশমত সেই সময় বল্লম টানিয়া বাহির করা হইল। মহাপ্রাণ আলি একটুকুও জানিতে পারিলেন না—কি হইতে কি হইয়া গেল। নমাজ শেষ করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, উরুবিদ্ধ বল্লম অপসৃত হইয়াছে ও ক্ষতস্থান বেশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া গেলেন। আর যাঁহার মঙ্গলময় করুণায় এতবড় একটা কাজ তাঁহার (আলির) দেহের উপর হইয়া গেল কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না, সেই "খোদাতাল্লার" চরণে বারবার প্রণতি জানাইলেন।

(২)

ভক্তসাধু বসিয়া তখন সেলাই করিতেছিলেন। বাড়ীর মালিক দূরে বসিয়া দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কোনও কারণবশতঃ মালিকপত্নী ঘোমটা না দিয়াই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মালিক, পত্নীর এই সমাজ ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া পত্নীকে বলিলেন—"তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে মুসলমান শাস্ত্রের অনুশাসন আছে যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষের সামনে ঘোমটা না দিয়া আসিলে তাহার যত চুল দৃষ্ট হইবে, ততবার তাহাকে বিষম নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে?"

স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন— "হাঁ আমার একথা মনে আছে কিন্তু জীবিতপুরুষের সম্মুখে যাইলে না জীবিত ও মৃত উভয়ের সম্মুখে যাইলেই এ বিধির প্রয়োগ হয়?"

স্বামী উত্তরে বলিলেন—"না, শুধু জীবিতের বিষয়েই ইহা প্রযোজ্য।"

স্ত্রী কহিলেন—"তবেতো প্রভু, আমার অপরাধ হয় নাই। দেখুন, ঐ লোকটী যদিও বাহিরে জীবিত দেখিতেছেন কিন্তু উঁহার অন্তরাত্মা বাহ্যিক সমস্ত বিষয়েই মৃত।"

স্বামী বলিলেন—"সে কি কথা? দেখিতে পাইতেছনা ও সেলাই করিতেছে? উঁহার অন্তরাত্মা বাহিক ব্যাপারে মৃত কোনখানে?"

স্ত্রী—"আপনি একটু উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসুন ও কি করিতেছে।" স্বামী, স্ত্রীর কথামত উঠিয়া গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন ভক্তসাধু উরুর উপর কন্থা রাখিয়া সেলাই করিতেছিলেন—কন্থার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের দেহের চামড়াও সেলাই করিয়া ফেলিতেছিলেন আর অজস্র ধারায় রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাতই ছিল না। বাহিরের হাতদু'টী যন্ত্রের ন্যায় সেলাই করিয়া যাইতেছিল কিন্তু মন সে কাজে ছিল না। যাঁহাকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া লইয়াছিলেন এবং এ যাবৎ যাঁহার চিন্তনেই তিনি দিবারাত্রি নির্ব্বিকারভাবে অতিবাহিত করিতেছিলেন তাঁহারই চরণে মন তখন নিবিষ্ট ছিল, তাঁহাতেই তিনি তন্ময় হইয়াছিলেন। তিনি সেই পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, যে পরমানন্দকে পাইলে জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত থাকে না। শ্রী—

টেপ লজ, রংপুর।

আবাহন।

[মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের শুভা জন্মতিথি উপলক্ষে লিখিত]

এস মা——এস মা নিত্যাষ্টমী—— শুভতিথি, জন্মতিথি—এস মা। এস মা অনন্তকালসাগরে অনন্তরূপিনি; শুভঙ্করি, প্রাণময়ি জন্মতিথি এস। চিরশুভলক্ষণযুতা, শান্তিরূপিনী, শিবময়ী জন্মতিথি এস। তোমার শুভাগমনে ধরা প্রসন্ন হৌক। ঐ কুসুম-মালিনী প্রকৃতিরাণী ফুলের মালা পরাইয়া ফুলের অর্ঘ্য চরণে ঢালিবার জন্য তোমায় আবাহন করিতেছে। ঐ মধুর মলয়-সমীরণ কুসুম-সুবাস বহন করিয়া তোমায় বীজন করিবার জন্য মুহুর্মুহু বহিয়া যাইতেছে। ঐ চ্যুতমুকুলের মধুর সৌরভে মত্ত হইয়া পিককুল কাননে কাননে কল কুজন করিয়া মা গো। তোমারই আবাহন গান গাহিতেছে। ভ্রমর-ভ্রমরী পুষ্পপরাগে রঞ্জিত হইয়া তোমার আগমনোল্লাসে নৃত্য করিতেছে। ধরণী হিমানীর জড়ভাব ত্যাগ করিয়া আজ বসন্তের নবীনসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তোমারই আবাহন করিতেছে। তবে এস মা শুভজন্মতিথি এস। তোমার আসাত নূতন নয়! এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তুমি ত বহুবারই আসিয়াছ! এবার মা তোমার সেই হাসিভরামুখে, নিত্যগোপাল-কোলে ধরায় আগমন যে দেখিয়াছে সেই ধন্য। সুরতরঙ্গিনীর পূতপ্রবাহের মধুরস্পর্শে পাণিহাটি গ্রাম চির-পবিত্র;—যেদিন মা শুভতিথি তুমি নিত্যগোপাল কোলে করিয়া সেই পবিত্রধামে আগমন করিলে সেই হইতে পাণিহাটি অনেকেরই প্রাণহাটি হইল। তোমার হাসিভরামুখ, কেননা কোলে তোমার নিত্যগোপাল;—তোমার অঙ্গ পুলকে পুলকিত, নিত্যঅঙ্গে যে তোমার অঙ্গ বিলসিত। তোমার রূপের ছটা যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ তুমি আসিতেছ—মৃদু-পদসঞ্চালনে নিত্যগোপাল

কোলে করিয়া মধুর হাঁসি হাঁসিয়া আসিতেছ। ধীরে ধীরে তুমি ধরায় নামিয়া আসিলে। [illegible] ছড়াইয়া পড়িয়াছে, [illegible], তোমার শ্যামলাঞ্চলে স্নিগ্ধ [illegible] খেলিয়া যাইতেছে। মা, তোমার পাণিদ্বয় বরাভয়সমন্বিত ;—জগৎকে কতই আশ্বাস দিতেছ। দেবি, প্রাণস্বরূপিণি! তোমার কোলে ঐ কে? তুমি যাঁহার পানে এক একবার চাহিতেছ অনিমেষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইতেছ—ঐ সোণার গোপাল তোমার কোলে—উনি কে? মা ঐ সোনার পুতুল ননীর গোপাল কে? মা শুভতিথি, আমাদের কি চিনাইয়া দিবে?

তবে এস মা ব্রহ্মময়ি—ব্রহ্মস্বরূপিণি—জীবনিস্তারের জন্য উদয় হও মা! একবার তুমিইত মা সত্যযুগে নাভিরাজার আকুল প্রার্থনায় পূর্ণব্রহ্ম ঋষভ ভগবানকে কোলে করিয়া জগৎকে আনিয়া দিয়াছিলে; আবার সাধুপরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দ্বাপর যুগে কংসের আলয়ে ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন গগনের স্তর ভাঙ্গিয়া ধরার বক্ষে ব্রহ্মগোপাল-শ্রীকৃষ্ণ-কোলে তুমিই ত আসিয়াছিলে মা। বৃষভানুরাজ, কাত্যায়নী ভগবতীকে কন্যারূপে প্রার্থনা করায় অনন্তরূপিণী যখন বৃষভানুরাজনন্দিনী, ননীর পুতুলি গোপবালারূপে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তুমিই ত' মা সেই স্বর্ণপ্রতিমা কোলে করিয়া ধরায় আনিয়াছিলে; আবার মহামায়া যশোদাগৃহে আবির্ভূতা হইতে ইচ্ছা করিলে তুমিই ত' মা সেই বিন্ধ্যবাসিনী কৃষ্ণভগিনী যোগমায়াকে বক্ষে লইয়া নন্দভবনে উদিত হইয়াছিলে! তাই বলি মা অষ্টমী তিথি! তুমি ব্রহ্মতিথি। মা ব্রহ্মতিথি তোমার কোলে কি ব্রহ্ম? ব্রহ্ম কি রূপ ধরিয়া আসিলেন? তুমি দে মা—তা' না হ'লে এ অভাব বুঝিবে কে? মা তুমি না হইলে ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে অধর্ম্মনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য ব্রহ্মগোপাল-কোলে কে আসিবে? তনয়ের দুঃখ মা ভিন্ন কে বুঝিবে মা? মহাসমন্বয় প্রচারকল্পে সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপাদক জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিলক্ষণ-সম্পন্ন পারমহংস্যধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য একবার মা তুমিই বাসন্তী-অষ্টমী রূপে ভগবান ঋষভদেবকে কোলে লইয়া আসিয়াছিলে। সেই তুমিই আবার পাণিহাটী গ্রামে সেই বাসন্তী-অষ্টমীরূপে মহাসমন্বয়ধর্ম্ম সংস্থাপন কল্পে শ্রীনিত্যগোপাল-কোলে উদিত হইয়াছ। মা ব্রহ্মময়ি! ব্রহ্মতিথি! তুমি সর্ব্বমঙ্গলা জীব নিস্তারিনী—পরাভক্তি-পরামুক্তিদায়িনী—তুমি সুখময়ী সুখস্বরূপিনী—সংসার-দাবদগ্ধ-জীবকুলের শান্তি-শৈবলিনী—পাপ-তাপসঙ্কুল সংসার-সাগরে অভয়তরণী—মা এস তবে। তোমার আবাহন-গান অকিঞ্চন আমি কি গাহিব?

মা ব্রহ্মতিথি **অষ্টমীতিথি,** তুমি নিত্যগোপাল-কোলে চৈত্রমাসে আসিলে কেন? মা অশোকাষ্টমি! ধরাকে অশোক করিতে বুঝি তুমি আসিলে? **চৈত্রমাস,** বসন্তকালের অঙ্গ। "ঋতুনাং কুসুমাকরঃ". তাই দেখিতেছি শ্রেষ্ঠ ঋতুতেই তুমি আসিয়াছ। রবিবারে তোমার উদয় কেন? "বারে আদিত্যবারোহহং ব্রঃ বৈঃ পুঃ। তাই তুমি **রবিবারে** আসিয়াছ। অয়ি আমার নিত্যগোপাল-জন্মতিথি! তুমি শুভমাসে শুভবারে সর্ব্বশুভক্ষণে উদিত হইয়াছ!! আর কোলে তোমার **নিত্যগোপাল**—দেখিয়া জগৎ আশ্বস্ত হইয়াছে। মা মহাতিথি! তোমার দেব-ঋষি-মুনি-নর-বন্দিত শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী প্রণিপাত।

জয় জয় জন্মতিথি নিত্যস্বরূপিণী।
জয় মহাশক্তি পরাভক্তি প্রদায়িনী॥
প্রেমস্বরূপিনী মা গো বিজ্ঞানরূপিনী।
আনন্দময়ীমূরতি জীব নিস্তারিনী॥
অনন্তব্যাপিনী তুমি অনন্তরূপিনী।
পরমাপ্রকৃতি সতী পরা-আহ্লাদিনী॥
এই ভিক্ষা যাচি মোরা তোমার চরণে।
কর ধনী মা গো সবে নিত্যপ্রেমধনে॥
ওঁ তৎ সৎ।
শ্রীহরিপদানন্দ অবধূত।

আগামী ২১শে চৈত্র শনিবার যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের শুভ জন্মতিথি। ২২শে চৈত্র রবিবার ৺কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠে মহোৎসব ও শ্রীকীর্ত্তনাদি হইবে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

নিত্যপদাশ্রিত
সেবকমণ্ডলী

দোললীলা বা বসন্তোৎসব তত্ত্ব

দোলযাত্রা সমাগতা। আনন্দে জগৎ উৎফুল্ল। সকল প্রকৃতি * মিলিয়া যেন আজ মনের আনন্দে তাঁহাদিগের পরাণ-বঁধুয়ার জন্য বাসরসজ্জা করিতেছেন। ফল-পুষ্পাবনত তরুরাজি মধুগন্ধোন্মত্ত ভ্রমরনিকরের গুঞ্জন-ধ্বনিতে, কোকিলকুলবধূর উন্মাদক কুহুতানে এবং অপরাপর বিহঙ্গমের অস্ফুট-কলনিনাদে আয়োজন অনেক দিন হইতে আরব্ধ হইয়াছে। কোন প্রকৃতি শীতল উত্তর বায়ুর প্রতিরোধ করিয়া সুখস্পর্শ মলয়-মারুত প্রবাহিত করিলেন, কেহ বা বৃক্ষ সমূহের পুরাতন পত্রগুলি শুষ্ক করিয়া শাখাচ্যুত করিলেন, কোনও প্রকৃতি মেঘাকর্ষণ পূর্ব্বক বায়ুমণ্ডল বিধৌত করতঃ খরকরতপ্তা পৃথিবীতে অমৃত বৃষ্টি করিলেন, কোন প্রকৃতি বৃক্ষ সকলের মধ্যে সেই রস সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে নূতন পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত করিলেন;—নব পত্র বিকাশে পাছে মুকুলোদগমের ব্যাঘাত জন্মে এই আশঙ্কায় মুকুলসম্ভাবিতপাদপরাজিতে পল্লব বিন্যস্ত না হইয়া মুকুলাবলীই উন্মীলিত হইল আনন্দ-চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী প্রকৃতিবৃন্দ আজ যাঁহার যেমন শক্তি যাঁহার যেমন অধিকার তদনুসারে শ্রীগোবিন্দের সপর্য্যার আয়োজন করিতেছেন। কেহ বা আনন্দস্রোতপ্রবাহে ফল্গু-সম্ভারের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা দোললীলা দর্শনে ধন্য হইবার আশায়, কেহ বা শ্রীগোবিন্দের চরণপূজামানসে আনন্দে বিভোর হইতেছেন, আয়োজন জগৎজোড়া, ব্যাপার বিশ্বব্যাপী।

যাহার জন্য এত আয়োজন এক পূর্ণিমার সহিতই যে সেই লীলার অবসান হইবে তাহা নহে।

* "পুরুষ একক সাংখ্যদর্শনের সার।
সংখ্যাতীত প্রকৃতিতে করেন বিহার॥"
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"
শ্রীভগবানের এই লীলা নিত্য,——দেশ, কাল অথবা পাত্রভেদে ব্যবচ্ছিন্ন হইবার নহে। ভক্তগণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ইহার রসাস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া গর্ব্ব করেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত যাঁহারা অনুমাত্রও বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহেন, যাঁহারা তাঁহাদের চক্ষু বিস্ফারিত ও দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারাও উন্মীলিত নেত্রেই শ্রীভগবল্লীলার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। সত্য লুক্কায়িত হইবার নহে। কন্যা কুমারী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিলে দেখা যাইবে, সমস্ত দেশে কেমন এক আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। অনেকের শ্রবণ-সুখকর না হইলেও, যে অদ্ভুত মধুর বাদ্যোত্তম সহকারে হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃগণ প্রমত্ত-গীতি গাহিতেছেন উহা কি আনন্দ ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের চরমাভিব্যক্তির চিহ্ন নহে? শুধু ভারতবর্ষে কেন ঐ যে রোমদেশের চিরন্তনী প্রথা 'ফেষ্টাম ষ্টুলটোরাম'(১) 'মেট্রোনালিয়া ফেষ্টা'(২) 'লিউপারকালিয়া'(৩) প্রভৃতি দোলযাত্রার সমসাময়িক উৎসব এবং 'য়্যাবট অভ আনরিজন(৪) 'দি পাছোভার'(৫) 'দি ডে অভ অল ফুলস্'(৬) প্রভৃতি যে সকল কৌতুকাবহ আমোদ প্রমোদ বর্ত্তমানকালে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে প্রচলিত আছে, উহা দোলযাত্রারই অনুকরণ বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। (Jonnas Aubanas) জোনাস আবানাস লিখিত বিবরণ ও (Neogurgus) নিওগারগাসের কবিতায় আমাদের দেশের দোলযাত্রার আনন্দোৎসের প্রতিচ্ছায়াভাস পরিস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে॥ শ্রীভগবান নিত্য এবং জগতের সার্ব্বভৌম সার্ব্বজনীন সম্পদ; তাঁহার লীলাকেলিও তদ্রূপ; তাই সেই নিত্যসুন্দরের দোলযাত্রার আনন্দাংশ-কণা সকল দেশেই ছড়াইয়া গিয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

মাধ্যাকর্ষণ যোগাকর্ষণ, বিকর্ষণ অথবা সংসক্তি-সংহতি প্রভৃতি যেরূপ একই আকর্ষণের নামান্তর, অথবা পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রশান্ত প্রভৃতি যেরূপ একই মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন নাম, সেইরূপ ভগবানের একই লীলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পার্থিব দৃষ্টান্তে পরিচ্ছিন্নতা দোষ থাকিলেও চিন্ময় দার্ষ্টান্তিকে তাহা আরোপিত হইতে পারে না।

শিক্ষিতাভিমানী অপেক্ষা অশিক্ষিতদিগের মধ্যে এই আনন্দ অধিক একথা সত্য। আধুনিক-শিক্ষা, সহজ জ্ঞানাপসারিনী কৃত্রিম জ্ঞানপ্রদা। যিনি যত শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহার সহজ জ্ঞান ততই আবৃত হইয়া গুটিপোকার ন্যায় স্বরচিত কোষ-জালে বদ্ধদশা লাভ করিতেছে। যদি কেহ ঐ কল্পিত স্তর গুলি ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিবেন,—ঐ যে সূর্য্যের আকুঞ্চন-প্রসারণ, ঐ যে গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাবলীর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ, উহার সকলের মূলেই শ্রীভগবানের এই দোললীলা! অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, উহারা বহু বহু দূরে অবস্থিত হইলেও মণিমালার মণিরাজির ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সহিত

(১) Festum Stultorum.
(২) Metronalia festa.
(৩) Lupercalia.
(৪) Abbot of unreason,
(৫) The Passover.
(৬) The day of all fools.

আকৃষ্ট ও সম্বদ্ধ। আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। যেমন ঘটিকা যন্ত্রের পরিদোলক আন্দোলিত হইয়া সমস্ত চক্রগুলিকে পরিচালিত করে সেইরূপ শ্রীভগবানের দোলায় দোলে আন্দোলিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ পথে চলিতেছে। এই জন্যই কোনও কোনও পণ্ডিত "চলা পৃথ্বী"কে অ-চলা * বলিয়া থাকেন। পুরাণাদির খগোল বৃত্তান্ত, শিশুমার সংস্থান পাঠ করিলে এ বিষয় সুন্দর বুঝিতে পারা যায়।

যাহাতে কোন ভাব, শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর সাধারণ সমস্ত লোকের মনেই জাগ্রত থাকে এবং বদ্ধমূল হয় এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ ভাবানুযায়ী কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলতঃ ভাবই কর্ম্মের প্রসূতি। একটী ভাবের যেরূপ পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ভাব থাকে, কর্ম্মের পক্ষেও উহা তদ্রূপ। শ্রীভগবানের দোললীলায় "নেড়াপোড়ান" অথবা "বুড়ির ঘর পোড়ান" (বহ্ন্যুৎসব) সেইরূপ একটী ব্যাপার। দোলযাত্রা ব্রতের বিধান পাঠ করিলে জানা যায় যে হোমের পর দোলমণ্ডপের কিছু দূরে বিশুদ্ধ ভূমির উপর তৃণ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মেষ গ্রহের নিকট শ্রীগোবিন্দ দেবকে রক্ষা করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে এবং অত্যুচ্চ তৃণরাশির মধ্যে মেষ রক্ষা করিয়া জলদ্বারা ঐ গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অরণি নির্ম্মন্থনোদ্ভূত হোমাবশিষ্ট অগ্নি উহাতে প্রদান করিবে, উহার মন্ত্র যথা;—

"বিষ্ণু-বক্ত্র-সমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন।
মেষ-মন্দিরদাহেঽত্র সমুদ্ভূতশিখোত্তব॥

সুতরাং স্পষ্টই মেষদাহের ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। মেষ-শব্দ চলিত কথায় 'ভেড়া' বলে, সুতরাং "ভেড়াপোড়া" হইতে অপভ্রংশ ক্রমে 'নেড়া পোড়া' প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এবং এই মেষ-প্রতিপালিকা বৃদ্ধার নামানুসারে 'বুড়ীর ঘর' কথা চলিত হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়।

স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত উৎকল খণ্ডে মেষ গৃহ ও মেষ প্রদাহের ব্যবস্থা আছে। মেষ সহ মেষ-গৃহ দাহের ব্যবস্থা দোলযাত্রায় কিরূপে আসিল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে 'মেষ' শব্দের সংস্কৃত অপর নাম 'মেঢ্র'। ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে দোলযাত্রা প্রসঙ্গে মেঢ্রাসুর বধের উল্লেখ আছে। ঐ প্রসঙ্গটী † শ্রীমদ্ভাগবতে (কুবেরানুচর) শঙ্খচূড় বধের অনুরূপ। এই শঙ্খচূড় ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শঙ্খচূড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ক্রমশঃ।

শ্রীপুণ্ডরিকাক্ষ ব্রতরত্ন।

---

* "অ" অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার দ্বারা 'চলা' চালিতা। লেখক।

* ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ॥ ১
প্রত্যর্চ্চং দেবদেবস্য গোবিন্দাখ্যাং তু কারয়েৎ।
প্রাসাদপূরতঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শস্তম্ভমুচ্ছ্রিতম্॥ ২
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং মণ্ডলং বেদিকান্বিতং।
চারুচন্দ্রাতপংমাল্যচামরধ্বজশোভিতম্॥ ৩
ভদ্রাসনং বেদিকায়াং শ্রীপর্ণীকাষ্ঠনির্ম্মিতম্।
ফল্গুৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা॥ ৪
ফাল্গুণ্যা পূর্ব্বতো বিপ্রাশ্চতুর্দ্দশ্যাং নিশামুখে।
বহ্ন্যুৎসবং প্রকুর্ব্বীত দোলামণ্ডপপূর্ব্বতঃ॥ ৫
গোবিন্দানুগৃহীতংতু যাত্রাঙ্গং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
আচার্য্যবরণং কৃত্বা বহ্নিং নির্ম্মন্থনোত্তবম্॥ ৬
ভূমিং সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃণরাশিং মহোচ্ছ্রিতম্।
সপশুং কারয়িত্বাতু বহ্নিং তত্র বিনিক্ষিপেৎ॥ ৭
উৎকলখণ্ডে, ৪২শ অধ্যায়ে ১—৭। সম্পাদক।

† শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। লেখক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র ।

"—সর্ব্বধর্ম্ম-ময় প্রভু স্থাপে সর্ব্বধর্ম্ম—"

[শ্রীচৈতন্যভাগবত ।]

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ।"

(এই) প্রভুর পরম-বাণী, ভক্তি-চৈতন্য-দায়িনী,
(তাহা) 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে' উজ্জ্বল প্রমাণ,—
সকলের এই বাণী দিব্য আলম্বন ॥"

[নিত্যগীতি, ৩০ ।]

১ম বর্ষ । } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০ । সন ১৩২১, বৈশাখ । { ৪র্থ সংখ্যা ।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

প্রত্যেক নরের মধ্যে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে যে শ্রেণীর প্রেম আছে তাহা কোন নরের অথবা কোন নারীর প্রতি হইবারই উপযোগী । প্রত্যেক নরের মধ্যে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে যে শ্রেণীর ভক্তি আছে তাহা কোন নরের প্রতি অথবা কোন নারীর প্রতি হইবারই উপযোগী । যে নরের বা যে নারীর মধ্যে যে শ্রেণীর জ্ঞান আছে তাহা দ্বারা কেবল কোন নর বা নারীকে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় । তাহা অতি সামান্য । তাহা দ্বারা অনর-অনারী ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিতে বা বুঝিতে পারা যাইতে পারিবে ? নর অথবা নারীর মধ্যে যে শ্রেণীর শ্রদ্ধা আছে তাহা কেবল অন্য কোন নরের বা নারীর প্রতিই হইতে পারে । সে শ্রদ্ধা যাহা পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে কি প্রকারে উপযোগী হইবে অথবা উপযোগী হইতে পারে ?

সেই জন্যই বলি, কোন নর বা কোন নারীমধ্যস্থিত প্রেম অদ্ভুত অসামান্য পরমেশ্বরের জন্য উপযোগী হইতে পারে না। সেই জন্যই বলি, কোন নর বা নারীমধ্যস্থিত ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেই অসামান্য পরমেশ্বরের জন্য উপযোগী হইতে পারে না। সেই জন্যই বলি, কোন নর বা নারীমধ্যস্থিত জ্ঞান সেই সর্ব্বশক্তিমান অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য মহান্ পরমেশ্বরকে জানিবার বা বুঝিবার পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না। সেইজন্যই বলি, পরমেশ্বর সামান্য নরনারীর প্রেমাস্পদ কি প্রকারে হইবেন? সেইজন্যই বলি, অসামান্য পরমেশ্বর অতি সামান্য নরনারীর ভক্তিভাজনই বা কি প্রকারে হইবেন? সেইজন্যই বলি, অসামান্য পরমেশ্বর অতি সামান্য নরনারীর শ্রদ্ধাস্পদ কি প্রকারে হইবেন? সেইজন্যই বলি, অসামান্য পরমেশ্বর অতি সামান্য নরনারীর পক্ষে জ্ঞেয়ই বা কি প্রকারে হইবেন? তবে তিনি নরনারীর মতন হইলে নরনারী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাও করিতে পারে, তাঁহার প্রতি ভক্তিও করিতে পারে এবং তাঁহার প্রতি প্রেমও করিতে পারে এবং তাহা হইলে নরনারী তাঁহাকে জানিতেও পারে। দয়াময় পরমেশ্বর নরনারীর সুবিধার জন্যই সময়ে সময়ে নর অথবা নারীর আকার ধারণ করেন। নরনারী তাঁহাকে ধরিতে পারিবে বলিয়াই, নরনারী তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে বলিয়াই তিনি কখন নর এবং কখন নারী হন। নর অথবা নারী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম করিতে পারিবে বলিয়াই তিনি সময়ে সময়ে নর অথবা নারী হইয়া এই জগতে অবতীর্ণ হন। সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

নরনারী তাঁহাকে ভক্তিদ্বারা ভজনা করিতে পারিবে বলিয়াই তিনি কখন নর এবং কখন নারী হন। নরনারী তাঁহাকে জানিতে পারিবে বলিয়াই তিনি কখন নর এবং কখন বা নারী হইয়া তিনি যে নিজে কি, সেই নরনারীর জ্ঞানের উপযোগী হইয়া, সেই নরনারীর জ্ঞানগম্য হইয়া, তিনি আপনাকে আপনি জানান অথবা বোঝান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতাতে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

নববর্ষ।

এস, নিত্য-নব-বর্ষ, এস!
বিশ্বের মন্দিরে কর শুভ-অধিষ্ঠান;
নবসাজে এস, বঁধু, বিলাও প্রেমের মধু,
মধুকালে মধুময় কর বিশ্ব-প্রাণ;
বিশ্ব-প্রেমে বিশ্ববাসী হো'ক্ মুহ্যমান।

এস, নিত্য-নব-বর্ষ, এস!
'এস' বলি পিকবধূ ডাকিছে তোমায়,
বাসন্তি কুসুম-কুল, হ'য়ে নিত্য-প্রেমাকুল,
নীরবে তুলিয়া তব আগমনি গায়;
গুঞ্জরিয়া অলিকুল ডাকিছে তোমায়!

এস, নিত্য-নব-বর্ষ, এস!
এস, অভিনববেশে, চির-পুরাতন!
পুরাতন হ'য়ে তুমি, রস-রঙ্গ-লীলা-ভূমি,
বর্ষে বর্ষে নববেশ করিয়া ধারণ,
নিত্য-নব! ধরা-বক্ষে কর আগমন।

সেই তুমি চির-পুরাতন,
একদিন,—স্থাপিবারে 'ঋষভ বিধান,'
ল'য়ে শ্রীঋষভ দেহে, অবতীর্ণ হ'লে ভবে,
কৃতজ্ঞ অন্তরে বিশ্ব এমহান্ দান,
লইল মস্তকপাতি'—প্রেম মুগ্ধ-প্রাণ!

হেন রূপে কত শত বার,
অশক্যে—সাধিতে এই জগত-কল্যাণ,
সরব-মঙ্গলালয়, পুণ্য-সুখ-প্রেমময়!—
এলে তুমি ধরা-বক্ষে,—অনন্ত, মহান্!
কে করিবে সংখ্যা তা'র? জ্ঞান—ম্রিয়মান।

সেই তুমি, নিত্য-নব-রূপী!
'মহা সমন্বয়ধর্ম্ম' করিতে স্থাপন,
পবিত্রিতে ধরা ধাম, বিলাইতে 'নিত্য'-নাম
"শ্রীনিত্য-গোপালে" ল'য়ে করি আগমন
ক্ষিতি-পৃষ্ঠে, মহা কীর্ত্তি করিলে অর্জ্জন।
সেই তুমি, চিরপুরাতন,
অনাদি-অনন্ত-সত্য,নিত্য-নির্ব্বিকার,
লীলা-রস-রঙ্গ-ভূমি, পূর্ণ, পুণ্যতম, তুমি,
এস আজ;—শ্রীচরণ পরশে তোমার,
জাগুক সে 'নিত্য'-স্মৃতি—প্রেম-পারাবার!
এস, নিত্য-নব-বর্ষ, এস!
নব-বেশে এস আজ চির-পুরাতন!
নিত্য-স্মৃতি-বিজড়িত, নিত্য-লীলা-বিলসিত,
এস এস বক্ষে চাপি "গৌরির দুলাল!"
এস ল'য়ে চিরারাধ্য "শ্রীনিত্য গোপাল!"
শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রাণি

(শম্ভুনাথ বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিরচিত)
[১ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

ভবসাগর নৌপদপদ্মযুগং
ভবসাগরনাবিকপারকরম্।
অনুকম্পানিয়ামকমিষ্টসুরং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্॥ ৫॥

দয়াময়! তোমার পাদপদ্মযুগ্মই ভবসাগরের তরণী—আর এই ভবসমুদ্রে তুমিই আমার (একমাত্র) কাণ্ডারী। হে দয়াল! ভব পারের সম্বলতো আমার কিছুই নাই, কেবল তোমার করুণাই আমার একমাত্র ভরসা। প্রভু হে! তুমিই যে আমার নিয়ন্তা—আমি তোমার হাতের কাঠের পুতুল—'আমাকে যেমন নাচাও তেমনি নাচি'। প্রাণবল্লভ! তুমিই তো আমার একমাত্র ইষ্ট দেব। হে ভবভয়নাশি গুরো! তোমার চরণে প্রণাম করি। ৫।

নৌ=নৌকা। অনুকম্পা=করুণাময়।
নিয়ামক=নিয়ন্তা; প্রভু।

অতিপাতকিনো মনুজেষু ভবে
মম তারণকারকমেকমলম্।
মম দুর্ম্মতিদুর্গতিনাশকরং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্॥৬॥

পতিত পাবন! এই জগতে নরগণের মধ্যে আমি যে অতিশয় পাতকী;—কেবল তুমি

ভিন্ন আমাকে উদ্ধার করিবার আর যে কেহই নাই। প্রভো! (দয়াময়!) আমার দুর্ম্মতির জন্য আমি কত দুর্গতি ভোগ করিতেছি; তুমি ভিন্ন এই দুর্গতি নষ্ট করিবার আর কেহই নাই; হে জগত্তারণ গুরো! এ মহাপাপী তোমাকে প্রণাম করিতেছে। ৬। মনুজ=মনুষ্য।

সিতচন্দনলিপ্তকলেবরকং
দিবিদুর্ল্লভপুষ্পসমার্চ্চিতকম্।
ভবজন্তমনোহরমূর্ত্তিধরং *
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্ ॥৭॥

(মদন মোহন!) তোমার শরীর শ্বেতচন্দনে মাখা। দেবগণ তোমাকে অপূর্ব্ব ফুল দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তোমার অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি জগৎবাসীর মনপ্রাণ কাড়িয়া লয়। হে ভবসাগরের নাবিক গুরো! তোমাকে নমস্কার করি। ৭।
সিত=সাদা। দিবি=স্বর্গে।

জলজান্তরকোমলপাদতলং
শুচিকোমলপদ্মসমাসনকম্।
ভবজন্মজদুঃখবিনাশকরং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্ ॥৮॥

---

* উপরোক্ত শ্লোকটীর শেষ চরণের প্রথমার্দ্ধটুকুর অনেক প্রকার অর্থ হয় বলিয়া বোধ হয়;—

(১) 'ভবজন্তমনোহরমূর্ত্তিধরং'
তু ভবজং মনোহরমূর্ত্তিধরং

যদিও দেবগণ দুর্লভ পুষ্প দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করেন তথাপি জীব যেন মনে না করে যে তোমার শ্রীবিগ্রহ কেবল স্বর্গীয় কোন উপাদান বা স্থান বিশেষের বস্তু, জগজ্জীবের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। জীবের প্রতি অশেষ করুণাবশতঃ তোমার শ্রীবিগ্রহ 'ভবজ'; অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক জনক জননী অবলম্বন করিয়াও জগতে অবতীর্ণ হইয়া তুমি জীবকে দয়া কর।

(২) ভবজং তু মনোহরমূর্ত্তিধরং

তোমার শ্রীমূর্ত্তি ভবজাত হইলেও, উহা দেখিবামাত্র জগজ্জীবের মন ভুলিয়া যায়। এমন কি তুমি মদন মোহন।

(৩) ভবজন্ত মনোহর ......।

তোমার শ্রীমূর্ত্তি সংসারের সমস্ত প্রাণীর (ক) মনহরণ করে। শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনলীলায় যথেষ্ট বর্ণনা আছে,—

সখা হে, তোমায় না দেখে
ঐ দেখ গাভীদল।
খেতে চায় না তৃণ জল ॥ ইত্যাদি
(ব্রজগীতি)

(ক) প্রাণীতু চেতনো জন্মীজন্তু জন্যু শরীরিণঃ—ইত্যমরঃ।

(৪) ভবজন্ত মনোহরং যতঃ মূর্ত্তিধরং

তুমি সংসারী জীবের মনহরণ কর, কারণ তুমি (তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া) মূর্ত্তি গ্রহণ কর। তাহা না হইলে অক্ষর, অব্যয়, অনন্ত, মূর্ত্তি শূন্য কেবল ব্রহ্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলে সংসারী জীবের আশা ভরসা কোথায়?

(৫) ভবজন্তমনোহরমূর্ত্তিধরং

জগতে যত জীব আছে সকলের মনহরণ করে এমন মূর্ত্তিধারী। তোমার অদ্ভুত নরমূর্ত্তির এমনই গঠন কৌশল যে, শুধু নর নহে জগজ্জাত সমস্ত জীবজন্তুই সেই অপূর্ব্ব নরবপু দর্শনে আত্মহারা।

(৬) মূর্ত্তিধরং

তোমার কোন মূর্ত্তি নাই; তুমি অমূর্ত্ত।

হে প্রভো! তোমার পদতল দু'টী পদ্মপুষ্পের মত অতি কোমল। শ্বেতবর্ণ কমল তোমার আসন। এই সংসারে জন্মগ্রহণ জন্য জীবের যে অশেষ দুঃভোগ হয়, তুমিই তাহা দূর কর। হে ভবদুঃখনাশন গুরো! এ দাস তোমাকে প্রণাম করিতেছে।

জলজ=পদ্ম। শুচি=সাদা।

অজশাশ্বত নিত্য নিরঞ্জন হে
ভবভীষণদুর্জ্জয়ষড়রিপুতঃ।
তব কিঙ্করকিঙ্করকিঙ্করমাং
কলিকল্মষনাশন পাহি গুরো॥ ৯।

গুরুদেব! তোমার জন্ম নাই; তোমার অভাব নাই, তুমি চিরকালই আছ; তুমি নির্ম্মল (জ্যোতির্ময়)। দয়াময়! আমি তোমার দাস। এই ভীষণ, দুর্জ্জয় ছয় রিপুর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। এই কলির পাপ নাশ করিতে তুমি ব্যতীত আর যে কেহই নাই। হে শরণাগত-পালক! এ দাসকে গ্রহণ কর। ৯। অজ=যাঁহার জন্ম নাই। শাশ্বত=যিনি চিরকাল থাকেন। কল্মষ=পাপ।

গুরুদেব কৃপাময় সত্য বিভো
তব পাদকুশেশয়যুগ্ম অলম্।
অতিপাতকিপাতকিপাতকিনো
মম দুর্ম্মতিনোমতিরস্তুসদা॥ ১০॥

হে গুরুদেব! কৃপাময়! হে বিভু! তুমিই সত্য। আমি অতি পাপী, অতি দুর্ম্মতি। হে পাতকিতারণ! তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন সর্ব্বদাই আমার মতি থাকে। ১০।

কুশেশয়=পদ্ম।

তব পাদসরোরুহযুগ্ম বিনা
মম নাস্তিরুচির্ভুবিচান্য ধনে।
ন রুচিঃ স্বজনেহভিরুচেন গৃহং
ভবদুস্তরসাগরতারণ হে॥ ১১॥

হে গুরুদেব! এই দুস্তর ভবসাগরে তুমিই একমাত্র কাণ্ডারী। প্রভু হে! তোমার যুগল পাদপদ্ম ব্যতীত এ জগতে আর কোন ধনে আমার রুচি নাই। কি আত্মীয়-স্বজন, কি গৃহ, কিছুই আর ভাল লাগে না। ১১।

সরোরুহ=পদ্ম। অভিরুচে=ভাল লাগে।

ভববন্ধনছেদন পাবন হে
করুণাময় দেব সনাতন হে।
অতিকল্মষকারিণমুদ্ধর মাং
তব পাদসরোরুহনাস্তিগতিম্॥১২॥

হে করুণাময় দেব! তুমি সনাতন (সকল সময়েই তুমি থাক—কোন কালেই তোমার তবে কখন কখন মূর্ত্তি ধারণ কর বটে। যখন তুমি মূর্ত্তি গ্রহণ কর তখন সে মূর্ত্তি জগজ্জীবের মন হরণ করে।

(৭) মনোহরায় মূর্ত্তিধরং

তুমি মূর্ত্তিশূন্য নিরাকার। তবে জগতের জীবগণের (সাধকের) মনস্তুষ্টির জন্যই তোমার মূর্ত্তি পরিগ্রহ।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

(৮) ভবজন্তু-মূর্ত্তিধরং

জগজ্জীবের মূর্ত্তিধারণ করিয়া তুমি অদ্ভুত লীলা-রস আস্বাদন কর। মধ্যে মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি জীবগণের দেহের অনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ কর। জলচর, বনচর প্রভৃতির মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি হইলেও এবং জীবশ্রেষ্ঠ নরবপুর সদৃশ না হইলেও সব মূর্ত্তিগুলিই অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অলৌকিক, মনোহর—অতএব প্রাণারাম।

অভাব হয় না)। হে ভবরোগনাশন! তুমিই তো জীবের ভববন্ধন ছেদন করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র কর। হে অগতির গতি আমি মহাপাপী—আমাকে উদ্ধার কর। তোমার পাদপদ্ম বিনা এ অধমের আর গতি নাই। ১। সরোরুহ=পদ্ম।

ইতি শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রং সম্পূর্ণঃ।
ওঁ তৎসৎ।
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

(২য় সংখ্যার পর।)

'গু'-কারশ্চ গুণাতীতো রূপাতীতো
'রু'-কারকঃ।
গুণ-রূপ-বিহীনত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥
গুরুগীতা।

'গু'কার গুণাতীতকে বুঝায়, 'রু'কার রূপাতীতকে বুঝায়; এইজন্য রূপগুণবিহীন যে নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহাকেই গুরু শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইতেছে।

যিনি নিজ কৃপাগুণে শিষ্যের মায়া-অন্ধকার নাশ করেন সেই সগুণ ব্রহ্মই গুরু। যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজিত হইয়া কখন কখন নির্গুণ ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মই গুরু। শিষ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন, গুরু সেই অন্ধকারনিবারক তেজ। যেমন আলোকের নিকট অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না তদ্রূপ যে শিষ্যের প্রতি তাঁহার গুরুর প্রভাব পতিত হয় তিনিও আর অজ্ঞানে রহেন না। যেমন অন্ধকার নিবারণের একমাত্র উপায় আলোক, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেবের কৃপাশক্তি বা তেজ। যেমন প্রভাতসমাগম ও অন্ধকার নাশ এককালেই হইয়া থাকে তদ্রূপ শিষ্য-জীবনে গুরুকৃপাপ্রসূত সুপ্রভাত ও অজ্ঞাননাশ এক সঙ্গেই হইয়া থাকে।

এইবার শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যাইবে। ত্রিতাপদগ্ধ সংসারের জীবকুল কাহার পানে তাকাইয়া মুহুর্মুহুঃ বলিতেছে,—"প্রভো! ত্রাণ কর"; শোকমোহাচ্ছন্ন ক্লিষ্টহৃদয়ে ভার বহনে অক্ষম হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে কাহার পানে চাহিয়া জীব বলিতেছে,—"দয়াময় শান্তিবারি বর্ষণ কর;" এ সংসার-মায়া-মরুর-প্রান্তরে তাপদগ্ধ-হৃদয়ে কাহার নিকটে জীব শুষ্ককণ্ঠে তৃষ্ণার জল চাহিতেছে, শান্তি দিতে, সান্ত্বনা করিতে এ জগতে কে আছে? আছেন একজন, তিনিই গুরু। প্রেমিক, প্রেম পিপাসায় মত্ত হইয়া যাঁহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,—জ্ঞানী দিব্য উন্মত্ততায় যাঁহার তত্ত্বে বিভোর রহিয়াছেন, ভক্ত অশ্রুসিক্ত নয়নে যাঁহার উদ্দেশে জোড় করে স্তুতিবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে সেই পরম প্রেমাস্পদ, জ্ঞানঘন, ভক্তবৎসল ভগবানই গুরু। চন্দ্র সূর্য্য অহোরাত্র তাঁহারই আরতি করিয়া ধরা প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুনীলাম্বরে নিশিথিনী তারারত্নমালা পরিয়া তাঁহাকেই বরণ করিতেছে; শারদ গগনের নীলিমায় ভাসিয়া মনোহর সুধাকর তাঁহারই হাসির কিরণ বিলাইতেছে; বায়ু মৃদু মৃদু বহিয়া তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে; শ্যামলাধরণীর তরুরাজি তাঁহারই

উদ্দেশে যেন ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; বিহগকুল কলতানে তাঁহারই গান গাহিতেছে; স্থির হিমাচলনির্ঝরের ঝরঝররবে তাঁহারই মঙ্গলময় গীতির স্ফুরণ হইতেছে, তটিনী তাঁহারই প্রেমে নাচিয়া নাচিয়া সাগর-সম্মিলনে প্রধাবিত হইতেছে; সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া কি এক মহান্ ভাবের ডালি সাজাইয়া প্রকৃতিদেবী তাঁহারই চরণে অর্ঘ্য ঢালিতেছে। সেই বিশ্বপতি, সেই জগদীশ্বর, সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবানই গুরু। তিনিই জীবের প্রতি, আপনার অধম পতিত জীব সন্তানের প্রতি, নিজ কৃপাগুণে প্রসন্ন হইয়া সম্যক্ ভাবে দর্শন দেন, আর সেই দর্শনেই মলিন পাপদগ্ধ জীব অমৃতের অধিকারী হয়। আহা! এ জগতের সকলেই যে তাঁ'রই। যাহার জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি নিয়তই বিধান করিতেছেন। তিনি তাহা কেন করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহা অপেক্ষা জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অধিক আর কেহই নাই। তাঁহার স্নেহ ও দয়া জীবজীবনে নিয়তই বর্ষিত হইতেছে। কি পাপী, কি পুণ্যবান; কি ধনী কি নির্ধন; কি নর কি নারী; কি তির্য্যক, কি কীট, কি পতঙ্গ; কি স্থাবর কি জঙ্গম—যাবতীয় জীব, জন্তু ও পদার্থের প্রতিই নিয়ত তাঁহার দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে। ইহা আমরা ধারণা করিতে পারিনা বটে, কিন্তু তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের এমনি প্রভাব যে, এ সমস্তই এবং ইহা ছাড়া আরও কত কি তাঁহাতে সম্ভব হইতেছে।

তিনি এই জগতে কত স্থানে কত ভাবে স্বয়ং এক হইয়াও নিজ যোগমায়া বলে কত প্রকারে লীলা করিতেছেন; জীব ইহা অনুভব করিলে স্তম্ভিত হন—অবাক্ হন্। তিনি এক, অদ্বিতীয়,সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সত্বাতেই এই জগতের সত্বা।

"সর্ব্বত্রে তিনি ব্যাপিত, সর্ব্বতত্ত্বে বিরাজিত।"
নিত্যগীতি।

"যৎসত্বেন জগৎ সত্যং যৎপ্রকাশেন ভাতিযৎ ॥"
গুরুগীতা।

তাঁহার সত্বাতেই জগতের সত্বা, তাঁহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ।

তিনি ত্রিগুণের আশ্রয় বলিয়া এই জগৎ-প্রপঞ্চে ত্রিগুণের ক্রিয়াও সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; কিন্তু তিনি স্বয়ং ঐ ত্রিগুণে থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥"
গুরুগীতা।

যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, আনন্দময়, পরমসুখদায়ী, একমাত্র জ্ঞানমূর্ত্তি, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ নির্ম্মল, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য,নিত্য, বিমল, অচল, নিরন্তর সাক্ষীস্বরূপ, সমস্তভাবের অতীত ও ত্রিগুণাতীত সেই সদ্গুরু দেবকে নমস্কার। তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা ও কালরূপে সংহর্ত্তা। তিনি আদি, যেহেতু তিনি সকলেরই পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছেন। তিনি অনাদি, তাঁহার পূর্ব্বে কেহই ছিলনা।

"স পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥"
পাতঞ্জল দর্শন।

তিনি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সকলেরই গুরু। কারণ তিনি কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন।

"গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরম দৈবতং ॥"
গুরুগীতা।

গুরু বিশ্বের আদি এবং অনাদি। গুরুই পরম দৈবতা।

তিনি নিজ শক্তি দ্বারা এই বিশ্বের সমস্ত কার্য্যেরই নির্ব্বাহ করিতেছেন। যখন ঐ শক্তি

তাঁহাতে অব্যক্ত, তখন তাঁহার নির্গুণ আখ্যা হইতেছে। শক্তিযোগে তিনিই আবার সগুণ ভাব ধারণ করিতেছেন। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

"নিত্যাখণ্ডো গুরুর্নিত্যঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥"

শ্রীশ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি।

তাঁহাকেই,—

"নিত্যায় নিত্যবোধায় নিত্যজ্ঞানপ্রদায়িনে।
নিত্যানিত্যপ্রবোধায় নিত্যানিত্যগুণাত্মনে।
সর্ব্বায় সর্ব্বরূপায় সর্ব্বেশ্বর! নমস্তুতে ॥"

৩।৬৬।৬৭ রাধাহৃদয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ গুরু নিত্য [ক্ষয়োদয়রহিত] নিত্যজ্ঞানপ্রদ, নিত্যবোধস্বরূপ, নিত্যও অনিত্য উভয়াত্মকবোধস্বরূপ, নিত্য ও অনিত্য উভয়গুণাত্মক পরব্রহ্মস্বরূপ। হে সর্ব্বেশ্বর শ্রীগুরুদেব! তুমিই সর্ব্ব, তুমিই সর্ব্বরূপ—তোমাকে নমস্কার করি। যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীগুরু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"(তিনি) অখণ্ডমণ্ডলাকারবিশ্বে বিরাজিত
শশী, সূর্য্য, হুতাশনে তিনি প্রকাশিত,
তিনি দিব্য জ্ঞানানন্দে, শুদ্ধপ্রেম মকরন্দে,
নির্ব্বিকার ব্রহ্মানন্দ, তিনি নিরঞ্জন (বা নারায়ণ)
ভক্তিভাবে করি তাঁর শ্রীপদ স্মরণ (বা বন্দন)।
সুনীল অম্বরে তিনি, তিনি সমীরণে,
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তিনি, প্রফুল্ল প্রসূনে,
তিনি মোহিনী মায়াতে, অহেতুকী করুণাতে,
সর্ব্বযোগ বিভূতিতে তাঁহার স্ফুরণ,
প্রাণের দেবতা তিনি প্রিয় দরশন ॥"

"জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা তিনি, পরম কারণ,
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য সনাতন,
শ্রুতিতে তিনি কীর্ত্তিত, আছেন অবধারিত,
বেদব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তাঁহার স্ফুরণ,
তাঁহার স্ফুরণ দিব্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।
তাঁহা হইতে স্ফুরিত পুরাণ সকল,
সকল উপপুরাণ সুপ্রেম অমল,
আগম নিগম তন্ত্র, চৈতন্যদায়ক মন্ত্র,
তাঁহা হইতে স্ফুরিত সকল বিধান,
স্ফুরিত সকল স্মৃতি সকল প্রমাণ" ॥

"(তিনি) প্রত্যক্ষপরমদেব অনন্ত মহান" ॥
"(তিনি) অপ্রাকৃত নিরাকার অদ্ভুত সাকার ॥"

"শ্রীগুরু অনন্তদেব, শ্রীগুরু পরম শিব ॥"

(নিত্যগীতি)

"শিব জগদ্গুরু। তিনিই গুরু ব্রহ্ম,
তিনিই গুরু সচ্চিদানন্দ।"

(সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার)

"শ্রীগুরু সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মসনাতন,
চিন্ময় চৈতন্যদেব হরিনারায়ণ ॥"

(নিত্যগীতি)

তিনিই সর্ব্বত্র ব্যাপিত এবং সর্ব্বভূতে বিরাজিত। নিরালম্ব উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বশরীরস্থ চৈতন্য প্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ।"

এস্থলে শ্রীগুরুকে সর্ব্বশরীরস্থ চৈতন্য বলা হইল এবং তিনিই উপাস্য। সেই পরম উপাস্যদেব জীবের প্রতি নিজ অহেতুকী করুণা প্রকাশ জন্য কখন কখন তাহাদেরই মত আকার পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত রাধাহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ তেজোরাশি মিবোজ্জ্বলম্ ॥"

৩।৪০।

অর্থাৎ নির্গুণাত্মক গুরুদেব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ। শুদ্ধ ভক্তদিগের উপাসনার্থ অনুগ্রহ করিয়া বিগ্রহ ধারণ করেন; উজ্জ্বল তেজোরাশি স্বরূপ, স্বকীয় তেজ দ্বারা দশদিককে নিরস্তিমির করিতেছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—

"গুরুঃ স্বয়ং দেহী জনার্দ্দনঃ" ॥ ৮৩। ১৩ ॥

অর্থাৎ স্বয়ং জনার্দ্দন গুরুই দেহ ধারণে দেহী হন।

"নারায়ণশ্চ ভগবান গুরুঃ প্রত্যক্ষ এবচ ॥" ৮৩ ১২ ॥

অর্থাৎ নারায়ণ ভগবানই গুরুরূপে প্রত্যক্ষ হন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"নরাকৃতি পরব্রহ্ম রূপায়াজ্ঞানহারিণে ॥"

ইহাতে বুঝা যায় যে, শ্রীগুরুদেব স্বয়ং পরব্রহ্ম, তিনি নরাকার ধারণ করিয়া শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করেন।

কোন ভক্ত মহাত্মা গাহিয়াছেন,—

"নরাকার পরব্রহ্ম সর্ব্বদেবে বলে যাঁরে।
(গুরু) প্রত্যক্ষ পরম দেবতা
কেন মনন কর না তাঁরে ॥"

তিনিই কখন শিবরূপ ধারণ করিয়া জীবকে পরম জ্ঞান দান করিতেছেন। যথা গুরুতন্ত্রে,—

"গুরুরেকঃ শিবঃ প্রোক্তঃ
সোঽহং দেবি ন সংশয়ঃ ॥"

আবার কখন তিনি প্রকৃতিরূপ ধারণ করিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতেছেন। যথা গুরুতন্ত্রে,—

"গুরুস্ত্বমসি দেবেশি মন্ত্রোঽপি গুরুরুচ্যতে ॥"

তিনিই কৃষ্ণরূপে পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়া পরম প্রেমলীলায় বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই দিব্য কর্ম্মযোগ ও অজ্ঞানান্ধ মানবকে দিব্য-জ্ঞানযোগ এবং পরাভক্তিযোগ দান করিয়াছেন।

"দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং ॥"

তিনিই কখন হরিরূপ, আবার কখন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিতেছেন। যথা নিত্যতন্ত্রে,—

"যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং।"

অগস্ত্য সংহিতায়,—

"অতঃপ্রাগ্‌ গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্‌।"

তিনিই আবার বিষ্ণুরূপ ধারণ করিতেছেন। যথা বিষ্ণুরহস্যে,—

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথা বিষ্ণুং তথা গুরুং।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্‌ যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ ॥"

ক্রমশঃ—

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত।

পারের কাণ্ডারী।

ভাদ্র মাস—জন্মাষ্টমী—শ্রীধাম নবদ্বীপের আম্পুলিয়া পাড়ায় আজ যেন বড় সজীবতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যুবকমণ্ডলী যেন বড়ই ব্যস্ত; কেহ দ্রুত-পদে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে, কেহ কাহাকে ডাকিতেছে, কেহ বা অনুচ্চস্বরে কি পরামর্শ করিতেছে। হর হরিকে ডাকিতেছে, হরি শিবুকে, শিবু কালীকে, কালী ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নিত্যকে ডাকিতেছে। এ বলে উহাকে,—সে বলে তাহাকে,—কেবল ব্যস্ততা; সকলেই আজ্ঞা করিতেছে, পালন করিতে কেহ নাই। কেহ বা এ কখণ্ড কাগজ দৃষ্টে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কি বলিতেছে; সবিশেষ সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম, যাহা—তাহাই।

আর কিছু না—মানুষের এমন একটা বয়স বা সময় আছে যাহা জীবনের উন্নতির

বিষম অন্তরায়, সেই সময় পদস্খলিত না হইলে মানুষ বেশ উন্নত হইতে পারে; কিন্তু প্রায় এইখানে বাধা পায়, সে সময় যৌবনের প্রথম উদ্যম। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ একদল লোক আছেন। ইঁহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি যথেষ্ট আছে; তাস-পাশা খেলার আড্ডা, জিমনাষ্টিক পার্টি, কনসার্ট পার্টি, কুস্তির আড্ডা, সখের যাত্রার দল, লাইব্রেরি, থিয়েটার, অন্ততঃপক্ষে একটা হরিসভা প্রভৃতি কার্য্যে অগ্রণী,—ইঁহারা। ইঁহাদের সম্মুখে যে কাজ পড়িবে তাহা সম্পাদিত হইবেই। শ্রীধাম নবদ্বীপেও এইরূপ যুবকমণ্ডলীর চেষ্টা ও যত্নে একটা সখের দল স্থাপিত হইয়াছে। যাত্রাদলের গায়ক, বাদক, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতির কাজ এই যুবকমণ্ডলীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। স্বনামখ্যাত মহাত্মা ধর্ম্মদাস রায় মহাশয় ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহাই অভিনীত হইবে। অভিনয়ের বিষয় "মারুতি-মিলন।" ভগবান রামচন্দ্রের সহিত ঋষ্যমুখে সুগ্রীবাদির মিলন। আগামী কল্য নন্দোৎসবের দিন এই দল মুড়াগাছা নামক গ্রামে অভিনয়ের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অদ্য ইঁহারা অভিনয় জন্য মুড়াগাছা যাত্রা করিবেন,—তাই এত ব্যস্ততা—ভয়-ভাবনা-মিশ্রিত—আনন্দ-উৎসাহ। যিনি যাহা অভিনয় করিবেন, যে ভাবে বলিতে হইবে, এখনও কেহ কেহ তাহা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপ ব্যস্ততার মধ্যে সকলে সজ্জিত হইতেছেন। ক্রমে যথাসময়ে ইঁহারা সদলবলে সসজ্জ হইয়া মুড়াগাছা যাত্রা করিলেন। তথায় সযত্নে সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসী সকলেই বিশেষ চেষ্টিত ও যত্নবান,—যাহাতে তাঁহাদের গ্রামের নিন্দা না হয়, যাহাতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, যাহাতে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে থাকেন, সে বিষয়ে প্রাণপণ করিতে সকলে প্রস্তুত আছেন। একজনকে একটা কাজ করিতে বলিলে, তাহা সম্পাদন করিতে তিনজন আসিয়া উপস্থিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রামবাসিগণ ভদ্রতা রক্ষার জন্য ও নিন্দার ভয়ে সকল বিষয় সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। বেলা ৪টার সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল; ভালমন্দ উভয়ের মধ্য দিয়া যাত্রার দলের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। অভিনয়ান্তে নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। কেহ বলেন সুগ্রীবের পাঠ ভাল মুখস্থ হয় নাই, লক্ষণ লাজুক, রাম সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিল, হনুমান পণ্ডিত, বাজিয়ের হাত মিষ্ট ইত্যাদি। নানাপ্রকার মতামত চলিতে লাগিল। যাত্রার দলস্থ সকলে বিজয়ী বীরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তাঁহারা সেই রাত্রেই নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিলেন এবং সেই সময়ে সকলে নবদ্বীপের পরপারস্থ ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। কৃষ্ণানবমীর মৃদু জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক ঈষদালোকিত। ভাদ্রমাসের গঙ্গা;—ভগবতী জহ্নুকুমারী সর্ব্বাবয়বসম্পন্না পূর্ণকলেবরা সতেজে সগর্ব্বে অভিমানিনী যুবতীর ন্যায় সাগরাভিমুখে ধাবিতা। চারিদিক নিস্তব্ধ—মধ্যে মধ্যে নিশাবিহারী পক্ষীগণের কণ্ঠস্বর আর গঙ্গাবারির কুলু কুলু ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। দলস্থ সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘাটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নৌকা ও মাঝি পরপারে। মাঝির নাম যদুনাথ। যদুনাথ কোন কোন দিন ঘাটের নিকটস্থ ঘরে রাত্রে থাকে, আবার কোন কোন রাত্রে বাড়ী যায়। আজ কিন্তু যদুনাথ বাড়ী গিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি? উপায়—ডাকা। ভাই রে! আজ এই এক ডাকা, আর সেই এক ডাকা। যে দিন ভবজলধির কূলে বসিয়া তাহার উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হ'তে হ'বে, সেই দিন,—সেই নিরুপায়ের দিনে উপায় একমাত্র ডাকা। এ ডাকা চারিযুগেই আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ডাকের শব্দ বিভিন্ন রূপ। কিন্তু ডাকা আছে। তাই মনকে বলি, মন রে, তোর যে সকল দিকেই নিরুপায়, তোর না আছে ভক্তি—না আছে বিশ্বাস—না আছে নির্ভর, তোর উপায় কেবল ডাকা। ডাকের মত ডাকিতে পারিলে কতক্ষণ তিনি ঢাকা থাকিবেন? তাঁ'র ঢাকা খুলিতে হইলে, ডাকাই প্রশস্ত উপায়। আবার সুবিধা কেমন! ডাকার বিধি—অবিধি নাই—তা' মনেই ডাক আর মুখেই ডাক—শৌচাশৌচ, কালাকাল, জাতিবিচার, স্থানবিচার, পাত্রবিচার বা বয়স বিচার নাই—যে কোন প্রকারে হউক—শ্রদ্ধায়, হেলায় ডাকিলেও ফল। আমার মতে একটু উচ্চৈস্বরে ডাকাই ভাল। কেন না নিত্যধাম বৃন্দাবনে, গোপবধূগণ তাঁ'কে আদর করিয়া 'কালা' বলিয়া ডাকিত। 'কালা'ত' যে শুনিতে পায় কম, তা'কেই বলে! তাই বলি ভাই উচ্চৈস্বরে ডাকাই ভাল। জগদ্বাসী ভাইরে, কে কোথায় আছিস্, আজ একবার বদন ভরিয়া শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাক্ দেখি! তা' হ'লে সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। উপস্থিত গঙ্গা পারের জন্য ডাকা-উপায়ই অবলম্বিত হইল।

সুরধুনী-কূলে বসিয়া সকলেই যদুনাথকে ডাকিতে লাগিল; যাঁ'র যত শক্তি প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কৈ, নাবিক ত' উত্তর দেয় না? ডাকের উপর ডাক—উচ্চ হইতে উচ্চৈস্বরে ডাক—পৃথক পৃথক ডাক—পরিশেষে এককালে, সমস্বরে, ভীষণ শব্দে সকলেই ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু উত্তর দিবে কে? যদুনাথ ত' সেখানে নাই। সে যে আজ বাড়ী গিয়াছে। পারার্থিগণ নিরাশ হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।—নিরুপায়! পরিশেষে প্রাতে পার হওয়াই স্থির হইল। ইঁহাদের মধ্যে অশেষ গুরু-ভক্তি-পরায়ণ পূজ্যপাদ ধর্ম্মদাস রায় মহাশয় ছিলেন। আজ তাঁহার মনোমধ্যে একি ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে; দেখিতেছেন, তিনি যেন ভবজলধির কূলে উপস্থিত। পারের উপায় নাই, তাই আজ যুগল নয়নের ধারা গণ্ডস্থল বহিয়া যাইতেছে। বলিতেছেন,—"কি, আমার পারের প্রতিবন্ধক? আমি যে নিত্য সন্তান!" তাই আজ অভিমানে স্ফুরিতাধর হইয়া দুই বাহু উত্তোলন করিয়া বজ্র-গম্ভীর-স্বরে ডাকিতেছেন, "কোথায় নিত্য-কর্ণধার, পার কর!" একবার—দুইবার ডাক দিতেই আর কি থাকিতে পারেন? অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, নিরুপায়ের উপায়, হতাশের আশা আর কি থাকিতে পারেন? বিপন্নের বন্ধু, ভক্তের পূজনীয়, বিশ্ববাসীর বরণীয় প্রেমিকের অবলম্বন, অগতির গতি আর কি থাকিতে পারেন? তিনি আর কতক্ষণ থাকিবেন? পরপার হইতে মধুমাখা স্বরে উত্তর হইল,—"যাচ্ছি গো—!" দেখিতে দেখিতে নাবিক নৌকা লইয়া উপস্থিত। এ নাবিক সে নাবিক নয়। এ যদুনাথ নাবিক নয়, আজ ভক্তের জন্য স্বয়ং 'যদুনাথ' যদুনাথ-বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। নৌকা তীরপ্রাপ্ত

হইলে, নাবিক লম্ফ দিয়া কূলে উঠিলেন। কেহই নাবিককে লক্ষ্য করিল না। কেবল মাত্র একটী বালক দেখিল, একজন শ্মশ্রুবিশিষ্ট গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া গেলেন। এমন সময় দলস্থ সকলে 'ঐ নৌকা আসিয়াছে' বলিয়া যুগপৎ চীৎকারে দশদিক শব্দিত করতঃ নৌকায় দ্রুতবেগে উঠিতে আরম্ভ করিল। কে কার সংবাদ লয়? যে পারে সেই আগে উঠিল। কোন বৃহৎ নদীতীরস্থ বা গ্রামবাসী পুরুষগণ অল্পাধিক দাঁড় টানিতে, হা'ল ধরিতে ও নৌকা বাহিতে জানে। এখানেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। যুবক মণ্ডলী অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে কেহ হা'ল ধরিল, কেহ কেহ দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। সকলে উঠিলে পর নৌকা খুলিয়া দিয়া আপনারাই বাহিয়া চলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় নাবিকের কেহ খোজ লইল না বা তাহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপনীত হইল। তথায় ভাগিরথীর বেগ অতি প্রখরা। নৌকা কিছুতেই স্থির থাকে না। স্রোতবেগে নৌকা স্থির রাখিতে না পারায় আরোহীগণ সকলেই ভীত হইলেন। তখন মাঝির খোজ পড়িল। "মাঝি কৈ, মাঝি কৈ? নৌকা যে মাঝ গঙ্গায় মারা যায়? মাঝি কৈ হে, শীঘ্র এস।" আর মাঝি,—মাঝি কোথায়! তখন যিনি নৌকার কর্ণধার হইয়াছিলেন, তিনি নৌকার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ণ ধারণ করিয়া স্বীয় আহম্মকির জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই পরস্পরের দোষ দিতে লাগিল। সকলেই বলে—"মাঝি না দেখিয়া নৌকা ছাড়িলে কেন?" প্রথমে দ্বেষাদ্বেষি ক্রমে বচসা, শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম; এ দিকে নৌকার অস্থিরতা ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে- সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। তখন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় মহাশয় সকলকে স্থির হইতে বলিয়া ব্যাকুলপ্রাণে শ্রীগুরুদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের কাতর ডাক শ্রীভগবানের কর্ণে পৌছিল। গঙ্গার ভয়াবহ আবর্ত্ত হইতে নৌকা সহসা দ্রুতবেগে তীরাভিমুখে চলিল। তরণী তটসংলগ্ন হইলে যে যাহার মত লম্ফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং পয়সা দিবার জন্য মাঝির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া সকলে আপন আপন আবাসাভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু ধর্ম্মদাস রায় মহাশয়ের মনে উদিত হইল, আমি কাহাকে ডাকিয়াছিলাম, আর কে'ই বা পার করিল?' পারঘাটের পাটনীর নাম যদুনাথ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'আজ পার করিল কে? এই যদুনাথ কি সেই যদুনাথ?" এই সকল চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য নিজ গৃহে না যাইয়া আমপুলিয়া পাড়া আশ্রমে চলিলেন। ঠাকুর তখন নবদ্বীপের আশ্রমে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাদা আশ্রমে গিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিশার অবসান হইয়া আসিল। ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইলে পর ধর্ম্মদাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লালসায় অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের দ্বারের সম্মুখীন হইলেন, অমনি ভক্তবৎসল করুণাসিন্ধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কৈ পারের পয়সা দাও দেখি।" এই কথা শ্রবণ মাত্র ধর্ম্মদাস দাদার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, অশ্রুধারায় বসনাঞ্চল অভিষিক্ত ও বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া গদগদস্বরে বলিলেন,—

"ত্বমেবস্রষ্টা পাতাচ সংহর্ত্তাচ ত্বমেবহি শরণং নাথ! ত্রাহিমাং দুঃখসঙ্কটাৎ ॥"

"গতির্ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।"

আজ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, কোন দেবতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ; তিনি কাহার আশ্রিত, তাঁহার রক্ষক ও অবলম্বন কে? শুন শুন ভাই, নিত্য-সন্তান! শুন নিত্য-পরিবার! শুন নিত্য-আশ্রিত যে যেখানে আছ, ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী;—

"মেষপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালক থাকে। কোন মেষ বিপথগামী হইলে তিনি তাহাকে প্রকৃত পথে চালান। গুরু শিষ্য পালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মেষপালকের ন্যায় থাকেন। তাহাদের কেহ বিপথগামী হইলে তিনি টেনে এনে প্রকৃত গন্তব্য পথে চালান।"

(সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার।)

ভাই রে, আমাদের সচ্চিৎ গুরু নহেন, সদানন্দ গুরু ও নহেন, আমাদের গুরু শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ গুরু। তিনিই আমাদের রক্ষক ও পরমাশ্রয়।

আহা! কি আশার কথা! তিনি সর্ব্বদা আমাদের নিকট থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান কে আছে? আমাদের উপর তাঁহার কত কৃপা! —আমরা তাঁহার সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, আশ্বাসবাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। আমরা জানি,—আমরা নিঃসংশয়ে জানি তিনি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই,—অন্য ঈশ্বর নাই।

ধর্ম্মদাস দাদা পুনর্ব্বার ভক্তি-গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"হে নিত্য-প্রভু, হে নিত্য সখা, হে নিত্য-পিতা, হে নিত্য-মাতা, হে নিত্য-ধন হে নিত্য নাথ দয়াল। আজ একি লীলা দেখাইলে প্রভু! আমি যে তোমার অযোগ্য সন্তান,—আমার প্রতি এত কৃপা কেন, নাথ? আমি যে আপনা আপনি লজ্জিত হইতেছি। প্রভো! এই হতভাগ্যের জন্য শ্রীকরে ক্ষেপণী ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে আমার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইলে? ধিক্ আমাকে! আমি স্বীয় স্বার্থের জন্য প্রভুকে, প্রাণের প্রিয়তম ধনকে কতই না কষ্ট দিলাম।" এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করতঃ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর সস্নেহ মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মদাদা প্রবুদ্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন,—"আমার এই সৌভাগ্য স্মরণীয় করিবার জন্য আমি আমার ভাইদিগকে একত্রিত করিয়া মহামহোৎসব দিব; আপনি আজ্ঞা করুন। ঠাকুর সম্মতি দিলেন। অমনি ভাই সকল একত্রিত হইয়া পরমানন্দে মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে সকল বিষয় সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল। সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। এবার আমরা

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবোমহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এবং

"ভবসাগরপোতপদদ্বয়যুগং
ভবসাগরনাবিকপারকরম্।
অনুকম্পানিয়ামকমিষ্টসুরং
প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্॥"

বলিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রণামান্তর এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

যত দিন দেহে রহিবে জীবন,
ভুলিনাকো যেন তোমারে;
ও দু'টী চরণ যেন দরশন
পাই সদা হৃদি মাঝারে;
ভাবের প্রসূনে, ভকতি-চন্দনে
যেন ও চরণ দু'খানি,—
পূজিয়ে মানসে, প্রেমের হর্ষে,
মগ্ন থাকি দিন যামিনী।

রসনা আমার, যেন অনিবার,
করে তব নাম কীর্ত্তন;
শ্রুতিযুগ যেন তব কথা বিনা
নাহি করে আন শ্রবণ।
বিষয়ীর সঙ্গ করি পরিহার;
যেন তব ভক্ত মিলনে—
করি সদা আশ; মাগে তব দাস
দীন হীনে রেখ চরণে!

শ্রীকাঙ্গালিকৃষ্ণ দত্ত।

শ্রীভগবানের ভজনা।

ঈশ্বর লইয়া জগতের অস্তিত্ব। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় কেমন করিয়া জীব তাঁহাকে অনুভব ও বিশেষ বিশেষ ভাবে সম্ভোগ করিতে পারে। শ্রীভগবানের সৃষ্টি তত্ত্বে, মায়ার সংযোগেই এই জগৎ সংসারের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মায়াকে অবিদ্যা মায়া বলা হয়—যাহার বলে মানব জগতে আসিয়া ইহাই চির বাসস্থান মনে করে ও যাহার সঙ্গে মায়ার সমস্ত বৃত্তিগুলি অর্থাৎ ছয় রিপু, কামিনী-কাঞ্চন-তৃষ্ণা পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে জাগতিক সুখ দুঃখের ব্যাপারে নিক্ষেপ করে। মহাজনেরা বলিয়া থাকেন এই জাগতিক সুখ দুঃখ উভয়ই বন্ধন।

এই সুখ দুঃখের প্রবর্ত্তক কে? তুমি—না তোমার প্রাক্তন বা মায়া?

তুমি কে? না তুমি একটী জীব, দশবিধ ইন্দ্রিয় ঘটিত সীমার আবরণে প্রস্তুত একটী যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রের একজন যন্ত্রী আছেন—কেন না সেই যন্ত্রী ভিন্ন যন্ত্র চলে না বা বাজে না কিন্তু আমি যন্ত্র মাত্র হইয়া, যন্ত্রীর ন্যায় চলিতে বাসনা করি তজ্জন্য আমার পদে পদে বিপদ সংঘটন হয়। যেমন দাস প্রভুকে স্বীকার না করিলে, তাঁহার আদেশ মত না চলিলে প্রতি পাদবিক্ষেপে সর্ব্বাবস্থায় দুঃখ কষ্ট পায়: এ জগতে যাহা সুখ বলিয়া মনে করা হয় তাহাও এক জাতীয় বিশেষ দুঃখের কারণ। এখন দেখ তুমি শ্রীভগবানের সৃষ্ট পদার্থ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়ায় তুমি এক সুন্দর দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবরূপে পরিণত হইয়াছে।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের প্রাক্তন নিশ্চয়ই দুর্দ্দশাময় এখন এই প্রাক্তন কি? প্রাক্তন অদৃষ্ট ব্যতীত কিছুই নহে। মানব জন্মগ্রহণ করার প্রধান উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শ্রীভগবানের ভজন। নরতনু ভজনের মূল। ভগবান শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন;—

"নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ
যস্মাৎ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্॥

অন্বার্থ—"হে পুত্রগণ, এই মনুষ্যলোকে জীবের নরদেহ বিষ্ঠাভোজী শূকরাদির ভোগ্য সকলের উপযুক্ত নহে। যে তপস্যা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, নরদেহ সেই তপস্যারই যোগ্য।" স্ত্রীসঙ্গে বা রসনাতৃপ্তিতে যে সুখ, শূকরীসঙ্গে ও বিষ্ঠাভোজনে শূকরও তাহা প্রাপ্ত হইতেছে। অপ্রাকৃত ব্রহ্মানন্দ লাভই মনুষ্যদেহের বিশেষত্ব। এজন্য মানব-জীবন লাভ করিয়া ভগবানের ভজনা করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাতেই তীব্র অনুরাগ, তাঁহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাঁহার শ্রীপদে ভক্তি ও পরাপ্রীতিই জীবনের সার্থকতা। জীব এইগুলির কোন একটি লইয়া এ জগতে আসিলে যে ভাবে চালিত হয়, সেই অবস্থাই অতীব সুন্দর।

মায়ার দুই বৃত্তি, বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়া। এই অবিদ্যা মায়া মানবের উপর অধিকার কিরূপে বিস্তার করিল। তুমি জীব হইয়াও নিত্যভগবদ্দাস। শ্রীভগবান নিত্য সুতরাং তাঁহার দাস ও নিত্য।* এ কথা তুমি মুখে স্বীকার না করিলেও অবস্থাবিশেষ তোমাকে স্বীকার করাইবেই করাইবে। এই জগতে আসিয়া দুর্ব্বাসনাময় সংসারের বহু আশা পোষণ করণান্তর এই নিত্য সম্বন্ধ বিস্মরণ হইয়া গিয়াছ সুতরাং অবিদ্যা মায়া তোমার গলায় ফাঁসি দিয়া এ দুরাশাগ্রস্থ সংসাররূপ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

* আত্মা নিত্য। জীবাত্মার, আত্মা নিত্য জীবত্ব অনিত্য। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে 'ত্বং' পদের দ্বারা চৈতন্য অংশকেই লক্ষ্য করা হয়। জীবমাত্রকেই নিত্যভগবদ্দাস বলিলে জীবাত্মার আত্মা অংশকেই কি লক্ষ্য করা হইতেছে?

নিঃ সং।

তুমি যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছ। ভাবিতেছ তোমার এই যাতনা আর যাইবে না। কত কল্পনা করিতেছ—তদ্দণ্ডেই নির্ব্বাপিত হইতেছে। একবার ভুলিয়াও সেই বিপদ-হারী দীনদয়াল মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিতেছ না; একবার ভুলিয়াও সেই সর্ব্বমঙ্গলা অনন্ত-স্নেহদায়িনী মাকে, মনে করিতেছ না। অবিদ্যা মায়া তোমার উপর আরও অধিকার বিস্তার করিতেছে। এই অবিদ্যা মায়ার হাত হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যায় তা'ই শ্রীগীতা বলিতেছেন ;—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

"এই সত্ত্বাদিগুণ বিকারময়ী অলৌকিকী আমার মায়া নিশ্চয়ই দুরত্যয়া। যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন তাঁহারা এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন।"

অবিদ্যা মায়া সংযুক্ত মুগ্ধ জীবের অবস্থা যদ্রূপ সংঘটন হয় তদ্‌সম্বন্ধে গীতা বলেন ;—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবম্ শ্রিতাঃ॥"

পাপপরায়ণ, বিবেকশূন্য নরাধমগণ মায়া-দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আসুরস্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমার ভজনা করে না।

আমরা মূঢ় জীব—আমাদিগের উদ্ধারের উপায় কি? তাঁহার একমাত্র দয়াই আমাদিগের ভবসাগর হইতে উদ্ধারের উপায়।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

অসম্ভব যাহা,—তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা সম্ভব করিতে পারেন। পতিত জীব আমরা আমাদের ইহাই ভরসা।

তাঁহার কৃপাই এই জাগতিক সমস্ত বন্ধন ছেদন করার শাণিত অস্ত্র! আমরা মায়া-বদ্ধ

মুগ্ধ-জীব। আমাদের এমন কোন্ জিনিষ নাই যাহা দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত তোমার আমার একমাত্র সম্বল আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকা ও ক্রন্দন করা। তখন তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তোমাকে নিশ্চয়ই কোলে করিবেন। তিনি যদি তোমাকে কোলে না লইতেন তাহা হইলে কি তোমার এই দুর্দ্দশাযুক্ত বিপদ যাইত? কখনই নহে।

দয়া করা তাঁহার স্বভাব, তিনি দয়া না করিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তিনি দয়া না করিলে আমরা আমাদের কোন অবস্থা লাভ করিতে পারি না। তাই তাঁহার একমাত্র দয়া দ্বারা আমরা সমস্ত জিনিষ লাভ করিয়া থাকি। তিনি জীবকে দয়া করার জন্য অযাচিতভাবে প্রতি দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকায় যোগাচার্য্য ভগবান শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—

"তাঁহার দয়ার সীমা নাই। তাঁহার যে দয়া তাহারই নির্হেতুত্ব আছে। জীবের দয়ার হেতু আছে।"

কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ, সর্ব্বদা বিষয় বাসনায় মত্ত হইয়া একবারও তাঁহাকে আপনার প্রাণের জিনিষ বলিয়া মনে করি না। তাঁহার কত দয়া তাহা দেখাইবার জন্য তিনি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে একটী গান রচনা করিয়াছেন, যথা:—

"হরিকে অমনি পাওয়া যায়।
তাঁরে ডাক্‌লে পরে রইতে নারে,
রাখেন তিনি রাঙ্গা পায়॥
সে সবার তরে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে;
সম্পদেতে ভুলেও কেউ ডাকে না তাঁ'রে॥
তাঁ'র নাই অভিমান, নাই অপমান,
নামে পাপী তরে যায়॥"

তাঁহার নাম ও তিনি অভেদ। এই নামাশ্রয়ে নামাভাসে পাপ তাপ সমস্তই চলিয়া যায়—তা ছাড়া তাঁহার মধুময় নাম সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ঘরে বসিয়া তোমার কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে নাম আশ্রয় কর, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল পাত্র নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

পতিতপাবন অনাথ শরণ দীন দয়াল শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাই পতিত কলিহত জীবের জন্য বলিয়াছেন ও তিনি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হরের্ণাম অর্থাৎ হরির নাম। হরি শব্দ ব্রহ্মবাচক। এই জন্য হরের্ণাম বলিলে ব্রহ্মের সকল নামকেই বুঝায়। শিব, কালী, রাম, রাধা, কৃষ্ণ, দুর্গা, পরমাত্মা, গড, আল্লা সকল নামই এক হরির।

প্রথমে নামে জীবন্মুক্তি অর্থাৎ পাপ, তাপ, রোগ, শোক সব দূরে যায়; পরে এই নামের গুণে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয়। এই ঘোর কলিকালে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে তাঁহাকে সহজে লাভ করা যায়। আবার উচ্চ করিয়া নাম সংকীর্ত্তনের কত ফল দেখ; সংকীর্ত্তনকারী নিজেত উদ্ধার হইয়াই যান—তা' ছাড়া এমন কি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত তরিয়া যায়।

"উচ্চৈঃ শতগুণাধিকম্।"

নাম নাম্নী অভেদ। বাইবেলও বলেন,—"In the begining there is name, the name is God and in the last the name remains." এই অভেদ জ্ঞান লাভ হইলে নাম গ্রহণও যাহা, নাম্নীকে এক ভাবে লাভও তাহা। কলিমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"
১২।৩।৫১।

হে রাজন্ কলি দোষের আকর হইলেও তাহার এক মহৎ গুণ এই যে, মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন মাত্রে মুক্তবন্ধন হইয়া পরম পুরুষকে লাভ করে।

সাধক কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া যখন অমৃতময়ের একবিন্দু অমৃত আস্বাদন করে, তখন প্রাণ আরও সুধা আহরণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পায়। সে তখন—

"মচ্চিত্তাঃ মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ॥"

এই ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হয়।

তখন সে সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকেই ভজনা করে। সে ভজনা কিরূপ না অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় প্রীতি মিশ্রিত। তিনি পূর্ণ প্রেমময় তাঁহাকে তীব্র অনুরাগের সহিত প্রীতি দ্বারা ভজনা করিলে, তাহার ফলে অবিদ্যা মায়া রাক্ষসী ও দূরে পলায়ন করেই তাহা ব্যতীত অতি মনোরম বুদ্ধি যোগ লাভে বিদ্যামায়ার পূর্ণ সংযোগ সম্যক প্রকারে সংঘটন হইয়া তাঁহাকেই লাভ হয়। তখন জীবন মধুময় হয়। সে তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছু চাহে না—সে তাঁহাতেই মজিয়া থাকে—আর তাঁহাকে না হইলে বাঁচে না।

নিত্যপদাশ্রিত শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

সংসার চিত্র

(বালকের রচনা)

এই সংসার দেখিতে ঠিক যেন একটি মাকাল ফল। মাকাল ফল দেখিতে যেমন সুন্দর: সংসার দেখিতে ঠিক সেইরূপ। যোগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন,—

বাহ্য দর্শনে সংসার অতি সুন্দর ও মনোহর। সাংসারিক-বহির্দৃশ্য অধিক চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু অন্তর, পারে না।" *

মাকাল ফল দেখিলেই যেমন সেই ফলটার উপর লোভ জন্মায় ও সেই ফলটী পাড়িয়া লইতে ইচ্ছা হয়; যখন ঐ ফলটী পাড়িয়া লওয়া হয় তখন মনে হয় কি সুন্দর ফলটীই না পাইলাম। সেই নব অনুরাগে কত যত্ন সহ কারে তুলিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা আর বলিবার নহে, সেইরূপ যখন কেহ সংসাররূপ মাকাল ফলটী লাভ করে তখন

* "সংসার কেমন যেমন আমড়া। শস্যের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল আঁটী আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।"
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। নিঃ সঃ।

সে মনে করে, ভগবান কি সুন্দর দ্রব্যই না আমাকে প্রদান করিলেন! এমন কি তুমি সেই ফল পাইয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলে, তখন একবার ভাবিয়া দেখিলে না যে ঐ ফলটীর মধ্যে কি আছে ভাঙ্গিয়া দেখি। কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ ফলটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তুমি দেখিলে যে, ঐ ফলটীর মধ্যে বিড়ালের বিষ্ঠার মতন একরূপ পদার্থ রহিয়াছে। তখন তাহা দেখিয়া মনে এত ঘৃণা বোধ ও কষ্ট হইতে লাগিল যে তোমার স্নান করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। সংসারও ঠিক ঐরূপ মাকাল ফলের মতন। তাহার উপরে অতি সুন্দর সুখের রং মাখান কিন্তু ভিতর দুঃখরূপ বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। † গুরু কৃপায় জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই সংসাররূপ ফল ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সে ভক্তি গঙ্গায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। নিত্য সেবক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ। (কালো)

কে আমার? *

আমি কা'র কে আমার—মায়ার স্বপন।
পান্থশালা এ সংসারে দু'দিন মিলন ॥
স্বপ্নপ্রায় এ জীবন, স্বপ্নে ভ্রান্তি দরশন,
মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গে হোলে দিব্য উদ্বোধন।
দিবানিশি নাহি শান্তি, আমি আমার এ ভ্রান্তি,
হায় মোহ তমঃ নাশ হবে কি কখন!
ভাই বন্ধু আদি যত, যন্ত্রণা দিতেছে কত,
মায়ার নিগড়ে বাঁধি, যখন তখন।
আপনঃস্বার্থের তরে, সবাই আদর করে,
করে তা'রা সুধু নিজ স্বার্থ অন্বেষণ।
স্বর্ণ শিকলি বাঁধা, বিষম মোহের ধাঁধা,
বন্ধনেরে জ্ঞান করে সুখের কারণ।
আমার আমার করি, মিছে সদা মরে ঘুরি',
এ 'আমার' চিরদিন রবে কি কখন?
তবু এ পরাণ মন, দিবানিশি অনুক্ষণ,
কা'র বা সুখের লাগি' ভাবে অকারণ।
গৃধিনীর পক্ষছায়, মায়াময় এ ধরায়
বিশ্রাম করিবে কায়া শ্মশানে যখন,
দারাসুত বন্ধু জন, প্রাণসম প্রিয়ধন
ভাব ভাই কোথা সব রহিবে তখন!
গুরুপদ কর সার, এ সংসার কারাগার,
অনিত্য সম্বন্ধ সব বিষম বন্ধন।
শ্রীনিত্যগোপাল সত্য, অনাদি পুরুষ নিত্য
নিরঞ্জন অবধূত তিনি নারায়ণ।
পতিত জীবের গতি, তিনি ত্রিভুবন পতি,
প্রাণারাম প্রিয়তম ভুবনমোহন।
আমি তা'র সে আমার, এই জ্ঞান সর্ব্বসার,
অনিত্য সম্বন্ধ যত, দুঃখের কারণ।
সম্বন্ধ তাঁহার সনে, ঘুচিবে না কোন দিনে,
সেই নিত্যযোগ নিত্যসুখের সদন।

শ্রীমহেশ্বরানন্দ অবধূত।

† "সকল দর্শনকারেরই মত এই যে, সংসার দুঃখের আলয়। এখানে যতটুকু সুখ আছে তাহা যে সুধু ক্ষণস্থায়ী এমন নহে, তাহা দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র। গীতার মতেও সংসার ক্ষণভঙ্গুর ও দুঃখের নিলয়।
'অনিত্য মসুখং লোকমিমং ॥ ৯।৩
'মৃত্যু-সংসার-সাগর।' ১২।৭"
'মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।' ৯।৩"
গীতায় ঈশ্বরবাদ। নিঃ, সঃ।

* মুলতান——আড়া।

উমা।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লীতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লোকটী শান্ত, শিষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ। যদিও অর্থের হিসাবে তিনি গরীব ছিলেন কিন্তু মা জগদম্বা তাঁহাকে সন্তোষরূপ পরমরত্ন দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পরিজনের মধ্যে ব্রাহ্মণী ও একটী কন্যা। মহাষ্টমীর দিন কন্যাটী ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ব্রাহ্মণ মা জগদম্বার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। কন্যার নাম উমাসুন্দরী। যথাকালে উমা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বিবাহের জন্য বরের খোঁজ করা হইতে লাগিল। উমা স্বভাব-সুন্দরী হইলেও দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে ভাল বর কেমন করিয়া মিলিবে এই চিন্তা সর্ব্বক্ষণই ব্রাহ্মণের মনে উদিত হইত ও সেই ক্ষোভে তিনি নিজ দারিদ্র্যজীবনকে ধিক্কার দিতেন। হায় ব্রাহ্মণ মা তোমায় যে প্রেমধনে ধনী করিয়াছেন তোমার অন্য ধনে কি প্রয়োজন? তাই তোমার ভাবনাতে মা সর্ব্বমঙ্গলারও ভাবনা উপস্থিত। লোকে বলে ঘটনা ঘটিল। ঘটনা সব কি আর অমনি ঘটে? সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর এ সবই লীলা। একটী বড় লোকের ঘরের ছেলের জন্য ঘটকেরা পাত্রী খুঁজিতে আসিল। আর ব্রাহ্মণকে দূরে যাইতে হইল না। ঘরে বসিয়াই বরের খোঁজ মিলিল। সেই স্বভাব সুন্দরী উমাসুন্দরীর বিবাহ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন যেন মা জগদম্বা তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন এ কথা কি হয়? আবার আর এক রাত্রে মা ঐ স্বপ্নই দিলেন।

বঙ্গে শরৎকাল আসিল। বর্ষার আকাশের ঘনঘটা সরিয়া গেল। সুন্দর নীলিম গগনে তপন হাসিল। মায়ের আগমনের জন্য ধরিত্রী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সকলেরই মনে হইল এইবার পূজা আসিতেছে। ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পূজার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পাঁচটী টাকা সংগৃহীত হইল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়াই পূজা করিবেন স্থির করিলেন। কুম্ভকারের বাড়ী যাইয়া প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। কুম্ভকারকে বলিলেন "বাপুহে আমার পাঁচটী টাকা সম্বল, এ দিয়ে সব কর্ত্তে হবে। আমার ছোট ঘর তুমি আমায় ছোট একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দাও।"

কুম্ভকার বলিল,—"ঠাকুর মশাই আপনি কি খেপেছেন, পাঁচ টাকায় পূজো হয়, এও কি সম্ভব?"

ব্রা। "তা' যাই হোক্ তুমি বাপু আমায় একখানি প্রতিমা গড়িয়ে দাও।"

অবশেষে কুম্ভকার বিনামূল্যে একখানি প্রতিমা গড়াইয়া দিতে রাজি হইল।

যথাসম্ভব পূজার যোগাড় হইতে লাগিল। দৈববশে কোন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণী পূজার কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিলেন না। এখন উমাসুন্দরী না আসিলে পূজার আয়োজন করে কে? কিন্তু উমাসুন্দরীর শ্বশুরালয়ে দুর্গা পূজা—তা'তে আবার তাঁহারা বড় লোক। উমার পিত্রালয়ে আসা অসম্ভব! অনেক ভাবিলেন শেষে কন্যা আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। উমার শ্বশুরালয় প্রায় দুই ক্রোশ পথ ব্যবধান। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ উমার শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। উমা সুন্দরী

পিতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে কি হইলেন তাহা আমি বলিতে পারিব না। কেন না তাহা অব্যক্ত। যে ক্রোড়ে শৈশবের ধূলামাখা গায়ে কত আদর পাইয়াছেন, যে ক্রোড়ে বসিয়া কত আবদারের কত ভাষা কহিয়াছেন, যাঁহার মুখ না দেখিলে জগৎ আনন্দময় বোধ হইত না উমার আজ সেই পিতা আসিয়াছেন। বড় মানুষের বউ কিন্তু বাবার কাছে ত সে সেই আদরের গরীব-ব্রাহ্মণের মেয়ে। উমার প্রাণ ছটফট্ করিতে লাগিল—কতক্ষণে পিতার দর্শন পাইবে। কিন্তু সে'টী হঠাৎ হ'ব'র যো নেই। ব্রাহ্মণের আদর অভ্যর্থনার কোন ক্রটী হইল না; কিন্তু আসল কথার কি? সে দিকে ত' কোন সুবিধাই দেখা যাইতেছে না। উমার সহিত সাক্ষাৎ: হইল। বাল্য সখী, বাল্য জীবন ও সেই জীবনের সহচর পিতা, মাতা যে নারীর কত আদরের সামগ্রী তাহা পুরুষ মানুষ বুঝিতে পারে না। এ জন্যও বটে আর বড় মানুষের বাড়ী পূজা সেজন্যও বটে বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষেরা উমাকে কিছুতেই সে সময় যাইতে অনুমতি দিলেন না। উমা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ শাবকের ন্যায় কাতরভাবে: পিতার গলা ধরিয়া অনেক কাঁদিল। ব্রাহ্মণও কাঁদিল। শেষে আর কি হইবে? হতাশ হইয়া ব্রাহ্মণ নিজ গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন কেহই নাই। আবার যাইতে যাইতে শুনিলেন সেই নূপুরধ্বনি! মায়ের আমার পায়ে নূপুর, হাতে শাকা, মুখে হাসি। মা যে এলোকেশী। প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন সময় পশ্চাৎদিকে "বাবা বাবা" এই শব্দটী শুনিতে পাইলেন। ফিরিয়া দেখেন আলুথালু বেশা আলুলায়িতকুন্তলা উমা ছুটিয়া আসিতেছে আর সুন্দর শাঁখা পরা সোনার হাত দু'খানি তুলিয়া বলিতেছে "বাবা আমি যাব।" ব্রাহ্মণ কন্যার ঈদৃশ ব্যবহারে ভীত, দুঃখিত, ক্রুদ্ধ ও আনন্দিত হইলেন। ভীত ও দুঃখিত পাছে কেহ উমার নামে অপবাদ করে। ক্রুদ্ধ এই হঠকারিতায় আর আনন্দ উমার মুখশশী দর্শনে। ব্রাহ্মণ দেখিলেন উমার অঙ্গ হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। অঙ্গ সৌষ্টব কান্তিপূর্ণ। উমা যেন একেবারে নূতন উমা হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের বড়ই আনন্দ হইল, ভাবিল, ভাল খায় দায় তাই এমন হইয়াছে। হায় স্নেহ, ঐশ্বর্য্যের বড়াই তোমার কাছে হার মানিয়াছে। তা স্নেহ ত হিসাবের জিনিষ নয়। মেয়েকে পাইয়া পিতার আর সব যুক্তি ভাসিয়া গেল। উমা যুক্তি দেখাইয়া বলিল,—"আমি সকলকে বলিয়া আসিয়াছি।"

উমা-বাড়ীতে পৌঁছিয়া পূজার সমস্ত আয়োজন করিল। ষষ্ঠী তিথিতে ব্রাহ্মণ প্রতিমা আনিতে গেলেন। কিন্তু এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। কুম্ভকারপত্নী প্রতিমার গঠন ও সৌন্দর্য্য দর্শনে নিজেই সেখানি রাখিবার ইচ্ছা করিল। ব্রাহ্মণও প্রতিমা লইবার জন্য কৃত সংকল্প। এই লইয়া কুম্ভকার ও তৎপত্নীতে বিষম কলহ উপস্থিত হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণের আগ্রহ ও স্বামীর দৈন্য দর্শনে কুম্ভকার পত্নী স্বীকৃতা হইল। ব্রাহ্মণ প্রতিমা লইয়া আসিলেন।

দুর্গাপূজার সপ্তমী তিথি। উমা বলিল "বাবা তুমি গ্রামের সব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া এস।"

ব্রা। তুই বলিস্ কি সেও কি সম্ভব হয়?

উমা। বাবা তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তাহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত আমি ক'র্ব্ব।

তবে রাগ কোরে আমায় অযথা দুর্ব্বাক্য বোল্লে আমি কিন্তু চোলে যাব "

যাহা হউক ব্রাহ্মণ কন্যার কথানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাই করিলেন। যথাকালে পূজারম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের এই বাতুলের ন্যায় উদ্যোগে গ্রামের অধিকাংশ লোকই উপহাস করিতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণের ভ্রূক্ষেপ নাই! সরলবিশ্বাসীর এইরূপ স্বভাবই বটে। ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ একেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইবেন, তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে কি করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন এই ভাবিয়া ব্যাকুল তাহার পর রন্ধনশালায় গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রোষভরে বলিলেন "মাকে এই সামান্য ভোগ লাগাইয়া এত লোককে কি করিয়া প্রসাদ দিবি। তুই আমার মুখ হাঁসালি।" উমা "বাবা তোমার প্রসাদে এত অবিশ্বাস কেন? মায়ের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমি আবার রাগ কোরে যদি আমায় কিছু বল ত আমি এখনই চ'লে যাব।" উমা চলিয়া গেলে সব দিক অন্ধকার। নিরুপায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ সকাতরে অশ্রুনয়নে নিরুপায়ের উপায় মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রতিমা দর্শনে সকলেই একবাক্যে কহিলেন তাঁহারা জীবনে এমন প্রতিমা কখন দর্শন করেন নাই। মা যেন সাক্ষাৎ বিরাজিতা। ভোজনের জন্য উমা আসন ও পত্র বিস্তার করিতে ব্রাহ্মণকে কহিলেন। দু'দশজন প্রতিবাসী সহায় হইল। কেহ কেহ বা উপহাস ছলে মৃদু মৃদু হাস্য করিল। হায় সেই সব পাষাণ হৃদয় গলাইবার জন্যই ত' মায়ের আজ এই খেলা। উমা ব্রাহ্মণের হস্তে একটী অন্নপূর্ণ পাত্র ছিল। তদ্দ্বারা বহুলোকের পত্রে অন্ন পরিবেশন করিয়াও পাত্র পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ রহিল। হায়! মহামায়ার মায়া—ব্রাহ্মণের সে দিকে লক্ষ্যই নাই। অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি দ্বারাও ঐরূপে অল্প দ্রব্যে প্রত্যেকেরই তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন নির্ব্বাহ হইল। পাষণ্ড যাহারা উপহাস করিয়াছিল ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাহারাই আবার পূজায় যোগদান করিল। দুষ্কৃতির বিনাশ, দুষ্কৃতের বিনাশ, সাধুর পরিত্রাণ মায়ের আমার অনন্ত লীলা। লীলাময়ি! শুভঙ্করি! ভক্ত, প্রেমিক যে তোমার বড় আদরের ধন তাই তাহাদের লইয়াই তোমার যত খেলা। বিজয়া দশমী আসিল। আজ মা পান্থাভোগ পাইয়া শিব সঙ্গে শিবলোকে যাইবেন। মায়ের আজ বড় তাড়াতাড়ি। তাই ব্রাহ্মণ যখন পান্থা ভোগ লাগাইয়াছেন তখন দেখিতে পাইলেন স্বীয় কন্যা উমাসুন্দরী সেই অন্ন ভোজন করিতেছে। তিনি একেবারে রোষভরে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"পোড়ারমুখি তুই আমার ধর্ম্মনাশ করলি—তুই দূর হ।" তখন উমা হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল "বাবা তবে যাই"। ব্রাহ্মণ বলিল—"যা—"। এ দিকে তিনি প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য উদ্যোগ করিয়া তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তারপর মেয়েটীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। 'আহা! না খাইয়া উমা আমার কোথায় চলিয়া গেল।' ব্রাহ্মণ ভাবিয়া স্থির করিলেন উমা বোধ হয় উন্মাদ রোগগ্রস্থ হইয়াছে নতুবা অমন শান্ত মেয়ের এ সব ব্যবহার কেন হইবে? প্রথমতঃ এই অল্প আয়োজনে বিরাট ব্যাপার নির্ব্বাহ—তাহাত জগদম্বার কৃপায় সম্পন্ন হইল। তারপর দেবীর অন্ন নিজেই ভক্ষণ করিল ইহা স্পষ্টই মস্তিষ্কের বিকার। বড়ই দুঃখ হইল। অমন সোণার মেয়ে—তা'র এই হইল। উমা কোথায়

গেল? ভাবিয়া দেখিলেন শ্বশুরালয়ে যাইবারই সম্ভব। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া উমাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তথায় উমার শ্বশুর মহাশয় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও ভবিষ্যতে যে উমাকে যাইতে দিবেন এ কথাও বলিলেন। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন বৈবাহিক মহাশয় রহস্য করিতেছেন। তারপর উমার সহিত সাক্ষাৎ। আজ এ' উমা দর্শনেই ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। কেমন একটা ধোকা লাগিল। তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই অমন কোরে চোলে এলি কেন?" উমা —"কি বলছ বাবা আমি ত যাইনি।" ব্রা—তা' আমার উপর কিরাগ কর্ত্তে হয় মা?" উমা— বাবা আমি তোমায় ছুঁয়ে শপথ কোরে বল্‌ছি আমি যাই নি।" ব্রাহ্মণ যাহা অনুমান করিতেছিলেন দেখিলেন তাহাই সত্য। শরীর কণ্টকিত হইল। আবেগে দুই চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। শরীর কম্পিত হইল—ব্রাহ্মণ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেক যত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"হায় আমি যাকে পাইয়াও নিজদোষে হারাইলাম। ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না, ভালমুখে কথাও বলিলাম না। শেষে কিনা রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম। হায়! মা আমার না খাইয়াই চলিয়া গেল! মা জগদম্বে! কেনই বা তুই এমন কোরে এলি আর কেনই বা তুই তোর মায়া দিয়ে চিন্‌তে দিলি না। মা আর কি দেখতে পাব? আর কি সেই মধুর মুখে বাবা ডাক শুনতে পাব?" এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া উমার সহিত ব্রাহ্মণ নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণীকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন তিনজনে মিলিয়া পূজা-মণ্ডপে যাইয়া বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাই বলিতে হয়,—

"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী"।

ওঁ তৎসৎ।

কাঙ্গাল।

দোললীলা বা বস‌ন্তোৎসব তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শঙ্খচূড় এই শঙ্খচূড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শঙ্খচূড় গোলোকের সুদামা নামক গোপবালক, শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ্ সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণব তোষণীতে', শ্রীজীব গোস্বামী 'ক্রমসন্দর্ভে' এবং শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'সারার্থ দর্শিনীতে সে লীলাকে * **হোলিকা** **লীলা** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহার সহিত ভাগবতোক্ত শঙ্খচূড় বধলীলা সংশ্লিষ্ট। হোরিকালীলা বা হোলিলীলা **দোল-লীলারই** নামান্তর এবং এই শঙ্খচূড় ভবিষ্যপুরাণে মেড্রাসুর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবেন। ইহাই সুধীবৃন্দের অনুমান এবং এই মেড্রাসুর বধের অনুসারে দোললীলাতে

---

* "শারদীং রাসলীলাং বর্ণয়িত্বা **হোলিকা-গান-লীলাং** বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং শিবরাত্রি-যাত্রামাহ।" সারার্থ দর্শিন্যাং।

'মেড়াপোড়া' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় অবগত হওয়া মানুষীশক্তির সীমার অতীত। তাঁহারা শব্দ সমূহের মুখ্য অর্থাৎ সাধারণ অর্থ ছাড়িয়া গৌণ-অর্থ কল্পনা (ক) করাকে অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ যাহাতে হৃদয়ে কলুষিত ভাবসমূহ বিকশিত হইবার অবসর না পায় তৎপ্রতিও তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ অতত্ত্বদর্শী স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহারা কোনও ভাব আবৃত করিয়া রাখিবেন ইহা অসমীচীন নহে বরং যুক্তিযুক্ত। 'মেঢ্র" শব্দের যাহা সাধারণ অর্থ এবং মেষগণের যে প্রকৃতি এইকালে প্রকাশ পায় তাহাতে 'মেঢ্র' বা 'মেষ' শব্দে কাম প্রবৃত্তি এবং উহার প্রতিপালিকা বুড়ীটী অবিদ্যা বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। * অতএব এই বুড়ীরঘর পোড়ান ভূতশুদ্ধি বা অঘমর্ষণের দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন অগ্নি জ্বালাইয়া বায়ুশুদ্ধ করা অথবা আবির মাখিয়া বসন্ত রোগাদির ভয় নিবারণ করা প্রভৃতি অবান্তর লক্ষ্য হইতে পারে।

হিন্দুদিগের দৈনন্দিন প্রত্যেক কর্ম্ম যেরূপ ধর্ম্মের সহিত অনুস্যূত, তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও সেইরূপ সাধনার অঙ্গীভূত। শ্রীভগবানের দোললীলা দর্শন করিতে হইলে তদনুরূপ অধিকারী হওয়া আবশ্যক এবং তদনুরূপ ইন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন। তিনি বা তাঁহার লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। দৃশ্যদর্শনে যেমন চক্ষুর এবং শব্দশ্রবণে কর্ণের প্রয়োজন, শ্রীভগবানের লীলাবলী অবলোকন করিতেও তেমন শুদ্ধ নিষ্কাম চিত্তের আবশ্যক। সুদৃশ্য পদার্থ কর্ণের বা সুগন্ধি পদার্থ রসনার নিকট ধরিলে যেমন উহাদের গুণের উপলব্ধি হয় না তদ্রূপ জ্ঞানানন্দময়ের চিদানন্দময়ী লীলাকেলিও সকাম চিত্তে প্রতিফলিত

(ক) ভগবান নিত্য। তাঁহার চিন্ময়ী লীলাও নিত্যা। লীলার আধ্যাত্মিক (?) ব্যাখ্যা আমার অভিপ্রায় নহে। তবে লীলাতত্ত্ব আধ্যাত্মিক (?) গণের জন্য এই গৌণী ব্যাখ্যার অবতারণা। লেখক।

* মেঢ্রাসুর বা শঙ্খচূড়কে কামরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইদানীং অনেকেই লীলাতত্ত্বের ঐরূপ বৈজ্ঞানিক গৌণ-ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পান। লেখক বলিতেছেন এই শঙ্খচূড়ই কাম। শঙ্খচূড়ই গোপীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। যখন ভগবান রাম ও কৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া লীলা করিতেছিলেন তখন—

"গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৪।২৪

অস্যার্থ—গোপীগণ সেই রামকৃষ্ণের কর্ণ-মন-রসায়ন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহারা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। অজ্ঞাতসারে দুকূল ও কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়িল।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ পরম ভাবে ভাবিতা গোপীগণকে মেঢ্রাসুর বা শঙ্খাসুর রূপ কাম আক্রমণ করিবে ইহা অতি অসম্ভব। শ্রীভগবানের দর্শনেই নিষ্কাম ভাব প্রাপ্তি হয়। তাঁহার লীলা সহচরিগণকে কামে আক্রমণ করিবে ইহা অতি অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই যে কি অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ২১শ অধ্যায় পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। আমরা লেখকের বৈজ্ঞানিক-তথ্যের শাস্ত্রানুগত্য পাইলাম না। নিঃ সং।

হয় না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন—মানব, যদি অপ্রাকৃত মদনমোহন সেই জ্ঞানানন্দময় বৃন্দাবন-চন্দ্রের লীলা-সমুদ্রের তীরাভিমুখী হইতে চাও, যদি অশেষ রসসাগর সেই পরম প্রেমসম্পৎ শ্রীভগবানের হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণোদ্ভাসিত প্রশান্ত-লীলা সমুদ্রের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে ইচ্ছা কর, যদি জগদেক-শরণ নিখিল তত্ত্বার্ণব শ্রীভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চাও—তবে প্রথমে 'মেঢ্র' জয় কর, যেষ প্রকৃতি পুড়াইয়া ভস্ম কর, অবিদ্যার অধিকার হইতে মুক্ত হও, তবে অগ্রসর হইও। কাম-মল-কলুষিত, বিষয়-বিষ-দূষিত-চিত্ত লইয়া অথবা সামান্য নায়ক-নায়িকার অভিনয়ের ভাব লইয়া এই অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলা রসের আস্বাদন করিতে যাইও না। আসুরী প্রকৃতি, মধুর লীলার কি বুঝিবে? তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—"শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" বেদ গান করিতেছেন,—"মা শিশ্ন দেবাঃ।" *

যত দিন পরমাণুতে পরমাণুতে আকর্ষণ থাকিবে, যত দিন সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল সূর্য্যদেব থাকিবেন, ততদিন ইঁহারা দোললীলার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন। যখন সমস্ত বিশ্ব এক মহান্ কেন্দ্র-আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবানে প্রবেশ করিবে—যখন কেহ দেখিবার বুঝিবার থাকিবে না, তখনও তিনি দুলিবেন। দোলাই তাঁহার স্বভাব। তিনি শচীর দুলাল, তিনি যশোদার দুলাল, তিনি আবার নন্দদুলাল।

শ্রীপুণ্ডরিকাক্ষ ব্রতরত্ন।

শ্রীগুরু ভজনা

ভজ গুরু অনুপম।
প্রাণারাম প্রিয়তম॥
ভজ শুদ্ধপ্রেমানন্দে, শ্রীগুরুসচ্চিদানন্দে,
দিবানিশি জপ তাঁ'র মধুর শ্রীনাম॥

ধ্যানযোগে ধ্যান কর, হৃদে তাঁ'রে নিরন্তর
তাহাতে হইবে মহামায়ার বিরাম॥
(নিত্যশুদ্ধ নিরুপম তাঁ'র দিব্য প্রেম॥)

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

তিনিত্ব তুমিত্ব দ্বৈত এবে তিরোধান।
'অহং ব্রহ্মাস্মি' তত্ত্বের হ'তেছে স্ফুরণ॥
তিনি তুমি ভেদ শূন্য, কেহ নাই আমি ভিন্ন
একত্বে বহুত্ব এই আছে বিদ্যমান॥

আছে বিবিধ প্রকার, স্বর্ণে স্বর্ণ অলঙ্কার,
সকলই স্বর্ণ বিকাশ হয় নির্ব্বাচন॥
রূপেগুণে বিভিন্নতা, বিকাশে বহুর কথা,
আত্মজ্ঞানে একতত্ত্ব হয় নিরূপণ॥
(আত্মতত্ত্বজ্ঞানে হয় এক নিরূপণ)

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

C,f. * সামবেদ।—'শিশ্নেন'—উপস্থেন, 'দিব্যান্ত'—ক্রীড়ন্তি; ইতি "শিশ্নদেবাঃ" অব্রহ্মচারিণঃ। সম্পাদক।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্র ।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ। { ৫ম সংখ্যা।

গুরু ও গুরু-মাহাত্ম্য।

সদা ধ্যান কর গুরুদেবের মূরতি,
শ্রীগুরু সচ্চিদানন্দ, জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ,
সহস্রদলকমলে তাঁহার বসতি।
মুক্তির কারণ গুরু কৃপাময় কল্পতরু,
শ্রীগুরু চরণে আছে অমলা ভকতি!
গুরুরাজ মহামন্ত্রে; আছে যার মতি,
পেয়েছে সেজন কত অদ্ভুত বিভূতি।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত
জ্ঞানানন্দ দেবের
উপদেশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সুষুপ্তি-অবস্থায় আমাতে গুণ-কর্ম্ম সকল থাকে। সে অবস্থায় তাহারা আমাতে অব্যক্ত-ভাবে থাকে বলিয়া সে অবস্থায় আমি নির্গুণ নিক্রিয় হই। সুষুপ্তি-অবস্থায় আমি কিছুই বুঝিনা; সে অবস্থায় আমার নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝি না। জাগরণে নিজের অস্তিত্ব বোধ করিয়া থাকি। জাগরণে আমি সগুণ-সক্রিয় হই। আমি সুষুপ্তি-অবস্থায় যে নির্গুণ-নিক্রিয় হইয়া থাকি তাহা জাগরণেই বুঝিয়া থাকি। জাগরণে আমার সগুণ সক্রিয়াবস্থা। সুতরাং আমার সুষুপ্তি এবং নির্গুণ নিক্রিয়াবস্থা বুঝিবার কারণ জাগরণ এবং সগুণ সক্রিয়াবস্থা। আমার যদ্যপি জাগরণ এবং সগুণ সক্রিয়াবস্থা না হইত তাহা হইলে আমি নিজ-সুষুপ্তি এবং নির্গুণ-নিক্রিয়াবস্থাও বুঝিতাম না। তাহা হইলে আমি নির্গুণ নিক্রিয় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি 'সুষুপ্তি' শব্দ, 'নির্গুণ' শব্দ এবং 'নিক্রিয়' শব্দ পর্য্যন্ত জানিতাম না। শ্রুতি-বেদান্তানুসারে আমি-আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি ও বেদান্তানুসারে আমি-আত্মা বা ব্রহ্ম নির্গুণ-নিক্রিয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমি-আত্মার সগুণ-সক্রিয়াবস্থাতেই আমি-আত্মার নির্গুণ-নিক্রিয়াবস্থা বুঝিতে হয়। সুতরাং আমি-ব্রহ্মাত্মা 'নিত্য-নির্গুণ-নিক্রিয় নই। আমি-ব্রহ্মাত্মা যদ্যপি নির্গুণ-নিক্রিয় হইতাম তাহা হইলে আমি-ব্রহ্মাত্মা আপনাকে নির্গুণ-নিক্রিয় বলিয়া বুঝিতাম না। তবে আমি-ব্রহ্মাত্মা সময়ে সময়ে নির্গুণ-নিক্রিয় হই বটে। আমি-ব্রহ্মাত্মা সময়ে সময়ে যে নির্গুণ-নিক্রিয় হই তাহা আমি-ব্রহ্মাত্মা আমার সগুণ সক্রিয়াবস্থাতেই বুঝিয়া থাকি, অতএব বেদান্তে আমি-আত্মা-ব্রহ্মের নির্গুণ-নিক্রিয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া আমি-আত্মা-ব্রহ্মের সগুণ-সক্রিয়ত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমি-আত্মা-ব্রহ্ম নির্গুণ-নিক্রিয়াবস্থা হইতে সগুণ-সক্রিয়াবস্থা হইলেই সেই আমি-আত্মা-ব্রহ্ম যে নির্গুণ-নিক্রিয় ছিলাম তাহা বুঝিতে পারি। অতএব আমি-আত্মা-ব্রহ্ম নির্গুণ-নিক্রিয় স্বীকার করিলে আমি-আত্মা-ব্রহ্মই সগুণ-সক্রিয় স্বীকার করিতে হয়।

আমি-আত্মা-ব্রহ্ম নিত্য-সগুণ-সক্রিয়ও বলা যায় না। কারণ আমি-আত্মা-ব্রহ্ম সুষুপ্তিতেই নির্গুণ-নিক্রিয় হইয়া থাকি। আমি-আত্মা-ব্রহ্ম জাগরণে সগুণ-সক্রিয়। আমার সুষুপ্তি অবস্থা বহুবার হইয়াছে ও হইবে। আমার জাগরণ অবস্থা বহুবার হইয়াছে, বহুবার হইবে এবং এখনও আমার জাগরণ অবস্থা। আমার অনেকবার সুষুপ্তি অবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমার অনেকবার নির্গুণ-নিক্রিয়াবস্থাও হইয়াছে। আমার অনেকবার সুষুপ্তি অবস্থা হইবে বলিয়া আমার অনেকবার নির্গুণ-নিক্রিয়াবস্থাও হইবে। আমার অনেকবার জাগরণ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমার অনেকবার সগুণ-সক্রিয়াবস্থাও হইয়াছে। আমার অনেকবার জাগরণ অবস্থা

হইবে বলিয়া আমি অনেকবার সগুণ-সক্রিয় হইব। এখন আমার জাগরণ অবস্থা বলিয়া এখন আমি সগুণ-সক্রিয়।

আমাতে গুণ কর্ম্ম না থাকিলে, আমি গুণী ও কর্ম্মী না হইলে আমি কি প্রকার তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতাম না।

আত্মজ্ঞানী-আত্মাকে একসঙ্গে অহংকার-বিশিষ্ট এবং নিরহংকারী বলিতে পার না। কারণ অহংকারীর বিপরীত নিরহংকারী। কেহই একসঙ্গে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইতে পারে না; কেহই একসঙ্গে ভক্ত এবং অভক্ত হইতে পারে না; কেহই একসঙ্গে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পারে না।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধই আত্মজ্ঞান; "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধই অদ্বৈত-জ্ঞান। সুতরাং আত্মজ্ঞানের, অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত অহংকারের সংস্রব নাই বলিতে পার না।

যখন আমি "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ করি না, যখন আমি "সোহহং" বোধ করি না, যখন আমি "শিবোহহং" বোধ করি না, যখন আমি "নিত্যোহহং" "নিরঞ্জনোহহং" বোধ করি না, যখন আমি সম্পূর্ণ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হই, তখনই আমি নিরহংকার হই। ঐ প্রকার নিরহংকার গুণাতীত।

আত্মজ্ঞান বশতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ হইলে "আত্মজ্ঞানে আত্মা নিরহংকার হন" স্বীকার করা আর চলে কৈ? অদ্বৈতমতে আত্মজ্ঞান বশতঃই "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ করা হয়। সেই অদ্বৈতমতেই আত্মজ্ঞান হইলে আত্মা নিরহংকার হন। নিরহংকার-আত্মার অহংকার থাকিতেই পারে না। অথবা অহংকার-বিশিষ্ট আত্মার নিরহংকার থাকিতেই পারে না। আত্মজ্ঞানী অহংকারী এবং নিরহংকারী উভয়ই বলা যাইতে পারে না। তাহা বলিতে পারা যাইলে সেই আত্মজ্ঞানী আত্মাকে কেবল নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলাই বা হইতেছে না কেন? তাহা হইলে তাঁহাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় এবং সগুণ-সক্রিয় উভয়ই বলা যাইতেছে না কেন?

ন্যায়তঃ তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ অহংকার ব্যতীত আত্মা স্বয়ং আছেনও বোধ করিতে পারেন না, অহংকার ব্যতীত আমি-আত্মা "অহং ব্রহ্মাস্মি"ও বোধ করিতে পারি না। সুতরাং আত্মজ্ঞানের বা অদ্বৈত-জ্ঞানের সঙ্গে অহংকারের বিশেষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তুমি অজ্ঞানকে অবিদ্যাই বল। আমরা অজ্ঞানকেও বিদ্যা বলি, কারণ আমাদের মতে অজ্ঞানও জানিবার যোগ্য। অজ্ঞান জানিবার যোগ্য না হইলে অজ্ঞানে বীতরাগ হইবে কেন? আমাদের মতে জ্ঞানও বিদ্যা এবং অজ্ঞানও বিদ্যা। জ্ঞান, অজ্ঞান উভয়ই বুঝিতে হয়। তবে অজ্ঞানের দোষ সকল ধৃত হয়। অজ্ঞানের দোষ সকল ধৃত না হইলে অজ্ঞানকে হেয়, তুচ্ছ বা পরিত্যজ্য বোধ হইতেই পারে না। যথার্থই যদ্যপি অজ্ঞান অবিদ্যা হইত, তাহা হইলে তাহাতে কাহার না বিরাগ থাকিত? অবিদ্যা অর্থে যাহা জানিতে পারা যায় না অথবা যাহা জানিবার অযোগ্য। যাহাতে তোমার অনুরাগ আছে তাহা তুমি নিশ্চয় জান। তাহা যদি না জানিতে, তাহা হইলে তাহাতে তোমার অনুরাগও থাকিত না। অন্নদ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, জল দ্বারা তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয়—যিনি জানেন, তাঁহার ক্ষুধা বশতঃ অন্নে অনুরাগ হইয়া থাকে। তাঁহার তৃষ্ণা বশতঃ জলে অনুরাগ হইয়া থাকে।

অজ্ঞানে কেবল জড়তাই আছে বলিতে পার না। আমাদের বিবেচনায় অজ্ঞানে জড়তা

এবং চেতনতা উভয়ই আছে। শ্রুতি, বেদান্ত প্রভৃতি মতে কোন্ গুণ, কোন্ কর্ম্ম না অজ্ঞানের বিকাশ? তুমি কি কর্ম্মকে জড় বলিতে পার? কর্ম্ম প্রত্যক্ষই বুঝিতেছ; কর্ম্ম জড় নহে; কর্ম্ম চেতন। অনেক শাস্ত্রে ঐ কর্ম্মকে ক্রিয়াশক্তি বলা হইয়াছে। শক্তি অবশ্যই অজড়া। অজড়া যাহা, তাহা অবশ্যই চেতনা-বিশিষ্টা।

পৃথিবীতে আগমন-কালে পুত্রকন্যা প্রভৃতি সঙ্গে আসে না। পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার সময়ে তাহারা সঙ্গে যায় না। সেই জন্য তাহাদের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধও নহে। তাহারা গচ্ছিত সামগ্রীর ন্যায় আমাদের কাছে থাকে। যিনি কোন সামগ্রী গছাইয়া রাখেন তাঁহার সেই সামগ্রী প্রয়োজন হইলেই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা যাহাদের পুত্রকন্যা প্রভৃতি বলি, প্রকৃত কথায় তাহারা আমাদের নয়। তাহারাও গচ্ছিত সামগ্রী। তাহারা যাঁহার সামগ্রী, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত যদ্যপি আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হইত তাহা হইলে আমরা এক প্রকার পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আর আমাদের মোহ এবং অহংকারের সীমা থাকিত না।

পুত্রকন্যা আমাদের পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবেনা। তাহারাও যাঁহার, আমরাও তাঁহার। সেই জন্য তিনি কেবল তাহাদের এবং আমাদের পরমাত্মীয় এবং পরমবন্ধু। সেইজন্য অন্যান্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, অনন্যগতি হইয়া কেবল তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং নিয়ত—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"॥

এই শ্লোকটী স্মরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই শ্লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর সূচিত হইয়াছে।

সংসারে যদ্যপি নিত্যসুখশান্তি, নিত্যমঙ্গল এবং নিত্যাভয় থাকিত তাহা হইলে জীবকে আরও অধিক সংসারে অভিভূত হইতে হইত, তাহা হইলে সংসারে অতিশয় লিপ্ত হইতে হইত। সংসারের অনিত্যতা বুঝিবার জন্যই সংসারে থাকিয়া বহুশোক, বহুদুঃখ, বহুবিপদ, বহুরোগ, বহু নির্য্যাতন, বহু তিরস্কার এবং বহু অবমাননা প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। সংসারের প্রতি যে প্রেম তাহা মহাশোক, মহাদুঃখ, মহা বিপদ, মহারোগ, মহানির্যাতন, মহাতিরস্কার এবং মহা অবমাননার কারণ। কেবল পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম তাহাই নিত্য-সুখ-শান্তির কারণ, তাহাই নিত্যমঙ্গলের কারণ, তাহাই স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার উচ্চ কারণ।

যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও ঈশ্বরে অবিচলিতরতি-মতি রাখিতে পারেন তিনিই বীরভক্ত। ঈশ্বরের সহিতই জীবের চিরসম্বন্ধ। নিজ মৃত্যুতে অথবা সংসারের কাহারও মৃত্যুতে তাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না।

কোন অনুভূতির বিষয় বাস্তবিক কেহ যদি অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা তিনি অনুভব করেন নাই বলিয়া অন্য কেহ বহু বাচনিক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেও তাঁহার সেই অনুভূত বিষয় তিনি অনুভব করেন নাই, কখনই বোধ করেন না। এক ব্যক্তির আত্মানুভূতি হইলে অন্য কেহ নানা বাচনিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাঁহার আত্মানুভূতি হয় নাই বলিলেও তাঁহার

তাহা বিশ্বাস ও ধারণা হয় না। কোন রমণী সন্তান প্রসব করিলে তাঁহার সেই সন্তানের প্রতি অবশ্যই বাৎসল্য ভাব হইয়া থাকে। কেহ যদি নানা বাচনিক যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার সেই প্রসূত সন্তান তাঁহার নহে এবং তাঁহার সেই সন্তান-প্রতি বাৎসল ভাবও নাই, সে কথা তিনি কখনও বিশ্বাস ধারণা করেন না। যাঁহার নিশ্চয়ই গোপাল-কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাব হইয়াছে, কেহ তাঁহার সেই ভাব অসত্য বলিলেও তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না, তাহা তাঁহার কখনই ধারণা হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি কিম্বা অত্যন্ত প্রেম থাকিলে তাঁহাকে দর্শন করা যায়। কাহারও কাহারও মতে ভ্রমবশতই ঐ প্রকার দর্শন হইয়া থাকে। তাঁহাদের সেই ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধে আপত্তির প্রতিকূলে আপত্তি করিয়া বলা হইতে পারে তুমি একটি গৃহের অন্যান্য নানা প্রকার সামগ্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের অপরূপ রূপ দর্শন কালে তাহা তুমি অস্বীকার কি প্রকারে করিবে? তোমার ঐ দর্শন যদ্যপি ভ্রমাত্মক হয় তাহা হইলে ঐ গৃহ, ঐ গৃহস্থ সমস্ত সামগ্রী তোমার স্থূল জড়দেহ এবং তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্তই বা ভ্রমাত্মক হইবেনা কেন? ঐ প্রকার দর্শন সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয়।

বিশ্বাস ও নির্ভর উভয়ই অধীনতার অন্তর্গত। ভক্ত হইতে হইলে ঈশ্বরের অধীনই হইতে হয়। আপনাকে সম্যক্‌প্রকারে ঈশ্বরাধীন বোধ হইলে কোন কুপ্রবৃত্তিরই অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। প্রকৃত ঈশ্বরাধীনই স্বাধীন। স্বাধীন যিনি তিনি বিনয়ী এবং বিনম্র। ভক্তের বহুভূষণের মধ্যে বিনয়, নম্রতা এবং দীনতাও তাঁহার ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

পরমেশ্বরের প্রতি কোন ভাবের সম্পূর্ণ আধিক্যের নামই মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় বাৎসল্য ভাব হইলে তাহাই বাৎসল্য-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় সখ্য ভাব হইলে তাহাই সখ্য-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় মধুরভাব হইলে তাহাই মধুর-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় দাস্য ভাব হইলে তাহাই দাস্য-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় ভ্রাতৃভাব হইলে তাহাই ভ্রাতৃ-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় স্বস্বভাব হইলে তাহাই স্বস্ব-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় শত্রুভাব হইলে তাহাই শত্রু-মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় কোন ভাব হইলেই তাহাকেই মহাভাব বলা যাইতে পারে। পরমেশ্বরের প্রতি যে কোন ভাব হয় তাহাই উত্তম ভাব, তাহাই পবিত্র ভাব, তাহাই বিশুদ্ধ ভাব, তাহাই দিব্যভাব এবং তাহাই পরম ভাব।

পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমাত্মক ভাবও হইতে পারে এবং অপ্রেমাত্মক ভাবও হইতে পারে। প্রেমাত্মক ভাব নানাপ্রকার। প্রেমাত্মক সখ্যভাব, প্রেমাত্মক মধুরভাব, কখন কখনও প্রেমাত্মক দাস্যভাবও হয়। প্রেমাত্মক অন্যান্য ভাবও আছে। অপ্রেমাত্মক কেবল শত্রু-ভাবকেই বলা যাইতে পারে।

প্রেমে যত নিষ্ঠা আছে তত অন্য কিছুতেই নাই। শুদ্ধ-প্রেমিকের নিজ প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রীতির সামগ্রী নহে। শুদ্ধ-প্রেমিকের সমস্তই তাঁহার নিজ প্রেমাস্পদের। তাঁহার ধন থাকিলে সে ধন তাঁহার

প্রেমাস্পদের। তাঁহার সম্ভ্রম থাকিলে সে সম্ভ্রম তাঁহার প্রেমাস্পদের। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিজপ্রেমাস্পদের বিবেচনা করেন। তিনি আপনার প্রাণও আপনার বোধ করেন না, তিনি আপনাকেও আপনার বোধ করেন না, তিনি আপনাকেও নিজ প্রেমাস্পদের বিবেচনা করেন। সেইজন্যই তাঁহার অহংকার এবং মমতা উভয়ই নাই। শুদ্ধ প্রেমিকের নিজ প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কিছুতেই মমতা নাই। সেইজন্যই তিনি অন্য কিছু সম্বন্ধে নির্ম্মম। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে নির্ম্মম নহেন। তাঁহাতে তাঁহার বিশেষ মমতা। প্রকৃত কথায় শুদ্ধ-প্রেমিকের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম আছে। সেইজন্য তাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ মমতা।

যে প্রেম নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি নিজ স্বার্থবশতঃ স্ফুরিত হয় না, তাহাই নিঃস্বার্থ-প্রেম, তাহাই শুদ্ধ-প্রেম, তাহাই পরম-প্রেম, তাহাই দিব্য-প্রেম। তাহা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার স্ফুরিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি ধন্য। সেই জন্যই তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

কবিতাকুসুম-মালা।

১

নিবিড় কাননে, বিজন বিপিনে,
সজনে নির্জ্জনে, শ্রীহরি বিহরে।
ভূধরে প্রান্তরে, গভীর সাগরে,
আছেন প্রস্তরে অন্তরে অন্তরে।
বিহরে সতত, হৃদয় মাঝারে।

২

কাননে কাননে কর কেন তাঁ'র অন্বেষণ?
ধ্যানযোগে যোগী তাঁরে, হেরে হৃদয়-মাঝারে,
তুমি ধ্যানযোগে তাঁ'রে হৃদে কর দরশন।
গুরুর কৃপায় হয় প্রকৃত বিশুদ্ধ ধ্যান।

৩

ভক্তিতে পাইতে পার তাঁরে হৃদয় মাঝারে,
নহেন তিনি যে দূরে, আছেন তব অন্তরে,
অন্তরে না থাকিলে কি পার বাঁচিবারে?

১

শ্যামের কারণে সই এত যে লাঞ্ছনা,
তবু তাঁরে প্রাণ চায়, শোনে না সে মানা।
ভুলে গেছে সে আমারে,
ভুলিতে নারি তাঁহারে,
যাতনা কত যে সই, তবু তাঁ'রে ভুলিনা।
কেন যে ভুলিনা তাঁ'রে বুঝিতে পারিনা।

২

ব্যাকুল এ চিত তাঁহার কারণ!
কেমনে পাইব তাঁ'র দরশন?
সে বিনা সতত, কাঁদি অবিরত,
সদা ব্যাকুলিত এ পোড়া পরাণ।
বিষাদ-সাগরে ডুবে আছে সদা মন।

৩

সুশীতল সমীরণ অনল সমান!
ফুল্ল শশধর যেন কত ম্রিয়মাণ!

ব্যাকুল অন্তরে যেন, যমুনা করে রোদন,
রোদন করিছে ঐ কূল তরুগণ।
বিষাদে পুড়েছে যেন যমুনা পুলিন॥
সুখ নাই কুঞ্জবনে,
সুখ নাই এ জীবনে,
সখিগণ মৃতপ্রায় সবে সুখহীন!

৪

কি কাজ সজনি! বাসে এ ছার গৃহেতে?
শ্যামচাঁদ বিনা আর কি কাজ দেহেতে?
দারুণ বিরহ আর পারিনা সহিতে?
বসুমতী দ্বিধা হও প্রবেশি তোমাতে!

৫

শ্যামচাঁদ বিনা মম জীবনে কি প্রয়োজন?
হ'য়েছে জীবন যেন দুর্ব্বহ বহন।
কেবল রোদন সার,
করি সুধু হাহাকার,
হেরি সব শব যেন সংসার শ্মশান!
গ্রাসিবারে চাহে, মুখ করিয়ে ব্যাদন।

৬

পাষাণ হইতে কঠিন এ প্রাণ!
কৃষ্ণবিনা তাই আছে এত দিন!
জলে ডুবিলে ডুবি না,
পুড়িতে চাহিলে পুড়িনা,
বিধাতার কি বিবেচনা, বিধি নিদারুণ!

পরে কি হইবে যদি জানিতে পারিতে,
পরিণাম চিন্তা করি কতই কাঁদিতে!
কিসে হ'বে পরিত্রাণ সতত ভাবিতে!
ভাবিতে ভাবিতে শুদ্ধ-ভক্তিবারি পেতে॥
হইত অমল মন,
সে সলিলে প্রক্ষালন,
পাইতে নব জীবন; হরি কি বুঝিতে,
কলঙ্ক-সাগরে আর হ'ত না ডুবিতে।

আছে কুবাসনা কত তোমার হৃদয়ে!
কহ না কাহারে কভু সরমের ভয়ে!
অনেকে জানে সুজন,
তুমি অতি গুণবান,
অথচ আছে জীবন মলিন যে হ'য়ে!
কর না যতন তবু ফেলিবারে ধুয়ে।

৩

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ভুলে র'বে কত কাল?
কবে হবে জ্ঞানোদয়,
হেরিবে সে রসময়,
মনোময় ক'রে তারে হেরিবে কেবল?

৪

এ দেহ সুন্দর র'বে চিরদিন
ক'রেছ কি মনে?
অনিত্য এ দেহ—সৌন্দর্য্য ইহার—
বোধ হ'বে যবে, হবে সচেতন।
জানিবে তখনি সকলি যে ভ্রম!
হ'বে জ্ঞানোদয় শুদ্ধ মন প্রাণ॥

৫

এ দেহ সুন্দর আরো কত কাল র'বে?
যৌবনের পরে এ যে অন্যরূপ হ'বে!
মরিলে মৃত্তিকা হবে,
এ সৌন্দর্য্য সব যাবে,
কর কেন সৌন্দর্য্যের অহংকার তবে?
জান না কি পঞ্চভূতে পঞ্চ মিশাবে?

৬

তোমার যে অনুরাগ সংসারে কেবল।
তাই মন স্থির নহে এরূপ চঞ্চল॥
যাহে মন স্থির হয়,
চঞ্চলতা নাহি রয়,
ঘুচে যায় ভব-ভয়, চিত্ত হয় অমল,
এমন হরির নাম রসনায় বল।

হরিনাম বলে হ'বে পবিত্র যে মন।
হরিনাম বলে হ'বে বিষয়ী সুজন॥
বিনয়ের বিনিময়ে পাবে যে রতন।
যতন করিলে তাতে পা'বে হরিধন॥
বিনয়বিহীন জন,
জানে না শান্তি কেমন,
শান্তি বিনা হরিধন মিলে না কখন।

শুদ্ধ প্রেমের তুলনা সংসারে কোথায়?
সে প্রেম অমূল্য ধন সহজে কি পাওয়া যায়?
সুপ্রেমিক একজন,
শুদ্ধ প্রেমের মহাজন,
তাঁ'র কৃপা হ'লে সে প্রেম জগাই মাধাই পায়,
অতি পাষণ্ডের মনে প্রেমোদয় হয়।

২

কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারি সকলে কি হ'বে?
সে প্রেমধন কি সই সকলে বুঝিবে?
সে প্রেম সামান্য নয়,
সহজে কি পাওয়া যায়?
শ্রীকৃষ্ণ সে প্রেমময়—
কৃষ্ণ ভজ, বিনা মূলে সে প্রেম যে পাবে।

প্রখর-তপন-তাপে কানু গোচারণে গেছে!
কেমনে মায়ের প্রাণে ধৈর্য্য ধ'রে ঘরে আছে?
কঠিন প্রান্তরে কত,
চরণে পাবে আঘাত,
মা—মা বোলে অবিরত ব্যাকুল হইবে!
আমার বিহনে বাছা কত যে কাঁদিবে!

২

যাইব সেখানে আমি, যেথানে গেছে গোপাল।
পরাণ জুড়াব তাঁ'র হেরে মুখ নবমল॥
অঞ্চলে নিব নবনী,
খাবে আমার নীলমণি,
কোলে এসে মা জননী বলিবে আমারে,
হৃদয়-মাঝারে তা'রে থোব গোপনে গোপনে,
দেখিতে দিব না কারে, নিজে হেরিব কেবল।

বীরদর্পে আসে অই রেণুকানন্দন,
ঘূর্ণিত-নয়নে জ্বলে দীপ্ত-হুতাশন।
ধনুর্ব্বাণ শোভে করে,
কাঁপে ধরা হুহুঙ্কারে,
হেরে ভয়ে কাঁপে ক্ষত্রগণ,
হেরি নাই কভু হেন মূরতি ভীষণ!
ভীষণ এ দৃশ্য বিশ্বে হেরেছে যে জন,
জেনেছে সে ত্রিভুবন,
নহে বিশ্ব ভয়হীন,
লয়েছে তাঁ'র শরণ, যিনি ভয়হীন।

কি হ'বে সামান্য রণে?
সাজ সবে প্রাণপণে,
এ রণে কি হ'বে বল সাজ মহারণে,
যে রণে মরিবে যত দুষ্ট রিপুগণে।
বিবেক-কবচে অঙ্গরক্ষা কর।
জ্ঞান-খড়্গে ষড় রিপু করহে সংহার॥
দুর্ভেদ্য বৈরাগ্য-দুর্গে কর এসে বাস।
ভয় নাই সেনাপতি নিজে কীর্ত্তিবাস॥
মনোক্ষেত্রে রক্ষাকর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
সেই ধর্ম্মে কর সবে বীরাচার কর্ম্ম॥

ভূধরে একাকী কর সাধন ভজন,
অনাহারে কতদিন,
কর তুমি অবস্থান,
তথাপি র'য়েছে তব প্রফুল্ল বদন।
অদ্ভুত শকতি বিনা হয় কি এমন?

হ'য়ে মগ্না তপস্বিনী হ'য়েছ তুমি যোগিনী,
না জানি আনন্দময়ী কর কার উপাসনা?
নাহি অঙ্গে আভরণ,
বিচিত্র টাঙ্গ বসন,
ধ্যানে মগ্ন পদ্মাসনে তুমি পদ্মাসন,
যোগিনীর বেশে কেন আছ তা' জানিনা।

আশার কথা।

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

ভগবান! তুমি যত উৎকৃষ্ট দ্রব্যই আমাদের দাও না কেন, আমরা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহাকে ঠিক আমাদের মত অপকৃষ্ট করিয়া লইবই লইব। ঐ দেখ না, তোমার বড় সাধের প্রেমের ধর্ম্মের আজ কি দুরবস্থা। তোমার দোহাই দিয়া আজ কি কাণ্ডটা না হইতেছে। তুমি যাহা দিয়া গিয়াছিলে, আমরা তাহার কতটুকু রাখিয়াছি? তোমার সে অলৌকিক নিষ্ঠা ও চরিত্র-সংযমের পরিবর্ত্তে আমরা কেমন ব্যভিচার-স্রোত চালাইয়াছি। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় বিবাহিত পত্নীর পর্য্যন্ত মুখদর্শন কর নাই; পরমভক্তিমতী অশীতিবর্ষদেশীয়া মাধবী দাসীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করার অপরাধে তোমার প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাসকে পরিবর্জ্জন করিয়া যোষিৎসঙ্গ সাধকের পক্ষে কিরূপ পরিত্যজ্য তাহার বিস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছ; আর আজ তোমার দোহাই দিয়া ভেক (সন্ন্যাস) গ্রহণ পূর্ব্বক শত শত লোক যোষিৎসংসর্গ করতঃ তোমার ধর্ম্মের যাজন করিতেছে। তুমি ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে, আর এখন আমরা অবিদ্যা-প্রেমে মত্ত হইয়া লোক-দেখান নাম সংকীর্ত্তন করিতেছি। তুমি পিছু ফিরিতে না ফিরিতেই আমরা তোমার ধর্ম্মমত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অনেক উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছি। তোমার উদার সার্ব্বজনীন মত কাটিয়া ছাটিয়া বহু সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছি। এমন করিয়া তুলিয়'ছি যে তুমি এখন আবার যদি নিজে এস, তাহা হইলেও আর উহা তোমার ধর্ম্ম বলিয়া চিনিতেই পারিবে না। তুমি স্বয়ং শিব-মন্দিরে, কালী-মন্দিরে মাথা কুটিয়াছ, প্রসাদ খাইয়াছ, আর আজ কাল তোমার অনেক দাসানুদাস তোমার অপেক্ষাও বড় হইয়াছেন; কেন না তাঁহারা বলেন,—'শিব আমাদের গুরু-ভাই, কালী আমাদের বৌদিদি;—তাহাদের প্রসাদ খাইব কেন?' হায় প্রভু! তুমিও বোধ হয় এই সকল দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছ। কিন্তু তা' করিলে কি হইবে? আমাদের কার্য্যই এই। বার বার তুমি আসিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছ, আর বার বার আমরা এইরূপ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছি। তুমি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়া আমাদিগকে যে অমৃত-ফল দিয়া গিয়াছিলে, আমরা তা'র ত্বক মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছি। চারিশত বৎসরের মধ্যে আমরা কিরূপ কুকীর্ত্তি দেখাইয়াছি, তাহা ত' বুঝিতে পারিতেছ। এখন আর ভাবিলে কি হইবে?—তোমাকে আমরা বিশ্রাম করিতে দিব না। আবার তোমাকে এই ধরাধামে আসিতে হইবে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বদেশীয় সাধুসজ্জনগণের হৃদয়ে একটা

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানি দর্শন করিয়া তাঁহারা কাতর প্রাণে শ্রীভগবানকে প্রাণে প্রাণে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"হে করুণানিধে! তুমি এস; তোমার প্রদত্ত দয়া, জ্ঞান ও প্রেমের ধর্ম্ম জীব গ্রহণ করিতে পারে নাই। অচিরকাল মধ্যেই তাহাদের স্বকপোলকল্পিত মায়াবিজৃম্ভিত আবর্জ্জনা মিশাইয়া তোমার সেই কৃপার দানকে এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত করিয়াছে। অতএব এস জ্ঞানময়! অজ্ঞজীবকে আবার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত কর; এস দয়াল! তোমার ভ্রমান্ধ জীবকে আবার হাতে ধরিয়া তোমার পুণ্যপথের পথিক করিয়া দাও; এস প্রেমময়! জীবের এই মরুভূমিতুল্য শুষ্ক হৃদয়কে আবার প্রেম-বন্যায় প্লাবিত কর। আমরা বড়ই তাপিত, তৃষিত; তোমার আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের হৃদয়ের সন্তাপ প্রাণের তৃষা দূরীভূত কর। এ বিষম ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে তুমি স্বয়ং না আসিলে আর কেহ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিবে না। এবার আমরা সার্ব্বজনীন উদার ধর্ম্মমত উপদেশের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি; কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা প্রদেশ বিশেষের উপযোগী কোন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য নহে। তুমি আসিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করতঃ এমন একটি উদার যুগধর্ম্ম সংস্থাপন কর, যাহার আশ্রয়ে সর্ব্বদেশীয় তোমার প্রেমিক ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া তোমার ভজন করতঃ তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন।" ভক্তগণের এই প্রাণের আহ্বানে ভক্ত-বৎসলের প্রাণ কাঁদিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই যুগের উপযোগী, জীবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ 'নিত্যধর্ম্ম' বা 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' সংস্থাপন জন্য তিনি ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আহা সে দিন জীবের কি শুভদিন! সকল মঙ্গলালয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য, ভক্তগণের ভজন-বিভ্রাট নিরাকরণ জন্য, তিনি তাহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অংশ নয়, কলা নয়,—অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি স্বয়ং পূর্ণ শ্রীভগবান জীবের পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? কোটি কোটি যুগ কঠোর তপস্যা করিয়া যোগী-ঋষিগণ যাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, আজ অনায়াসে জীব সেই চিদানন্দ-স্বরূপ জ্ঞানানন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। সর্ব্ব ভাবের ভাবুক, সর্ব্বধর্ম্মের সারনির্ণয় কর্ত্তা, সর্ব্বঅবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ ভগবান এই কলিহত, অতি দুর্ব্বল জীবগণকে এককালীন অভয় দিলেন। পূর্ব্বে যত অবতার আসিয়াছেন, কেহই একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের এমন চরম সমাবেশ, সকল ভাবের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, সকল ধর্ম্মমতে এমন উদার আস্থা দেখাইয়া যান নাই। শ্রীশঙ্কর আসিয়া কেবল জ্ঞানপথের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া কেবল কৃষ্ণ-ভক্তিরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার জ্ঞানানন্দে জ্ঞান যেমন প্রেমও তেমনই। তাঁহার কাছে কৃষ্ণ-কথার আলোচনায় তাঁহার যেরূপ ভাবাবেশ ও দুই চক্ষে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত, কালীনাম প্রসঙ্গেও তদ্রূপ; শিব, রাম, গৌরাঙ্গ সকল প্রসঙ্গেই একই ভাব। এমন কি যিশু, মহম্মদের প্রসঙ্গেও তাঁহার ঐরূপ ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই

এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সকল ভাবের এরূপ পূর্ণতা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অবতারে লক্ষিত হয় না। এই জন্যই তিনি পূর্ণ এবং সর্ব্বাবতারের শ্রেষ্ঠ। জীবের প্রতি এত করুণাও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অবতার করেন নাই। সকলেই কোন না কোন রূপ কঠোর ভজন-প্রথার আদেশ করিয়াছেন। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গও তাঁহার ভক্তগণকে সন্ন্যাসের ও বৈরাগ্যের অতিকঠোর নিয়ম সকল মানিয়া চলিতে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। ছোট হরিদাস অশীতিপরবৃদ্ধা পরমভক্তিমতী মাধবী দাসীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
অতঃপর না হেরিব মুই উহার বদন॥"

কেবল মুখে বলা নয়; কাজেও তিনি উঁহার আর মুখ দর্শন করেন নাই এবং সেই দুঃখে তাঁহার পরম ভক্ত ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এইরূপ কঠোর নিয়ম আজকাল কয়জন মানিয়া চলিতে পারেন? আমাদের মত দুর্ব্বল-হৃদয় জীবকে নিষ্ঠা-ব্যাপারে এইরূপ কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে কেহ যদি বলেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে শত সহস্র হস্ত দূরে পলায়ন করি। তাঁহাকে নিশ্চয়ই বলিয়া বসি,—"কাজ নাই বাবা আমার ভজনসাধনে; আমি এত কঠোর করিতে পারিব না।" আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই প্রভু এবার অপার করুণাভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আমার জ্ঞানানন্দের কাছে কোন কঠোর ছিল না। ভবব্যাধি প্রশমনের জন্য তিনি আমাদিগকে কোন তিক্ত ঔষধ খাইতে দেন নাই। তাঁহার কাছে আমরা সন্দেশ রসগোল্লাই খাইয়াছি এবং তাহাই ঔষধের কার্য্য করিয়াছে। সেই করুণাময়ের এমনই করুণা যে তিনি ভক্তগণকে বলিতেন,—

"তোমরা যত পার না পার,—আমার উপর সব ভার রহিল।"

দেখ ভাই কলিহত জীব! এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখিয়াছ কি? এমন আশার বাণী আর কখন কেহ শুনাইয়াছেন কি? এস ভাই, সেই পরমকারুণিক দয়াবতার **শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ**-চরণে শরণ লও। তোমার কোনরূপ কঠোর করিতে হইবে না। সেই দয়ার ঠাকুর কৃপায় তোমায় পার করিবেন। তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আশার কথা আর কি আছে?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ,
এল, এম, এস্।

আদরের গোপাল।

আয় রে প্রাণের নিত্য গোপাল,
আয়রে যাদুমণি!
আদর ক'রে দেখ্‌ব তোমার
টুক্‌টুকে মুখখানি॥
রাঙ্গা মুখে মধুর হাসি
দেখ্‌ব পরাণ ভ'রে।
আয় দেখি বাপ, ধুলো ঝেড়ে
কোলে করি তোরে॥

সোণার গোপাল তুইরে আমার
নয়নের মণি।
অই দেখ বাপ রাখিয়াছি
কত সর ননী॥
পরাণ ভ'রে খাও নবনী
যত তুমি পার।
ব্রজ-গোপীর ঘরে ননী
কেন চুরি কর?

তোমার কিসের অভাব আছে,
ওরে বাছাধন !
তোমায় বলে ননীচোরা,
অন্যায় বচন ॥
ঘরে বসে খাও নবনী
ক্ষীর সর যত ।
যেও না আর গোপীর ঘরে,
থাক ভাল মত ॥
আদর ক'রে প্রাণ গোপালে
বল্‌ছে কত রাণী ।
হেন কালে এল যত
ব্রজের গোপিনী ॥
ইহা দেখে চতুর গোপাল
নিমিষে পালায় ।
'গোপাল, গোপাল' ডাকে রাণী,
সাড়া নাহি পায় ॥
ব্রজ-গোপী বল্‌ছে,—'রাণি,
নালিশ করি মোরা ।
কোথা চ'লে গেল তোমার
দুষ্ট ননী-চোরা ॥
আমরা গোপাল ভালবাসি,
কিন্তু শুন, রাণি !
অলক্ষ্যেতে খেয়ে আসে
যত সর ননী ॥
ধর্‌তে নারি তোমার গোপাল
দুষ্ট শিরোমণি ।
জিজ্ঞাসিলে বলে,—'কি গো,
কোথায় খেলাম ননী ?'
লুকাইয়ে রাখি ননী,
কেউ না জানে তায় ।
তোমার গোপাল কেমন ক'রে
তাহার নাগাল পায় ?
আমরা যত ব্রজ-গোপী
সদাই মরি ডরে ।
কোন ফাঁকেতে ননী-চোরা
প্রবেশিবে ঘরে ॥
গৃহ কাজ কি কর্‌ব বল,
গোপাল, গোপাল মনে ।
এমন ছেলে আর দেখি নাই
এই ত্রিভুবনে ॥
তোমার গোপাল এম্‌নি ক'রে
জ্বালায় অবিরত ।
আমরা ত' মা, কুলবধূ,
সহিব বা কত ॥
ভাল ক'রে শাসন ক'রে
ব'লো গোপালেরে ।
আর যেন না এমনি ক'রে
ননী চুরি করে ॥
মার্‌তে মোরা বলি নাকো
তোমার বাছাধনে ।
এখন থেকে রাখা ভাল
উচিত শাসনে ॥
নতুবা সে কর্‌বে চুরি
বসন ভূষণ ।
তোমারি ত' হবে রাণি,
বিষম গঞ্জন ॥
কপাল গুণে পেলে রাণি,
এমন দিব্য ছেলে ।
আমাদেরও কাঁদে গো প্রাণ
'গোপাল, গোপাল' ব'লে ॥
গোপালের মুখ দেখ্‌লে পরে
সকল ভুলে যাই ।
গোপাল-মুখে যত শোভা
ত্রিজগতে নাই ॥
ননী খেতে যাবে গোপাল,
যাক্‌না অবিরত ।
খাওয়াইব ক্ষীর নবনী
আদরেতে কত ॥

গোপনে যাইয়া গোপাল
ননী করে চুরি।
এই আপশোষে তোমায় রাণি,
আমরা নালিশ করি।
নইলে কত ভালবাসি
তোমার গোপালে।
কতই সুখ পাই যে মোরা
গোপালে হেরিলে॥
মের না, মের না, রাণি,
গোপাল মোদের প্রাণ।
করে করুক ননী চুরি,
থাকব সাবধান॥
গোপাল ত' মা, ছেলে মানুষ,
বালক স্বভাব তা'র।
তাইতে করে মাঝে মাঝে
এরূপ ব্যবহার॥
নইলে তোমার 'নিত্য-গোপাল'
অকলঙ্ক শশী।
সবাই তা'রে ভালবাসে
যত ব্রজবাসী॥
গোপাল তোমার সোণার ছেলে,
শুন নন্দরাণি!
কপাল গুণে পাইয়াছ
এমন গুণমণি॥
গোপাল মুখে মধুর হাসি
বড়ই ভালবাসি।
গোপাল ল'য়ে থাক সুখে,
আমরা এখন আসি॥

শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।
মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

এস পূর্ব্ব-স্মৃতি! এস; এস, আমার অতীত সুখের জীবন্ত প্রতিমা! বিগত জীবনের সাক্ষাৎ সার্থকতা! নিরাশ-আঁধারের আশার দেউটী! দুর্ব্বহ গুরুভার জীবনের লাঘবতা! এস পূর্ব্ব-স্মৃতি! এস; এস সুখময়ি শান্তিময়ি সান্ত্বনাময়ি পূর্ব্ব-স্মৃতি! এস; এস আমার শোকের সান্ত্বনা, দুঃখের অশ্রুধারা, বিরহের মিলন-আস্বাদ-স্বরূপা, এস পূর্ব্বস্মৃতি! এস; এস মরুভূমির ক্ষীণ-স্রোত-রেখা! এস দগ্ধ হৃদয়ের স্নিগ্ধ-চন্দন-প্রলেপ-তুল্যা! এস মর্ম্ম-বেদনার অংশ-ভাগিনি! এস, আনন্দময়ি পূর্ব্ব-স্মৃতি! এস; এস নিত্যা! এস নিত্যানন্দস্বরূপা! বিরহ-দগ্ধ-হৃদয়ে মিলনের অমিয়ধারা বর্ষণ করিয়া এস, পূর্ব্বস্মৃতি! এস; অয়ি বিমলানন্দদায়িনি পূর্ব্ব-স্মৃতি! প্রত্যেক নিত্য-সেবক-হৃদয়ে তোমার মঙ্গল-অধিষ্ঠান হউক! জীবন্মৃত আমরা তোমার প্রসাদে শ্রীনিত্য-লীলা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

পূর্ব্বস্মৃতি! বঞ্চিত আমরা আজ তোমার দুয়ারে বাঞ্ছিতের পদ-পঙ্কজ-রেণু বাঞ্ছা করিয়া বসনাঞ্চল পাতিয়া আছি; তুমিও কি বঞ্চনা করিবে? দীন আমরা—ভিখারী আমরা এ দুর্দ্দিনে তোমার দ্বারেও কি উপেক্ষিত হইব? এস সুখদে! এস বরদে! এস শান্তিময়ি, সুখময়ি, আনন্দময়ি! নিত্য-লীলা-বিজড়িত তোমার ঐ উজ্জ্বল-মহিমময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাপদগ্ধ হৃদয়ের সন্তাপ বিদূরিত করি।

পূর্ব্বস্মৃতি! তুমি নিত্য-পদ-রেণু-স্পর্শে পবিত্রতমা, পুণ্যতমা, পূর্ণানন্দময়ী; তোমার বরাঙ্গের প্রতি অণুপরমাণু নিত্য-লীলা-বিমণ্ডিত। যাঁহাকে এক দিন স্থূলে—সূক্ষ্মে, অন্তরে—বাহিরে, প্রত্যক্ষে—পরোক্ষে সম্ভোগ করিয়াছি, এস নিত্য-লীলাময়ি! আজ তোমার কৃপায় অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া বিরহ-সন্তাপ বিদূরিত করি!

তৃতীয়বার ঠাকুর দর্শনে হুগলী যাইতেছি। সঙ্গে—রঞ্জন বাবু। ইনি নূতন যাইতেছেন। শরৎকাল—অতি প্রত্যূষে দুইজনে শয্যা ত্যাগ করিয়া হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিলাম;—পদব্রজে। ইচ্ছা, কলনাদিনী জাহ্নবীর তীরে তীরে শরতের মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পল্লীশোভা দর্শন করিতে করিতে যাইব। হাওড়ার পুল পার হইয়া দুইজনে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিলাম। একদিকে শারদ-শিশির-সিক্ত ধরিত্রীর শ্যামল বসনাঞ্চল—অন্য দিকে গলিত-সুবর্ণবৎ প্রাতঃ-সূর্য্য-করোজ্জ্বল সুখদা-মোক্ষদা-গঙ্গা-জলপ্রবাহ!—প্রকৃতির অঙ্গে সৌন্দর্য্য ধরিতেছে না।

আমার নূতন সঙ্গী অল্প দিন হইল শ্রীকাশী-ধাম হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন।—ইঁহাটিতে অত্যন্ত. আসানসোল হইতে কলিকাতা পদব্রজে আসিয়াছেন। এ যে ঠাকুরের অপ্রতিহত আকর্ষণ-প্রভাব! ঠাকুর! ধন্য তোমার আকর্ষণী শক্তি!

'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে;
সহসা দেখিনু, নয়ন মেলিয়া,
এনেছ তোমার দুয়ারে!'

কোথায় আসানসোল—আর কোথায় কলিকাতা। তাহাও আবার পদব্রজে। কালীঘাটের চিন্তাহরণ বাবু আমার এই নব সাথীটির আত্মীয়। ইনি চাকরীর অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছেন। কে জানে শ্রীশ্রীদেবের খাস-দরবারে ইঁহার চাকরী নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে? চিন্তাহরণ বাবু ঠাকুরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত; তাঁহার বাড়ীতে অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মকথা, বিশেষতঃ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচিত হইত।—রঞ্জন বাবু প্রথমে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিলেন, পরে লীলা শ্রবণ করিলেন;—ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ঠাকুর অন্তরে অন্তরে আকর্ষণ করিলেন,—ইঁহারও ঠাকুর দর্শনে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। আর যেই শুনিলেন, আমি হুগলী যাইতেছি, তখনি আমার সঙ্গ লইলেন।

দুইজনে মনের আনন্দে ঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় হুগলীর শ্রীনিত্য-মঠে শ্রীনিত্য-চরণ-সকাশে উপনীত হইলাম। আমি অলস,—জড়-পিণ্ড; স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই সুদীর্ঘ ১৭।১৮ ক্রোশ পথ বিনাক্লেশে অতি-বাহন করিতে পারিব। কিন্তু হুগলী পঁহুছিয়া দেখিলাম, বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভূত হইতেছে না। পাঠক! বলিতে পারেন, এ কাঁহার অনুকম্পার নিদর্শন!

তখন ঠাকুর-ঘরের দরজা খোলা হইয়াছে। শরতের অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের শোভাকেও মলিন করিয়া, ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া ঠাকুর কথামৃত বিতরণ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র তাঁহার পদ-নখরেরও তুল্য নহে,—সেই নখ-চন্দ্র হইতে নিয়ত ভক্তি-সুধা বিনির্গত হইতেছে; ভক্তগণ সেই দেব-দুর্লভ সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তগণ নিবিষ্ট চিত্তে চিত্রপুত্তলিকাবৎ পলক-বিহীননেত্রে ঐ অপরূপ-রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন,- ভক্তবৃন্দ কথামৃত পান করিতেছিলেন। আমি বলি,

তাহা নয়; ওরূপ দেখিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শিথিল হইয়া যায়! স্ববশে থাকে আঁখি দু'টী; তাহারাও ঠিক স্ববশে নয়, কারণ স্ববশে থাকিলে পলক পড়িত। আঁখি দু'টী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া, পরিশেষে নিজের অতীব স্বাভাবিক পলক পর্য্যন্ত ভুলিয়া ঐ সর্ব্বরূপ-সার শ্রীনিত্য-গোপাল-মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকে। তখন শ্রবণের শ্রবণ-শক্তি থাকে না, নাসিকার ঘ্রাণ শক্তি থাকে না, জিহ্বার আস্বাদন-শক্তি থাকে না, ত্বকের স্পর্শ-শক্তি থাকে না; নেত্র সকল শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজে পঞ্চগুণ বলীয়ান হয়, অবশেষে পলক ভুলিয়া ঐ মদন-মন্মথ রূপ দর্শন করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তগণের বুঝি কথামৃত পান করিবার অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই!

দুইজন নিঃশব্দে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। কথামৃত-স্রোতে ক্ষণেকের জন্য বাধা পড়িল। ঠাকুর করুণ-কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কে কে নূতন এসেছেন?"

বলিহারি—বিনয়ের পূর্ণ-আদর্শ! 'এসেছেন' —কেন? 'এসেছে' বলিলে কি দোষ হইত? দোষ হইত বই কি? দেব! তুমিই না এক দিন ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন-রথে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলে,—"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ—"এও তোমার লোক শিক্ষার অঙ্গ!

রাম দাদা আমাদের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; তিনি উত্তর করিলেন, —"কবিরাজ মহাশয়ের মাষ্টার আর তাঁহার খুড়তুত ভাই।"

"কৈ, মাষ্টার এসেছ? কৈ? আমার সামনে দাঁড়াও";—ঠাকুর প্রত্যেক অক্ষর স্নেহ-সুধায় সিঞ্চিত করিয়া এই কথা কয়টি বলিলেন। জানিনা স্বর্গে কত সুখ, মুক্তিতে কত আনন্দ! শ্রীশ্রীদেবের এই অমিয়-সিঞ্চিত-বাণী আমার প্রাণে যে আনন্দের ধারা বর্ষণ করিতেছিল, আমার এ ক্ষুদ্র লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। দুর্ভাগ্য আমরা —তাই আজ এ স্বর্গাতীত সুখে বঞ্চিত! আমি আনন্দোৎফুল্ল-মুগ্ধ-হৃদয়ে সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি আবার সেই স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আমাদের শারীরিক এবং পারিবারিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া আহারাদির সংবাদ জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম,—"পথে জলযোগ হইয়াছে।"

ঠাকুর একটি ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন,— "এদের আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, যদি এদের কোন আপত্তি * না থাকে।"

ঠাকুর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; পুনর্ব্বার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অপক্ষভেদে চতুর্ব্বর্ণের দোষ-গুণ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত যুক্তিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছিলেন। হিন্দুর কোন শাস্ত্রে কোন বর্ণ সম্বন্ধে কি কি দোষগুণ বর্ণিত আছে, তাহা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অনর্গল বলিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন, সমগ্র শাস্ত্র-ভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে—তিনি আবশ্যক অনুযায়ী এক একখানি গ্রন্থ হইতে শ্লোকগুলি বলিয়া যাইতেছেন। এক একটী শ্লোক —সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের নাম;—অধ্যায়টি পর্য্যন্ত বাদ পড়িতেছে না। ভক্তগণ এই অদ্ভুত শাস্ত্র-জ্ঞান, অভাবনীয় স্মৃতি-শক্তি, অগাধ

---

* অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীদেবের ভোজন না হইলে, নিজে ভোজন করিতে আপত্তি করিতেন। লেখক।

পাণ্ডিত্যের একত্রে বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন! বাণি-বন্দিত! এ পাণ্ডিত্য তোমাতেই সম্ভব। আর তোমাতে অসম্ভবই বা কি? যাঁহার করুণা-কণা লাভ করিয়া পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়,—মহামূর্খ পণ্ডিতশিরোমণি হয়, বহু-শাস্ত্র হইতে বহু-শ্লোক আবৃত্তি করা তাঁহার নিকট অতি সামান্য মাত্র!'

আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সঙ্গী—রঞ্জন বাবু যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন,—পালঙ্কোপরি **বাল-গোপাল**-মূর্ত্তি বালক-স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পদ-পঙ্কজ দোলাইতেছেন। দেখিবা মাত্রই তিনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া গেলেন,—প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তেই অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তিনি বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, আর বালগোপাল মূর্ত্তি নাই—তৎস্থলে সহস্র-সূর্য্যসকাশ **শ্রীনিত্য-গোপাল** পালঙ্কোপরি পদ্মাসন-সমাসীন!—রঞ্জন বাবু অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিলেন, তাঁহার চাক্‌রী ঠিক হইয়া গিয়াছে।

(কোন ভক্ত আমার নিকট খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মাষ্টার! কেমন লোক নিয়ে এসেছ? প্রণাম ক'র্‌তে জানে না"? ভরসা করি তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিবেন।)

কথা প্রসঙ্গে রাত্র দ্বিপ্রহর অতিত হইল; ঠাকুর ভক্তগণের বিশ্রামের সময় অবগত হইয়া বলিলেন,—"এখন বিশ্রাম করা ভাল।" ভক্তগণ একে একে প্রণামান্তর বাহিরে চলিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

রুইদাস।

গুরু শ্রীরামানন্দের এক ব্রহ্মচারী শিষ্য ছিলেন। বারাণসী ধামে রামানন্দ প্রভুর সেই সময়ে আশ্রম। ব্রহ্মচারী উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন-ভাবে কিরূপে গুরু-সেবা করিতে হয়, কিরূপে—"সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ—" এই মন্ত্রের সাধন করিতে হয়, তাহা ব্রহ্মচারী বেশ বুঝিয়া ছিলেন। গুরুদেবের আদেশে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তদ্বারা গুরু-সেবা করিতেন। ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কোন এক ধনী তাঁহাকে মুষ্টি ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যহ 'সিধা' লইতে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মচারী গুরুর আদেশ না থাকায় কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। মনের আনন্দে গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ প্রভু সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদিদ্বারা ইষ্টদেবের ভোগ দিয়া উভয়ে প্রসাদ পান। একদিন অতিশয় ঝড় বৃষ্টির জন্য ব্রহ্মচারী মুষ্টি-ভিক্ষা করা অতিশয় অসুবিধা দেখিয়া, সেই ধনীর নিকট হইতে 'সিধা' লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। রামানন্দ প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দনের মত ঐ দ্রব্যগুলি রন্ধন হইলে পর, ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতে বসিয়া প্রাণের মধ্যে কি যেন এক অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন; ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইল না;—চিত্রপটে ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাইলেন না। কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাকুল হইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, আজ ভিক্ষাদ্রব্য কোথায় পাইয়াছ?"

শিষ্য মস্তক অবনত করিয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। রামানন্দ কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"কেন, আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে কোন 'বিষয়ী'র গৃহে স্থূল-ভিক্ষা করিতে বারণ করিয়াছি।

'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥'
শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ।

"উদাসীন, ত্যাগী ও সন্ন্যাসীর মুষ্টি ভিক্ষা ব্যতীত আর কিছুতেই অধিকার নাই। ইহা ছাড়া আর যাহা বাঞ্ছা করিবে, তাহারেই সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবে। আমি তোমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তথাপি তুমি আমার কথা শুন নাই; অতএব আমার বাক্য অবহেলা করায় তোমার পাপ হইয়াছে এবং তাহার ফলে তোমাকে পর জন্মে অতি নীচ কুলে জন্ম লইতে হইবে।"

ব্রহ্মচারী অবনত মস্তকে গুরুদেবের অভিশাপ স্বীকার করিলেন। পিতা মাতা যে সন্তানকে বিশেষ ভাল বাসেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক যে ছাত্রটীকে অধিক স্নেহ করেন, সর্ব্বদাই তাহাকে চক্ষের উপর রাখিতে চান; সামান্য দোষ দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ উহা সংশোধন করিয়া পুত্র বা ছাত্রটীকে ভাল করিবার চেষ্টা করেন। গুরুদেব আজ শিষ্যের দণ্ড বিধান করিয়া সেই স্নেহেরই পরিচয় দিলেন। আর শিষ্যও জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, 'গুরু-ভক্তি' একটী মৌখিক ব্যাপার নহে—আত্মসমর্পণ একটি সামান্য বিষয় নহে। যাঁহার হস্তে দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা সমর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহার কার্য্যে আবার বিচার কি? অধিকারই বা কোথায়? তিনি ঐ গুলি লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। লভ্য বস্তু 'শ্রীগুরু' ও শ্রীভগবান;—কৃপণের মত যতক্ষণ সঞ্চিত অর্থে হস্তক্ষেপ না হয়, ততক্ষণ তাহার ব্যাকুল হইবার কোনই কারণ থাকে না। গুরুর অভিশাপে ব্রহ্মচারী এমন কিছুই বুঝিলেন না যে, তিনি গুরু-সেবায় বঞ্চিত হইবেন অথবা তাঁহার শ্রীভগবান-স্মৃতি লোপ হইবে; সুতরাং সুবোধ সুশীল সন্তানের ন্যায় নিজের কুকর্ম্ম জন্য গুরুদত্ত দণ্ড অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেন। শ্রীভগবদ্ভক্তিই ভক্তগণের একমাত্র ধন; সেই ধনে বঞ্চিত না হইলে ভক্তগণ কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—"দয়াময়! প্রাণবল্লভ! যে কোন যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন,—কীট পতঙ্গ হইয়াই তোমার জগতে থাকি না কেন, তাহাতে অসন্তোষ নাই; কেবল একটী কৃপাশীর্ব্বাদ কর যেন সকল অবস্থাতেই তোমার চরণে অটলভক্তি থাকে।"

ব্রহ্মচারী অবশিষ্ট জীবন গুরুসেবায় অতিবাহিত করিয়া দেহরক্ষা করিলেন। গুরুশাপের জন্য পরজন্মে তাঁহার এক চর্ম্মকারের (মুচির) ঘরে জন্ম হইল। গুরু-কৃপায় ও গুরু-সেবার ফলে তিনি 'জাতিস্মর' হইয়া জন্মিলেন। জন্ম-মাত্র পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা মনে হইল—হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তির বিকাশ হইল। শ্রীগুরুচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন,—শ্রীগুরুসেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন, এই চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শিশু মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করে না। পিতামাতা কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই শিশু স্তন খায় না; কেবল কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা কর্ত্তব্যানুরোধে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে অতি প্রিয় পুত্রকেও সময়ে সময়ে কঠোর শাস্তি দেন বটে কিন্তু পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়। গুরু

রামানন্দ জগতের শিক্ষার জন্য প্রিয় শিষ্যকে কঠোর দণ্ড দিয়াছেন বটে কিন্তু করুণায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে;—ব্রহ্মচারীকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন নাই। শিশুর পিতা চর্ম্মকারও মহাপুণ্যবান সন্দেহ নাই, নতুবা তাঁহার গৃহে এমন গুরুভক্ত-হরিভক্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে কেন? যোগভ্রষ্ট মহাত্মারা যে সে ঘরে জন্মগ্রহণ করেন না।

চর্ম্মকার শিশুর অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া অনতিদূরে স্বামীজির আশ্রমে গিয়া কাতরভাবে শিশুটীর অবস্থা জানাইলেন। শুনিবা মাত্র রামানন্দ প্রভুর স্মরণ হইল যে এই শিশুটী তাহার প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচারী।

শিষ্যের গুরুভক্তির সংস্কার দেখিয়া স্বামীজির বড়ই কষ্ট হইল;—ভাবিলেন, 'হায় আমি কি অন্যায় করিয়াছি! লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়াছি; আমার এমন শিষ্যের একটী পাপ ক্ষমা করি নাই! কেন আমার এমন মোহ হইয়াছিল? আমি কেন এমন কুকর্ম্ম করিলাম?' এই দুঃখ-চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু পরে ভাব সম্বরণ করিয়া, মনের ভাব গোপন করিয়া চর্ম্মকারকে কহিলেন;—"তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার পুত্রের কি হইয়াছে? চল, আমি দেখিয়া আসি। ভয় কি? কোন চিন্তা নাই। ছেলে ভাল হইয়া যাইবে।"

রামানন্দ প্রভুর কথা শুনিয়া চর্ম্মকার অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া হাত যোড় করিয়া কহিল;—"সে কি প্রভু! আপনি আমার ঘরে যাবেন কি? আমি যে অস্পৃশ্য চামার।"

স্বামীজি কহিলেন,—"তা'তে দোষ কি? পরের উপকার করিলে শ্রীভগবান তুষ্ট হ'ন। চল, আমি তোমার বাড়ী যাইব।" এই বলিয়া রামানন্দ প্রভু সেই চর্ম্মকারের সঙ্গে তাঁহার বাড়ী গিয়া শিশুকে দেখিলেন। প্রভুকে দেখিবামাত্র শিশু,—নব মেঘের দিকে চাতক পাখির মত, হারান ধনের দিকে দরিদ্রের মত,—এক দৃষ্টে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল: নয়ন ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল; বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল; ভাষার অভাবে মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না। স্বামীজি শিশুর ভাব দেখিয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইলেন! শিশুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—অনেক আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"ভয় কি বৎস! শ্রীভগবান তোমাকে অবশ্য দয়া করিবেন।" এই বলিয়া শিশুর কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। শিশু সুস্থ হইল। ক্রমে বাল্যকালাদি অতিক্রম করিয়া শিশু পূর্ণ বয়স্ক হইল। ভক্তিদেবীও শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সেই ভক্তের হৃদয় অধিকার করিলেন। ভক্তবর চর্ম্মকার-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ দুই জোড়া পাদুকা প্রস্তুত করেন;—এক জোড়া শ্রীভগবানের যে কোন ভক্তকে দান করেন; আর এক জোড়া বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যে কোন ভক্তের জুতা তৈয়ার ও মেরামত প্রভৃতি করিয়া ছদ্মভাবে ভক্তসেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির নিকট হইতে দূরে গিয়া, একটি নির্জ্জন স্থানে একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া, তথায় গোপনে একটী 'শালগ্রাম' স্থাপন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। লোক সমাজে নাম হইল "রুইদাস"। আমাদের ঠাকুরের ভক্তগুলি প্রায় সকলেই "অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ।" রুইদাসও সে নিয়ম ছাড়া নহেন।—

"কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা চালায় কোন মতে।
কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে॥"
(ভক্তমাল)।

তথাপি হরিসেবা ছাড়িবার নয়,—ঠিক বটে এ ব্যাপারটী 'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ'।

কুইদাস শ্রীরাম-মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি দয়ার নিধি শ্রীরামচন্দ্র ছদ্মবেশ ধরিয়া, একটী স্পর্শমণি হাতে করিয়া কুইদাসের কুটীরে উপস্থিত। প্রিয় ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হাঁহে বাপু, তোমার বড় কষ্ট! দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সংসার চালাইতে পার না। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। তোমাকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না, এই স্পর্শ মণি লও। যে কোন লোহে ইহা স্পর্শ করাইবে তাহা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইবে।"

ভক্তবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

আগন্তুক বলিলেন,—"আমি তোমারই ইষ্টদেব।"

কুইদাস হাসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনি যদি সত্য সত্যই স্পর্শমণি আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি আমি ভুলিব? আপনি যদি আমার ইষ্টদেব হ'ন, তবে আমাকে আপনার 'নিত্যমূর্ত্তি' দেখান দেখি।"

ছদ্মবেশী কুইদাসের একটী লৌহময় যন্ত্রে সেই মণি স্পর্শ করাইয়া স্বর্ণ করিলেন। ভক্তবর তাহাতেও ভুলিলেন না; বরং "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন; একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কি অন্যায় করিলেন! ঐ যন্ত্রটী আমার জীবনোপায়; আপনি উহাকে নষ্ট করিলেন! আমি ওরূপ অর্থ চাই না; ওরূপ অর্থে মানুষের রজোগুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে; আমি আপনার ও অর্থ চাই না; আপনার ধন আপনি লইয়া যান।"

ধন্য কুইদাস! ধন্য তোমার উপেক্ষা! ধন্য তোমার প্রত্যাহার! যে নিত্যানন্দ-রত্নাকরের সন্ধান পাইয়াছে, প্রেমানন্দ-স্পর্শমণি যা'র "লৌহময় দেহকে কাঞ্চন" করিয়াছে, সে কি আর তুচ্ছ পার্থিব রত্নের দিকে দৃক্‌পাত করে? স্বয়ং নিত্যানন্দরত্নাকরও তাহাকে অন্য রত্ন দিয়া ভুলাইতে পারেন না। রত্ন ত' দূরের কথা, অষ্ট সিদ্ধিও তা'র কাছে তুচ্ছ!

আগন্তুক বলিলেন,—"সত্য সত্যই আমি তোমার ইষ্টদেব। তুমি আগে এই মণি লও, পরে আমি স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইব।" ভক্তবর ভুলিবার পাত্র নহেন; মনে করিলেন এ বুঝি একটী নূতন পরীক্ষা! আমার হৃদয় মণিকে ভুলাইবার জন্য এ মণি-সমস্যা! বুঝি অবিদ্যারাণীর ছলনা! তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া আগন্তুককে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু বিদায় করিলে কি হয়? ভক্তপ্রাণ, দয়ার নিধি ভক্তের ভৎর্সনা শুনিতেও যে বড় ভালবাসেন! তার উপর আবার দেহযাত্রার জন্য ভক্তের কষ্ট! ঠাকুর গেলেন বটে, কিন্তু মনটী ভক্তকে দিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে আবার সেই ছদ্মবেশে আসিয়া কুইদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁহে! আমি তোমাকে এমন বস্তু দিলাম, তথাপি তুমি কষ্ট পাইতেছ? কই, সে মণি কই?"

কুইদাস হাঁসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! ঠাকুরের কৃপায় আপনি আমাকে ভুলাইতে পারিবেন না; আমি বেশ আছি; কে বলিল আমার কষ্ট? ঐ আপনার মণি চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছি, লইয়া যান; ঐ স্বর্ণও আমি চাই না, মণিও আমি চাই না; অন্য কাহাকেও দিন।"

ঠাকুর বলিলেন,—"বাপু হে, কেন অনর্থক কষ্ট পাও? কিছু অর্থ সম্ভোগ কর! আচ্ছা, মণি না লও, লইও না; প্রত্যহ তোমার শালগ্রাম ঠাকুরের বিছানার তলে পাঁচটী মোহর থাকিবে তাহাতেই তোমার ঠাকুরের সেবা করিও।"

এটীও দৈব ছলনা ভাবিয়া ভক্ত বলিলেন,—"না মহাশয়! আমার ওসব কিছুই চাই না। আপনি অন্য কাহারও কাছে যান। আমি বেশ আছি, আমার কোন কষ্ট নাই।"

ঠাকুর হাসিলেন। রুইদাসের সঙ্কল্প দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রুইদাস দেখিলেন শালগ্রাম ঠাকুরের শয্যাতলে ৫টী মোহর রহিয়াছে। বড়ই বিরক্ত হইয়া মোহর কয়টী দূরে ফেলিয়া দিলেন। অমনি নির্লজ্জ ঠাকুরটী আবার সেই ছদ্মবেশে আসিয়া উপস্থিত। রুইদাসের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার কষ্টে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তুমি কেন ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাইতেছ? স্পর্শমণি না লও, লইও না; কিন্তু তুমি আমাকে শপথ করিয়া বল যে, প্রত্যহ ঐ যে পাঁচটী মোহর পাইবে, তদ্দারা শালগ্রাম ঠাকুরের সেবা করিবে।"

সাধু কহিলেন,—"মহাশয়! সত্য করিয়া বলুন আপনি কে? আমার জন্য আপনি এত ব্যাকুল কেন?"

ছদ্মবেশী ঠাকুর বলিলেন,—"বৎস! সত্য সত্যই আমি তোমার ইষ্টদেব রামচন্দ্র।" এই বলিয়া ভক্তকে স্বরূপ মূর্ত্তি নবদুর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অপূর্ব্ব-অলৌকিক-ব্রহ্মজ্যোতি, সাধু পার্থিব দেহে সহ্য করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া কাষ্ঠবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; কাতর হইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন; কত শ্রীমুখের আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া কত অনুতাপ করিতে লাগিলেন; ঘোর অবিশ্বাসী বলিয়া আপনাকে কত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিছু পরে ভাবতরঙ্গ শান্ত হইলে, মনে মনে স্থির করিলেন, ঠাকুরের দত্ত মোহর লইয়া সেবার শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করিবেন। সুন্দর শ্রীমন্দির, নাট মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত হইল; ভোগরাগের বিশেষ ব্যবস্থা হইল; নৃত্যগীত মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল; হরিভক্তগণের সমাগমে, হরিকথালাপে সাধুর আবাসে আনন্দের উৎস ছুটিল—প্রেমের বন্যা বহিতে লাগিল।

অতঃপর 'ঝালী' নামে কোন এক রাজমহিষী বহুকাল হইতে সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার ইচ্ছামত গুরু লাভ হয় নাই। ভক্ত রুইদাসের কথা শুনিয়া তিনি এক দিন এই সাধুকে দর্শন করিতে আসিলেন। সাধুকে দেখিবামাত্র সাধুর চরণে 'রাণী' আত্মবিক্রয় করিলেন; স্থির করিলেন, তাঁহার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। রাজমহিষীর সংকল্প শুনিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাণীজির পার্থিব আত্মীয়স্বজন 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন। রুইদাস মুচির ছেলে, অস্পৃশ্য প্রভৃতি কত যুক্তি দেখান হইল। রাজমহিষী তাহাদের সমস্ত তর্ক খণ্ডন পূর্ব্বক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে "বিদ্যামদ, জাতী-অভিমান প্রভৃতি অহঙ্কার থাকিতে শ্রীভগবান লাভ হয় না। শ্রীভগবানের ভক্ত যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তিনি অতি বিশুদ্ধ—পরম পবিত্র; যাঁহার হৃদয়

পতিত পাবনের বাসস্থান, তিনি কখনই অস্পৃশ্য হইতে পারেন না; হরিভক্ত যে জাতাই হউন, তিনি গুরুস্থানীয়; তিনিই ভুান পাবন।" এইরূপ যুক্তিজালে ঐ অভক্তগুলিকে নিরস্ত করিয়া, রাজমহিষী সগর্ব্বে রুইদাসকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিলেন। নগরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

অনন্তর ভক্তমহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীভগবান এক খেলা আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী এক দিন গুরুদেবকে আপন বাড়ী আনিয়া ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রুইদাসকে ও সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে সমবেত হইলে রাণীজি এক পংক্তিতেই সকলের স্থান করিলেন; রুইদাসও সেই পংক্তিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণগণ মহাবিপদে পড়িলেন;—রাজমহিষীর ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিয়া রুইদাসের নিকট হইতে দূরে গিয়া বসিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যেখানে যান সেইখানেই দেখেন পাশে রুইদাস! আবার সরিয়া যান,—আবার দেখেন পাশে রুইদাস! অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণগণ অগত্যা ভোজন করিতে বসিলেন এদিকে ভোজনান্তে রাণীজি তাঁহার গুরুদেবকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া নিজ হস্তে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ অবাক হইয়া রাণীজির কাণ্ড দেখিতে দেখিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রুইদাসের দেহে অপূর্ব্ব বিষ্ণুজ্যোতি প্রকাশ হইল। ব্রাহ্মণগণ স্পষ্ট দেখিলেন, সাধুর স্কন্ধে একটী যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে?—"ধন বিদ্যা কুল আর মহত্ত্ব যৌবন"—অবিদ্যা রাণীর এই পঞ্চ কুমারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে ত বৈকুণ্ঠ-গোলকের পথ চিনিবার যো নাই! স্বয়ং শ্রীভগবান সম্মুখে উপস্থিত হইলেও জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে না।—যাঁর ধন সেই চেনে! রাজমহিষী প্রাণ ভরিয়া গুরুসেবা করিলেন এবং জীবনের শেষ কয়টী দিন গুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের ভজনানন্দে জীবন সার্থক করিয়া পরমায়ু শেষে নিত্যধামে গমন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অনুগা হইয়া শ্রীগোবিন্দের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইলেন। হে অপূর্ব্ব গুরুভক্ত ব্রহ্মচারা সাধুবর! আর পরম শ্রদ্ধাময়ী রাজমহিষী! কৃপা করিয়া এ অধমকে তোমাদের চরণধূলি দানে কৃতার্থ কর। শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

সমাধি।*

কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি আজি-
সেই 'মনোহর' পুরে!
সমাধি যাঁহার কভু নাহি হয়,
তাঁরি সমাধির দ্বারে!
হেথায় আবেশে বিভোর যোগেশ,
সমাধিমগন হ'য়ে ভাবাবেশ;
অথবা হেথায় আছে অবশেষ
হেথাকার যাহা তাই রে;
নিত্য যাহা তাই গিয়াছে চলিয়া
সে অমৃতসিন্ধু-পারে!

* শ্রীশ্রীগুরুদেবের সর্ব্বপ্রথম তিরোভাব-উৎসব-দিবসে তাঁহার সমাধি-মন্দির দর্শনে। (লেখক)

কেন প্রবোধ না মানে হৃদয় রে,
অশ্রু কাঁপিছে নয়নে ;
মনে হয় মোর সবি সমাপন,
সুপ্ত-সমাধি-শয়নে !
হেরি শত ভ্রাতা মোর কত সাজে,
আজি ব্যস্ত সবাই শত কাজে,
মোর হৃদি মাঝে কি যে ব্যথা বাজে
কহি কা'রে এই শ্মশানে !
(আমি) জোড়ি দু'টী কর আছি দাঁড়াইয়ে
শান্ত অবশ চরণে !
ভোজন-আরতি-শঙ্খ-ঘণ্টা
বাজিয়া উঠিল যবে,
ধূপ-চন্দন-কুসুম-সুবাসে
দিক পূরিল রবে।
করিতে হে প্রভু তোমার সন্ধান,
আজিকার এই মহা অনুষ্ঠান,
পূজিয়া তোমায় হে ভূমা মহান্!
ধন্য হইব ভবে।
"জয় গুরু জয়" রবেতে ভুবন
ভরিল ভকত সবে !

* * * *

(আজি) চকিতে হর্ষে হইয়া আকুল
সম্মুখে হেরি কাঁহারে !—
হারায়েছি ব'লে হইয়া ব্যাকুল
খুঁজিতেছিনু যাঁহারে !
প্রভু হাসিয়া কহিলা,—"মুগ্ধ ওরে,
আছি আমি সা'রা বিশ্বটী ঘিরে,
প্রকৃতির শত শোভার মাঝারে
খুঁজিয়া পাইবি মোরে" !
আজি অন্ধ পাইল দিব্য নয়ন
দেবতার শুভ বরে !
তোমারে খুঁজিয়া পাইনু ঠাকুর,
তোমারি সমাধি-দ্বারে !

শ্রীজনরঞ্জন রায়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি।

মা হারা সন্তান।

আমায় একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় লুকালে মা ? আমি যে ভয়ে সারা হ'লাম ! যেদিকে তাকাই সেই দিকেই যে নিরাশা ! আপন ভেবে, জুড়াইবার স্থান ভেবে যা'কে ধরি, সেই যে আমাকে পর ভেবে দূর ক'রে দেয়। কোথাও তো সুখ পাই না মা ! যখন রজনীর অন্ধকার-ভেদ করিয়া পূর্ব্বাকাশে লোহিতবর্ণ বালসূর্য্য দেখা দেন, তাঁহার শ্রীমুখকান্তি দেখিয়া মনে কত আশা করি। মনে হয়, ইনি বুঝি আমার সুখের সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন ; তুমি বুঝি ইঁহার মধ্যে বসিয়া আছ। এখনি আমাকে কোলে লইবে। তাই কত সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকি। ক্রমে ঐ লোহিত বালসূর্য্য যে মধ্যাহ্ন গগনে উপস্থিত ; কিন্তু মা তোমায় দেখা তো পেলাম না ? এখন যে রবি আমার প্রতি বড় রাগ ক'রে তাকাইতেছেন, আর যে তপনের পানে তাকা'তে পারি না ; চক্ষু যে জলে গেল মা ! ঐ যে ভানু দেখ্‌তে দেখ্‌তে

পশ্চিম আকাশে গিয়া আবার মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন। তবে কি মা তোমার দেখা পাব? কৈ তাতো নয়, উনি যে আমার দুরাশা দেখে উপহাসের হাসি হেসে লুক্‌ইলেন।

তোমার দেখা কোথায় পাব মা? ফুটন্ত মল্লিকা ফুলে, কোকিলের কূজনে, শশধরের সদা হাসিমাখা মুখে, সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে. তোমাকে কত খুঁজিলাম মা! তবু তো দেখা দিলে না। অভ্রভেদী হিমাচল-শিখরে, কুল-কুল-নাদিনী-নদীপুলিনে, কত পুণ্য তীর্থে, তোমার দেখা পাব ব'লে গিয়া. শেষে যে হতাশ হলাম মা! উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল অকূল সাগরের পানে কত আকুল প্রাণে চেয়ে রইলাম; কেবল তোমার দেখা পাব বলে। মা! সে অকূলেও তো তুমি আমায় কোলে নিলে না! আমি তোমার অবোধ ছেলে; না বুঝে যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তাই ব'লে কি মা! আমাকে ফাঁকী দিয়ে এমন ক'রে লুকিয়ে থাক্‌তে আছে? বেলা গেল মা! একবার দেখা দাও। ঐ দেখ মা! পশ্চিম আকাশে ঘোর মেঘ উঠেছে; পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেল। মেঘের কি শ্রবণ-ভৈরব গর্জ্জন! কি ভয়াবহ অশনিপাত! আর যে কিছু দেখতে পাইনা, মা! বুক যে দুড়্‌ দুড়্‌ করছে; শরীর যে অবশ হচ্ছে, প্রতিপদে যে পা ভেঙ্গে পড়ছে, কার কাছে যা'ব মা? কোথায় দাঁড়াব মা? মা হ'য়ে দুর্ব্বল ছেলেকে অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছ কেন মা?

সম্মুখে নিবিড় বন। ঐ শুন মা! কত বাঘ ভালুক ডাক্‌ছে আজ বুঝি আমার প্রাণ যায় মা! ঐ যে একটী আলোক দেখা যাচ্ছে! দয়াময়ি! তুমি কি এ ঘোর বিপদে আমাকে বাঁচাবে মা? ঐ যে, আলোকে একটী মন্দির দেখা যা'চ্ছে, মা এইবার বুঝি বাঁচলাম, এবার একটু আশ্রয় পেয়েছি। এমন অদ্ভুত মন্দির তো কখনও দেখি নাই। পাঁচটী দ্বার কি বৃহৎ! সকল গুলিই যে উন্মুক্ত! এই পাঁচটী দ্বার ছাড়া আরও কত ছোট ছোট দ্বার খোলা আছে, এই মন্দিরে কি তুমি আছ মা? ঐ যে আমার মত তোমার কত ছেলে মন্দিরের ভিতর তোমায় ডাক্‌ছে, মরি! মরি!! মন্দিরের মধ্যে কি অপরূপ শোভা! ইন্ধন-বিহীন এমন তেজঃ-পুঞ্জ-অগ্নিতো কখনও দেখি নাই। আলোকে যে বন আলো করেছে, মা! বৃহৎ পঞ্চদ্বারের উপর কি লেখা মা? আহা! অক্ষরগুলি কি সুন্দর! মা! আমাকে যদি মন্দিরে এনেছ, তবে একবার সকল দিক্ ভাল করে দেখি; যদি ভাগ্য গুণে তোমার সাক্ষাৎ পাই মা। দ্বার গুলির উপরে "শাক্ত", "শৈব", "গাণপত্য," "সৌর" ও "বৈষ্ণব" এই সকল শব্দ লেখা কেন মা? মধ্যস্থলে এক প্রশস্ত মর্ম্মর প্রস্তর এক গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে কেন মা? গ্রন্থগুলির আয়তন কি বৃহৎ। অবিশ্রান্ত শত সহস্র বৎসর অনর্গল পাঠ করিয়াও যে শেষ করা যায় না মা। কত বেদ, দর্শন, আগম, নিগম, পুরাণ, গীতা, কোরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ রহিয়াছেন। কত সুর, অসুর, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, মুনি ও ঋষি দিবানিশি গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু মা! কৈ তুমি গো এখানেও আমাকে দেখা দিলে না? সকল শাস্ত্রই যে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রান্ত হইল। মা! তুমি কোথায় আছ একবার আমায় বলে দাও। আমি তোমার গুণদোষ বিচার করিতে চাই না মা! আমি চাই তোমাকে। আমাকে একি ধাঁধায় ফেলিলে মা! আমি যে ম'লাম গো!

এ মন্দিরের আলোকে কেন পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে এলাম মা! আমি যে আঁধারে তোমা ক ডেকে অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলাম। এখানে এসে আমার যে আরও ভয় হচ্ছে,— ভরসা যাচ্ছে! মা গো! দয়া করে এ মন্দির থেকে আমাকে টেনে বাহির কর।

মন্দিরে যা'রা র'য়েছে, তা'রা যে আমাকে পাঁচ দিকে টেনে মেরে ফেলে মা! আমি যে আর টানাটানিতে বাঁচি না। তোমাকে খুঁজতে এসে শেষে কি এই হ'লো! মা! আমি তোমার বেদবেদান্ত দেখতে আসি নাই; আমি দেখ্‌তে চাই কেবল তোমাকে। তাই বলি মা! দয়া ক'রে একবার দেখা দাও। আমার সঙ্গে এমন বর্‌ছ কেন মা? সময় সময় মনে হয় বুঝি তোমার দেখা পেলাম। আবার তখনই এমনই লুকাও যে মনে আর আশা হয় না যে তোমার দেখা পা'ব।

জগতে অনেক দেখ্‌লাম। কেহ কেহ আমার দুঃখ দেখে একটু দুঃখ প্রকাশ করিল। কেহ বা আমাকে কাতর দেখে দুটা মিষ্টকথা বলিল। কি করি; তাহাদের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ পাতালেম। কাহাকেও বন্ধু, কা'হাকেও স্ত্রী, কাহাকেও পুত্র বলিয়া জানিলাম, তাহাদের সঙ্গে একটু মাখা মাখিও করিলাম, মন একটা বৈ তো দুটা নয়। তাই মা! মনের বাজে খরচে তোমাকেও ভুলিলাম। এ ল'ভুলোয়ে পড়ে আমি পাঁচ জনের মধ্যে একজন হ'লাম। কিছু কাল কাটালামও ভাল; কিন্তু মা! কাল তো আমার হ'ত ধরা নয়।

"কাল কর্‌ছে হৃদয়ে বাস, বাড়্‌ছে যেন শ'লের কোঁড়া।" শরীরে ক্রমে জরা বার্দ্ধক্য দেখা দিল। জঠরানল মন্দীভূত হইল। পরিপাক-শক্তির হ্রাস হইল। দেহের আর তাদৃশ বল নাই, অর্থ উপার্জ্জনের আর ক্ষমতা নাই। এখন বুড়ো হ'লাম। যাঁদের আপন ভেবে কত সাধের সম্বন্ধ পাতাইয়াছি, তাহারা এখন ফিরে তাকায় না। কত দুর্ব্বাক্য বলে; সময় সময় বলে, "বুড়ো" মলে বাঁচি, আর কতকাল যোগাবে? এই তো মা সংসার! আগে চিনিতে পারি নাই; এখন চিনেছি। দুই দিন বেঁচে থাকিলে আরও চিনিব। তাই বলি মা! আমাকে এমন দুর্বিপাকে ফেলে আর কত দুঃখ দিবে?

(ক্রমশঃ)

ভক্ত-কৃপা-ভিক্ষু
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু।

প্রীতির জন্য

"—তস্মিন্ প্রীতিস্তৎকার্যসাধনঞ্চ ধর্ম্ম—"

মন্ত্রদৃক্ প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রণালীদ্বারা মনস্তত্ত্বের দুরূহ সংজ্ঞানিচয়ের সরল সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ সুমীমাংসা জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচরীভূত হয় না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধযোগে তাঁহারা অন্তর্জগতের প্রত্যেক ভাবের—প্রতি অবস্থারই জন্য-জনকত্ব সুব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যদর্পণকার 'ভাব'কেই নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ভাব' মনোতাড়িতের প্রথম স্পন্দন—'ভাব'ই আদি ছন্দ। বেদান্তের বিশাল উরসে ভাবের মূল 'কারণ' অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা পরা-পশ্যন্তী-

মধ্যমা-বৈখরী চতুর্ব্বিধ ভাবময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি।—সে মূর্ত্তি— "ব্রহ্ম-চৈতন্য-নীড়ে"—। মাধুর্য্যের দিকে ত 'ভাব'ই সর্ব্বস্ব—

—"যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি"—

'ভাব' ঘনীভূত হইলে 'প্রেম,' প্রেমের নির্য্যাস 'প্রীতি'। প্রীতি-প্রফুল্ল প্রেমময় রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নিত্য গৌর-কৃষ্ণ ব্যতীত 'প্রীতি'র জনক দ্বিতীয় আর কে হইতে পারে? এবং সেই প্রীতির দেবতার নিষ্কাম 'সেবা'ই প্রীতির 'জন্য'—'কার্য্য'। এই সেবা শৌদ্রদাস্য নহে। কিন্তু 'স এব সমস্তাৎ' প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই প্রাণপ্রতিমার প্রীতির জন্য আত্মবলিদান মাত্র। ব্রহ্মণ্যের চরম পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা। শূদ্রের জন্য নহে, বৈশ্যের জন্য নহে, ক্ষত্রিয়ের জন্যও নহে, এক মহান্ ব্রহ্মণ্য-বিরাটের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। একদল ব্রাহ্মণ চাই। ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে আত্মাহুতির মহাহোম প্রয়োজন। ব্রহ্মণ্যের নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করিতে কর্ম্মের যাহা কিছু প্রয়োজন,—উহার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রয়োজনীয়তা নাই। ব্রহ্মণ্যের অত্যুচ্চ আদর্শে পৌঁছিতে না পারিয়া যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম ক্ষত্রীয়াদি হইবেন!

বশিষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বামিত্র এবং ভ্রষ্ট-ব্রহ্মণ্য দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়ের গুরু। অপরাপর বর্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা। ব্রহ্মণের জন্যই হউক কি ক্ষত্রিয়াদির জন্যই হউক, কর্ম্ম ত করিতেই হইবে। যতই কেন বিরক্তি প্রকাশ কর না, যতই কেন বৈরাগ্য প্রদর্শন কর না কর্ম্মত করিতেই হইবে। তোমার বৈরাগ্য মর্কটবৈরাগ্য মাত্র। নর-নারায়ণ-কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনকেও এই ক্ষুদ্র-হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তুমি আমি কোন ছার! আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিওনা।—"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ"—তুমি যে পৃথার সন্তান। জননীর কথা, জননীর ব্যথা, জননীর দুর্দ্দশা সব কি ভুলিয়া গেলে?—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—উঠ, মোহনিদ্রার কাল-শয্যা ত্যাগ কর, নিত্যরূপী পরমাত্মগুরুকে লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হও—ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিত্যস্থিতি লাভ কর। এই শান্তি-পদবী না ভজিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ কুটিলতার কোন্ কুহকে, কোন্ মোহের ছলনায় আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ? "অসম্ভাবনা" ও বিপরিত ভাবনা ত্যাগ কর, তোমার কল্যাণ হইবে। তুমি বুঝিতেছ না 'ভূতানুকম্পা'র ভাগবতী রথ্যা পরিত্যাগ করিয়া কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া পড়িতেছ। তুমি বুঝিতেছ না অতি সাত্ত্বিকতার ভানে ঘোর তামসিকতার আশ্রয় লইতেছ। বুঝিতেছ না কর্ম্ম উপেক্ষা করা কর্ম্মত্যাগ নহে। বুঝিতেছ না কাপুরুষতা তিতিক্ষা নহে। ভারতে তোমার জন্ম; হে ভারত! তিতিক্ষা অভ্যাস কর, কিন্তু মনে রাখিও তিতিক্ষা বীরত্বের কার্য্য,—পুরুষত্ব-বিবর্জ্জিত ক্লীবের হৃদয়ে তাহার ছায়া পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হইতে পারে না। ত্যাগের কথা কি বলিতেছ? কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হইল? যাবৎ সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে না পারিতেছ তাবৎ তোমার ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।—তাবৎ তুমি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের যোগ্য হইতে পার নাই। কৃষ্ণ-সখা শক্রনন্দন অর্জ্জুনও 'ন যোৎস্যে'—বলিয়া কর্ম্ম-নেমীর নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মারম্ভ ব্যতীত তিনিও কর্ম্মত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই;—তবে তোমার আমার সে নিষ্ফল আত্ম-প্রবঞ্চনার ঘোর

তামসিক অভিনয়ের পৌনঃপুনিকতায় কি হইবে? তোমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোরা প্রকৃতি তোমাকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। দুরন্ত কর্ম্মচণ্ডাল তোমাকে নিত্য নিষ্ঠুর কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। কর্ম্ম না করিয়াত তুমি এড়াইতে পারিবে না—প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া উঠিতে ত পারিবে না, অধিকন্তু কতকগুলি অকর্ম্ম করিবে। অকর্ম্মদ্বারা এমন কতকগুলি অভিনব কর্ম্মের সৃষ্টি করিবে, যাহাতে তোমাকে বন্ধন হইতে বন্ধনের বিষম নিগড়ে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাই বলি, অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া আর কামাচারের প্রশ্রয় দিও না, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া 'আপাপন্থী' হইতে যাইও না। সদ্‌গুরুর নিত্যানুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে দৃঢ়প্রযত্ন ও বদ্ধপরিকর হও। নতুবা তোমার এই বিড়ম্বিত অর্থশূন্য জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

তুমি নৈষ্কর্ম্ম্যজনিত প্রসন্নতা লাভ করিতে চাহিতেছ, অথচ কর্ম্মারম্ভ হইতে সযত্নে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছ. ভাবিয়া দেখ দেখি ইহা তোমার কিরূপ বাতুলতা! বাতুল! কিং নাস্তি তব নিয়ন্তা? কমল তুলিতে যাহার সাধ, কণ্টকে ভীতি থাকিলে তাহার চলিবে কেন? মণিতে যাহার প্রয়োজন, ফণীর ভয় তাহার থাকা নিতান্তই যুক্তিবিগর্হিত। যোগপদবীতে আরোহন করিতে যাহার সাধ, 'কর্ম্ম' তাহাকে করিতেই হইবে। "কর্ম"ই যোগের 'কারণ'—'জনক'। "আরুরুক্ষুমুনের্যোগ 'কর্ম্ম' কারণমুচ্যতে"—কার্য্য-কারণে নিত্য সম্বন্ধ। নিত্যে যাহার অনিত্য ধারণা হয়, অসূর্য্যনামা অন্ধতমঃ নরক তাহার জন্য নিত্য-নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"—সাধনার ইহাই ক্রম, সাধনার ইহাই প্রণালী! প্রণালী ধরিয়া যাও, নিত্য-কৃষ্ণের সাশ্বাস-প্রোৎসাহিনী বাণী শুনিতে পাইবে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্—" নৈষ্কর্ম্ম্য চাও, কর্ম্ম কর। প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে চাও, আপনাতে আপনি থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও; ব্রাহ্মীস্থিতি চাও, কর্ম্ম কর। জীবনের চরম পরিণতি—'প্রেমাপুমর্থো' মহান্—প্রেমে অভিরুচি থাকে, কর্ম্ম কর। প্রেমের পরিপক্ক ফল প্রীতির প্রতি প্রীতি থাকে, কর্ম্ম কর। কর্ম্ম-ব্যতীত যোগক্ষেমরূপ পরম নিশ্চিত শ্রেয়ঃ লাভের অন্য প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই। 'কর্ম্ম'ত করিতেই হইবে, তবে 'যেন তেন প্রকারেণ' করিলেত চলিবে না। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আপ্তবাক্যসম্মত ইষ্টগোষ্ঠিমতানুযায়ী সুকৌশল কর্ম্ম করিতে হইবে। সুকৌশল কর্ম্মই 'যোগ'। স্বিস্ত বাসনার লেশ থাকিতেও' সুকৌশল কর্ম্ম হইবে না। কর্ম্মে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইবে। কর্ম্ম আবার নিষ্কাম কিরূপে হয়? কর্ম্মের মূলে ভগবৎ-প্রীতি ভিন্ন অন্য কামনা না থাকিলে কর্ম্মের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধের অভাবে কর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। কামনামাত্র শূন্যতাই নিষ্কামতা নহে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-রাহিত্যই নিষ্কামতা। 'নিষ্কাম' হওয়া অর্থে প্রেম-পিচ্ছল প্রীতির দেবতার **প্রীতির জন্য** হওয়া। শান্তিমন্ত্রের বৈদিক ঋষির ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়—

—প্রীতি প্রীতি-প্রীতয়ে ভূয়াৎ,—

মা ভূয়াদাত্মপ্রীতয়ে।
প্রীতি ভুক্তি প্রীতি মুক্তি
তন্নো প্রীতি প্রচোদয়াৎ ॥"

প্রকাশক শ্রীসরোজ গোপাল অধিকারী।

ভগবানের ভজন

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

সে তাঁহাতে মজিয়া কি সুখ অনুভব করে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে, যথা :—

"এই প্রেম-আস্বাদন, তপ্তইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥
বাহিরে বিষের জ্বালা, অন্তরে আনন্দখেলা,
কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত।"

আর এখানে জনৈক ভক্ত শ্রীনাথরচিত একটী গান সংযোজিত করিলাম,—

"আর কি আমার সে দিন গো হবে না।
হৃদয়ের জ্বালা কভু কি গো যাবে না ॥
কতদিন বসি বসি, ডাকিতেছি দিবা নিশি,
আসিয়া কি মোরে দেখা তুমি দিবে না ॥
হৃদয়-দুয়ার খুলে, ডাকিতেছি এস বলে,
শূন্য আসনে নাথ! আসি কেন ব'স না ॥
কতই যে আশা ক'রে, আছি আমি ধৈর্য্য ধ'রে,
নয়নে সে ছবি আর দেখিতে কি পাব না ॥
অধম পাতকী ব'লে, আছ বুঝি প্রভু ভুলে,
তাই আমি হৃদি-মাঝে পাই এত যাতনা ॥
তুমি যে দয়াল প্রভু, ভুলিতে কি পার কভু,
যদি নাথ! ভুলে যেতে এজীবন র'ত না ॥
শ্রীনাথ বলিছে এবে, যত দিন প্রাণ রবে,
জীবন-সম্বল! যেন হৃদি ছেড়ে থেক না ॥"

যখন তাঁহার নাম, তাঁহার গুণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম, তাঁহার লীলা ইত্যাদি স্মরণ করিয়া নববিধা ভক্তি যাজন করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তের মত্ততা উপস্থিত হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির বলবতী আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দর্শন ও মানস জগতে প্রবেশ করিয়া আংশিকরূপেও নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন বাহির হইতে মনে হয়, তাহার খুব জ্বালা অনুভূত হইতেছে, কিন্তু আভ্যন্তরিক যে সুখ অনুভূত হয় তাহা এমন কাহারও সাধ্য নয় যে মুখে বিবরিয়া বলিতে পারে।

নারদ-সূত্র বলেন,—
"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।"

ভগবদ্ভক্ত, শ্রীমান্মদনমোহনের মনমোহিনী অখিল-আনন্দযুক্তা মহাভাবস্বরূপিনী পূর্ণতমা শুদ্ধপ্রেমস্বরূপিনী ভক্তচকোরের শীতল-পূর্ণ-প্রেম-সুধা-প্রদায়িনী শ্রীমতি রাসেশ্বরী রাধারাণীকে অখিল-আনন্দ-যুক্ত রসবিলাস শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহনের বামে রাখিয়া ঐ যুগল-চরণ হৃদ-পদ্মে দাঁড় করাইয়া—ঐ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অখিল-আনন্দযুক্ত শুদ্ধপ্রেমময় ও প্রেমময়ীর রূপযুগল দর্শন, স্পর্শন ও সেবা ইত্যাদি করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এই পার্থিব জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়,—নিজকেও হারাইয়া ফেলে। আহা মরি মরি! সে ভাগ্য একবার কাহারও উদয় হইলে, আর কি সে পার্থিব জগতে থাকিতে ইচ্ছা করে! সে এই জগতের কাছে মৃত হয়। আহা মরি মরি! ঐ যুগলরূপ একবার হৃদয়কুটীরে প্রবেশ করিলে প্রেমিক যে সুখ অনুভব করে,—যদি এককালে সহস্র বদন প্রাপ্ত হয় তথাপিও সে

সুখ বর্ণনা করিয়া তাহার আশা মিটে না। তখন, বিধি তাহাকে মাত্র দুইটী চক্ষু দিলেন কেন, ইহা মনে করিয়া সে খেদযুক্ত হয়। দুই চক্ষুতে ঐ যুগলরূপমাধুরী দর্শন করিয়া আশা মিটিতেছে না—যদি অসংখ্য চক্ষু বিধি দয়া করিয়া দিতেন, তবে কি হইত বলা যায় না। বোধ হয়, তাহা হইলেও দর্শন করিয়া আশা মিটিত না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলেও ঐ যুগলরূপমাধুরীর এমনই মহিমা, এমনই আকাঙ্খা বৃদ্ধি করা গুণ যে আশা না মিটিয়া কেবলই বাড়িয়া যায়; তাই রসিক ভক্ত রামানন্দ রায় গাহিয়াছেন,—

"অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল"।

রসিকভক্ত বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ঐ যুগলরূপ দর্শন করিয়া সমস্তই মধুর এই কথা বলিয়াছেন, -আর কিছু বলিতে পারেন নাই।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ণনা মনে হওয়ায় আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের একটী নিভৃত চিন্তা জাগিয়া উঠিল, তাহা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠক মহোদয়গণ, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। যেমন, কোন পার্থিব প্রেমিকযুগল অনুক্ষণ প্রীতি লইয়া এই সংসারে আনন্দের সহিত দিন যাপন করিতেছে, ভাগ্যবলে যদি উহাদিগের মধ্যে প্রেমিক বা প্রেমিকার শ্রীভগবানের যুগল-প্রেম-সুধা-বর্ণনার মধ্যে বিচ্ছেদ কাহিনী কর্ণগোচর হয়, অমনিই প্রাণ গলিতে আরম্ভ করে—সেই প্রাণগলা ভাবের আনন্দ অনুভব করণ অবস্থায়, সেই ভাবপূর্ণ কাহিনী জানিবার জন্য ইচ্ছা যতই বলবতী হয়, শ্রীভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে ততই প্রেমসুধা বর্ষণ করিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলেন। এই জন্য ভগবদ্বিচ্ছেদকাহিনী ভক্ত-প্রেমিকের প্রাণের জিনিষ। গুরুকৃপা লাভ হইলে, গুরুপদে মতি পূর্ণমাত্রায় যোজিত হইলে, গুরুকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান হইলে, শ্রীগুরু দয়া করিয়া জীবের হৃদয়ে অজস্র প্রেম ও ভক্তিসুধা ঢালিয়া দিয়া তিনিই তাহার অভীষ্ট দেবরূপে হৃদয়ে উদয় হন। এইরূপে তিনি জীবকে অনন্ত সুখের দেশে লইয়া যান। বাইবেলের মতে God is love. তাঁহার প্রেমে এই ত্রিজগত উদ্ভাসিত। মানব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই তত্ত্ব জানিতে বা বুঝিতে পারে না বলিয়া, সেই প্রেমময়ের প্রেমসুধা উপভোগ করিতে পারে না।

মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বারা জীব ভগবানকে নানা ভাবে উপভোগ করিয়া থাকে। কেহ শান্তভাবে, কেহ দাস্য ভাবে, কেহ সখ্য ভাবে, কেহ বাৎসল্য ভাবে, কেহ মধুর ভাবে ভজনা করে। তিনি সমস্ত ভাবেরই গোচর—সমস্ত ভাবেই তাঁহাকে লাভ হয়—তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে জীবের গোচর হইয়া আনন্দ দান করেন ও তাঁহার শ্রীপদে বাঁধিয়া রাখেন। ভক্ত ভগবানের প্রাণ, ভক্তের হৃদয়ে সদা ভগবানের বাসস্থান। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্য মনাগপি" ॥

ভাগবত, ৯,৪,৬৮।

ভক্ত তাঁহার দাস, ভক্তের তিনি আশ্রয়, ভক্ত তাঁহার ভ্রাতা সখা, তিনি ভক্তের ভ্রাতা সখা, ভক্ত তাঁহার পিতা মাতা, তিনি ভক্তের পিতা মাতা ও তাঁহার অতিশয় মধুর প্রিয়জন। তিনি ভক্তপ্রেমিকের প্রাণের প্রাণ, তাই ভক্ত তাঁহাকে কোন অবস্থায় ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

শ্রীমুকুন্দ লাল গুপ্ত।

বৈরাগ্য

'বিরাগ'-শব্দ 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া 'বৈরাগ্য' শব্দ হইয়াছে। অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে বীতরাগ বা ঔদাস্যই বৈরাগ্য। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব মহারাজের মতে,—"**সংসার ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলের প্রতি অরুচির নামই বৈরাগ্য, সংসারে বীত-রাগ ও ঘৃণাই বৈরাগ্য, সর্ব্ব বাসনার নিবৃত্তির নামই বৈরাগ্য।**" (সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণয় সার।)

"সংসারের বিপরীত পরম বৈরাগ্য।
সে বৈরাগ্যে রত যিনি তাঁহার সৌভাগ্য॥"
(নিত্যগীতি।)

বিশিষ্টে অর্থাৎ ভগবানে রাগ অর্থাৎ অনুরাগও বৈষ্ণব গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক বৈরাগ্য শব্দ বাচ্য হইয়াছে। যিনি শ্রীগুরুকৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তি এবং তৎসম্ভোগাদিকে নিত্য-সুখ-শান্তির হেতু এবং অনিত্য বিষয়াদিকে নিরানন্দ এবং মহাদুঃখের কারণ বোধে তৎপ্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্য পথের পথিক। আশুসুখান্বেষণই জীব-প্রকৃতি। তাই হতভাগ্য জীব হিতাহিত বিচার রহিত হইয়া অন্ধের ন্যায় অনিত্য সুখের আশায় আপাত মধুর বিষম বিষয়-বিষ পানের জন্য উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইয়া থাকে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখে না যে, ঐ দারুণ মোহময় বিষয় তাহার ধ্বংসের এবং অনন্ত-দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিবার কারণ। ভগবান ঋষভদেব, শুকদেব, বুদ্ধদেব ও শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতারগণ ও রূপ-সনাতন, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ এবং যিশুখৃষ্ট, টমাস্ এ কেম্পি, সম্রাট বায়োজিদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে অনিত্য বিষয়ে বীতরাগ বা বৈরাগ্যই নিত্যানন্দ এবং পরমাশান্তির কারণ। যদি সংসারই সুখ এবং আনন্দের ক্ষেত্র হইত, তবে ঐ সকল মহাত্মাগণ অতুল ঐশ্বর্য্য, পিতা, মাতা, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া প্রাণারাম শ্রীভগবানের উদ্দেশে চীরবাস মাত্র সম্বল করিয়া গিরিগুহা, বন-উপবন পর্য্যটন করতঃ কাঙ্গালবেশে কিঞ্চিন্মাত্র ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন না। এই মায়াময় সংসারে যদি নিত্য-সুখশান্তি থাকিত, তবে কোন ব্যক্তি বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানকে কামনা করিত? তবে কে, পিতা মাতা জায়া প্রভৃতির স্নেহালিঙ্গন তুচ্ছ করিয়া তদুদ্দেশে সর্ব্বত্যাগী হইয়া দুঃখকে পরমসুখ বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিত? সাংসারিক সুখ যে অসুখের উপর সুখের গিল্‌টী মাত্র, নিরানন্দের উপর আনন্দের রং ধরান মাত্র,—ইহা কোন্ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ষড়্‌দর্শনের মতেই সংসার দুঃখের আবাসস্থল। এখানে যতটুকু সুখ আছে, তাহাও দুঃখের পূর্ব্বরূপ মাত্র।

পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের স্নেহ কখনও নিঃস্বার্থ হইতে পারে না; জীব নিঃস্বার্থ হইতেই পারে না, এজন্য তাহাদের সে স্নেহে নিজ সুখ-শান্তির আশা নিহিত থাকে। জৈব সম্বন্ধের কারণ এই জড় দেহ। সুতরাং দেহ-নাশেই সে সম্বন্ধের নাশ হইয়া থাকে। দৈহিক সম্বন্ধ মায়িক সুতরাং তাহা

সংসার পাশের কারণ। এই সংসার-পান্থ-শালায় কত জীব স্ব স্ব প্রাক্তন-কর্ম্মবশে মিলিত হইতেছে. আবার কর্ম্ম শেষে নিজ নিজ কর্ম্মফল লইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিতেছে; কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখিতেছে না। কোন মহাত্মা জৈব সম্বন্ধ এবং বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"কো বা কস্য ভবেদ্বন্ধুঃ
সর্ব্বং স্বার্থং সমীহতে।
নিরুপাধিঃ সুহৃন্মিত্রং
হরের্ণামৈব কেবলম্॥
সম্পৎসু স্বজনা সর্ব্বে
বিপৎসু বিমুখাঃ সদা।
সম্পদাপৎসু মিত্রং হি
হরের্ণামৈব কেবলম্"॥

অর্থাৎ,—ভবে কেবা কাহার বন্ধু—সকলেই স্বার্থসম্বন্ধজড়িত। একমাত্র হরিনামই জীবের নিঃস্বার্থ নিত্যসুহৃৎ। সম্পদে সকলেই মিত্র—বিপদে সকলেই বিমুখ কিন্তু এই হরিনাম কি বিপদে কি সম্পদে সর্ব্বকালেই মিত্র।

যে তোমায় স্নেহ করে, যে তোমায় ভালবাসে, তাহাকে মিত্ররূপী পরম শত্রু বলিয়া জানিও, কারণ তাহার যত্নে তুমি তাহার প্রতি আসক্ত হইবে। যেহেতু আসক্তি হইতেই স্নেহ-মমতাদির উৎপত্তি। মমতা মহাবন্ধন। দেহ জড় এবং অনিত্য; এই অনাত্ম-জড়-দেহে 'আত্ম-বুদ্ধি'ই সংসারাসক্তি এবং ভব-বন্ধনের কারণ। দেহাত্ম-বুদ্ধি বশতঃই স্ত্রী, পুত্রকলত্রাদি নারী এবং অকিঞ্চিৎকর ধন প্রভৃতিতে 'আমি,' 'আমার' ইত্যাকার ভ্রম উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ ধন, নারী এবং অদিব্য অহং-বুদ্ধি এইগুলি দ্বারা অনিত্য সংসার গঠিত। অনাদি বাসনাই এই বিভীষিকাময়ী সংসারের ভিত্তি-স্বরূপ। সংসারচক্রে আবর্ত্তন-শীল ব্যক্তি 'আমার ধন,' 'আমার স্ত্রী,' 'আমার পুত্র' ইত্যাদি মানসিক কল্পনা দ্বারা অস্থির ভোগ্য বিষয়কে পরম সুখ-সম্পদের হেতু বোধে, পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিস্বরূপ সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ ধ্বংসের পথ প্রসারিত করে। তৃষিত মৃগসকল যেরূপ জলের আশায় মরীচিকা দর্শনে তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া পরিশেষে মরুর উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ মোহান্ধ হতভাগ্য জীব অলীক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খোদাতাল্লা মহাত্মা হাফেজকে বলিয়াছিলেন,—"হাফেজ! সংসার-ত্যাগই চিত্ত-প্রসন্নতার পন্থা। তুমি মনে করিও না যে, সংসারিকদিগের অবস্থা সুখের অবস্থা; সংসার অনুকূল হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করিও না। বিষ অপেক্ষা বিষম এই সংসারকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অমৃততুল্য সুমিষ্ট সংসার আসিবে।" ষড়-দর্শন, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তন্ত্র ও সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রমতেই সংসার অনিত্য, অসার এবং দুঃখের আলয়। সংসার-ভারাক্রান্ত জীবের ভবসাগর পার হইবার চেষ্টা আর বামনের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা একই প্রকার। অর্থ যে অনর্থের মূল এবং এই লক্ষ্মী (ধন) যে চঞ্চলা, নিত্য-সুখশান্তির অন্তরায় ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই অনুমোদিত। এইজন্য ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্॥

ধনমদে মত্ত অন্ধ জীব নিয়ত কত পৈশাচিক লীলাভিনয় করিয়া অহঙ্কার বশতঃ নিজকে কৃতিশীল এবং সৌভাগ্যবান ধনী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে তাহার ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্থ দরিদ্র আর কে হইতে পারে?

ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'মণিরত্নমালা' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"কোবা দরিদ্রোহস্তু বিশালতৃষ্ণঃ"।

অর্থাৎ দরিদ্র কে?—বিষয়ভোগের বলবতী আকাঙ্ক্ষা যা'র আছে। তিনি ধনহীন ব্যক্তিকে দরিদ্র বলেন নাই, তাঁহার মতে বিবেক-বিহীন বিষয়তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিই দরিদ্র। সৌভাগ্য যে সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল—জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উৎপত্তি মাত্রেই বিনাশ-শীল, এই ধন যে আলেয়ার আলোর মত মুহূর্ত্তের জন্যও একস্থানে অবস্থান করে না—এই ধন যে কামাদি বিকারের পরমাশ্রয়—এই ধন যে সুকোমল-বিবেক-লতিকা-ছিন্নকারী কীট স্বরূপ—অবিদ্যাই যে ইহার প্রধানা নায়িকা এবং বিবেক-নাশের কারণ, নিমিষের তরেও জীবের মানস-পটে ইহা উদিত হয় না।

ক্রমশঃ—

শ্রীমহেশ্বরানন্দ অবধূত।

বিরহ।

(১)

ওই যায়, ওই যায়, ওই যায় গোরা গো!
ধর ধর ধর ওরে, ধর ধর ধর গো!
হরিয়ে পরাণ মন, গোরা করে পলায়ন,
কেন করে এ লাঞ্ছন বুঝা নাহি যায় গো।
ধর ধর ধর ওরে, ধর ধর ধর গো!

(২)

হাঁসিতে হাঁসিতে বুঝি গগনে লুকা'ল গো!
কে আছ ধরিয়া দাও হৃদয়-রতনে গো।
বিলম্ব করিলে আর, সন্ধান পাবে না তার,
এখনো সে রূপ রাশি বিমানে ভাতিছে গো!
আকাশের কোলে থেকে ওই যে হাসিছে গো!

(৩)

এমনি করিয়া গোরা কেন চ'লে যায় গো?
দেখা দিয়ে কেন পুনঃ ফিরে নাহি চায় গো?
দারুণ-বিরহ-জ্বালা, প্রাণ করে ঝালাপালা,
ছার পোড়া প্রাণ কেন এখন(ও) না যায় গো?
ভাল বেসে এত জ্বালা হায় হায় হায় গো।

(৪)

হায় হায় এ যাতনা কেমনে সহিব গো?
কা'রে ক'য়ে মনব্যথা পরাণ জুড়া'ব গো?
যা'র তরে দিবানিশি, দুঃখসিন্ধুনীরে ভাসি,
বুঝি প্রাণ তা'রি তরে এত দিনে যায় গো!
'গোরা নিরদয়',—কথা কে করে প্রত্যয় গো?

(৫)

সুখের স্বপন হায়, কেন ভেঙ্গে গেল গো?
সেই ঘুম, কালঘুমে কেন না পশিল গো?
অনন্ত প্রাণের জ্বালা, প্রাণ করে ঝালা-পালা,
তুষের আগুণ সম ধিকি ধিকি জ্বলে গো!
সেই ঘুম, কাল-ঘুমে কেন না পশিল গো?

(৬)

যে ধন পাবার লাগি সকলি তেজিনু গো?
যা'র নাম সার ক'রে ভুবনে গাইনু গো,
প্রাণের পরাণ যেই, তা'র ব্যবহার এই,
নিদ্রাবশে দেখা দিয়ে কেন বা কাঁদায় গো?
সেই ঘুম কালঘুমে কেন না পশিল গো?

(৭)

মরি হায় একি হ'ল, কেন এল কেন গেল,
কিবা ভাব না পারি বুঝিতে।
কিবা কথা হ'য়ে ছিল, কি কথা বা ক'য়ে ছিল,
সব কথা না আসে মনেতে ॥

(৮)

কেবল মনেতে হয়, সে কথা অমিয়ময়,
প্রেমময় প্রেম-আলাপন !
যদি ঘুম না ভাঙ্গিত, না জানি কি সুখ হ'ত,
বুঝি হ'ত আশার পূরণ ॥

(৯)

আমি নারী অভাগিনী, নারী-কুল-কলঙ্কিনী,
হেন ভাগ্য কেমনে হইবে ?
যিনি অগতির গতি, যিনি জগতের পতি,
হেন পতি আমারে মিলিবে ?

(১০)

পেয়ে নিধি হারা হ'য়ে, কি কাজ পরাণ ল'য়ে,
না রাখিব এ পাপ জীবন।
জাহ্নবীর পূত-তোয়ে, এবে গিয়ে প্রবেশিয়ে,
ঘুচাইব সকল বেদন ॥

(১১)

দুঃখেতে অস্থির হ'য়ে, গঙ্গাতীরে যায় ধেয়ে,
হেন কালে শুনে দৈব বাণী।
"না ত্যজ না ত্যজ প্রাণ, ইথে নহে কল্যাণ,
স্থির হও পাবে গুণমণি ॥"

(১২)

আচম্বিতে চাহে ধনি, কোথা হ'তে হয় ধ্বনি,
কেবা কহে, কিরূপ তাঁহার।
নাহি দেখি কোন জনে, সকাতরে ভাবে মনে,
কে করিল আশার সঞ্চার ?

(১৩)

ঊর্দ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধকরে, ডাকি' কয় সকাতরে,
"কহ প্রভু হইয়া সদয়।
বল বল কোথা যাব, কোথা গেলে তাঁ'রে পাব,
কি উপায়ে জুড়াবে হৃদয় ॥"

(১৪)

"যে হই সে হই আমি, পুরীধামে যাও তুমি,
লহ নাম 'শ্রীমাধবী দাসী'।
হেরি' গোরা-চন্দ্রানন, সুধাসিক্ত হ'বে মন,
নিত্যানন্দ যাহে অভিলাষী ॥

(১৫)

"প্রেম-করুণায় ভরা, প্রেমে ঝরে আঁখিধারা,
পাষণ্ড তারিতে সদা মতি।
কলিতে এমন জন, নাহি আছে কোন জন,
—নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥"

(১৬)

আনন্দে বিভোর হয়ে, চ'লে রামা নাম গেয়ে,
হাসে কাঁদে কভু গড়ি যায় ;
দীন হীন করে আশ, কর তা'রে দাস দাস,
নিত্যানন্দ প্রভু গোরারায় ॥

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব।

Lakshmibilas Press.

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা ।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না । কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না । প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন । যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন ;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩ ।]

১ম বর্ষ । } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০ । সন ১৩২১, আষাঢ় । { ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

ঈশ্বর ।

অনন্ত জ্ঞান যাঁহার, তিনি আমার ঈশ্বর,
সর্ব্বজ্ঞতা আছে তাঁ'র আছে সর্ব্বশক্তি ।
তিনি অনাদি কারণ
সর্ব্ব-কারণ-কারণ,
তাঁহাতে জড় চেতন অবস্থান করে ।
নানারূপে ব্যাপ্ত তিনি বিশ্ব চরাচরে ॥
তাঁহাতে ভক্তের ভক্তি,
মুক্ত পুরুষের মুক্তি,
তিনি ব্রহ্ম সনাতন, তিনি ব্রহ্মশক্তি ।
তিনি শিবানী অনাদ্যা,
তিনি যে শাম্ভবী আদ্যা;
সর্ব্বশক্তিমতী গৌরী তাঁহাতেই বিদ্যমান ।
তিনি গৌরাঙ্গ সুন্দর,
মদনমথন হর,
সদানন্দ সত্য সনাতন ।
দীননাথ দিগম্বর,
সদানন্দ শুভঙ্কর,
নিত্যানন্দ নিত্য-নিরঞ্জন,
প্রকৃতি-পুরুষাতীত পুরুষ প্রধান ।

যোগাচার্য্য
শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানান

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত

জ্ঞানানন্দদেবের

উপদেশাবলী।

প্রথম অধ্যায়।

এক ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিয়া যদি সেই কথা অন্য কাহাকেও বল, তাহা হইলে সেই কথা তোমার কি নিজের রচনা বলা যাইবে? তাহা কখনই বলা যাইবে না। ঐ প্রকারে সেই নিত্যবেদ পুরুষপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া পরে তাহা কেহ গ্রন্থাকারে লিখিলে সেই বেদকে কি সেইজন্য সেই লেখকের রচনা বলা যাইতে পারে? তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। পুরাকালে লিখিত বেদ ছিল না। তাহা গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করা হইত বলিয়া সেই বেদেরই অপর এক নাম শ্রুতি। শ্রবণ করিয়া যাহা শিক্ষা করা যায় তাহাই শ্রুতি। অতি প্রাচীন কালে বেদই শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করা হইত। সেইজন্য বেদই শ্রুতি। অদ্যাপি শ্রুতি বলিলে অন্য কোন শাস্ত্র না বুঝিয়া আমরা বেদই বুঝি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-মতেই পরমেশ্বর নিত্য। পুরাণ-তন্ত্রমতে সেই পরমেশ্বর সাকার-নিরাকার। বাইবেল মতেও তিনি সাকার। বাইবেলের ওল্ডটেষ্টেমেণ্টে বলা হইয়াছে, God created men after his own image." সুতরাং বাইবেল-মতেও তাঁহাকে সাকার বলিতে হয়। কারণ image অর্থে 'আকার' বা 'মূর্ত্তি'ও বলা যায়। বাইবেলীয় উক্ত বাক্যানুসারে ঈশ্বরের ইমেজ আছে বলিয়া তিনি সাকার। তিনি সাকার বলিয়া অবশ্যই তাঁহার বাক্‌শক্তিও আছে। কারণ আমাদের ন্যায় আকার বিশিষ্টের বাক্‌শক্তি আছে, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। মনুষ্যের বাক্‌শক্তি আছে। বাইবেলীয় ঈশ্বর নিজ ইমেজের ন্যায় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মনুষ্যেরই বাক্‌শক্তি আছে বলিয়া তাঁহার বাক্‌শক্তি আছে, স্বীকার করা যায়। মানবীয় বাক্‌শক্তির স্ফুরণে নানা ভাষা। অবশ্যই সেই মানবীয় বাক্‌শক্তি পরমেশ্বরের অনুকৃতি। নানা মনুষ্য নানা ভাষায় কথা কহে বলিয়া পরমেশ্বরও নানা ভাষায় কথা কহেন এবং তাঁহার নানা ভাষা, বুঝিতে হইবে। সেই নানা ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষা সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়াছিল, দেখিতে হইবে। জগতের সুপ্রসিদ্ধ অনেক ভাষাবিদের মতেই সংস্কৃত ভাষা হইতেই অন্যান্য ভাষা। তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষাই অন্যান্য ভাষার কারণ বা জননী। ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষাও প্রধানা সংস্কৃতভাষা হইতে স্ফুরিত। সেই সকল ভাষার কোনটিই সংস্কৃতভাষার পূর্ব্ববর্ত্তিনী নহে। সংস্কৃত ভাষাই অন্যান্য সকল ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তিনী। সুতরাং আদিতে কেবল সংস্কৃত ভাষাই বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত-ভাষা সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া সংস্কৃতভাষাই পরমেশ্বরীয় ভাষা। সংস্কৃত ভাষার অপর নাম 'দেবনাগরী' ভাষা। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ 'পবিত্র। অবশ্য পরমেশ্বরের ভাষা যাহা তাহা পবিত্র। সেই জন্যই সংস্কৃত ভাষাই পরমেশ্বরের

ভাষা। সেই সংস্কৃত ভাষা দ্বারায় আদিধর্ম্মশাস্ত্র বেদ স্ফুরিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্‌গণের মতে সেই বেদ অপেক্ষা অন্যকোন গ্রন্থই প্রাচীন নহে। বেদ জগতের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রত্যেক ধার্ম্মিকেরই সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা বেদকেই অধিক শ্রদ্ধা করা উচিত। 'বেদ' ব্রহ্ম বা সেই অনাদি পরমেশ্বর হইতে বিকাশিত বলিয়া বেদও ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বেদকে 'শব্দ-ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। বেদ 'অক্ষর-ব্রহ্ম' হইতে বিকাশিত বলিয়া বেদও 'অক্ষরব্রহ্ম'। যেরূপ বৃক্ষ হইতে যে ফলের বিকাশ হয় সে ফলও বৃক্ষ, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে যে বেদের বিকাশ হয় সে বেদও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বয়ং পুরাণ-পুরুষ। সেই ব্রহ্ম হইতে বেদের বিকাশ বলিয়া সেই বেদও 'পুরাণ'। বেদ ও পুরাণ অভেদ। যে গ্রন্থগুলিকে পুরাণ বলা হয়, সেগুলিও উক্ত পুরাণ-বেদেরই নানা প্রকার বিকাশ, সুতরাং সে গুলিও বেদ-পুরাণ। যাহার সাহায্যে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম-পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় তাহাই বেদ। পুরাণ দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায়। সেই জন্য পুরাণও বেদ। তন্ত্র দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায়— তন্ত্রও বেদ। জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়— জ্ঞানও বেদ।

তৃতীয় অধ্যায়।

মনুসংহিতা অতি প্রাচীন। সেই মনুসংহিতার মতে চতুর্ব্বেদ নহে। সে মতে ত্রিবেদ। সে মতে অথর্ব্ববেদ যাহাকে বলা হয়, তাহা বেদ নহে। সে মতে কেবল ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদ স্বীকার করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভগবদ্গীতাতেও চতুর্ব্বেদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সে মতেও ত্রিবেদ।

অনেকেই বলেন, ঐ ত্রিবেদের প্রত্যেক বেদই ত্রিভাগে বিভক্ত। সেই ত্রিভাগের প্রথমভাগকে 'সংহিতা' বা মন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগকে 'ব্রাহ্মণ' এবং তৃতীয় ভাগকে 'উপনিষদ্' বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত একখানি সংহিতা। সেই একখানি সংহিতার অন্তর্গত অনেকগুলি মন্ত্র আছে। ঋগ্বেদের অন্তর্গত যে সংহিতা তাহাকে ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদের অন্তর্গত যে সংহিতা তাহাকে সামবেদ-সংহিতা এবং যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত যে সংহিতা তাহাকে যজুর্ব্বেদ সংহিতা কহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যেক বেদের মধ্যভাগের নামই ব্রাহ্মণ। তাহা আবার একাধিক। প্রত্যেক বেদের শেষভাগের নামই উপনিষদ। প্রত্যেক বেদীয় উপনীষদও বহু। সেই সর্ব্ব-বেদীয় সর্ব্ব-উপনিষদের মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বেদেরই ত্রিভাগ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ঐ ত্রিভাগ এক সময়ে এবং একব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে। ঐ ত্রিভাগের এক প্রকার রচনা নহে। প্রত্যেক বেদের ত্রিভাগ দেখিলে বোধ হয়, ত্রিভাগ এক সময়ে রচিত নহে। প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ দেখিলে বোধ হয়, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগাপেক্ষা অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগের সহিত তৃতীয় ভাগের রচনা তুলনা করিলে বোধ হয়, তৃতীয়ভাগ দ্বিতীয় ভাগের অনেক কাল পরের রচনা। ঐ ত্রিভাগ দেখিলে ঐ ত্রিভাগকে একজনের রচনা বলিয়াও বোধ হয় না। প্রত্যেক বেদের ত্রিভাগে এক প্রকার বিষয়ও নিহিত নাই। প্রত্যেক বেদের তিন প্রকার বিভাগে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আছে। প্রত্যেক

বেদের আদি বিভাগ যজ্ঞ বিষয়ক, মধ্য বিভাগ নানা প্রকার কর্ম্ম বিষয়ক এবং শেষ বিভাগ ব্রহ্ম বিষয়ক। সেই ব্রহ্ম বিষয়ক শেষ বিভাগ, আদি বিভাগ সংহিতা বা মন্ত্র-বিভাগ অপেক্ষা বহুকাল পরবর্ত্তী বলিয়া ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক শেষ বিভাগে "সোঽহং তত্ত্ব" সম্বন্ধে বা জীবব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে, সে সকল বৈদিক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈদিক আদি ভাগই অতি পুরাতন। সেই জন্য কেবল সেই সংহিতা বা মন্ত্র ভাগকেই বেদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। সেইভাগে "সোঽহং তত্ত্ব" বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যতত্ত্ব একেবারেই নাই। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে সেই বিভাগে উপদেশ নাই বলিয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ক মত অবৈদিকী বলিতে হয়। তাহা বৈদিক অথবা বেদ সম্মত নহে বলিয়া তাহাকে বৈদিক দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ মতই বলিতে হয়। প্রকৃত বেদের কোন স্থানেইত অদ্বৈতবাদ নাই। সুতরাং অদ্বৈত-বাদটী অবৈদিক উপনিষদ্ এবং বেদান্তের মত। অদ্বৈতবাদ অবৈদিক বলিয়া তাহা নিত্যমত নহে। সেইজন্য তাহা আধুনিক বলিয়াই পরিগণিত হইবার যোগ্য। সে মতের ভাষাও যদি কথিত বৈদিক মন্ত্র-বিভাগে থাকিত, তাহা হইলে তাহা বৈদিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত।

সম্পূর্ণ বৈদিক মন্ত্র বিভাগটীতে উপাস্য-উপাসকের ভাবই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব সেইজন্য তাহা দ্বৈতবাদ-প্রতিপাদকই বলিতে হয়।

'বেদান্ত' নামে যে দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান আছে, সেখানিও বৈদিক নহে। সেখানি বৈদিক মন্ত্র-বিভাগ বা সংহিতা-সম্মত নহে বলিয়া সেখানি বৈদিক মন্ত্রের পরিপোষকও বলা যায় না। সেখানিকেও বেদ-বিরুদ্ধ মত বলিতে হয়। সুতরাং কোন বৈদিক মহাত্মারই সে মতের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। 'সোঽহং' বা আমি সেই নহি। আমি যে সেই নহি, সে সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। শ্রুতিবেদান্ত মতে ব্রহ্ম বা আত্মা যিনি, তিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমি-আত্মা ত' নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন এবং নির্ম্মল প্রভৃতি নহি। আমি সবিকার, অঞ্জন-বিশিষ্ট, অনির্ম্মল, পরিবর্ত্তনশীল—স্পষ্টই অনুভব করা যাইতেছে। সুতরাং সেই ব্রহ্ম বা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা এবং আমি অভেদ বলিতে পারি না।

চতুর্থ অধ্যায়।

'নিরাকার' শব্দের অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই হইতে পারে। নিরাকার অর্থে যিনি আকার নহেন হইতে পারে। যিনি আকার নহেন বলিলে, যিনি সাকার এ অর্থও করা যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে যিনি নিশ্চয় আকারও বলা যাইতে পারে। কারণ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ অনুসারে 'নিঃ' অর্থে নিশ্চয়। সুতরাং নিরাকার অর্থে নিশ্চয়াকার বুঝিতে হয়। নিরাকার শব্দে যাহার নিশ্চয় আকারও হইতে পারে। তাহা হইলে অবশ্যই নিরাকার শব্দে যিনি নিশ্চয় সাকার বুঝিতে হয়। নিশ্চয় সাকার যিনি, তাঁহার আকার অনিশ্চিতও বলা যায় না।

বেদবেদান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে নিরাকার-ব্রহ্ম। সেই নিরাকার-ব্রহ্মার্থে নিশ্চয়-সাকার-ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বেদ-

বেদান্তে সেই নিরাকার ব্রহ্মকে 'নিত্য' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, নিরাকার-ব্রহ্ম অর্থেই নিশ্চয়-সাকার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য-সাকার প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আকারও নিত্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ সাকার অর্থে আকার বিশিষ্ট। ব্রহ্মের আকারও নিত্য স্বীকার না করিলে তাঁহাকে নিত্য-সাকার বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

নানা স্মৃতি, নানা পুরাণ এবং নানা তন্ত্রানুসারে অগ্নি হইতে জল প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ তোমার তৃষ্ণার উদ্রেক হইলে যদি জল না পাইয়া অগ্নি পাও, তাহা হইলে সেই অগ্নি পানে কি তোমার তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়? তুমি তৃষ্ণানিবারণীয় জলের পরিবর্ত্তে তৃষ্ণায় অগ্নি পান করিতে কি সমর্থ হও? না তাহা কখনই হও না। বহুক্ষণ অগ্নির নিকটে থাকিলে তোমার বরঞ্চ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইয়াই থাকে। আর তোমার তৃষ্ণার সময় অগ্নি এবং জল একই বস্তু বিচার দ্বারা অবধারণ করিয়া যদি অগ্নি পান কর, তাহা হইলে তোমার রসনা, মুখ প্রভৃতি দগ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা তোমার মৃত্যুও সংঘটিত হইতে পারে। শাস্ত্রানুসারে অগ্নি হইতে জল বলিয়া জলকেও অগ্নি বলা যাইতে পারে। কারণ অগ্নির অংশ জলও অগ্নি। যেমন বৃক্ষের বিকাশ ফলও বৃক্ষ, তদ্রূপ অগ্নির বিকাশ জলও অগ্নি। শাস্ত্রানুসারে অগ্নি জল বলিয়া জলও অগ্নি বলিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইতেছে, অগ্নির কার্য্য জল দ্বারা সম্পাদিত হয় না এবং জলের কার্য্য অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত হয় না। যখন তুমি অগ্নির কার্য্য জল দ্বারা সম্পাদিত এবং জলের কার্য্য অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে। তখনই বুঝিব, তোমার প্রকৃতি-পুরুষ অভেদ বোধ হইয়াছে, তখনই বুঝিব, চতুর্ব্বর্ণকে তোমার একবর্ণ বোধ হইয়াছে। অগ্নি এবং জল এক তোমার বোধ হয় নাই, প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। অতএব তোমার অদ্বৈতজ্ঞান যে হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তোমার অদ্বৈত জ্ঞান হয় নাই বলিয়া সর্ব্ববর্ণ অভেদ এ জ্ঞানও তোমার হয় নাই। সুতরাং তুমি বর্ণ বিভাগ কেনই বা স্বীকার করিবে না?

শাস্ত্রানুসারেই নিম্ব বৃক্ষও সেই প্রকৃতির বিকাশ এবং সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষও সেই প্রকৃতির বিকাশ। নিম্ববৃক্ষ এবং সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ কি তোমার অভেদ বোধ হইয়াছে? নিম্ববৃক্ষের ফলে তিক্ততা এবং আম্রবৃক্ষের ফলে মিষ্টতা। এই দুই তোমার যদি অভেদ বোধ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুই ভক্ষনেই তোমার সমান তৃপ্তি হইত। তাহা হইলে ঐ নিম্ববৃক্ষের ফলের যে আস্বাদন এবং ঐ সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষের ফলেও সেই আস্বাদন পাইতে। ঐ উভয় ফলের ভিন্নাস্বাদন পাইতে না। অতএব সেই জন্য তোমার অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয় নাই, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তোমার যদ্যপি যথার্থই অদ্বৈত জ্ঞান হইত, তাহা হইলে প্রাকৃত তিক্ত নিম্বফলে ও প্রাকৃত সুমিষ্ট আম্রফলে সমান আস্বাদনই পাইতে। তাহা হইলে ঐ দুই ফলাস্বাদনে কোন তারতম্য বোধই হইত না। তারতম্য বোধ থাকিতে অদ্বৈতজ্ঞান হইতেই পারে না। তুমি কেবল কথায় স্ত্রী পুরুষ অভেদ বলিয়া থাক; তোমার যদি স্ত্রী পুরুষ অভেদ বোধ হইত, তাহা হইলে তোমার পত্নীতে বা অন্য রমনীতে কামবশতঃ তোমার

যে রতি বা আসক্তি হইয়া থাকে, তাহা তোমার আহার প্রতি হইত না। কারণ তোমার সেই পত্নীর প্রতি যে প্রকার রতি বা আসক্তি কামবশতঃ হয়, তাহাত তোমার নিজের প্রতি ঐ প্রকার কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না। তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে বলিতেছ, তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ? তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ বোধ হইয়া থাকিলে, তোমার নিজের প্রতি যেমন কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না, তদ্রূপ কামবশতঃ রতি বা আসক্তি তোমার পত্নীর প্রতিও হইত না। অথচ নানা শাস্ত্রানুসারে তোমার পত্নীর দেহও প্রাকৃত, তোমার নিজের দেহও প্রাকৃত। উভয় দেহ পরীক্ষা করিলেও অভেদ জানা যায়। তোমার পত্নীর মাংস পরীক্ষা করিলে জানা যাইবে যে শ্রেণীর, তোমার দেহের মাংস পরীক্ষা করিলেও জানা যাইবে, তাহাও সেই শ্রেণীর, উভয়ে কোন প্রভেদই নাই। পরীক্ষা করিয়া জানা যাইবে, তোমার পত্নীর দেহের অস্থি যে শ্রেণীর, তোমার দেহের অস্থিও সেই শ্রেণীর। উভয়ে কোন প্রভেদই নাই। পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইবে, তোমার পত্নীর দেহের শোণিতও যাহা এবং তোমার নিজের দেহের শোণিতও তাহা। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। ঐ প্রকারে তোমার পত্নীর দেহে অন্যান্য যে সকল উপকরণ আছে, তোমার নিজের দেহেও অবিকল সেই সকল উপকরণই আছে। অথচ তোমার পত্নীর দেহের প্রতি কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় বলিয়াই তোমার দেহ এবং তোমার পত্নীর দেহ স্বরূপতঃ অভেদ, তাহা তোমার বোধ হয় নাই বলিয়া তোমাকে দ্বৈতবাদীই বলা যাইতে পারে। কারণ তোমার পত্নীর দেহ এবং তোমার নিজের দেহ অভেদ একবস্তু বলিয়া যদি বোধ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পত্নীর দেহে তোমার কামবশতঃ যে প্রকার রতি বা আসক্তি হয়, তাহা হইলে কামবশতঃ তোমার নিজের দেহেও রতি বা আসক্তি হইত। শ্রুতিবেদান্ত প্রভৃতি মতে তুমি যে আত্মা, তোমার পত্নীও সেই আত্মা। কিন্তু ঐ প্রকার অভেদত্ব বোধ যদ্যপি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তোমার পত্নী-আত্মাতে তোমার যে শ্রেণীর রতি বা আসক্তি, তোমার নিজের প্রতিও সেই শ্রেণীর রতি বা আসক্তি হইত। তাহা হইলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেই তোমার পত্নীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত। তাহা হইলে তোমার তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলেই তোমার পত্নীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইত। তোমার পত্নীর জ্ঞানে তোমার জ্ঞান হইত। তাহা হইলে তোমাদের উভয়ে সকল বিষয়েই একতা থাকিত। তোমার অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই বলিয়া তোমার পত্নীর সহিত সকল বিষয়েই পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং তুমি কি প্রকারে বল, তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ। সুতরাং তুমি কি প্রকারে বল তোমার সর্ব্বর্ণই অভেদ বোধ হইয়াছে? সমস্তই এক বোধ হইলে আর সমস্তকে সমস্ত বোধও হয় না। তাহা হইলে সমস্তকে একই বোধ হয়। তাহা হইলে এক ব্যতীত সমস্ত আছেও বোধ হয় না।

অহংকার—যাহা দ্বারা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বোধ করা যায়।

সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয় বলিলে বোঝা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের যে সকল রূপ গঠন করা হয়, সে সকল ব্রহ্মের রূপ নয়, কিন্তু প্রতিরূপ। যেমন একব্যক্তি আর তাহার ছবি একপদার্থ না

হইলেও, ছবিই তাহার রূপ না হইলেও—তাহার ছবি অর্থাৎ প্রতিরূপ বটে।

সামবেদ, যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদের মতে বর্ত্তমান ভজন। তাহা ঐ তিনবেদের তিন মহাবাক্য দ্বারাই বোঝা যায়। সামবেদ অনুসারে "তত্ত্বমসি" বলিলেও বর্ত্তমান-ভজন বোঝা যায়, যজুর্ব্বেদ অনুসারে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বলিলেও বর্ত্তমান-ভজন বোঝা যায়, অথর্ব্ববেদ অনুসারে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিলেও বর্ত্তমান-ভজন বোঝা যায়।

ধর্ম্মপথে অনেক বিঘ্ন এবং অনেক পরীক্ষা। সাহস, একাগ্রতা এবং বিশ্বাসের সহিত ঐ পথে চলিতে পারিলে মঙ্গলই হইয়া থাকে।

সাধুর উদ্দেশ্য সাধনা। নির্জ্জন প্রদেশেই উত্তমরূপে সাধনা হইতে পারে। বাক্যদ্বারা প্রার্থনা করিলেও আন্তরিক প্রার্থনা হরি জানেন। হরির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর থাকিলে সকল অবস্থাই প্রীতিজনক হইয়া থাকে, অথচ কোন অবস্থারই অধীনতা থাকে না। যে উপকার করিতে নিজ ভজনার বিঘ্ন হয়, সে উপকার না করাই ভাল। বাক্য, কার্য্য, ব্যবহার এবং মন দ্বারাও কাহারো অপকার সূচনা করা উচিত নহে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার সংযোগ হইলেই পরম-প্রয়াগ। সেই পরমতীর্থে জিহ্বা অবগাহন করিলেই পরম পবিত্র হন। সেই পরম-প্রয়াগ সহস্রার নামক মহাকমল। পার্থিব প্রয়াগও কল্মষহারী।

বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞান এবং ভ্রান্তির সংস্রব নাই। বিশ্বাস অপরিবর্ত্তনীয়।

শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আবৃত : রাধা-তন্ত্র মতে সেই শরীর কালী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।"

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং কৃষ্ণ-ভগবান বলিয়াছেন,—'জ্ঞানাপেক্ষা কিছুই পবিত্র নহে।'

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

অত্যন্ত শোকবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত দুঃখবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত রাগবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত অনুতাপবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত বিবেকবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে।

'ভাবের ঘরে চুরি করিও না' অর্থে কেহ কেহ ভাবের ব্যতিক্রম করিও না বলেন। যথার্থ যাঁহার যে ভাব আছে সে ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। যাঁহার যথার্থ বাৎসল্যভাব আছে, তাঁহার সে বাৎসল্য ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। ১।

অনেকের মতে 'ভাবের ঘরে চুরি করিও না' অর্থে অন্তরে যে ভাব আছে, সে ভাব গোপন করিয়া অন্য প্রকার ভাব প্রকাশ করিও না। আমি দেখিতে পাই অনেক উত্তম সত্ত্বগুণী সাধকই তাঁহাদের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, তাঁহাদের ভাবের মতন ভাববিশিষ্ট যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের সমক্ষে অন্যপ্রকার ভাব দেখাইয়া থাকেন। ঐ প্রকার করায় তাঁহাদের উন্নতিই হইয়া থাকে। ঐ প্রকার না করিলে তাঁহাদের উন্নতির পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে। ২।

রাধা এবং অন্যান্য গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব ছিল, শ্রীকৃষ্ণদ্বেষীদিগের সমক্ষে তাঁহারা কখনই সেই ভাব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহাদের সমক্ষে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে

অন্যপ্রকার ভাবই প্রকাশ পাইত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অনেক সময়ে নিত্যভাব গোপন করিয়া অন্য প্রকার ভাব দেখাইয়াছেন। ৩।

পরমেশ্বরের প্রত্যেক অবতারই অনেক সময়েই নিজ ঐশ্বর্য্যভাব গোপন করিয়া জৈবভাব দেখাইয়া থাকেন। এমন কি তিনি নানা অবতারে নানা প্রকার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার সকল অবতারেরই একপ্রকার শরীর হয় না। ৪।

এক ব্যক্তির প্রতি যে ভাব সেই ভাব ব্যতীত সেই ব্যক্তির প্রতি অন্য ভাব করাকেও কেহ কেহ ভাবের ঘরে চুরি করা বলিয়া থাকেন। যাহার প্রতি যে ভাব হওয়া উচিত তাহার প্রতি সেই ভাব ব্যতীত অন্যভাব হওয়াকেও ভাবের ঘরে চুরি বলা যায়। কিন্তু সেই প্রকার ভাবের ঘরে চুরি যশোদারও হইয়াছিল, দেবহুতীরও হইয়াছিল। স্বভাবতঃ পুত্রের প্রতি বাৎসল্য ভাবই হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন যশোদাকে নিজ উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি-বন্দনাই ভক্তিভাবে করিয়াছিলেন। দেবহুতির পুত্র কপিলদেব। তিনি সেই নিজপুত্র কপিলদেবকে গুরু করিয়া সেই কপিলদেবের উপদেশে সাংখ্যযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ৫।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

কবিতাকুসুম মালা।

কত সুশীতলজল, তুষার শীতল ?
শুদ্ধভক্তি পরিমল অতি সুশীতল।
শুদ্ধভক্তি অনুপমা, ভক্তচিত্ত মনোরমা,
নাহি তাহার উপমা, আপনি অতুল।
অতুল শ্রীকৃষ্ণধন, অতুল তাঁ'র চরণ,
পাই যেন অনুদিন, সে চরণে স্থল।
হ'লে তাঁ'র পদাশ্রিত, একান্ত শরণাগত,
জীবন হয় অমৃত অতি সুবিমল।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হ'লে সুখ হয় কেবল ॥

২

ভক্তির ভাণ্ডারী যত ভক্ত মহাজন,
হৃদয়ে রাখিতে যেন, পারি তাঁ'দের চরণ,
সঁপিবারে পারি যেন তাঁ'দের জীবন।
করি যেন দিবানিশি ভক্ত দরশন ॥
ভক্তের কৃপায় হ'বে হৃদে শুদ্ধভক্তি।
শুদ্ধভক্তিবলে হ'বে হরিতে আসক্তি ॥

উল্লাসে হাসিছে শশী অমল আকাশে,
ভক্তহৃদি-চিদাকাশে ভক্তিচন্দ্র হাসে।
অজ্ঞান তিমির যত, নাহি আর প্রকাশিত,
প্রেমামৃত প্রবাহিত, প্রেমে ধরা ভাসে।

৪

প্রেমসুধাসিন্ধু মাঝে বিরাজিত ভগবান।
অনন্ত লহরীরূপে কতরূপ অগণন ॥
মোহিনী মাধুরী কত, সিন্ধুনীরে বিকাশিত,
চিদাকাশে বিভাসিত সুচন্দ্রমোহন।
চন্দ্রালোকে আলোকিত এ তিন ভুবন ॥

৫

ভগবৎ-লীলারস-সাগর অনন্ত।
অনন্ত লহরী তা'র অথচ প্রশান্ত ॥
অপরূপ জ্যোতি কত, সে সাগরে বিভাসিত,
বিভাসিত অপরূপ পুরুষ মহান্ত।
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন মহাগুণবন্ত ॥

সে তারা বিহনে ভাসে অশ্রুজলে নয়ন তারা
আঁখিজলে তারাহীন, করে না সে দরশন,
অন্য কিছু আর।
অন্ধ প্রায় হ'য়ে আছি বিনা সে জীবনতারা।
জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, তারা যে পরম ধন,
এ শরীরে থাকে প্রাণ থাকিলে সে তারা,
কেন যে আছে এ প্রাণ হ'য়ে তারা-হারা?

সংযম কৌপীন হ'য়েছে যাঁহার।
প্রকৃত সন্ন্যাস হ'য়েছে তাঁহার॥
দণ্ড তাঁ'র জ্ঞান, কমণ্ডলু মন,
ভক্তি তা'তে বারি অতি সুমধুর।
যোগানন্দে রত তিনি সর্ব্বক্ষণ।
হ'য়েছে পবিত্র তাঁহার জীবন॥
দুনয়নে তা'র সদা অশ্রু ঝরে,
ডুবে থাকে সে যে প্রেমের সাগরে।

শ্রীগুরুদ্বাদশাক্ষর স্তোত্র। (ক)

ওঁ—সচ্চিদেকং হৃদয়ৈকগম্যং
ন—ভোমণিং শান্তমলভ্যবীর্য্যম্
মো—দং দধানং বিগলিত-কাম্যম্
গুরুং শিবং তং সততং নমামি
ভ—বং ভবেশং ভুবনৈকপূজ্যম্
গ—তিপ্রদং মোহহরং প্রশান্তম্
ব—রং বলিনং বিধিবেদ-বেদ্যম্
গুরুং শিবং তং সততং নমামি।
তে—মম্বদৃষ্টিং ভবভাবনৈক্যম
জ্ঞা—নং মুনীনাং সুখবোধ-বোধ্যম্
নন্দ—হস্কুতং পূর্ণমনাদ্যনন্তম্
গুরুং শিবং তং সততং নমামি।
ন—ম্যং বরাভীতিকরং প্রজেশ
ন্দা—ন্তং ধৃতিধ্যানময়ং প্রকাশম্
য—তিং যমং যোগময়স্বরূপম্
গুরুং শিবং তং সততং নমামি।
গুরোরাষ্টাক্ষরং স্তোত্রং ধ্যানমূলং পঠেৎ যদি।
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো গুরোঃ কৃপাং লভেত সঃ॥

ইতি শ্রীমৎ দাশরথিদেবশর্ম্মণাকৃতং গুরু-দ্বাদশাক্ষরস্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎসৎ।

সম্পাদকের নিবেদন।

শ্রীভগবানের ভক্ত-সঙ্গে ধর্ম্ম-কথা আলোচনা দ্বারা অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করাই এই শ্রীপত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য;—ধর্ম্ম-ব্যবসা ইহার উদ্দেশ্য নহে সুতরাং আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান মাস হইতে শ্রীপত্রিকার কলেবর এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ এইরূপ আরও বৃদ্ধি করিতে পারিলে আমাদের আরও আনন্দ হইবে।

(ক) এই পত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ নহেন, তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত পদ্যাদির নিম্নে বঙ্গানুবাদ দিবেন। সম্পাদক।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বোধ হয় এই জন্যই শ্রীপত্রিকার কার্য্যভার হস্তে লইবা মাত্র আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্য ফাল্গুণ, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসের কার্য্যে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে পারি নাই, এমন কি কোন কার্য্যই করি নাই, কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তজ্জন্য শ্রীপত্রিকায় বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি সংশোধন এবং কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তনের দোষে গ্রাহকগণের যদি কিছু বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পাদক-স্থলে ভক্তবর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ নাগ, এল, এম, এস, মহাশয়কে সহায় পাইয়া আমার দ্বিগুণ উৎসাহ হইয়াছে।

বিনীত শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

শ্রীমন্দির

শ্রীনিত্য-ভক্তমণ্ডলী সমীপে আজ আমরা একটি শুভ বার্ত্তা লইয়া উপনীত। আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন,—শ্রীশ্রীদেবের সমাজে একখানি সামান্য ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়া এতদিন উহাতে শ্রীশ্রীদেবের নিত্য-পূজা, ভোগরাগ ইত্যাদি হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভক্তমাত্রেই যে লজ্জিত এবং দুঃখিত একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বিশেষ বিশেষ উৎসব-সময়ে বিপুল-জন-সঙ্ঘ-সমাগমে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র সমাজ-গৃহ ভক্তমাত্রকেই যে গভীর মনোবেদনা প্রদান করিয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল দয়াল ঠাকুর আমাদের এই অন্তর্বেদনা অনুভব করিয়াই বুঝি আজ আমাদের অন্তরে শ্রীমন্দির নির্ম্মানের কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা করিয়াছেন। বাস্তবিক কতকগুলি প্রতিকূল বহির্ব্যাপারই এতদিন আমাদিগকে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে বাধাপ্রদান করিয়া আসিতেছিল। ঠাকুরের ইচ্ছায় একে একে সকল গুলিই অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীশ্রীদেবের কৃপামাত্র সম্বল করিয়া এবং ভক্তবৃন্দের আশ্বাসবাক্য বিশ্বাস করিয়াই আমরা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ;—

ভ্রাতৃবৃন্দ! শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে!

কিন্তু,—শ্রীনিত্য-ধর্ম্মের নিত্য-বিরাজ-ক্ষেত্রে, সার্ব্বজনীন-উদার-ধর্ম্মমতের উদ্ভব-প্রদেশে, জাগতিক সর্ব্বধর্ম্মের মহা-মিলন-তীর্থে, **শ্রীগুরু-পীঠ** মহানির্ব্বাণমঠে 'যেন তেন প্রকারেণ' কর্ম্ম সম্পাদন করিলে চলিবে কি? ভক্তবৃন্দ, ভ্রাতৃবর্গ! চিন্তা করিয়া দেখুন, ভাবিয়া দেখুন—ব্যাপার বৃহৎ, বহুল অর্থের বিশেষ প্রয়োজন! তাই বলিয়া নিরুৎসাহ হইবারও কোন কারণ নাই। বিন্দু বিন্দু বারিসমষ্টিই সাগর সৃষ্টি করিয়াছে, এক একখানি ইষ্টক সমবায়েই বৃহৎ রাজ-অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, এক একটী ক্ষুদ্র পাদ-বিক্ষেপেই পথিক বহু-যোজন-পথ অতিক্রম করিতেছে। 'দশের লাঠি একের বোঝা।' প্রত্যেকে সরল প্রাণে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই মহদনুষ্ঠানে ব্রতী হউন, সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিকী ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে

আমাদের সাধের শ্রীমন্দির—**শ্রীনিত্য-গোপালের** নিত্য-বাসগৃহ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষক হইবে।

আর ইহা অপেক্ষা অর্থের সদ্ব্যবহারই বা কি হইতে পারে? **শ্রীগুরু-পীঠ** নির্ম্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হইল সে অর্থ সার্থক, সে অর্থোপার্জ্জনের পরিশ্রম সার্থক, পরিশ্রম-পটু দেহও সার্থক। অর্থীর এরূপ অর্থ ব্যয়ই চিত্ত-প্রসন্নতা-লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীশ্রীদেবের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, তাঁহার কার্য্য সুচারু রূপেই নিষ্পন্ন হইবে; আজ এক পক্ষে যেমন আমাদের সম্মুখে একটি আনন্দের বিষয় রহিয়াছে, অন্য পক্ষে আবার উদ্বেগের বিষয়ও একটী রহিয়াছে। আজ আমাদের হৃদয়-দেবতাকে প্রাণের প্রীতি-সম্ভার প্রদর্শন করিবার একটি অপূর্ব্ব সুযোগ! আজ এই সেতুবন্ধনে 'কাঠ-বিড়ালী' আমরা যদি বালুকণা-সংগ্রহে ঔদাস্য প্রকাশ করি, তবে ঠাকুরের সেই সোহাগের চপটাঘাত লাভে বঞ্চিত হইব। তাই বলিতে ছিলাম,—'আমাদিগকে সরল প্রাণে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্যকপ্রকারে উপলব্ধি করিয়া এই মহা সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে হইবে!' আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি—একবার 'শ্রীগুরুপুষ্পাঞ্জলি'র আপনার নিত্য-পাঠ্য "শ্রীনিত্য-গোপাল-স্তোত্র" স্মরণ করুণ। ঐ শুনুন, জীবন-যজ্ঞের মহামন্ত্র—

"**সর্ব্বস্বং** গুরবে **নিত্য-**
গোপালায় চিদাত্মনে।
শ্রীমতে বিশ্বনাথায় মন্মাথায় নমোনমঃ॥"

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতেছে। আমাদের ঐকান্তিক বাসনা এই মহদনুষ্ঠানে সার্ব্বজনীন সহানুভূতি এবং অর্থ-সাহায্য আমাদিগের আনন্দ, প্রীতি এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অতিসত্বর আপনাদের সাহায্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীশ্রীনিত্য-পদাশ্রিত
সেবকমণ্ডলী।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—
শ্রীমৎ প্রণবানন্দ অবধূত,
মহানির্ব্বাণমঠ, কালীঘাট-পোঃ, কলিকাতা।

শ্রীনিত্য-গোপাল।

(তাল—ঠুংরি)।

জয় নিত্যগোপাল নিরঞ্জন।
করাল-কাল-ভয়-হরণ॥
তুমি কখন চিন্ময় হ'য়ে করহ বিরাজ,
কভু চিন্ময়ী হইয়ে ধর অপরূপ সাজ;
তুমি লীলার ছলে, কারণ-বারিধি-জলে,
ভেসে কুতুহলে করিলে ধরণী-সৃজন॥
শশী সূর্য্য নভঃ, বায়ু সিন্ধু ধরা,
তব নিত্য-নিদেশ বহিছে তারা;—
ব্রহ্মা আদি পুরন্দর, যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
তারা সেবে নিরন্তর, তব অভয় চরণ॥

তুমি কখন মুরলীধারী, কখন রাধা,
কভু করাল-বদনা কালী শিব-সুখদা;—
তোমার ভাবের অন্ত, নাহি জানে অনন্ত,
পালায় কৃতান্ত অন্তরে হেরি তব ভক্তগণ॥
তুমি চৈতন্যরূপেতে প্রেম বিলাও নদীয়ায়,
কভু জ্ঞানানন্দরূপে রাজ ভকত-হিয়ায়;—
ধর্ম্ম রক্ষার তরে, এলে গোলোক ছেড়ে,
রক্ষ দুস্তরে মাধবানন্দে রাজীবলোচন!

ভক্ত-কৃপা-ভিক্ষু
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু।

মাতৃভাব।

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভাবনিধি, সেই ভূতভাবন শ্রীভগবান ভাবের দ্বারা ভাব্য; ভাববন্ধনেই তিনি বাঁধা পড়েন। অন্য কোন প্রকারে তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। এই সংসারে দেখা যায় আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে, কাহাকেও আপনার করিতে হইলে, তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া বসি। বাবা, মা, খুড়া, জ্যেঠা, দাদা, দিদি এইরূপ কোন না কোন একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলি; দূরস্থ ব্যক্তিকে নিকট করিয়া ফেলি; নিঃসম্পর্কীয় নিতান্ত পরকেও আপনার করিয়া ফেলি। এইরূপ না করিলে, একটা ভাব জমাইয়া তুলিতে না পারিলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মে না;—কেমন একটা দূর দূর, পর পর ভাব থাকিয়া যায়। সংসার-খেলায় এই সম্বন্ধ পাতানটা যেমন লৌকিক রস-বিলাসের জন্য আবশ্যক, ভগবৎ-ভজন-ব্যাপারেও এই সম্বন্ধ পাতানটা সেই অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের সহিত রস-সম্ভোগের জন্য তদ্রূপই আবশ্যক। সেই অনন্ত, অব্যক্ত, বাক্যমনের অগোচর শ্রীভগবানকে আমরা কিরূপে আপনার করিতে পারি? ইহলোকে যে কোন ব্যক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাহার কথা শুনিতে পাই, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি, তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি। তবুও এক ব্যক্তিকে আপনার করিতে হইলে তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া না লইলে সুবিধা হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানত' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তিনি আমাদের বাক্যের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানেরও অতীত *; বাস্তবিক তিনি আমাদের পক্ষে পর—পর হইতেও পর; কেন না, আমরা বাস্তবিক অন্তরে তাঁহাকে আপনার বলিয়া অনুভব করি না। কিন্তু সেই পরাৎ-পর পরমপুরুষকে আপনার করিতে হইবে; তাঁহাকে নিতান্তই আপনার জন করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া না লইলে কোন মতেই উহা সম্ভব পর হয় না। সেই ধরা ধরির অতীত লোকটিকে ধরিতে গেলে, সেই সর্ব্ববন্ধনপরিশূন্য ব্যক্তিকে ধরিতে গেলে একটা সম্বন্ধ পাতান চাই;—একটা ভাব জমান চাই! এইজন্য পঞ্চভাবের উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পঞ্চভাবের যে কোন একটা ভাব জমিয়া উঠিলেই তাঁহাকে আপনার করা যায়;—তাঁহাকে সম্ভোগ করাও যায়। কোন কোন আচার্য্যের মতে ভাব পাঁচ প্রকার; কোন কোন শাস্ত্রমতে ভাব দশবিধ। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মধুর ভাবকেই শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অন্য সমস্ত ভাবই ঐ মধুর ভাবের অন্তর্গত। তাঁহাদের এই মতের দোহাই দিয়া আজকাল অনেককেই এই ভাবে উপাসনা করিতে প্রয়াসী দেখা যায় এবং অন্য ভাবের উপাসকদিগকে ইঁহারা নিকৃষ্ট অধিকারী জ্ঞানে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াও থাকেন! এক্ষণে আলোচ্য এই যে, এই ভাবে উপাসনা করিতে

* "অবাঙ্মনসগোচরঃ"। শ্রুতি।

সকলেই সমভাবে অধিকারী কি না? মধুর ভাবের উপাসনার অর্থ এই যে, শ্রীভগবানকে পতি বা পত্নি ভাবিয়া উপাসনা করা। এইরূপ উপাসনার কিন্তু এই পতি-পত্নীভাবের মধ্যে কাম-গন্ধটুকু পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে না। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কামরিপুকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ও আত্মজয়ী তাঁহারাই এইরূপ সাধনের অধিকারী। তাই ব'লে, 'হরে,' 'নরে,' 'শঙ্করে,' 'রামা,' 'শ্যামা' সকলেই এ'ভাবের উপাসক হইতে পারে না। সদ্‌গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত স্বেচ্ছায় এইরূপ উপাসনা করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই বোধ হয়। যেখানে সেখানে, যখন তখন যে সে ব্যক্তি এই রসের রসিক হইতে পারে না। যে সে ব্যক্তি মধুর ভাবের উপাসনার অধিকারী নহে। ব্রজগোপীরাই প্রকৃত পক্ষে এই রসের রসিকা ছিলেন; তাঁহারাই যথার্থ মধুর ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়া গিয়াছেন। তাই ব'লে, সকলেই তাহার অধিকারী হইবে? আমার প্রভু শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের মধুর লীলা প্রভৃতি যাহাতে বর্ণিত আছে অর্থাৎ রাস-পঞ্চাধ্যায় গ্রন্থ সাধারণের পাঠ্য নহে! গুরু যাহাকে অধিকারী দেখিয়া পড়িতে আদেশ করিবেন, তিনিই উহা পড়িতে পারেন। নতুবা কেহ পড়িবারও অধিকারী নন। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সকল গ্রন্থই সহজ-লভ্য হওয়ায় সকলেই সকল গ্রন্থ পড়িতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল না। বিনা গুরু-আজ্ঞায় ঐ সকল গুহ্য গ্রন্থ কেহ পড়িতে পাইত না। প্রকৃত অধিকারী না হইলে গুহ্যলীলায় কাহারও প্রবেশাধিকার জন্মে না। এই মধুর ভাবের উপাসনা নিতান্তই গুহ্য ব্যাপার। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—"ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস"—। ব্রজ-গোপীরাই এই রসাস্বাদনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি সাধারণ গোপাঙ্গনা? তাঁহাদের প্রেম কি প্রাকৃত প্রেম? তাঁহারা জন্মান্তরের সাধনসিদ্ধ ঋষি। শ্রীভগবানের জগ-জন-নয়ন-রঞ্জন-কান্ত-দেহ কান্তাভাবে ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদের অভিলাষ জন্মিয়াছিল। পরম দয়াল তাঁহার অপ্রাকৃত সিদ্ধ-শুদ্ধ প্রিয় ভক্তগণের ঐ অভিলাষ পূর্ণ করণেচ্ছায় তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বাপরযুগে রাস-লীলা করেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সাধন-সিদ্ধ না হইতে পারিলে ঐ রাস-লীলায় অধিকার হয় না। আর এক কথা, গোপীগণ জন্মান্তরের সাধন-সিদ্ধ ঋষি হইলেও ঐ জন্মে কাত্যায়নীপূজা করিয়া সর্ব্ব প্রথমে জগদম্বাকে প্রসন্না করেন এবং তাঁহার কাছে ভগবানকে পতিভাবে পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? মানব-দেহ ধারণ করিলে কাম-রিপুর হস্ত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই জগৎ অবিদ্যা-মোহিত। সুতরাং অবিদ্যা-সঞ্জাত রিপুকুলের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে, সেই মহামায়ার কৃপা লাভ করা চাই। তিনি প্রসন্না হইয়া যাঁহাকে অভয় দান করেন, তিনিই রিপু জয় করিতে সক্ষম; নতুবা প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইলে মাতৃভাবের সাধন ব্যতীত উপায় নাই।* যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পারিবেন যে,

* ভাব-পাশে শ্রীভগবানকে ধরিতে গিয়া এই স্থলে বুঝি লেখক নিজেই ধরা পড়িয়াছেন! "তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

অন্যতম সম্পাদক।

মাতৃভাবের নিকট কাম রিপু যেরূপ সহজে পরাজিত হয়, এমন আর কুত্রাপি নহে।* কোন সুন্দরী যুবতী সন্দর্শনে যদি প্রথমেই তৎপ্রতি মাতৃভাবের সঞ্চার হয়, তবে আর তা'র রূপ-লাবণ্যে, হাব-ভাবে বা কুটিল কটাক্ষে কাম উদ্দীপনার সম্ভাবনা থাকে না। যে এক নিষ্ঠ মাতৃভাবের সাধক জগজ্জননীর কৃপায় ঐ ভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বত্রই অন্ততঃ সকল স্ত্রী-মূর্ত্তিতেই মাতৃ-মূর্ত্তির বিকাশ সন্দর্শন করেন। তখনই তিনি কামরিপুকে যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হন। নতুবা সেই দুর্দ্দমনীয় রিপুকে। জয় করা সাধারণ জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি এইরূপ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিয়াছেন, তিনিই যেন মধুর ভাবের উপাসনা করিতে অগ্রসর হ'ন। নতুবা, হে কলি-হত দুর্ব্বল জীব, ইন্দ্রিয়-পরবশ পরাধীন জীব! জগজ্জননীই তোমাদের উপাস্য; মাতৃভাবই তোমাদের অবলম্বনীয়। তোমরা রোজা নও, সুতরাং সর্পের সহিত খেলা করিতে যাইও না। কামরিপু জয় করিতে পার নাই, নিষ্কাম প্রেম-লীলার অভিনয় করিতে যাইও না। আর ভাবিয়া দেখ, মায়ের কাছে সাত খুন মাপ, সন্তান যতই কেন অপরাধ করুক না, করুণাময়ী জননী কখনই তাহার দোষ গ্রহণ করেন না; যত অপরাধই করুক, মা কখনই তা'কে পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু ভাই, পতির কাছে সে আব্দার চলিবে না। সেখানে কথায় কথায় মান, অভিমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার বিবাদ, বিসম্বাদ, অপরাধ। সেখানে এত অল্পে মার্জ্জনা নাই।* এই সংসারে দেখ, বালিকা প্রথম বয়সে তাহার মা'র অনুগত হইয়াই থাকে। তা'র ক্ষুদ্র প্রাণের যতটুকু ভক্তি ভালবাসা সমস্তই তখন তা'র মা'র উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হয়। তখন সে তা'র মা ছাড়া আর কাহাকেও জানে না;—কাহাকেও চায় না। কিন্তু যখন সে বয়স্থা হয়, যখন যৌবনমলয়-সঞ্চারে তা'র দেহ-লতা নব শোভায় পল্লবিত হইয়া উঠে, ভাব-কুসুম-কলিকা-কুল ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠে, নব-রস সঞ্চারে আপনার ভিতরে আপনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠে, একটা অজ্ঞাত অননুভূতপূর্ব্ব রস-বিলাসের আকাঙ্ক্ষায় তা'র প্রাণটা তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, তখন তা'র সেই অবস্থা দেখিয়া জননী নিজেই তা'র জন্য একটী সৎপাত্রের সন্ধান করেন। কিন্তু এই রসবোধের পূর্ব্বে মায়ের অনুগত হইয়াই থাকিতে হয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালিকার মুখে রসের কথা শুনিলে যেমন তাহা একটা উপহাসের বিষয় হয়, তেমনি সিদ্ধি-লাভের পূর্ব্বে, কামরিপু জয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ সাধকের বাল্যাবস্থায় মধুর ভাবের উপাসনার প্রয়াসী হওয়াও একটা উপহাস্যকর ব্যাপার। আগে রসবোধ হউক, তবেত সেই রসময়ের সহিত রসালাপ করিবে? এখনও তোমার কথা ফোটে নি, এখনও মাকেই ভাল ক'রে ডা'কতে পার না, তবে বরের সঙ্গে কথা কইবে কি প্রকারে? এইরূপ বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থাটা আমাদের ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

---

* জগদম্বার সম্মুখেই ছাগবলির ব্যবস্থা আছে। ছাগ—কাম।

শ্রীভগবানের জগদম্বা মূর্ত্তির কৃপা হইলে তবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভাবে তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার অধিকার হয়। লেখকের বোধ হয়, ইহাই অভিপ্রায়।

অন্যতম সম্পাদক।

* অপরিণত-বুদ্ধি, উচ্ছৃঙ্খলা, নবীনা, নবোঢ়া বালিকার পক্ষে তাহাই বটে।

অন্যতম সম্পাদক।

আর মায়ের বিনা অনুমতিতে তুমি আপন ইচ্ছায় যদি বর জুটাইয়া লইতে চাও, তা' হলেও বর জুটিবে না। মা না দিলে, তোমার সাধ্য কি যে তুমি আপনা হ'তে জুটাইয়া লইবে? সে বর ত আর এই পার্থিব বরের ন্যায় ধনৈশ্বর্য্যের কাঙ্গাল নন। তিনি চা'ন কেবল তোমার হৃদয়স্থিত পরম পবিত্র ভাব-ধন। সে বিষয়ে যে তুমি এখন একেবারে দরিদ্র। সে ধনের তুমি এখন কাঙ্গাল। সুতরাং বরের তোমাকে আদৌ মনে ধরিবে না। যেটুকুকে তুমি ভাব ধন বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা পবিত্র নহে। তাহা হ'তে যে কামের পূতি-গন্ধ নির্গত হইতেছে। ঐ অপবিত্র পদার্থ দিয়া কি তুমি সেই পরম বরকে ভুলাইতে পার? ঐ নিকৃষ্ট দ্রব্য কি সেই পরাৎপরের উপযোগী হইতে পারে? অতএব তোমার ঐ ভ্রম দূর কর। তুমি যদি সেই রসিক-শেখরের যোগ্যা সুরসিকা হইতে চাও, তবে এখন মাতৃ-ক্রোড়ই তোমার আশ্রয়। তিনিই তোমার তৃপ্তির জন্য যথাকালে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ, এল, এম, এস।

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেব মহারাজ বলিয়াছেন,—"**ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একত্র আহার করিলে বা একত্র বসিয়া উপাসনা করিলেই জাতি-সমন্বয় বা ধর্ম্ম-সমন্বয় হয় না।**"

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন,—"জননী যেমন স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোন সন্তানের জন্য সাগু, কাহারও কাহারও জন্য মাছের ঝোল, আবার কাহারও জন্য পোলাও ব্যবস্থা করেন, তদ্রূপ জগজ্জননী ভিন্ন-ভিন্ন দেশ-বাসী, ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন সন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" সুতরাং অনুগত শান্ত সন্তান যেমন মাতৃদেবীর ব্যবস্থা হৃষ্টচিত্তে পালন করিয়া পরিণামে সুস্থ ও বলিষ্ঠ-দেহ হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আনন্দময়ীর শিষ্ট, শান্ত সন্তান, বিশ্বাসী সাধক অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই জগদম্বার ব্যবস্থা সুতরাং ঘৃণা, বিদ্বেষ বা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে, এই মনে করিয়া নিজ নিজ দেশ, কাল বা প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ও অচলা শ্রদ্ধা রাখিয়া সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া পরিশেষে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই একই প্রাণারাম হৃদয়ের ধন অনন্ত করুণার আধার শ্রীভগবা'ন অশেষ-করুণা-বশে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাজে সাজিয়াছেন—নিঃসন্দেহ অনুভব করিবেন যে তাঁহার প্রাণের ঠাকুর বহুরূপী—তিনি শুধু আমার নহেন, তিনি বহুবল্লভ। ইহাই অকপট ও সরল-বিশ্বাসী সাধক, সিদ্ধ পুরুষ ও মহাজনদিগের মত।

শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ কোন এক হিন্দু ভক্ত শ্রীভগবানের এই ভাবটী কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা হইল :—

ভারি সভা হইয়াছে,
মৌলবী যতেক, আ-নাভিলম্বিত,
দাড়ি-ধারী বসিয়াছে ॥
মাথে বাঁধা পাক, আল্‌বোলা আগে,
আমির সে মাঝে বসি।
একহাত দাড়ি, অতীব গম্ভীর
আরবী কহে হাসি হাসি ॥
সকলে তাহারে ভকতি করিছে,
মুখ তার চাহি দেখি।
চেন চেন করি, চিনিতে না পারি,
দাড়ি গেছে মুখ ঢাকি ॥
এমন সময় হঠাৎ সে জন
চাহিল আমার দিঠে,
নয়ন মিলিল, অমনি চিনিনু,
আমার রসিক বটে ॥
সে বেশ দেখিয়া, বড় হাসি পেল,
আঁচল ঝাপিনু মুখে
লজ্জা পেয়ে যেন, আঁখি ঠারি বলে
প্রকাশ ক'রো না কা'কে ॥

* * * * *

আমি (কহিলাম) :—
"ছুঁও না আমারে, পেঁয়াজ রশুন
গন্ধ কয় গায়ে তব।
এতদিনে সখা, জাতিটি খোয়ালে,
সমন্বয় করাইব ॥"
রসিক (শ্রীভগবান) কহিলেন :—
লুকায়ে সবারে, গিয়াছিনু আমি
বাহির করিলে তুমি,
চিরদিন হেন, যে খুঁজে আমাকে,
তারে ধরা দেই আমি ॥
আড়ালে আড়ালে সদাই বেড়াই
ঠাউরিয়া যে বা দেখে।
অল্প ধৈর্য্য ধরে, পাছে পাছে ফিরে
সে ধরিতে পারে মোকে ॥
উহারা আমাকে, ভকতি করিয়া
মুখেতে দিয়াছে দাড়ি।
ওইরূপে ওরা পায় সুখ মনে,
তেঁই ওইরূপ ধরি ॥
তুমি যাহা চাও, বেশ ফিরাইব,
ঘুচাব পিঁয়াজ-গন্ধ।
তোমার নয়নে সদাই মিলিব
রসিক নয়নানন্দ ॥

* * * * *

অবিদ্যা-জড়িত অবস্থায় স্বার্থের প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়া যেমন আমরা নিজের সন্তানটীর সহিত অপরের সন্তানের বিষম প্রভেদ বোধ করি, অজ্ঞান শিশুগুলি যেমন "আমার খেলনা ভাল! আমার খেলনা ভাল।" বলিয়া কলহ করে, ধর্ম্ম-রাজ্যেও তদ্রূপ আমরা অজ্ঞান-অবস্থায় "আমার ধর্ম্ম ভাল, আমার ধর্ম্ম ভাল" বলিয়া গর্ব্বিত হই ; এবং মোহের মাত্রা আরও অধিক হইলে শুধু উহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করি যে, অপরের ধর্ম্ম মন্দ, ভ্রান্তিমূলক ও অসত্য।

কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গাড়ী পাইবার জন্য দুইজন পথিক যেমন পথের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কলহ-বিবাদে উন্মত্ত হইলে নিরূপিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট গাড়ী ছাড়িয়া দেয়—উভয়ের মধ্যে কাহারও অভিলষিত স্থানে যাওয়া হয় না, তদ্রূপ "পরের ধর্ম্ম মন্দ" ইহা প্রমাণে ব্যস্ত হইলে নিজের ধর্ম্ম, নিজের সাধনা-বিষয়ে ভ্রান্তি ও অনাস্থা হইয়া জীব পরিশেষে দেখিতে পায় যে, সে 'যে আঁধারে সেই আঁধারেই' পড়িয়া আছে—এক পাও অগ্রসর হয় নাই ;—এদিকে

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে,—পরমায়ু শেষ হইয়াছে। তাই বুঝি মহাত্মা কবির সাধকগণকে সাবধান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,— "হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহ বৈঠ্‌কে আপন্ ঠাঁই।" (আপন ধর্ম্মে অচলা নিষ্ঠা রাখিয়া অপরের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও বলিতে থাক, "হাঁ উহাও সত্য, হাঁ উহাও সত্য।")

ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবির্ভূত শ্রীভগবানের অবতারগণ মূল ধর্ম্ম-মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু নিয়মের স্থাপন করিতে বাধ্য হ'ন। প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ঐ সকল আচারাদির বিশেষ কোন সংশ্রব না থাকিলেও ঐগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক হয়। এই বিশাল পৃথিবীর নানা স্থানের অধিবাসীদের ঐ সকল আচারাদি এত পৃথক যে সময়ে সময়ে সেগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং বলপূর্ব্বক উক্ত আচার ব্যবহার গুলির একতা-সম্পাদন করিতে গেলে তাহার ফলও বিপরীত হয়। অথচ প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে ঐগুলির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, মুসলমান-শাস্ত্র যেরূপ আচারকে শুচি বলেন, হিন্দু-শাস্ত্রকার হয়ত সেই আচারকে শুচি বলেন না। অথচ উভয় শাস্ত্রই অশুচি হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ করেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পাদুকা-সহ বা পাদ ধৌত না করিয়া অথবা স্নানাদি না করিয়া উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করেন কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ আছে, যে স্থানের লোকের পক্ষে নগ্নপদে বিচরণ অথবা অনবরত পাদধৌত করা কিম্বা স্নানাদি করা একেবারে অসম্ভব সুতরাং ঐ সকল স্থানের ধর্ম্ম-সংস্কার জন্য আবির্ভূত ধর্ম্মাচার্য্যগন উক্ত প্রকার আচার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে চান নাই। এদিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গেলে আচার্য্যগণের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ না মানিয়া নিজের সুবিধা, ইচ্ছা বা বিদ্যানুযায়ী টীকা টিপ্পনী করিলে, আচার্য্যগণের অবাধ্য হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার জন্য ধর্ম্মলাভে সমূহ ব্যাঘাত জন্মে। শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ লাভের সহিত সামান্য সামান্য আচার ব্যবহারের চরমে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও আদিতে বিশেষ সম্বন্ধ আছে;— এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ঐগুলি বাদ দিলে ধর্ম্মলাভ একেবারে অসম্ভব। হিন্দু-শাস্ত্রে একাদশী তিথির পালন একটী আচার। খৃষ্টান-শাস্ত্রে রবিবারে সাংসারিক কর্ম্মাদি বন্ধ করিয়া অজস্র ধর্ম্মানুষ্ঠান একটি আচার। কোন সাধক যদি উক্ত আচারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছাচার করেন, তবে উক্ত আচারের প্রবর্ত্তক-দিগের অবমাননা জন্য এবং তাহার প্রকৃতি ক্রমশঃ অধিক উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় ধর্ম্মলাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে, ইহাই মহাপুরুষদিগের মত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন,—"শস্যের খোলা হইতে গাছ হয় না, শাঁস হইতে গাছ হয় সত্য বটে কিন্তু ঐ খোলাটি বাদ দিয়া শুধু শাঁস পুতিলে গাছ হয় না, খোসা সমেত বীজ পুতিতে হয়।" তদ্রূপ ধর্ম্মলাভের পরিণামে বিধি-নিষেধের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও প্রথমাবস্থায় ঐ গুলির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে—ঐগুলি অবশ্য পালনীয়। তাহা যদি সত্য হয় তবে ব্রাহ্মণ, মুসলমান ও খৃষ্টানের একত্রে একস্থানে উপাসনা কিরূপে সম্ভবে! তাহার সম্বন্ধেও সেই কথা। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র অনুসারে কোন কোন বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান-শাস্ত্র অনুসারে উহা নিষিদ্ধ নহে; আবার উক্ত তিন শাস্ত্রের প্রণেতাই হয়ত (উক্ত শাস্ত্র-বিশেষ অনুসারে) স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ; সুতরাং উক্ত শাস্ত্র-

বিশেষ অনুসারে তাঁহার বিধি পালন না করিলে, মহা অপরাধজন্য ঈশ্বর প্রাপ্তিও অসম্ভব, এরূপস্থলে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের পক্ষে একত্রে একসঙ্গে ভোজন করা কিরূপে সম্ভব? তাই আমাদের মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেব তাঁহার "সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ণয়সার" নামক গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ত দূরের কথা যে হিন্দু ধর্ম্মের মজ্জাগত মূলমন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ং", তাহার মধ্যেও কিরূপ ভিন্নবিধি লক্ষ্য করুন। আমরা নিষ্ঠাবান শাক্তের মুখে শুনিতে পাই "তুলসীর গন্ধে চণ্ডিকাদেবী ক্রুদ্ধা হন," (তুলসী-ঘ্রাণমাত্রেণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা।) আবার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের মুখে শুনিতে পাই, "অপরাজিতা পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে অন্ধ হইতে হয়।" আমরা এগুলিকে বিদ্বেষানলে দগ্ধ সাধকের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বলি না; আমরা বলি ভিন্ন ভিন্ন সাধনের প্রকৃতি অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ভিন্ন ভিন্ন বিধি। ঐ গুলির মধ্যে সব গুলির সম্যক হেতু নির্দ্দেশ করা মানব বুদ্ধির অগম্য বিষয়; তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকেই এক শ্রেণীতে বসাইয়া একই পাঠ পড়াইবার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। লীলাময় শ্রীভগবানের বৈচিত্র্যময় জগতে মনে ত দূরের কথা, দুইটী মনুষ্যের দুইখানি মুখেও সাদৃশ্য নাই। খৃষ্টান-ধর্ম্ম সুসভ্য সুশিক্ষিত ইউরোপীয় জাতির হস্তে পড়িয়াছে তথাপি এই দুই হাজার বৎসরের মধ্যে উহাতে শতাধিক সম্প্রদায়। মূলে উহাদের বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও আচার ব্যবহার প্রভৃতির ন্যায় সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রায় শতাধিক মতভেদ।

যাঁহারা মনে করেন এক সঙ্গে আহারাদি না করিলে ভালবাসার চরমসীমা দেখান হয় না, তাঁহারা ভ্রান্ত নন্ কি? এক জননীর একই উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনী জগতে আসিয়া পরস্পর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ ইহা স্বভাবতঃই দেখা যায়, তাই বলিয়া কি তাহাদের একাসনে একপাত্রে আহার আবশ্যক হয়? অকৃত্রিম প্রীতি-সূত্রে পরস্পর গাঁথা দুটি ফুলের মত বন্ধুর অভাব এজগতে নাই কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্যই একসঙ্গে করিয়া থাকেন? হিন্দু-বিধবা রমণীকে বা নিষ্ঠাবান হিন্দু-পিতাকে আহার-কালে তাঁহাদের প্রাণাধিক নয়ন-মনি সদৃশ পুত্রও স্পর্শ করিতে পায় না, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, উক্ত জনক বা জননী ঐ পুত্রকে ভাল বাসেন না? প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ঐ ধর্ম্মবিশেষের স্থাপয়িতা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের বা স্বয়ং ঈশ্বরাবতারের নির্দ্দিষ্ট সামান্য সামান্য আচার ব্যবহার গুলি উল্লঙ্ঘন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না, বরং উহা করিলে পাপস্পর্শ হয়। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রেমের অবতারের প্রেম-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া গিয়াছিল,—যে দয়াল প্রভু ঘৃণিত বেশ্যা ও অস্পৃশ্য কুষ্ঠিকেও তাঁহার প্রেম-মাখা কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়াছেন,—

"অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

সেদিনও অবতারকল্প যে মহাপুরুষত্রয় জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সঙ্কেত পতাকা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, সেই

শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দদেব *, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়গণও ধর্ম্মরাজ্যে, সাধনরাজ্যে, আচার-ব্যবহার-রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাময়, স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ, কোনরূপ অবৈধ একাকারের প্রশ্রয় দেন নাই, তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুত্র ও কন্যাগণের পরস্পর বিবাহাদির আদেশ বা বিধি দেন নাই। তাহা হইবে কেন? শ্রীভগবানের অবতার-দেহ বা তাঁহার প্রেরিত, তাঁহারই ইচ্ছা-শক্তিতে পরিচালিত মহাপুরুষগণ শাস্ত্রবিধি ধ্বংশ করিতে জগতে আসেন না; উক্ত বিধি-পালনের সহজ পন্থা দেখাইতে আসেন—আমাদের ভ্রম সংশোধন করিতে আসেন—সেইজন্যই বুঝি ঈশ্বরাবতার খ্রীষ্টদেব খ্রীষ্টান-শাস্ত্রে বলিয়াছেন;—

I came to fulfil them and not to destroy them ;—

শাস্ত্রবাক্য পূর্ণতরে মোর আগমন।
আসি নাই করিবারে বিধির লঙ্ঘন॥

এখন দেখা যাউক্ কোন্ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের একতা সম্ভব? শ্রীভগবান-সম্বন্ধে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বোধ হয়, এই কয়টী প্রধান বিষয়ই স্থির করা একান্ত যথা—

১। শ্রীভগবানের স্থান কোথা?

২। শ্রীভগবানের স্বরূপ কি? অর্থাৎ তিনি সাকার না নিরাকার?

৩। শ্রীভগবান্ যদি সাকার হন তবে তাঁর কিরূপ আকার? যদি নিরাকার হন তবে কিরূপ নিরাকার?

৪। শ্রীভগবান যদি আকার বিশিষ্ট হন্ তবে তিনি পুরুষ-আকার না স্ত্রী-আকার?

৫। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি?

৬। শ্রীভগবানকে জীব পাইতে পারে কি না?

শ্রীভগবানকে জীবের কি আবশ্যক?

৮। শ্রীভগবানকে না পাইলে জীবের কি ক্ষতি?

৯। শ্রীভগবানকে পাওয়া সম্ভব হইলে কিরূপ সাধনার আবশ্যক।

১০। কতদিনে জীব শ্রীভগবানকে পাইতে পারে?

১১। শ্রীভগবান-লাভ হইলে জীবের আর কি লভ্য থাকে?

এই কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের কি মত তাহাই এবং ঐ সকল মতের সমন্বয় চেষ্টাই আমাদের আলোচনার বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রী—
ভক্তকৃপাভিক্ষু প্রকাশক
শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

* এই মহাত্মার শিষ্যগণের মতে ইনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার। সাধারণ ভক্ত-জগৎ-সমক্ষে উক্ত শিষ্যমণ্ডলী যতদিন তাঁহাদের ঠাকুরের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে না পারিবেন, ততদিন সাধারণ জগৎ যেন মনে করেন যে, উক্ত শিষ্যগণ অলৌকিক গুরুভক্তিবশেই স্বীয় ইষ্টদেবকে শাস্ত্রানুসারে 'পরংব্রহ্ম' বলিতেছেন। (গুরুরেব পরংব্রহ্ম)।

সম্পাদক।

শ্রীপাদ-পদ্ম

"শ্রীপাদ-পদ্ম" এই শব্দটীর ব্যাকরণগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, শ্রীপাদপদ্ম বলিলে আমরা বুঝি সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমমঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীচরণযুগল। কেমন নয় কি? সেই পরম পিতা শ্রীভগবানের চরণযুগল ভিন্ন ত্রিভুবনে শ্রীপাদপদ্ম বলিলে আর কিছু বুঝিবার আছে কি? নিশ্চয় নাই। যে চরণকমল কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মারও বাঞ্ছিত, যে পাদ-পদ্ম-মধু পানে উন্মত্ত হইয়া দেবর্ষি নারদ দিবানিশি বীনাযন্ত্রে মধুর হরিণাম গানে বিভোর, যে পাদ-পদ্ম হইতে সুরশৈবলিনী পতিতপাবনী নারায়ণী পুণ্যতোয়া শ্রীশ্রীজাহ্নবীর উদ্ভব, যে পদকোকনদের মধু পান জন্য কত শত যোগী, ঋষি, যুগযুগান্তর গভীর ধ্যানে মগ্ন, যাহার অতুল শোভা বর্ণনে বেদ-বেদান্তও অসমর্থ, এমন কি, যাহার মহিমা ত্রিকালজ্ঞ ভোলানাথ পঞ্চমুখেও কীর্ত্তন করিতে পারেন না, সেই ভবারাধ্য ধন শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে? তাই বলি, আমার পক্ষে শ্রীপাদ পদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাওয়া, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা, সন্দেহ নাই। নতুবা আমি বিবেকশূন্য বিদ্যাবুদ্ধিহীন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অতি সামান্ত জীব আমার কি সাধ্য যে আমি সেই সারাৎ-সার শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করি? তবে জানি না, কে অলক্ষ্যে আমার হৃদয়ে এই বাসনা জাগাইয়া দিয়াছে। যাহাই হউক, আজ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, কৃতাঞ্জলীপুটে ভক্ত-পদ-ধূলি শিরোভূষণ করিয়া নর-নারায়ণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, সেই শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি দয়াময়ের ইচ্ছায় আমার লিখিত কথায় শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তনের সামান্য ভাবও প্রকাশ পায়, তবে জীবন সার্থক মনে করিব। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।—"পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি তাঁহার কৃপায়।"

শ্রীভগবান তাঁহার লীলার জন্য নানাপ্রকার দিব্যরূপ ধারণ করিলেও নররূপেই বারংবার ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। জীব সাধরণ চক্ষে নরাকারই দর্শন করে। আমরা সাধারণ জ্ঞানে বুঝি নরদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বোত্তম অঙ্গ, পরে যথাক্রমে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সর্ব্বশেষে পদযুগল। তাই পিতামহ ব্রহ্মার শ্রীঅঙ্গের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি বলিয়া শূদ্রকে চতুর্থ স্থানে রাখা হইয়াছে। কিন্তু নররূপী জগৎ পিতার সর্ব্বাঙ্গই শ্রেষ্ঠ হইলেও দেখিতে পাই, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ; ইহাতে যে লীলাময়ের কি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা তিনিই জানেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে গেলে, প্রথমে শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা পরে তাঁহার শ্রীরূপ দর্শন এবং অন্যান্য কাজ। দেখিতে পাই, শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মেই যেন তাঁহার সর্ব্ব শক্তির বিকাশ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই যেন ত্রিভুবন-বাসীর একমাত্র আশ্রয় স্থল; ঐ পাদপদ্মেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সমস্তই আছে; বলিতে কি, ঐ পাদপদ্মেই যেন কোটি কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ; মনে হয় যেন, শ্রীভগবানের ভগবানত্বই এই শ্রীপাদপদ্মে। নতুবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতেও শ্রীপাদপদ্মের এত

মহিমা কেন,—এত আদর কেন? যে শ্রীপাদ-পদ্ম নিজে কমলা দিবানিশি সেবা করিয়াও তৃপ্ত হন না, তাহা কি সামান্য বস্তু? যে শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্ব তীর্থের একত্র সমাবেশ, যাহা লাভ করিলে জগতে আর কিছুই দুর্লভ থাকে না, তাহা কি সামান্য ধন? আমি দীনহীন কাঙ্গাল—তাহার মহিমা কি কীর্ত্তন করিব?

শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদ-পদ্ম-মকরন্দ বিন্দুমাত্রও যাহারা পান করিয়াছেন, তাঁহারা ত ধন্যই; এই দিব্য-মধু-পান-লোলুপ ভক্তগণেরও সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহাদের শোক নাই, তাপ নাই, অশান্তি নাই, তাঁহারা দিব্য জ্ঞানানন্দ লাভ করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছেন। আহা! তাই বুঝি নিত্য-ভক্তি প্রদায়িনী শ্রীশ্রীতুলসীরাণী সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া চির-দিনের জন্য শ্রীশ্রীহরিপদ-বিলাসিনী হইয়াছেন! ওগো শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সি তুলসীরাণি! তুমিই ত্রিজগতে ধন্যা! তুমি পরম বস্তু চিনিতে পারিয়াছ; তোমার সেবা যাহারা করেন, তাঁহাদের ত' কথাই নাই,—তোমার শ্রীনাম উচ্চারণ করিলেও নিত্য-ভক্তির উদয় হয়। তাই মহাজনগণ সমস্বরে গাহিয়া গিয়াছেন—

"যে তোমার নাম লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
দয়া ক'রে কর তা'রে বৃন্দাবন-বাসী।"

ধন্যা মহারাণি! তুমিই ধন্য; আহা! তুমি শ্রীশ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পার না তাই শ্রীশ্রীনারায়ণও তোমাকে শ্রীপাদপদ্মে রাখিতে বড় ভাল বাসেন। ওগো হরিপদ বিলাসিনী-তুলসী-দেবি! ত্রিভুবনে অমূল্য ধন কি, ত্রিজগৎবাসী তোমার নিকট তাহা শিক্ষা করুক। জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই কি তোমার ঐ পদসেবা? ওগো কৃষ্ণ-প্রেয়সি! তোমার জয় হউক! শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা প্রচার জন্যই কি তোমার এ ধরাধামে শুভাগমন? ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা জগতে প্রচার জন্যই কি তুমি জীবের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছ? পতিত-পাবনি! কৃপা করিয়া জগতকে শ্রীপাদপদ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও; তোমার নিকট এ দীনহীন কাঙ্গালের এই নিবেদন।

শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা কে বুঝিবে, কে গাইবে? কেবল শ্রীশ্রীতুলসী রাণী নহেন—আবার কৈলাস-পতি ভোলানাথ কি করিয়াছেন, দেখ! সেই নারায়ণের পদোদ্ভবা পতিতপাবনী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া আছেন! ইহাতেও ভোলানাথের সাধ মিটে নাই; তাই গঙ্গাধর শ্রীপাদ-পদ্ম-মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া শবাকারে শয়ন করিয়া সেই নারায়ণের অভেদ-শক্তি পরমা জননী শ্রীশ্রীনারায়ণীর শ্রীপাদ-পদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, সমাধি-মগ্ন হইয়া আছেন। জগৎবাসী! আজ সেই জ্ঞানানন্দময় গুরুদেব পঞ্চাননের ভাব দেখ দেখি। ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিয়াও ভোলানাথের আশা মিটিতেছে না। শ্রীপাদ-পদ্মে যে কত মধু, শ্রীপাদপদ্ম যে কি অমূল্য ধন, তাহা কে বুঝিবে? আমার মনে হয়, ভোলানাথ শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া নিজেও চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। এবং ত্রিভুবন-বাসীগণকে দেখাইতেছেন যে, হে ত্রিভুবনবাসী! এই শ্রীপাদ-পদ্মই জগতে সার-ধন; সকলেই যাহাতে ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম-মধু পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পার তাহারই চেষ্টা কর; আমি ইহা নিয়ত বক্ষে ধারণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।"—তাই বুঝি জগদ্গুরু শিবের এই ভাব!

তাই বলি, শ্রীপাদ-পদ্মের অনন্ত-মহিমা, অসীম শক্তি। শ্রীপাদ-পদ্ম ভিন্ন ত্রিভুবনবাসির

আর অন্য গতি নাই ; জীবনে মরণে ঐ শ্রীপাদপদ্ম ভরসা। তাই জীবের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার পরও শ্রীশ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্মে উহার পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ ; ইহা যাইবার নহে— মুছিবার নহে। যে দিকে চাহিবে, কেবল শ্রীপাদ-পদ্মের মহিমা প্রকাশ ! তাই আমার দয়াময় ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

(তাঁর) দিব্য বিনোদ শ্রীপদ,
শুদ্ধ ভক্তের সম্পদ,
(সেই) বিনোদ শ্রীপদে শোভে মোক্ষের আকর।"
(নিত্যগীতি)।

লোকে যে মোক্ষ কামনা করিয়া যুগ-যুগান্তর কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না, সেই মোক্ষের আকর ঐ শ্রীপাদপদ্ম।

তাই বলি, হে জগত-বাসী ! এস আমরাও সেই শ্রীপাদ-পদ্ম মধু পানে অমরত্ব লাভ করি। এস, আমারাও সেই হরবাঞ্ছিত ধনকে আশ্রয় করি ; আর কেন ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইতেছি ? এস, যাহাতে আমাদের মনোভৃঙ্গ শ্রীশ্রীনিত্য-পাদ-পদ্ম-মধু-পানে চিরশান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য দয়াময়ের নিকট কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি। এস, আজ সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"হে জগত-পিতা পরমেশ্বর ! আমরা অন্ধ, বিবেকহীন, আমরা সর্ব্বদা তোমারই মায়াজালে আবদ্ধ, তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিমা আমরা কিছুই জানি না ; দয়া ক'রে আমাদিগকে দিব্য চক্ষু প্রদান কর ; তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে আমাদিগের রতি-মতি দাও। হে কাঙ্গালের ঠাকুর ! একবার এ দুঃখী জীবের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি কর ; আমরা যে তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম-মাধুরী বুঝিতে না পারিয়া অমৃত জ্ঞানে বিষ পান করিতে নিয়ত উন্মত ; রক্ষা কর, তোমার ঐ চিরশান্তির আলয় শ্রীশ্রীরাতুল-পাদ-পদ্মে স্থান দাও, প্রভো !

জগত-বাসী ! এস, আজ সকলেই কাতর প্রাণে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি। শ্রীভগবান অনন্তরূপী ; তাঁহার অনন্ত নাম,—নিতাই, গৌর, কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, আল্লা, যিশু ; যে যে নামেই ডাক না কেন, সমস্ত ডাকই তাঁ'র কর্ণগোচর হইবে। সমস্ত নাম তাঁ'রই ; এস, আমরা দ্বিধা ভাব ভুলে গিয়ে, হৃদয় খুলে, যাহার যে নাম ভাল লাগে, সেই নামে তাঁহাকে প্রাণ ভ'রে ডাকি ; অবশ্য তাঁ'র কৃপা হইবে। ঐ দেখ, আমরা না ডাকিতেই, আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া দয়াময় শ্রীভগবান নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগুরুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া "আয়" "আয়," ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। এস ভাই, আমরা সেই জ্ঞানানন্দ-ময় নরনারায়ণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকালের জন্য শরণ লইয়া চির-শান্তি লাভ করি। আমরা সামান্য জীব ; সেই অনন্ত-রূপীকে সহজে ধরিতে পারিব না বলিয়াই দয়াল ঠাকুর আজ শ্রীশ্রীগুরুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে প্রেম যাচিতেছেন। তাই শ্রীসনাতন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হল গুরুরূপ ধরি ॥"

ভ্রাতৃ-বৃন্দ ! আজ দয়াময়ের দয়ায় আমাদের সেই ভবারাধ্য ধন শ্রীপাদ-পদ্ম লাভ করিবার মাহেন্দ্র যোগ ঘটিয়াছে ; এস, সকলেই "জয় গুরু, শ্রীগুরু" বলিয়া সেই ভবপারের একমাত্র তরণীস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীনিত্য-পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিত্য-প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাই। "জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।"

নিত্য-পদাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

তা'রে কি পাসরা যায়?

সখি! তা'রে কি পাসরা যায়?
হৃদয়-রঞ্জন মোর সে কালরতন,
তাহাকে লভিতে কত পেয়েছি গঞ্জন;
অবিরত রেখে হৃদে হিয়া না জুড়ায়,—
তা'রে কি পাসরা যায়?
হৃদয়েতে রেখে তা'রে কতই যতনে,
রেখেছি প্রহরি সদা এ দু'টী নয়নে;
তবু প্রাণ তা'রি তরে কাঁদে গো সদায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
তিলেক তাহারে সই! পাসরিতে নারি,
কি জানি কেমনে মন করিয়াছে চুরি?
তাই প্রেমে বাঁধিয়াছি সে মন চোরায়,
তা'রে কি পাসরা যায়?
নিমিষ না হেরে তা'রে হই পাগলিনী,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু'খানি;
মধুর বচনে সদা পরাণ জুড়ায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
কুল-মান-লাজ-ভয় দিয়েছি চরণে,
বলেছি প্রাণের ব্যথা হৃদয়-রতনে,
তা'রে বিনে প্রাণ মোর কিছু নাহি চায়,
তা'রে কি পাসরা যায়?

শয়নে স্বপনে সদা থাক তা'রে লয়ে,
তাহারি মূরতি মোর জাগে এ হৃদয়ে;
স'পিয়াছি প্রাণ-মণ তাহারি সেবায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
কতই যন্ত্রণা সখি! পেয়েছি এ প্রাণে,
কতই সয়েছি দুঃখ লভিতে সে ধনে;
কাটায়েছি কাল সুধু আশায় আশায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
নয়নে নয়নে যদি সে থাকে আমার,
পরাণ ভরিয়ে হেরি শ্রীরূপ তাহার;
তবু নাহি মিটে আশা থাকি পিপাসায়,
তা'রে কি পাসরা যায়?
তাহার মোহনরূপ বারেক হেরিলে,
কুলমান ভেসে যায় নয়ন সলিলে;
ইচ্ছা হয়, হই গিয়ে দাসী অই পায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
(কিবা) মোহন মূরতি তা'র বঙ্কিম নয়ন,
গলে বন-ফুল মালা নয়ন-রঞ্জন;
শিখি-পুচ্ছ শোভে কিবা বিনোদ চূড়ায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?

পরিধানে পীতবাস মাণতে খচিত,
অলকা-তিলকাবলি শ্রীমুখে অঙ্কিত;
শ্রীকরে মোহন বাঁশী কত শোভা পায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?
কত দিব্য আভরণে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত,
মকর কুণ্ডল কর্ণে হ'তেছে দোলিত;
সুবর্ণ-নূপুর শোভে ও রাতুল পায়,
তা'রে কি পাসরা যায়?

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে যমুনা-পুলিনে,
দাঁড়ায়ে বাজায় বাঁশী সুমধুর তানে;
যমুনা উজান বহে, জগত মাতায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?

কদম্ব-তলেতে গিয়ে কভু বাঁকাশশী,
মদন-মোহন-রূপ ব্রজেতে প্রকাশি;
"রাধা, রাধা, রাধা" বলে বাঁশরী বাজায়,
তা'রে কি পাসরা যায়?

শুনিলে বাঁশরী তা'র মনপ্রাণ হরে,
ইচ্ছা হ'য় দেখে আসি সেই মনচোরে;
বাঁশীর স্বরেতে মন কেড়ে লয়ে যায়;
তা'রে কি পাসরা যায়?

ভুবন-মোহন-রূপ শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর,
অপরূপ নিত্য-রূপ রসের নাগর ;
হেরিলে তাহারে সই ! প্রাণ রাখা দায় ;
তা'রে কি পাসরা যায় ?
বারেক হেরিলে সই ! সে মন-মোহনে,
অমনি হইবি দাসী ও রাঙ্গা-চরণে ;
এহেন গুণের নিধি কে আছে কোথায় ;
তা'রে কি পাসরা যায় ?
সব ভুলে যাই যেন, তা'রে নাহি ভুলি,
সে মোর হিয়ার মাঝে পরাণ-পুতলি ;
জনমে মরণে সখি ! সে মোর সহায় ;
তা'রে কি পাসরা যায় ?

সখি রে !
আমি চির-কাঙ্গালিনী, জনম-দুঃখিনী ;
রাখিব তাপিত হৃদে চরণ দু'খানি ;
জনমে জনমে হ'ব দাসী রাঙ্গা পায় ;
তা'রে কি পাসরা যায় ?

নিত্য-পদাকাঙ্ক্ষী,—
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য ।

ক্ষণোপলব্ধি

হে আমার দেবতা, প্রাণারাম, সুন্দর-সৌম্য-কান্ত ! আজ আমার তমসাবৃত মনোমধ্যে তোমার রূপ ত' প্রতিভাত হইতেছে না ! চিরানন্দোৎসারিণী-হৃদি-বৃন্দাবনে আজ অপূর্ব্বকাব্যময় নিত্য-জ্ঞান-সূর্য্য যেন জলদ-জালাবৃত ; সে অনুভূতি সততই অন্তরকে তিমির-ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে ! অমৃত-সাগরের তীরে বাস করিয়া কখন তাহা পান করি নাই। হা ভাগ্য—আজ আমাকেই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িতে হইতেছে ! আমার প্রাণের ভালবাসার সামগ্রী—অন্তরের ভক্তির আধার তুমিই ছিলে, হৃদয়-দেবতা ! আজ আমার এই হৃদয়-বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাকে আনন্দ-মুখর চির-মনোহর করিয়া দাও, প্রভু !

নয়নের তৃপ্তি—সুদর্শনে, শ্রবণ চায় শ্রুতি-সুখ। প্রভু ! তোমার সেই কোটীচন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল রূপভাতি—সেই স্বর্গীয় সুষমা যাহা অঙ্গের প্রতি লোম-কূপে বিচ্ছুরিত হইত, সেই সরল শিশুর মত আনন্দময় ভাবময় বদন-চন্দ্রমা, সেই অমৃতময় মধুর কথাগুলি আমার শ্রবণ-দর্শনে কি এক আনন্দ-স্ফূর্ত্তি, সুধার উৎস প্রবাহিত করিত !—মনে হইত সে প্রবাহে সমস্ত পৃথিবীটাই পুলকিতা ও মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে !

হে আমার শুদ্ধ ঠাকুর ! কি ছিলে তুমি, প্রভু ! এমন সুখ, এত আনন্দ-তৃপ্তি,—এত ত' কিছুতে পাই নাই—কোথাও হয় নাই, যেমন তোমার কাছে গেলে পেতাম ! আজ সত্য-দাদা প্রভৃতি ঠাকুরের কথাগুলি লিখিতেছেন ; আমার কিন্তু দু'চারিটি কথা ছাড়া কিছুই মনে আসে না। কারণ আমি বুঝি শুধুই দেখতাম —এক দৃষ্টে, নির্ণিমেষ নয়নে, প্রাণ-ভরে, নয়ন-ভরে ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে হৃদয় আমার আনন্দে ভরে আস্‌তো, একটা মাদকতা আস্‌তো—আমি বেশ অনুভব কর্‌তাম, চোখ বুঁজে আস্‌তো। হৃদয়ের মধ্যে একটা স্ফূর্ত্তি, একটা আনন্দোপলব্ধি হ'তো ! তখন একটা রোমাঞ্চ আস্‌তো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেটে জল বাহির হতো। কানে যে অমৃতবাণী ঝঙ্কৃত হ'ত, তাহা সেই আনন্দ-অনুভূতিতে একটা মধুর সুর

বেঁধে দিত মাত্র! তাই বল্‌ছি, কথা নিয়ে আমি কখন ঘাটাঘাটি করি নাই। কথা মনে ক'রে রাখ্‌বার যেন আমি অবসরই পেতাম্‌ না। ঠাকুরের দর্শনেই আমি বিভোর হ'য়ে যেতাম,—আনন্দ-স্পন্দনে প্রাণে যেন একটা তরঙ্গ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিত! সেই নির্ম্মল-আনন্দ-ধারা ক্রমে সে উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ ক'রে যেন অসীম হ'তে প্রাণের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য অবিচলিত হ'য়ে থাক্‌তো। কি একটা জিনিষ প্রাণের মাঝে যেন ধরা দিত,—যাহাতে নিমেষের জন্য বাহ্য জগতটাকেই হারাইয়া ফেলিতাম।

ঠাকুর! তুমি কে এসেছিলে চিনিতে পারি নাই! যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে কতবার এমন আসিয়া থাক—কখন পূর্ণ, কখন খণ্ডভাবে,—হে দেব! কয়জন তোমায় চিনিয়া লইতে পারে? দয়া ক'রে যাঁ'দের শ্রীচরণাশ্রয় দাও, তাঁ'রা ছাড়া আর কেই বা তোমার কথা জানিতে পারে? পিসীমা বল্লেন,—"ওরে, আজ ঠাকুরের গোপাল ভাব হ'য়েছিল। এক ভক্ত কতগুলি রসগোল্লা দিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর গোপালের মত ব'সে একটি একটি ক'রে রসগোল্লা চেয়ে নিয়ে খেয়েছেন। কিন্তু এখন আশ্চর্য্য দেখ্‌ছি, রসগোল্লার বাটী যেন ভরাই রয়েছে! তোরাও প্রসাদ পাবি!"

ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য আমি প্রথমে দেখি আমাদের বাগান বাড়িতে। দাদা তখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন। তিনি বাটী আসিয়া সশিষ্য ঠাকুরকে আমাদের বাগানে রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। গীত বাদ্যের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, দুইজন বাউল কীর্ত্তনিয়াকে আনান হইয়াছিল। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—মুখে কি আস্তে আস্তে বলিতেছিলেন। ঠাকুরকে ধরিতে অনেকেই দাঁড়াইলেন। ক্রমে কালীদাস দা'ও নাচিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে উভয়েই নৃত্য করিতেছেন। উভয়েরই এক প্রকার (?) আবেশ—চক্ষু মুদ্রিত। ঠাকুর যে রকম নাচিতেছেন, কালীদাস দা'ও ঠিক সেই মত নাচিতেছেন। কীর্ত্তনও জোরে জোরে হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই যেন নাচিতে আরম্ভ করিলেন, আর মুহুর্ম্মুহু হরিধ্বনি—একটা বিরাট আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রেমানন্দ-গদ্‌গদ ভক্তবৃন্দ নাচিতেছেন; মাঝে ঠাকুর—সেই আনন্দ-সুন্দর-মূর্ত্তি! প্রেমাশ্রু দরবিগলিত ধারে বহিতেছে;—ঠাকুর হাসিতেছেন—নাচিতেছেন। বাউল দুইজনও মুগ্ধের ন্যায় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে। কীর্ত্তনের শব্দে পাড়ার ইতর লোক—বাদ্গী তুয়া প্রভৃতি যাঁ'রা এসেছিল, দেখিলাম, দেবতার কৃপায় তা'রাও করতালি দিয়া 'হরি বোল' 'হরিবোল' বলিতেছে। প্রেমের বন্যায় সব ভাসিয়া যাইতেছে—তুচ্ছ তৃণখণ্ডকে তিনি কোল না দিবেন কেন? হে আমাদের সোণার গৌর! তুমি এমনি ক'রে মাঝে মাঝে জীবকে প্রেমের আস্বাদন জানিয়ে দাও বুঝি? কত দিন আগে এমনি ক'রে এদেশের দ্বারে দ্বারে তুমি প্রেম যেচে যেচে বেড়িয়েছিলে। কেহবা ফিরে তাকিয়েছিল, কেউ বা তাকায় নি—যাচা প্রেম ব'লে কত লোকে তা' প্রত্যাখ্যান করেছিল! আমরা না পাইলে অভিমান করি, কিন্তু দিলেও লইতে যাই না।

ঠাকুরকে এক এক দিন গোতম বুদ্ধের মত বলিয়া মনে হইত। উভয়েই সংসারত্যাগী, মহাশিক্ষক, জগদ্‌গুরু, শান্ত-কান্তিময়-মূর্ত্তি! আমার মা যখন ক্রমাগত আমার কয়টি ভাই-বোন মারা যাওয়ায় অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হ'য়ে

পড়েছিলেন তখন এক দিন ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের পুরাতন বাটিতে লইয়া আসা হয়। ঠাকুর, মাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, —"দেখুন, আপনারও ত চারটী ভাই, দু'টী বোন মারা গিয়াছে; জানবেন সেও নারায়ণের ইচ্ছা; আর আপনার ছেলেপুলে যে মারা যাচ্ছে, এও নারায়ণের ইচ্ছা। তাঁ'র ইচ্ছাতেই জগত চল্‌ছে। দেহটা চিরকাল থাকে না—সংসারের এই ত' সাধারণ নিয়ম।"

ইহা শুনিয়াই মনে হয় না কি সেই উপদেশ—বোধিসৎ শোকাতুরা শিষ্যাকে বলিতেছেন, — * * * * "তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমার একটী কাজ করিতে হইবে; শোকের ছায়ায় মলিন হয় নাই এমন কোন পুরী হইতে এক মুষ্টি সর্ষপ ভিক্ষা করিয়া আন।" অবশ্য শিষ্যা সে পুরী খুজিয়া পান নাই। জগত-পাতার নিয়মের ব্যত্যয় সাধারণতঃ হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,—"প্রভু, এমন স্থানে যেন আমার সৎকার হয়, যেখানে কখন আর কাহারও সৎকার হয় নাই।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"অন্যের কথা ছাড়িয়া দাও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তোমারই দেহের সৎকার বহুবার না হইয়াছে এমন কোন স্থান এই সংসারে খুজিয়া পাইবে না।"

ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মেই সমান আস্থা ছিল। তিনি বলিতেন যে, দেশকালপাত্রভেদে মহম্মদ জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট এবং বাইবেলকে তিনি খুব সম্মান করিতেন। যিশুর মৃত্যু-দিনে বাইবেলের কথা, তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতা, ক্রুশে আবদ্ধ করণের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন ভাবাবেশে বড়ই শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। শেষে উন্মত্তের ন্যায় নিজের মাথার চুল দুই হাতে ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলে সকলে অনেক প্রকার চেষ্টার পর তাঁহাকে শান্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজনরঞ্জন রায়।

ব্রাহ্মণ বরেণ্য কেন?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু-ব্যবস্থা-শাস্ত্র-প্রেণেতা মনু কর্ত্তৃক শূদ্রাদির প্রতি যে সমস্ত অনুদার ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন জয়কামী আর্য্যগণ পরাজিত অনার্য্যগণের প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়াই এই প্রকার ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; শূদ্রেরা (পরাজিতেরা) * যাহাতে কোন প্রকারে জেতাদের কাছে মাথা তুলিতে না পারে, সমাজে নিস্তেজ হইয়া কেবলই তাঁহাদের দাসত্ব করে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কৌশলক্রমে তাহারই বিধান করিয়াছেন। শূদ্র বিদ্যার্জ্জন করিতে পারিবে না, ভগবানকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিবে না, কেবল ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে;

* "আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া যে অনার্য্য জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহারাই (দস্যু বা) দাস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কল্পিত ধারণা বিষয়ে এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদি বাসভূমি। (See R. C. Dutt's History of India.) সম্পাদক।

কিন্তু বাস্তবিক এইরূপ উক্তির যে কোনই ভিত্তি নাই, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদন করা যাইতেছে, হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টিপ্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে সত্ত্বগুণান্বিত শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রজোগুণান্বিত রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজো ও তমো মিশ্রিত পীতবর্ণ বৈশ্য এবং পদ হইতে তমঃ প্রধান কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র উদ্ভূত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণই আর্য্যসমাজের মেরুদণ্ড। অন্যান্য অঙ্গের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যেমন মেরুদণ্ডহীন হইলে অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্রিয়া একেবারে অসম্ভব হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণহীন সমাজ অন্যান্যবর্ণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অচল। কাজেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বরণীয়। আর্য্যদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজাধিরাজ সম্রাটের স্বর্ণমুকুটশোভিত মস্তক ছিন্নকন্থা চীর-বসন-মাত্র-সম্বল, কুটিরবাসী, দরিদ্র-ভিখারী ব্রাহ্মণের পথের ধূলিমিশ্রিত নগ্ন-পদে লুণ্ঠিত হইত। অধিকন্তু লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে কিম্বা প্রভূত শক্তিপ্রয়োগে যাহাকে আয়ত্তে আনয়ন করিতে পারা যায় নাই, এহেন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকেও পথের ভিখারী ব্রাহ্মণ চির-দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিয়াছেন! ইহা কি অলৌকিক ব্যাপার নহে?

এই ব্রাহ্মণ রাজ-পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না, তিনি অসংখ্য নর-দেহ-পাতে ধরাতল লোহিতরাগে রঞ্জিত করিয়া শকুনী গৃধিনী প্রভৃতি শবভুক্ প্রাণীর তাণ্ডব নৃত্যে যোগদান করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন না; অতুল-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত রাজ-পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অম্লান বদনে ছিন্ন কন্থা, এবং চীর-বসন-গ্রহণে পরব্রহ্মরূপ নিত্য-বস্তু লাভের জন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীতে প্রবেশ করতঃ কৃচ্ছ্র-সাধনে তৎপর হইতেন; কেহ কেহ বা এই পাপতাপপূর্ণ স্বার্থময় অনিত্য সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য-ব্রহ্ম লাভের জন্য ঘৃণা, বিদ্বেষ, মান, অপমান সমজ্ঞান করতঃ মুষ্টি ভিক্ষা এবং নৈসর্গিক বস্তুমাত্র অবলম্বনে নিয়ত নিত্যানন্দে বিভোর থাকিতেন। এইরূপ পুরুষদের গন্তব্য স্থানই ব্রাহ্মণত্ব। এই ব্রাহ্মণত্বই বিস্তৃত ভক্তিরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ মোহাচ্ছন্ন মানবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছে। ইহাতে স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই; আছে স্বর্গীয় নন্দন-কানন-জাত পারিজাত কুসুমের ন্যায় পরার্থপরতার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ। ইহা অশান্তি-উত্তপ্ত ধরাবক্ষে শান্তি-বারি বর্ষণে সুশীতল করিতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। কিন্তু এই সত্ত্বগুণ জন্মমাত্রই নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। মানুষ জন্মের পর শূদ্র থাকে, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজ হন, বেদ-পাঠ দ্বারা বিপ্র হ'ন, তদনন্তর বেদ পাঠে মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া যখন পরব্রহ্ম-রূপ নিত্য-বস্তুর সত্তা অনুভব করিতে পারেন, তখনই ব্রাহ্মণ হ'ন। যথা:—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মজ্ঞানাত্তি ব্রাহ্মণঃ॥

(মনু।)

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণত্বের দাবী করা যে সে লোকের কার্য্য নহে। আর যিনি ঐ পদ লাভের যোগ্য, তিনি কেন মনুষ্য-সমাজের বরেণ্য হইবেন না? যিনি সমস্ত অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র (ঈশ্বরজ্ঞেয়তত্ত্ব) মন্থন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে পরব্রহ্ম-রূপ নিত্যবস্তুকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কেন সমাজের শিরোভূষণ হইয়া থাকিতে পারিবেন না?

ব্রাহ্মণের প্রেম সীমাবদ্ধ নহে, সার্ব্বজনীন; কাজেই তাঁহার কেহই শত্রু বা মিত্র নাই। তিনি সমদর্শী। রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়

উৎপন্ন হইয়াছেন ; ক্ষত্রিয়ের কার্য্য আত্মরক্ষা, তারপর অপর দশজনের রক্ষা এবং পরিশেষে দেশরক্ষা ; কিন্তু ব্রাহ্মণের আসন ইহার অনেক উপরে। সুধু দশের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদে না, অথবা সীমাবদ্ধ স্বদেশের মধ্যেই তাঁহার প্রেম আবদ্ধ নহে। তাঁহার প্রাণের আবেগ দশ ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, বিদেশ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে। যেখানেই পাপ-চিন্তা, পাপ-কথন, পাপাচরণ ও দীর্ঘ-সূত্রতা প্রভৃতি তমোগুণবিশিষ্ট শূদ্র দেখিবেন, সেইখানেই তাঁহার উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণের গমন। স্বার্থে অন্ধীভূত হইয়া নিয়ত তমোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে! ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু। এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ গুরু হইতে পারেন না। এই ব্রাহ্মণের কৃপাতেই কলুষিত-চরিত্র ব্যক্তির কলুষরাশী ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া, সে উন্নত হইতে পারে।

এখন শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং যথার্থ শূদ্র কাহারা দেখা যাউক। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? গৌতম-সংহিতার মতে,
"অগ্নিহোত্র-ব্রত-পরান্ স্বাধ্যায়-নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যাঁহারা অগ্নিহোত্র-ব্রত-পরায়ণ, স্বাধ্যায়-নিরত, শুচী, উপবাস-রত, দান্ত, দেবতাগণ তাঁহাদিগেকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে ; গুণই কল্যাণকারক! চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—
"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

বর্ণাভিব্যঞ্জক যাহার যেরূপ লক্ষণ কথিত হইল, তাহা অন্যবর্ণসম্ভূত ব্যক্তিতে দেখিলে, তাহাকেও তদ্রূপ স্থির করিবে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে বনপর্ব্বের অন্তর্গত অজগর-পর্ব্বাধ্যায়ে অজগর রূপী রাজর্ষী নহুষ বলিতেছেন,—"হে যুধিষ্ঠির! অভ্রান্ত বেদ চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক, সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান ক্ষমা, অনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে, তবে কি শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজ-জাতিতেও শূদ্র-লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্র-বংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ-বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাঁহারাই শূদ্র।"

রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই আবার রাজর্ষি বলিতে লাগিলেন,—"হে আয়ুষ্মন্! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেই যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে?"

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন,—"হে মহাসর্প! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানব জাতিরই সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতি-বিচার-বিমূঢ় হইয়া, নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকেন ; অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে সমুদায় বর্ণের এইরূপ সঙ্করভাবশতঃ ব্রাহ্মণাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে যাঁহারা যাগশীল তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলেন।"

এই আর্য্য প্রমানানুসারে বৈদিক

ব্যাবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গিকার করিয়াছেন; বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু।

ঐ বনপর্ব্বে উক্ত সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মার্কণ্ডেয় সমস্যাধ্যায় পর্ব্বে আছে,—"পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াশক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়; আর শূদ্র যদি সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত থাকে, তবে তাহাকেও আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি; কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে ব্যবহার দ্বারাই ব্রাহ্মণশূদ্র জানিতে পারা যায়।

আর্য্যজাতির বর্ণবিভাগের ইতিবৃত্ত আমাদিগের নিকট দুর্জ্ঞেয়, কাজেই তৎসম্বন্ধে আমরা ভ্রান্তি-সঙ্কুল বিশ্বাস পোষণ করিতেছি। পুরাকালের ব্রাহ্মণত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা করিয়া এমনও জানিতে পারা গিয়াছে যে, যাহারা বর্ত্তমান সময়ে সমাজে অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণিত, অস্পৃশ্য এবং পদ-দলিত এরূপ পতিতা ব্যভিচারিণীর সন্তানও স্বীয় গুণে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণিত আছে।

সত্যকাম জাবাল নামক এক ব্যক্তি মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল; মহর্ষি এবম্বিধ অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির প্রস্তাব প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান না করিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার গোত্র কি?"

সত্যকাম বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—"প্রভু! আমি আমার গোত্র জানি না।"

মহর্ষি পুনরায় বলিলেন,—"বৎস! আমার দারুণ প্রতিজ্ঞা, আমি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করি না। তোমার কে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া তোমার গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

সত্যকাম জাবাল মহর্ষির এই আদেশ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া, মহর্ষির আদেশ বাক্য আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ মা! আমার গোত্র কি? আমি কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি?"

তদুত্তরে জননী বলিলেন,—"প্রিয়দর্শন! আমি যৌবনকালে দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়া বহু ব্যক্তির পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে তোমাহেন পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। সুতরাং তোমার গোত্র জানি না।"

জননীর এই বাক্য শুনিয়া জাবাল পর দিবস ঋষির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঋষি উচ্চ বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন! জাবালকে আবার সে দিবসও দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! তোমার জননীর নিকট তোমার গোত্র জানিতে পারিয়াছ?"

জাবাল কহিল,—"আজ্ঞে হাঁ! জানিতে পারিয়াছি।" তখন মহর্ষির নিকট অকপটে স্বীয় জন্ম-বৃত্তান্ত, যাহা ইতঃগ্রে জননীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল।

জাবালের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই আশ্রমস্থ ছাত্রগণ তাহাকে বলিয়া উঠিল,—"রে অন্ত্যজ বেশ্যাপুত্র! দূর হ', দূর হ'।"

কিন্তু মহর্ষি এই অদ্ভুত সত্যপ্রকাশক কপটতা-বর্জ্জিত বালকের বাক্য শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বৎস! তুমিই ব্রাহ্মণ হওয়ার উপযুক্ত।" তিনি তাহাকে ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বেশ্যাপুত্র বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন না; বরং উপনয়ন-সংস্কার করিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না সত্যই সত্যের দীপ্তি-প্রকাশক। এই

সত্য ব্যতিরেকে কখনই সত্যের গরিমা অব্যাহত থাকিতে পারে না। কাজেই মহর্ষি গৌতম সত্যজাত সত্যকামকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া দিলেন। সত্য-কামের এরূপ অদ্ভুত সত্য প্রকাশের জন্য তাহার ভাবী জীবনের আবছায়া টুকু মহর্ষির হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল ; ইহা তিনি জ্ঞাননেত্রে সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পুরাকালের এরূপ ব্রাহ্মণত্বের কত ইতিহাস আমাদের নিকট দুর্জ্ঞেয় রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কি আধুনিক সকল সময়েই সত্ত্বগুণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। রজো ও তমো পর্য্যায়ক্রমে তাহার নিম্নে স্থান পাইয়াছে। ইহাই বর্ণবিভাগের মূল ভিত্তি। তাই শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—"

বাস্তবিক যদি গুণ ও কর্ম্মদ্বারা ভারতীয় আর্য্য-ঋষিরা বর্ণবিভাগ না করিতেন তবে বর্ত্তমান কালের কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগকে জগতের গুরু বলিয়া স্বীকার করিত না। শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রকারদের উদার নীতি প্রতিপন্ন হইবে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণত্বের ভিত্তি যদি গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত, তবে কে তাঁহার এত আদর করিত ? কে তাঁহার পদঃরজ শিরে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত ? অধিকন্তু কোন নিকৃষ্ট-কুল-জাত ব্যক্তিও যদি প্রভূত জ্ঞানলাভ করতঃ সদ্‌গুণশালী হইয়া নিত্য-ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক পার্থিব বিভবের জন্য হিংসা-দ্বেষাদি নিকৃষ্ট-বৃত্তি-নিচয়ের বশবর্ত্তী না হয়েন, তবে তিনি কেন দ্বিজনন্দনাপেক্ষা বরেণ্য হইবেন না ? প্রত্যুত, হওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত। পুরাণাদি হইতে তাহার বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে তাহা হইতে আপাততঃ বিরত রহিলাম।

গুণের আদর দেখাইবার জন্যই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন। গুণের জন্যই ত ধীবর-কন্যার পুত্র ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ্য সমাজে পূজনীয়। গুণ পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য-সমাজ যখন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিরুদ্ধ হইল, তখন হইতেই আর্য্যদিগের অধোগতি। স্রোতস্বিনীর স্রোত বদ্ধ হইলে যেমন তীরস্থিত জনপদ নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং ক্রমশঃ ক্ষেত্র সকল অনুর্ব্বর হইতে থাকে, তদ্রূপ আমাদের সমাজের প্রসারতা ক্রমশঃ কমিয়া সংকীর্ণতায় বিপ্লব-ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছেন। ইহার নিরাসন করিতে হইলেই আবার সেই পুরাকালের গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে সমাজের পুনঃ আদর্শ সৃষ্টি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহা হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে চাহিবে না ; সমস্ত বৈষম্য তিরোহিত হইয়া যাইবে। তখন ব্রাহ্মণের পদঃরজে ভারতভূমি পবিত্র হইবে। তমসাচ্ছন্ন শূদ্র সেই পদ-সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিবে। তখন আর্য্য-রমণীগণ সুব্যবস্থিত মঙ্গলময় বৈদিক রীতির অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রসূ ভারতকে গৌরবান্বিত করিবেন। হে ভূদেব ব্রাহ্মণ! আবার কি ভারতের সে সুদিন আসিবে ? আবার কি সাম-গানে তপোবন মুখরিত হইবে ? আবার তোমাদের সেই প্রকৃতি দেখাও ; তমসাচ্ছন্নেরা তোমাদের চরণ সেবক হইয়া জীবন সফল করুক।

অসত্য-প্রিয়তা, নাস্তিকতা, অপবিত্রতা,

অভক্ষ্য-প্রিয়তা, অবৈধ-ইন্দ্রিয়-পরতা, পরশ্রী-কাতরতা, নৃশংসতা, লুব্ধতা, দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যসন এ সকলই তমোগুণের লক্ষণ। তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই শূদ্র। ব্রাহ্মণ উক্ত দোষ বর্জ্জিত হইয়া সত্ত্বগুণী হইলেই সকলে তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ মনের মন্দিরে রাখিয়া পূজা করিবে। সাধারণের পূজা আকর্ষণ করিতে আর বাহ্যাড়ম্বর করিতে হইবে না। তমোগুণী শূদ্রও ক্রমশঃ স্বীয় দোষ পরিহার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। মস্তিষ্ক সুস্থ হইলে, অন্যান্য অঙ্গ সহজেই সুস্থ হইবে। গুণের আদর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই আছে। হরিদাস, কবীর, রুইদাস ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ভক্ত-সমাজের বরেণ্য হইবার জন্য পথে পথে আপনাদিগকে প্রচার করিয়া বেড়ান নাই। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপ সত্ত্ব-গুণ-মণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই আজও ভক্ত-সমাজে বরেণ্য।

শ্রীকালীচরণ দে সরকার।

প্রচ্ছন্ন শক্তি

পৃথিবীতে কোথা দিয়া কি হইয়া যায় মানবমন ভাবিয়া তাহার কুলকিনারা পায় না। সামান্য একটী দীপশলাকা প্রকাণ্ড একটা সহরকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, ক্ষুদ্র একটী বীজ কালক্রমে বৃহৎ একটী বনস্পতির আকার ধারণ করে। তাহার মধ্যে কি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, মানুষের স্থূলদৃষ্টি সব সময় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না—তাই জগতে দেখিতে পাই যোগীর নিগ্রহ, ত্যাগীর লাঞ্ছনা, প্রেমিকের উন্মাদখ্যাতি, ভক্তের অপমান, কর্ম্মবীরের প্রতিবন্ধক। আবার এই অন্তর্নিহিত শক্তিও উপযুক্ত পাত্র ও জলবায়ুর গুণে সব সময় কার্য্যকরী হইয়া উঠে না। বীজ যদি জলহীন উষর ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে সে যেমন জন্মিতে পারে না, সেইরূপ মানবমনও প্রকৃত জ্ঞানরূপ বারিসিঞ্চন না পাইলে বিকশিত হইয়া উঠে না বা উঠিতে পারে না। মরুভূমিতেও জলের স্পর্শ পাইলে আবার সেই বীজই যেমন বিকশিত হইয়া উঠে ও মুক্তির আনন্দে অনেক খানি মরুভূকে ছায়াসুশীতল করিয়া তুলে, সেইরূপ অন্তর্নিহিতশক্তি-সম্পন্ন বিলাস-ভোগরত সংসারীর মনে মায়াপুরীর রাজকন্যার দৈত্যের মত সামান্য একটু জ্ঞান স্পর্শেই নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া আপনি জাগিয়া উঠে। সে শক্তিকে মানুষ আর চাপিয়া ধরিতে পারে না। সে তখন উদ্দামতটিনীর ন্যায় আপনার পথে প্রবাহিত হয় এবং সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়।

(১)

পিতা শুদ্ধধন দেখিলেন, তাঁহার একমাত্র সন্তান সংসারে তেমন মন দিতেছে না; সর্ব্বদা বিরলে বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করে। বাহিরের উন্মাদ-কোলাহল দূরে পরিহার করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তাতেই তাহার সুখ-শান্তি। পুত্রের এঘোর কাটিয়া ফেলিবার জন্য, তাহার মনে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ দিয়া দিতে পিতা বিপুল আয়োজন করিলেন; পুত্রের বিবাহ দিলেন। এমনি করিয়া দশটী বৎসর চলিয়া গেল; পুত্রের সন্তান জন্মিল। একটী নূতন মোহ আসিয়া জুটিল। কিন্তু এই সময় অদৃশ্য-দেবতাটী এমন করিয়া কি একটী কল ঘুরাইয়া দিলেন, যাহার আবর্ত্তনে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকের দৃষ্টি-বিভ্রমকারী সমগ্র আবরণ খসিয়া পড়িল।

প্রত্যেক মানব প্রতিদিন যাহা দেখে, প্রত্যেকের গৃহে যার তাণ্ডবনর্ত্তন হয়, সেই জরা, মৃত্যু, রোগ ও শোক দেখিয়া কৈ কাহারও মনে তো এরূপ ভাবোদয় হইতে দেখা যায় না? কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছনশক্তি আজ এই সামান্য স্পর্শেই জাগিয়া উঠিল—জগদ্দল পাষাণপ্রমাণ বাধাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল, কএকটী সামান্যকারণে জগতের একটী শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের জ্ঞানোন্মেষণা হইল।

(২)

নানকের মন শৈশব হইতেই সংসারের কাজে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছিল না দেখিয়া নানকের পিতামাতা তাহার বিবাহ দিলেন; নানকের এক পুত্র জন্মিল; নানকপত্নী আবার গর্ভবতী হইলেন। এই সময় তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে রাশীকৃত গোধূম ওজন করিতেছিল আর বলিতেছিল,—"একরাম এক, দোরাম দো।" এইরূপ বলিতে বলিতে সেই পসারী যেই "তেরা রাম তেরা" বলিয়াছে, অমনি কেমন করিয়া নানকের মনে অপূর্ব্ব এক ভাবসঞ্চার হইয়া গেল। সংসারের বন্ধন তাঁহাকে কষ্ট দিতে লাগিল; তিনি ভাবিলেন, কেন তিনি এত দিন ইষ্টচিন্তায় এমনভাবে বিরত ছিলেন? কিসের প্রভাব দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল? সেইদিন হইতে তিনি ইষ্ট-চিন্তায় গভীরভাবে রত হইলেন। যতই চিন্তা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বর সন্দর্শনের জন্য উন্মত্ত হইতে লাগিলেন।

একদিন প্রত্যুষে নানক নদীতে স্নান করিতে গেলেন, চাকর আসিয়া খবর দিল, নানক নদীস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন। বহু অনুসন্ধান হইল, কিন্তু নানককে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। এদিকে নানক ভাসিতে ভাসিতে দূরে যাইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা হইলে তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিলেন,—"হে নানক! জাগ, উঠ; আপন কার্য্যে রত হও; আর কতদিন পড়িয়া থাকিবে?" নানক আর বাড়ী ফিরিলেন না। সেইদিন হইতে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। সামান্য 'তেরা রাম তেরা' তাঁহার সমস্তবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া রিক্ত করি । পথে আনিয়া ছাড়িয়া দিল।

(৩)

বিল্বমঙ্গল জাতিতে বিপ্র কিন্তু লম্পট-স্বভাব। ধর্ম্ম কি তাহা সে বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। নিজের মোহে সে আবিষ্ট হইয়া থাকে। আর "নদীপারে এক বেশ্যা নাম চিন্তামণি। তাহাতে আসক্ত সদা দিবসরজনী॥"

এদিকে একদিন বিল্বমঙ্গলের পিতার মৃতাতিথি উপস্থিত হইল। বিল্বমঙ্গল সারাদিন ঘরে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিল। তাহার এমনি কু-আসক্তি যে বজ্রপাত ও প্রলয়সদৃশ ঝড় উপেক্ষা করিয়াও সে চলিল। নদীতে তরী নাই। কিন্তু সে "কাষ্ঠতরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা।" কিছু দূর যাইয়া একটী গলিত, স্খলিত মৃতদেহ পাইল। তাহাকে ভ্রমবশে কাষ্ঠখণ্ড জ্ঞান করিয়া তৎসাহায্যে নদী পার হইল। তারপর দ্বার না পাইয়া এক মৃতসর্পকে "রজ্জুজ্ঞানে ধরি উঠে প্রাচীর উপরি।" সেখানে যাইয়াই তাহার সবভ্রম ঘুচিয়া গেল; জ্ঞানের জ্যোতি তাহার দেহ, মন ও প্রাণে একটা পুলক স্পর্শদিয়া গেল; চারিদিকের ঘনাবরণ মুক্ত হইয়া গেল; তাহার চিদাকাশ মেঘশূন্য হইল। তারপর সে সোমগিরির নিকট দীক্ষা লইয়া, "হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল।" এখানেও দেখিতে পাই প্রচ্ছন্নশক্তি সামান্য স্পর্শে জাগিয়া উঠিল।

(৪)

সেবার অগ্রহায়ণ মাসে দুরন্তশীত পড়িয়াছে। তুষারশীতলশীত-শিশিরস্পর্শে সমস্ত ফুলগুলি মরিয়া যাইতেছে। সেদিন কেবলমাত্র সুদাস মালীর ঘরে একটী সুন্দর শতদলপদ্ম ফুটিয়া রহিল, ঝরিয়া পড়িল না। বহু অর্থ প্রাপ্তি আশে সুদাস অকালের ফুলটী লইয়া রাজ প্রসাদে চলিল। এমন সময় এক পথিক বহু মূল্যে ফুলটী ক্রয় করিতে চাহিল; মালী আশাতীত মূল্য পাইয়া যেই ফুলটি দিতে যাইবে, অমনি আচম্বিতে রাজা আসিয়া তার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিলেন। পথিকও বেশী দিতে চাহেন, রাজা আরও বেশী বলেন। কেহই ছাড়েন না। মালী ভাবিল, "যাঁহাকে দিবার জন্য এই দুই ব্যক্তি সামান্য, নগন্য এই ফুলটী ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, না জানি তাঁহাকে দিলে কত কি পাই।" অমনি সে যেখানে প্রেমাবতার বুদ্ধদেব কানন উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছিলেন সেখানে যাইয়া প্রভুর চরণপদ্মে ফুলটী রাখিয়া দিল। অর্থের কথা সে তখন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের তেজে ভুলিয়া গেল। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কহ বৎস কি তব প্রার্থনা।" ব্যাকুল সুদাস কহিল, "প্রভু আর কিছু নহে, চরণের ধূলি এক কণা।" সাকাঙ্খ একটী ফুলের কারণে তাহার মোহতন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল।

(৫)

জগাই মাধাই নবদ্বীপ সহরের সহর কোটাল। তাহাদের সমাজে প্রতিপত্তি আছে, মান আছে, সম্ভ্রম আছে আর আছে আনন্দলাভের আকণ্ঠ পিপাসা।

এদিকে ঠাকুর চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ। তিনি সেখানে প্রেমের তুফান তুলিয়াছেন। সেই পরশ-মণির-পরশে সব সোণা হইয়া যাইতেছে।

নিত্যানন্দ ভিক্ষায় বাহির হইলেন—হরিবোল বলাইয়া নদীয়া পাগল করিয়া দিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—"জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে হইবে, ঠাকুর!"

ঠাকুর পরদিন নগর সংকীর্ত্তন লইয়া জগাই মাধাইএর বাড়ীর দিকে চলিলেন—নিত্যানন্দ ভাবের আবেশ, আজ পাপী ও তাপী উদ্ধার হইবে এই আশায়, আনন্দে, আগ্রহে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। জগাই মাধাই শুনিল, 'হরিবোলের দল' তা'দেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা চটিয়া লাল হইয়া গেল; সম্মুখেই অগ্রদূত, প্রেমপাগল নিত্যানন্দকে দেখিয়া খোলা ছুড়িয়া মারিল। নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তবুও নিত্যানন্দ প্রভু "মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না" বলিয়া জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। তখন অন্তরের খাঁটী মানুষটী তা'দের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন সাধুতা বাহির হইল। সেই শুভদিনে যখন তা'দের নিকটে প্রেমপাগল নিত্যানন্দের আবির্ভাব হইল সেদিন তাহারা বুঝিল, যে আনন্দের অন্বেষণে তাহারা উদ্দামউন্মাদ হইয়া ফিরিয়াছে, সে আনন্দ কোথায়! যে ইন্ধন তাহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে জড় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে প্রেমানন্দের স্ফুলিঙ্গ পড়িল; তাহাদের অন্তর বাহিরের সকল আবর্জ্জনা জ্বালাইয়া, পোড়াইয়া সমস্ত প্রাণমন আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তুচ্ছ তখন সুরাপাত্র! তুচ্ছ তখন ইন্দ্রিয়-সুখ! তাহারা আজ এক নূতন সুরার আস্বাদ পাইল, সামান্য কারণে কি হইতে কি হইয়া গেল।

শ্রী:—রংপুর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সাধকসুহৃদ

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দদেব প্রণীত।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অবতার প্রসঙ্গ লইয়াই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক গ্রন্থখানির অবতারণা। ঐ পরম দেবের উপবাসনায় অবলম্বনীয় মন্ত্রের বিষয়ও মীমাংসিত হইয়াছে।

"সাধক-সুহৃদ্" নামক গ্রন্থে সাধকের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কি ভাবে জীবন যাপন করিলে ইষ্ট প্রাপ্তির পথ সুগম হয়, তাহা সকল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্মপথের পথিকের পক্ষে এই বিঘ্নসংকুল সংসারে যে এই প্রকার গ্রন্থের কি উপকারিতা, তাহা অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারিবেন! এজন্য সকল সাধকই এই গ্রন্থরাজকে নিজের "সুহৃদ্" মনে করিয়া সঙ্গী করিতে পারেন।

উত্তম আইভরি ফিনিস্ কাগজে ডবল ক্রাউন সাইজে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ||৵০ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার, মহানির্ব্বাণ মঠ, ২৯ নং মনোহরপুকুর রোড।
কালীঘাট, কলিকাতা।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা ।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা, করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন ;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, শ্রাবণ। { [illegible]ম সংখ্যা

স্তব।

যোগেশ জগদানন্দ যোগীমনরঞ্জন।
সপ্রকাশ সদানন্দ নিরুপম নির্গুণ ॥
প্রেমচন্দ্র পূর্ণানন্দ সুখশান্তিনিকেতন।
ঈশ্বর আনন্দময় মহাবিঘ্ননাশন ॥
নির্ব্বিকার নিত্যরূপ অপরূপ রূপধারণ।
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব দীনজন-তারণ ॥
সর্ব্বপাপহারী হয় দর্পহারী দীনেশ।
সেবক-আশ্রয় শিব অবিনাশী অশেষ ॥

অশোক শোকনাশন জয় অশোকজীবন।
চিন্ময় চৈতন্যদেব অচৈতন্যবারণ ॥
পরম মঙ্গলাকর জয় কারণ-কারণ।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি কর বাঞ্ছা পূরণ ॥
নিত্য সত্যবোধরূপ বিঘ্নবিপদভঞ্জন।
সর্ব্বমূলাধার সার সর্ব্বদুঃখ-হরণ ॥

যোগাচার্য্য
শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

(ক)

জীবাত্মার অশিবত্ব।

বেদান্তানুসারে আত্মা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু 'তুমি'-উপাধি বিশিষ্ট আত্মাতে বৈদান্তিক ঐ সকল লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি-আত্মাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি অনেক প্রকার বিকার দেখিতেছি। সেইজন্য তুমি-আত্মাকে নির্ব্বিকার প্রভৃতি বলিতে পারি না। তুমি-আত্মাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি অঞ্জন সকল রহিয়াছে। সেইজন্য তুমি-আত্মাকে নিরঞ্জন ও শুদ্ধ বলিতে পারি না। তুমি-আত্মা 'সোঽহং' বলিতেছ এবং অন্যান্য নানা প্রকার কথা সকল বলিতেছ। সেই জন্য তুমি-আত্মাকে নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়ও বলিতে পারি না। তুমি-আত্মা দ্বারা নানা প্রকার ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা দর্শন করিয়াছি। সেইজন্য তুমি-আত্মা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহ। তুমি আপনাকে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় আত্মা বল বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চকও বলা যাইতে পারে। কারণ প্রকৃত পক্ষে তুমি যাহা নহ তাহা বলিয়া আপনার পরিচয় লোক সমক্ষে দিয়া থাক।

তুমি-আত্মা কোন প্রকার গুণও নহ, তুমি-আত্মা কোন প্রকার কর্ম্মও নহ। অথচ তুমি-আত্মার সহিত নানা গুণের এবং বিবিধ কর্ম্মের যোগ থাকা প্রযুক্ত তুমি-আত্মাই নানা গুণী, তুমি-আত্মাই বিবিধ কর্ম্মী। বেদান্ত মতে নির্ব্বিকার আত্মা যিনি, তিনি নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। সে মতে গুণকর্ম্ম সকলই বিকার। তোমাতে গুণকর্ম্ম সকল আছে বলিয়া, তোমার সহিত গুণকর্ম্ম সকলের সংস্রব আছে বলিয়া তুমি সগুণ এবং সক্রিয়। তুমি সগুণসক্রিয় জীবাত্মা বলিয়া তুমি সে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্মা নহ। অদ্বৈত মতের গ্রন্থ সকলেও তদ্বিষয়ক বহু প্রমাণ আছে। অদ্বৈতমতানুসারে জীবাত্মাকে বা জীবকেই 'অশিব' বলিতে হয়। সুতরাং তুমি 'সোঽহং' বা 'শিবোঽহং' কি প্রকারে বল?

(খ)

আত্মা।

প্রথম প্রসঙ্গ

আমি-শব্দ সংকীর্ণ। কিন্তু সেই শব্দের ন্যায় আমি সংকীর্ণ নহি। আমি-শব্দ যত বড়, আমি তাহাপেক্ষা অনেক বড়। আমি যত বড়, আমি-শব্দ তত বড় নহে। আমি-শব্দের সীমা আছে। কিন্তু আমির সীমা নাই। আমি-শব্দ সান্ত। আমি অনন্ত।

আমি নিঃশক্তি নহি। আমি যেরূপ নিত্য, তদ্রূপ আমার শক্তিও নিত্য। সেই নিত্যাশক্তি হইতে সর্ব্বশক্তির প্রকাশ। আমি আত্মা। সেইজন্য আমাতেই আত্মবোধিনী শক্তির স্থান। মায়া দ্বারা আমার বহু উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে।

যখন 'আমি আছি' বোধ করি তখন আমাতে আমার বোধ-শক্তি ব্যক্ত থাকে। যখন 'আমি আছি' বোধ করি না তখন আমার বোধ শক্তি আমাতে অব্যক্তভাবে থাকে। তখন আমাতে বোধ-শক্তি অব্যক্ত থাকে, 'আমি আছি' যখন আমার বোধ থাকে না, তখন আমার অহংকার ও মমতা আমাতে ব্যক্ত থাকে না। তখন আমি নিরহংকার ও নির্ম্মম হই। তখন আমি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হই। তখন আমি সম্যক্ প্রকারে শান্ত হই। তখন সর্ব্বপ্রকার চিত্তব্যুত্থান সকলও নিরুদ্ধ হয়। তখন বুদ্ধিও নিরোধাবস্থায় থাকে। তখন অহংকারও নিরোধাবস্থায় থাকে। তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও নিরোধাবস্থায় থাকে। তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও নিরোধাবস্থায় থাকে। তখন চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্বই অনিরুদ্ধ রহে না। তখন সর্ব্বতত্ত্বই নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সে অবস্থায় আমিও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হই বলিয়া আমার সঙ্গে কোন তত্ত্বেরই সম্বন্ধ থাকে না। তখন আমার আত্মজ্ঞানও নিরুদ্ধ নহে। সেইজন্য তখন আমি অজ্ঞেয় হই। সেইজন্য তখন আমি জ্ঞানাতীত হই। তখন আত্মজ্ঞানও আমাতে অব্যক্তভাবে রহে। তখন আমি সেই জ্ঞানের সহিতও নিঃসম্বন্ধ ভাবে রহি। সেইজন্য তখন আমি জ্ঞেয়োপাধি দ্বারাও অভিহিত হই না। সেইজন্য তখন আমি কোন ব্যক্তির পক্ষে দুর্জ্ঞেয় হই না। সে অবস্থায় আমি সর্ব্বাতীত হই।

যখন মদীয় আত্মবোধিনী শক্তি ব্যক্ত রহে, তখন আমাতে সর্ব্বতত্ত্বই ব্যক্ত রহে। সেইজন্য তখন আমার অহংকার ও মমতাও অব্যক্ত রহে না। সেইজন্য তখন আমি সগুণ ও সক্রিয় হই। আমি সগুণসক্রিয় হইলেও আমি বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হই না। আমি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ হই না। সেইজন্য আমি ক্ষুদ্রও নহি, বৃহৎও নহি। আমি চিন্ময়ীশক্তি-সমন্বিত শুদ্ধাত্মা। শ্রৌত উপনিষদাদি গ্রন্থ সকলে আমি 'আত্মা' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছি। অনেক মহাপুরাণে, অনেক পুরাণে, অনেক উপপুরাণে আমিই 'পরমাত্মা' সংজ্ঞা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছি। পৃথিবীর আত্মবাদী দার্শনিকদিগের মতে আমি আত্মা। বেদান্তাদিতে আত্মার অনন্তত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদান্তাদি মতে আত্মা নিরুপাধি। সর্ব্বশাস্ত্রমতে আমি 'আত্মা'। সেইজন্য আমি শিশু নহি। সেই জন্য আমি যুবক কিম্বা যুবতী নহি। সেইজন্য আমি প্রৌঢ় কিম্বা প্রৌঢ়া নহি। সেই জন্য আমি কোন ব্যক্তি অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ নহি। সেইজন্য আমি পুরুষ কিম্বা প্রকৃতি নহি। সেইজনা আমি কোন প্রকার জীব কিম্বা জন্তু নহি। সেইজন্য আমি কোন নামধারী নহ। সেইজন্য আমি জাত নহি। সেইজন্য আমার কোন প্রকার জাতি নাই। সেইজন্য আমার কোন প্রকার বর্ণ নাই বলিয়া আমি অবর্ণ। আমি মুখে মাত্র 'আমি'কে 'আমি'-উপাধি-বিশিষ্ট বলিতেছি। বাস্তবিক 'আমি' অহংকার শূন্য, বাস্তবিক 'আমি' আমিত্ব শূন্য। যেরূপ আমি আমিত্ব শূন্য তদ্রূপ আমি তুমিত্ব শূন্য। যেরূপ

তুমিত্ব শূন্য তদ্রূপ আমি তিনিত্ব শূন্য। আমি, তুমি এবং তিনি শব্দও উপাধি, সেইজন্য ঐ সকল উপাধিও আত্মার নাই।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

অদ্বৈতমতের বেদান্তাদি গ্রন্থসকলানুসারে একাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় আত্মা নাই। সেইজন্য দেহ প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃত পদার্থ সকল ব্যতীত অপর কোন অপ্রাকৃত পদার্থের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই।

নিজের সহিত নিজের সম্বন্ধ হইতে পারে না। একের সহিত অপরের সম্বন্ধ হয়। আমি-আত্মা ব্যতীত অপর আত্মা থাকিলে, তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইতে পারিত। সম্বন্ধ দ্বৈতবোধক। আত্মা অদ্বৈত। একাত্মা ব্যতীত অপর আত্মা নাই বলিয়া একাত্মার অপরাত্মার সহিত সম্বন্ধ নাই। আত্মা নির্ব্বিকার নামে প্রসিদ্ধ। সেইজন্য আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই কল্পনা। সেইজন্য ঐ উভয়কেই মিথ্যা বলা হয়। বন্ধন এবং মুক্তি উভয়ই অজ্ঞান-সম্ভূত।

আত্মা আছেন বলিয়া আত্মাকে 'সৎ' বলা হয়। তিনি পরে থাকিবেন না এরূপ বোধ করিও না। যেহেতু তাঁহার নিত্যতা আছে। নিত্য যিনি, তিনি পরে থাকিবেন না এরূপ বলা যায় না। 'সৎ' যিনি, তিনি কখন অসৎ হন্ না।

আত্মা এক। আত্মা নিত্য। আত্মা সত্য। আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। আত্মা কখন বিকৃত হন্ না। আত্মা নির্ব্বিকার।

আত্মা নিত্য। সেইজন্যই তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বিদ্যমান আছেন। তিনি বিদ্যমান থাকিবেন। অনাদিকালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সদাত্মা। আত্মা বহু নহে। সেইজন্য তাঁহার বহুত্বও নাই। তিনি এক বলিয়া, অদ্বৈত-বাদীরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করেন। আমাদিগের বিবেচনায় তিনি এক এবং বহুর অতীত। তিনি একত্বে এবং বহুত্বে লিপ্ত নহেন। তিনি যে তিনি-সংজ্ঞকও নহেন। তিনি যে তুমি-সংজ্ঞকও নহেন। তিনি যে আমি-সংজ্ঞকও নহেন। তিনি যে সর্ব্বনামের অতীত। তাঁহার বিষয় আভাসে মাত্র বলিবার জন্য সর্ব্বনামাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিবিধ বাক্যে এবং বিবিধ উপমা প্রয়োগ দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় আভাসমাত্র প্রকাশ করা হয়। তিনি যে বাক্যাতীত। তিনি যে বর্ণাতীত। তিনি যে সর্ব্ব উপমার অতীত। কেবল আত্মজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে হয়। সে আত্মজ্ঞানও তিনি। তাহা তিনি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নহে। যেমন সূর্য্যকিরণ সাহায্যে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়, তদ্রূপ আত্মদ্বারা আত্মাকে জানিতে হয়।

(গ)
অনাত্মা প্রকৃতি।

আত্মা হইতে প্রকৃতি বিকাশিত হন্ যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতিও আত্মার অংশ। অথবা প্রকৃতি আত্মার এক প্রকার বিকাশ এরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মার অংশ যাহা, তাহাও আত্মা।

আত্মার অংশকে অনাত্মা বলা যাইতে পারে না। তোমার মতানুসারে প্রকৃতি আত্মার অংশ অথবা বিকাশ স্বীকৃত হইলে, প্রকৃতিকেও 'সং' বলিতে হয়। কারণ সতের অংশ কিম্বা বিকাশ 'অসৎ' হইতে পারে না।

বেদান্তমতে আত্মাকে অংশ করা যায় না। যাঁহাকে অংশ করা যায় না, তাঁহার অংশ প্রকৃতি এরূপ কখনই বলিতে পার না। বেদান্তানুসারে আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। যাঁহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই, তাঁহার কোন প্রকার পরিণামও নাই। পরিবর্ত্তনদ্বারা পরিণাম হইয়া থাকে। যাঁহার পরিণাম না, তাঁহার নানা প্রকার বিকাশও হইতে পারে না। সেইজন্য প্রকৃতিকে আত্মার এক্ প্রকার বিকাশও বলিতে পার না। কারণ আত্মা কেবল মাত্র 'এক্ প্রকার'। তোমার মতানুসারে প্রকৃতিকে আত্মার কোন প্রকার বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার কেবল মাত্র 'এক্ প্রকারতা' রক্ষিত হয় না। সেই জন্য অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদিগের মতে প্রকৃতিকে আত্মার কোন প্রকার বিকাশ বলিয়া স্বীকার করাও সঙ্গত নহে।

(ঘ)

কৌলাচার সমর্থন

তন্ত্রে মৎস্য মাংস না খাইলে কালীদর্শন পাওয়া যায় না। এ অতি উত্তম বিধান। শবের উপর বোসে কালীসাধনা করিতে হ'লে অনেক বিঘ্নবিপত্তি। কালীর অভয় চরণ দর্শন লাভ সহজে হয় না, প্রথমতঃ তিনি কত ভয়, কত বিভীষিকা দেখান; কত শাঁখিনী, যোগিনী, প্রেতিনী, কত ভূত, কত প্রেত, কত দানা দৈত্য দেখা যায়। না-ছোড় হোয়ে নির্ভীক অন্তরে তাঁহার আরাধনা করিলে পশ্চাৎ আনন্দময়ী দর্শন দেন। কালী নিজে পরম-বৈষ্ণবী; তিনি মৎস্য মাংস খান না। দেওয়া হয়, তাঁহার গণেদের সন্তোষ রাখিবার জন্য। তাহা না দিলে, তাহারা (ভূত প্রেত) প্রতিবন্ধক জন্মায়। তেমি কালী আরাধনায় বীরভাবে স্ত্রীসংসর্গ ক'রে মাছমাংস খেয়ে তাঁ'কে পেতে হবে। অর্থ এই—আমাদের হৃদয়ে বা অন্তরে যে সমস্ত কামক্রোধ প্রভৃতি লালসা বা ইচ্ছাবৃত্তি সমুদয় আছে, তাহাদের মধ্যে কামের আহার (অতি) কদর্য্য-কার্য্য-স্ত্রীসংসর্গ। লোভের কার্য্য কদর্য্য-আহার-ভক্ষণ। এই সমস্ত ভয়ানক হিংস্র রিপু (রাক্ষস) দৈত্যগণকে, তাহাদের মনোমত যথেষ্ট আহার্য্য দিয়া, তাহাদের অন্যমনস্ক ক'রে, তাহাদের বিশ্বাস জন্মায়ে যে তাহাদের মিত্র তুমি, তোমার তাহাদের সঙ্গে রিপুভাব আর নাই, এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করা। বলে না পারিলে কৌশলে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। তন্ত্রে আদৌ বল প্রয়োগ নাই। (বেদ ইত্যাদিতে বল প্রয়োগ।) সমস্তই কৌশলে। তুমি কোন জমিদার বা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না দরখাস্তকারক রাজার কাছে যাইতে হইলে অগ্রে আমলাদের সন্তোষ করিতে হইবে। ঘুষ দানে। (তাঁ'র কাছে যেতে হোলেও ঘুষ।) তবে ন্যায়বান্

রাজসমীপে যাইতে পারিবে। রাজা ঘুষ লন না। ঘুষ খাওয়া চোরের কার্য্য; রাজা কা'রে লুকায়ে ঘুষ লবেন? রাজ্য, প্রজা সমস্তই যে তাঁ'র। মনে করিলে প্রজার সমস্ত সম্পত্তি যে তিনি লইতে পারেন।

---

(৬)
কর্ম্ম।

প্রথম প্রসঙ্গ।

যাহা দ্বারা বিবিধ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাই কর্ম্ম। প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণের বিকাশ। গুণজ কর্ম্ম। কেবল সত্বগুণ যাঁহাতে, আছে তাঁহাতেই পূর্ণ সাত্বিক ভাব আছে। কেবল রজোগুণ যাঁহাতে আছে, তাঁহাতেই পূর্ণ রাজসিক ভাব আছে। কেবলমাত্র তমোগুণ যাঁহাতে আছে, তাঁহাতেই পূর্ণ তামসিক ভাব আছে। কোন ব্যক্তিতে পূর্ণ সত্বগুণ থাকিলে, তাঁহাতে রজোগুণ এবং তমোগুণ থাকিতে পারে না। কোন ব্যক্তিতে পূর্ণ রজঃগুণ থাকিলে তাঁহাতে সত্বগুণ এবং তমোগুণ থাকিতে পারে না। কোন ব্যক্তিতে পূর্ণ তমোগুণ থাকিলে তাঁহাতে সত্বগুণ এবং রজোগুণ থাকিতে পারে না। কোন ব্যক্তিতে অপূর্ণভাবে কোন গুণ থাকিলে অন্য কোন গুণাংশ তাহাতে যুক্ত হইতে পারে।

গুণ দ্বারা কর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গুণের অন্তর্গত বহু কর্ম্ম আছে। সেই সকল কর্ম্মের পরস্পর বিভিন্নতা আছে। সত্বগুণ হইতে যে সকল কর্ম্ম প্রকাশিত হয়, সে সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেকটীকে সাত্বিক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল কর্ম্ম পরস্পর এক প্রকার নহে। রজোগুণ হইতে যে সকল কর্ম্ম প্রকাশিত হয় সে সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেক কর্ম্মকে রাজসিক কর্ম্ম কহা যায়। সে সকল কর্ম্মও পরস্পর এক প্রকার নহে। তমোগুণ হইতে যে সকল কর্ম্ম প্রকাশিত হয় সে সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রত্যেকটীকে তামসিক কর্ম্ম কহা যায়। কিন্তু সে সকল কর্ম্মেরও পরস্পর একতা নাই। তাহারাও পরস্পর বিভিন্ন। এক বৃক্ষের নানা শাখা প্রশাখা সকল আছে। কিন্তু তাহারা পরস্পর এক প্রকার নহে। ঐ প্রকারে একরূপ কর্ম্মবৃক্ষের নানা শাখা প্রশাখা সকল আছে। সাত্বিক কর্ম্মবৃক্ষের সাত্বিকী শাখাপ্রশাখা সকল আছে। রাজসিক কর্ম্মবৃক্ষের রাজসী শাখ প্রশাখা সকল আছে। তামসিক কর্ম্মবৃক্ষের তামসী শাখা প্রশাখা সকল আছে।

কোন প্রকার সাধনা করিতে হইলে, তাহাও কর্ম্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিনা কর্ম্মে সাধনা হইতে পারে না। ত্রিগুণানুসারে সাধনাও ত্রিবিধ আছে; যে সাধনায় সত্বগুণের প্রকাশ, তাহাই সাত্বিকী সাধনা। যে সাধনায় রজোগুণের প্রকাশ তাহাই রাজসী সাধনা। যে সাধনায় তমোগুণের প্রকাশ তাহাই তামসী সাধনা। সাত্বিকী সাধনার অন্তর্গত নানা প্রকার কর্ম্ম আছে। রাজসী সাধনার অন্তর্গতও নানা প্রকার কর্ম্ম আছে। তামসী সাধনার অন্তর্গতও নানা প্রকার কর্ম্ম আছে। সাত্বিকী সাধনার অন্তর্গত কোন

প্রকার রাজসিক কর্ম্ম অথবা তামসিক কর্ম্ম নহে। সাত্ত্বিকী সাধনার অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিক। রাজসী সাধনার অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মই রাজসিক; তামসী সাধনার অন্তর্গত সমস্ত কর্ম্মই তামসিক।

নানাপ্রকার সাধনার ন্যায় নানাপ্রকার প্রাকৃত যজ্ঞ সকলও কর্ম্মদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

প্রধানতঃ দ্বিপ্রকার যজ্ঞ। সেই দ্বিপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে এক প্রকার যজ্ঞের নাম প্রাকৃত যজ্ঞ। তদ্ব্যতীত অন্য প্রকার যজ্ঞকে অপ্রাকৃত যজ্ঞ বলা হয়। বেদাদি শাস্ত্র সকলে অনেক প্রকার প্রাকৃত যজ্ঞের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক প্রাকৃত যজ্ঞই নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কর্ম্মদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম ব্যতীত প্রাকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে পারে না। যাঁহারা প্রাকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকই কর্ম্মী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অকর্ম্মী নহেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই কর্ম্মানুরাগ আছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই যজ্ঞানুরাগ নাই। যজ্ঞানুরাগ হইলে প্রাকৃতযজ্ঞকর্ম্মাদিতে বিরাগ হইয়া থাকে। জ্ঞানানুরাগ হইলে জ্ঞানযজ্ঞে অধিকার হইয়া থাকে। জ্ঞানযজ্ঞকেই অপ্রাকৃত যজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞেই অগ্নির প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রাকৃত যজ্ঞের অগ্নিও প্রাকৃত। অপ্রাকৃত যজ্ঞের অপ্রাকৃতাগ্নি। প্রাকৃত যজ্ঞাগ্নির আহুতি প্রাকৃত ঘৃতাদি যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল। অপ্রাকৃত যজ্ঞাগ্নির আহুতি অজ্ঞান। সে অগ্নিতে সর্ব্বতত্ত্বের আহুতি হইতে পারে। যে অগ্নিহোত্রী অপ্রাকৃত জ্ঞানানলে প্রাকৃত তত্ত্ব সকলকে আহুতি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার উপর দুরত্যয়া মায়ারও অধিকার নাই; তিনি মায়াতীত জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারই আত্মজ্ঞান নামক মহারত্ন লাভ হইয়াছে। তাঁহারই অনিত্য যজ্ঞকর্ম্ম সকলের সমাপ্তি হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত নিত্যযজ্ঞ প্রভাবে শ্রীভগবানের পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভর লাভ করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রসঙ্গ।

শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর হইলে কোন প্রকার কর্ম্মে এবং কর্ম্মফলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। বিশ্বাসী নির্ভরশীল মহাপুরুষকে কোন প্রকার কর্ম্মফলই গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহার পাপাচরণে সম্পূর্ণ বিরতি হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্য লাভ জন্যও আস্থা হয় না। সেইজন্য তিনি পুণ্যেও আবদ্ধ নহেন।

শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইলে, তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর হয়। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর হইলে তবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। যাঁহার শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ হইয়াছে, তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম আছে। যাঁহার শ্রীভগবানে প্রেম আছে, তাঁহার তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরেরও অভাব নাই। সেই জন্য তাঁহার শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ হইয়াছেও বুঝিতে হইবে। পরাভক্তি দ্বারাও শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ হইতে পারে। সেই আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে শ্রীভগবানে বিশ্বাস এবং নির্ভরও হইয়া থাকে।

বিদ্যা বুদ্ধি অথবা ধন দ্বারা কেহ ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। কেবলমাত্র দিব্য-

জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। দিব্যজ্ঞানলাভ সম্বন্ধে যে সকল সাধনা আছে, গুরু-উপদিষ্ট পদ্ধতিক্রমে সেই সকল সাধনা করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দিব্যজ্ঞান লাভ জন্য যে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে কর্ম্মের সহিত দিব্যতার সংযোগ আছে। তাহা কোন প্রকার প্রাকৃত কর্ম্ম নহে। অতএব তাহা কোন প্রকার অনিত্য কর্ম্ম নহে। তাহাকেই নিত্য কর্ম্ম বলা যায়। কেবল মাত্র ঐশীকৃপাবলে সে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য হইয়া থাকে।

(চ)

বিবিধ।

শুদ্ধভক্তি অতি দুর্ল্লভ। তাহা সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। ১।

মানুষের স্বভাব পরস্পর ঠোগ্রান। মানুষ এক রকম বিচিত্র পাখী। ২।

এ সময় আত্মাশক্তি তোমার মনে শক্তি দিন্। জগতের স্নেহ মমতার সকল সম্বন্ধই অনিত্য প্রত্যক্ষই দর্শন করিতেছি। **প্রকৃত ভালবাসার সামগ্রী ভগবান। তাঁহাতে চিত্তাপিত হইলে জাগতিক ব্যসনে আর অভিভূত হয় না। স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি ধর্ম্মপথের বিষম বিঘ্ন। সেই সকল বিঘ্নের যেটী মহাবিঘ্ন স্বয়ং ভগবানই সেটী অপসারিত করিয়া দেন। এখন প্রাণভরে 'হরি' 'হরি' বল। প্রকৃত মঙ্গল তাহাতেই সম্পন্ন হইবে। ৩।**

অন্ধকার না থাকিলে আলোকের প্রয়োজন হইত না। অজ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের প্রয়োজন হইত না। ৪।

পরমজ্ঞান পরমধন। পরমজ্ঞানরূপ পরমধন লাভ হইলে আর অন্য ধনে আস্থা থাকে না। ৫।

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে সকল প্রকার মনোবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ৬।

তুমি ত সকল ধনে ধনী নও। তুমি ত সামান্য ধনে ধনী, তুমি ত পার্থিব ধনে ধনী। তোমার সমস্ত পার্থিব ধনও নাই। তবে আপনাকে মহাধনী বোধ করিয়া অহংকৃত হইয়াছ কেন? তোমার ত জ্ঞানধন নাই। তুমি যে সে বিষয়ে দরিদ্র। ৭।

তোমার বহুধন আছে স্বীকার করিতেছি কিন্তু তথাপি তোমার দারিদ্র্য রহিয়াছে। যেদিন তোমার ধনে আর প্রয়োজন থাকিবে না, সে দিন যথার্থই তোমার দারিদ্র্য ঘুচিবে। ৮।

বহু পার্থিব ধন থাকিলেও যিনি আপনাকে নির্ধন বোধ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরমধন লাভ হইবে। ৯।

প্রবল বৈরাগ্য প্রভাবে ঈশ্বরপ্রেম হইয়া

থাকে। প্রবল ঈশ্বরপ্রেম বশতও সমাধি হইয়া থাকে। ১০।

প্রবল ঈশ্বরপ্রেম বশতঃ যে সমাধি হইয়া থাকে তাহা প্রেমময়ী। সেই সমাধি-সম্ভূত আনন্দই দিব্য প্রেমানন্দ। দিব্যপ্রেমানন্দ দিব্য জ্ঞানময়। ১১।

যাহা আছে, তাহা আছে; তাহা নাই বলিতেও পার না; তাহা থাকিবে না বলিতেও পার না। ১২।

পূর্ব্বজন্মের পূর্ব্বসংস্কার অনুসারেই প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। নতুবা অতি শৈশবে সাধনা এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন (প্রভৃতি উপায় ব্যতীত) বিনাও তাঁহার কি প্রকারে বিষ্ণুভক্তি হইয়াছিল বলিবে? যদি বল পৈত্রিকতত্ত্ব অনুসারে তিনি নিজ পিতামাতার ভাব পাইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পার না। কারণ প্রহ্লাদের পিতা মহারাজ শিবভক্ত ছিলেন। তাহা হইলে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি স্ফুরিত না হইয়া শিব-ভক্তিই স্ফুরিত হওয়া উচিত ছিল। ১৩।

যখন এমেরিকা আছে জানা হয় নাই, তখন এমেরিকা ছিল। পরলোক রহিয়াছে, অথচ পরলোক রহিয়াছে জানিতে পারিতেছ না। ১৪।

"জীবের সৃষ্টি স্থিতিলয় মায়া কর্ত্তৃক" অর্থাৎ ঐ বিষয়ে 'আমার' কর্ত্তৃত্ব এই যদি বেদান্তসিদ্ধান্তবাক্য হয় তাহা হইলে সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহা হইতে হইতেছে তিনি মায়িক, ও যাহা হইতেছে তাহা (অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়কে) মায়া বলা যাইতে পারে। হঠাৎ ব্রহ্মেতে এই ইচ্ছাশক্তি উদয় হইল "অহং বহু স্যাম:" ইতি শ্রুতিঃ, অর্থাৎ আমি বহু হইব, এইস্থলে 'আমি' মায়িক। ১৫।

মুণ্ডমালাতন্ত্র এবং অন্যান্য নানা তন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত শাক্ত হইতে পারে। সর্ব্বকুলোদ্ভব শাক্তই শঙ্কর। সে সম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে,—

"শক্তাশ্চ শঙ্করাঃ দেবি যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ"।২।

পুরুষ-শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি, প্রকৃতি-শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি। মুণ্ডমালা তন্ত্রের মতে—

"তদংশাংশৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনি।" ৩।

১৬।

কাশীতে পাপ করিলে যতি দর্শন করিলেও সে পাপের ক্ষয় হইবে না, এরূপ কঠোর বিধি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাই না। সে বিধি কাশীখণ্ডেও নাই। উদারতাপূর্ণ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবার এইরূপ সহজ উপায় আছে,—

"যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে পাপী ব্যক্তি যতি দর্শন মাত্র কেবল যে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন তাহা নয়, যতিদর্শনে তিনি সমুদায় তীর্থ গমনে সমুদায় ব্রতের অনুষ্ঠানে, সমুদায় তপস্যার আচরণে, সমুদায় দান ও সমুদায় যজ্ঞ করিলে যে-সকল ফল পাওয়া যায়, সে সমস্তই প্রাপ্ত হন। এমন উদার মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মত কোন্ সুবুদ্ধি না অনুসরণ করিবেন? ১৭।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

কবিতাকুসুমমালা।

উপহাস করিলে কি টলে চেতন মানুষ ?
নাহি তা'র অভিমান, নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান,
অবস্থার দাস নহে, সে যে নিজবশ,
সদানন্দে ভাসে সদা সতত সন্তোষ।

২

জ্ঞানানন্দে অবিরত যে জন মগন,
প্রেমানন্দে করে সদা আত্মাতে রমণ
প্রকৃতিতে নহে লীন, জীবন্মুক্ত উদাসীন,
নহে শিশু প্রৌঢ় সে যে যুবক প্রাচীন ;
বাল্যভাবের ভাবুক নহে কোন দিন,
অদ্বৈতজ্ঞানের সিন্ধু, সদা দ্বৈতহীন।

সরোবরে ফুটেছে কমল,
সুশীতল সমীরণে, কাঁপে ব্রততী বিতানে,
সুকোমল কিশলয়কুল,
আনন্দ উৎসবে আজি মেতেছে গোকুল।
কুঞ্জবন কুসুমিত, হেরি কিবা সুশোভিত,
গাহে সুমধুর গীত কত বিহঙ্গিণী,
বিকসিত সরোবরে ফুল্ল কমলিনী,
মদনমোহন সনে রাধা বিনোদিনী
উল্লাসে আবেশে ভাসে যমুনা পুলিনে।

৩

শোভিছে যমুনাতীর, বহিছে ধীর সমীর,
সমীরণ সনে পিক হরিগুণ গায়,
শ্যামদরশনে সবে মনোসুখে যায়

কেন বা বিষাদে কাঁদ ? কেন কর এত খেদ ?
এখনি আসিবে শ্যাম হবে তব সুখোদয়।
হেরিলে তব ক্রন্দন, অস্থির যে হয় মন,
নিরানন্দে নিমগন হই লো সজনি !
তোমার হইলে সুখ আমার যে সুখ হয়,
বাঁচি সখি এলে ত্বরা তোমার সে রসময়।

২

কেন বা অশান্তি এত, কেন তুমি অভিভূত,
ফুল্লমুখী-সরোজবদনি !
চৈতন্যময়ি চৈতন্যে, কেন থাক অচৈতন্যে ?
চৈতন্যবিহীনা নহ চৈতন্যদায়িনি,
তুমি আদ্যাশক্তি সতী হরিবিলাসিনী,
লীলাবতী লীলাতরে আছ বিষাদিনী।

নীরদবরণ আজি হেরি চিদাকাশে,
সে নীরদে ঘন ঘন দামিনী বিকাশে।
দামিনী মনোমোহিনী, যেন কৃষ্ণবিনোদিনী,
নীরদবরণ যেন শ্রীরাধামনমোহন,
হেরিনু নয়নে আজি যুগলমিলন।
যুগলমিলন বড় চিত ভালবাসে,
যমুনাপুলিনে তাই বারে বারে আসে।

অথ শ্রীশ্রীআনন্দষোড়শী স্তোত্রম্ ।

জ্ঞানানন্দ-বিনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনম্ ।
জ্ঞানানন্দমহং বন্দে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ১

"জ্ঞান" কিম্বা "আনন্দের" করিতে নির্দ্ধার,
সর্ব্বাগ্রেতে প্রয়োজন যাঁহার কৃপার,
'সৎ চিৎ-আনন্দ' সেই পূর্ণ-অবতার,—
জ্ঞানানন্দে ভক্তিভরে নমি বারবার ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধ-জ্ঞান-দেহায় শুদ্ধানন্দ-স্বরূপিণে ।
জ্ঞানানন্দ ! নমস্তুভ্যং মহানন্দ-বিধায়িনে ॥ ২

'রূপে' যিনি সুবিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্তিমান,
শুদ্ধানন্দ 'স্বরূপেতে' যাঁর অধিষ্ঠান,
কটাক্ষেতে হয় মহানন্দের বিধান,—
প্রণমি সে জ্ঞানানন্দে পূর্ণ ভগবান ॥ ২ ॥

জ্ঞানঞ্চ শঙ্করং নিত্যগোপালং রস-সাগরম্ ।
জ্ঞানানন্দং নমাম্যহং শঙ্করং কৃষ্ণমদ্বয়ম্ ॥ ৩

'শঙ্কর' জগদ্‌গুরু 'জ্ঞান' রূপ ধরে,
'আনন্দ' রূপেতে 'নিত্যগোপাল' বিহরে,
নমি কৃষ্ণ জগদিষ্ট, নমি শ্রীশঙ্করে,
জ্ঞানানন্দ-দেবে নমি, নমি হরি-হরে ॥ ৩ ॥

রাধিকাং হ্লাদিনীং শূলীং, নিত্যগোপাল-কালিকাম্ ।
রাধা-কৃষ্ণমহং বন্দে, বন্দে শ্রীহর-কালিকাম্ ॥ ৪

কৃষ্ণ-আহ্লাদিনী-'রাধা' শিব-রূপ ধারী,
শ্রীনিত্যগোপাল-'কালী' ভক্ত-আর্ত্তি-হারী ;—
বন্দি রাধা-কৃষ্ণ-দ্বন্দ্ব যুগল-মাধুরী,
'শুদ্ধ-সত্ত্ব-যোগে' বন্দি শঙ্কর-শঙ্করী ॥ ৪ ॥

রাধিকায়ৈ নমঃ শূলিমায়াল্লায়ৈ নমোনমঃ ।
কালী-কৃষ্ণ-করিমায় কামাগ্নীশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫

নমি রাধা আল্লা-রূপী-শিব-ভগবত,
কালী-কৃষ্ণ সে করীমে নমি দণ্ডবত,—
ত্র্যক্ষর করীম-রূপে যাঁহার বিলাস,
কালী কৃষ্ণ-কল্পমূলে তাঁহারই নিবাস ॥ ৫ ॥

বিশ্বেল্লায়ৈ নমো নিত্যমীশা-বিষ্ণুস্বরূপিণে ।
লজ্জাবীজ-হরিং বন্দে শ্রীরাম-রহিমস্তথা ॥ ৬

বিশ্বরূপী 'বিশ্বোল্লা' বিষ্ণু ভগবান,
'ঈশাকৃষ্ণাচার্য্যে' নমি করুণা-নিদান ;
নমি সে 'রহিম'-রামে লজ্জাবীজ-প্রাণ,—
"হ্‌রি" রূপে তাঁহারই স্পষ্ট অভিজ্ঞান ॥ ৬ ॥

রাধিকা-রূপিণং কৃষ্ণং, রাধিকাং কৃষ্ণ-রূপিণীম্ ।
রাস-যোগেন বৈ বন্দে রস-রাসরসেশ্বরীম্ ॥ ৭

রাধারূপী কৃষ্ণচন্দ্র পরব্রহ্ম হরি,
নমি গোপীবর্য্যা রাধা কৃষ্ণরূপধারী ;—
যোগেশের 'রাস-যোগ' করি আলম্বন,
রস-রাসরসেশ্বরী করিনু বন্দন ॥ ৭ ॥

শ্রীনামাকর্ষণং কৃষ্ণং, নামধ্বনিঞ্চ রাধিকাম্ ।
অর্দ্ধনারীশ্বরং বন্দে, শ্রীগৌরী-তারকং গুরুম্ ॥ ৮

শ্রীনামাকর্ষণ কৃষ্ণ নমি কৃপাময়,
নামব্রহ্ম-ধ্বনি রাধা—মহাভাবোদয় ;
গৌরী-শক্তি সহ বন্দি শ্রীগুরু ওঁকার,
অর্দ্ধনারীশ্বর বন্দি জগতের সার ॥ ৮ ॥

ব্যোম-ভূমি সমাসীনং বন্দে শ্রীরসমাতৃকাম্।
র-ল-য়োর্মেলনং বন্দে, বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-কালিকাম্ ॥ ৯

শ্রীরসমাতৃকা বন্দি বর্গের জননী,
যাঁর নিত্য সুখাসন অনল অবনী ;
'র'কার 'ল'কারে বন্দি নিত্য ভেদহীন,
শ্রীকৃষ্ণ-কালিকা বন্দি আমি জ্ঞানহীন ॥ ৯ ॥

বামাক্ষিস্তমহং বন্দে, নাদ-বায়ুং গুরুস্তথা।
বিন্দুং বিষ্ণুপদং বন্দে প্রণবং পঞ্চতত্ত্বগম্ ॥ ১০

বন্দি 'বাম-অক্ষি' শক্তি, গুরু বায়ু-'নাদ'
নিত্যব্যাপ্ত 'বিন্দু' বন্দি নভঃ বিষ্ণুপাদ,—
একে পাঁচ পাঁচে এক, বন্দি ঐক্যভাবে,
একাধারে "পঞ্চতত্ত্ব" বন্দি সে প্রণবে ॥ ১০ ॥

শিব-রাধা-তনুং বন্দে কালী-কৃষ্ণ-স্বরূপিণং।
বন্দে তং কীর্ত্তনানন্দং কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহম্ ॥ ১১

একাধারে পঞ্চতত্ত্ব শিব-রাধা-তনু,
বন্দি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কালী-কৃষ্ণ-জনু
জ্ঞানানন্দ গোরা তুমি মঙ্গলাবতার,
সঙ্কীর্ত্তনে ভাসাইলে এ তিন সংসার ॥ ১১ ॥

'ঋষভ'-মার্গ-দেষ্টারং 'মহানির্ব্বাণ'-দায়কম্।
মূলমন্ত্রমহং বন্দে মন্ত্রচৈতন্য-কারকম্ ॥ ১২

পুনঃ প্রতিষ্ঠিলে তুমি "ঋষভ"-বিধান,
তোমারি করুণা দান এ "মহানির্ব্বাণ,"
মন্ত্রের চৈতন্যদাতা মূলমন্ত্র তুমি,
প্রেম-ভক্তি-ভরে তব শ্রীচরণ চুমি ॥ ১২ ॥

'নিত্যধর্ম্ম'-প্রমোদায় 'সর্ব্বধর্ম্ম'-বিলাসিনে !
যুগধর্ম্ম-বিভাদায় জ্ঞানানন্দায় বৈ নমঃ ॥ ১৩

"নিত্যধর্ম্মে" প্রমোদিত "সর্ব্বধর্ম্ম"-মাতা,
প্রণমি তোমারে গুরো ! জ্ঞানানন্দ ধাতা,
কৃপা করি জীবে কৈলে "যুগধর্ম্ম" দান,
প্রণমি তোমারে গুরো ! করুণানিদান ॥ ১৩ ॥

প্রেমস্পর্শমণিং শ্রেষ্ঠং প্রেমবৈচিত্ত্য-পারগম্।
জ্ঞানানন্দং মহাভাবং মন্ত্রাচার্য্যং নমাম্যহম্ ॥ ১৪

প্রেমস্পর্শমণি তুমি প্রেমেতে বিলাস,
প্রেম-বৈচিত্ত্যের পারে তোমার নিবাস,
সঙ্কল্প-বিকল্প ত্রাতা, মন্ত্রের আচার্য্য,
জ্ঞানানন্দ মহাভাব নমি গুরুবর্য্য ॥ ১৪ ॥

ওঁ নমঃ পঞ্চতত্ত্বায় নিত্যসিদ্ধ-বৃতায় চ।
পঞ্চরশ্মিকৃতাগ্রায় জ্ঞানানন্দায় বৈ নমঃ ॥ ১৫

নমি গুরো ! জ্ঞানানন্দ শ্রীনিত্যগোপাল,
অখিল-ভুবন-পতি পরম দয়াল ;
চাহি না'ক স্বর্গ-মোক্ষ বৃথা ধন-জনে,
রাগাত্মিকা ভক্তি দেহ তব শ্রীচরণে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানানন্দ গুরো নিত্যগোপাল পালক প্রভো !
দেহি ত্বচ্চরণে ভক্তিং রাগাত্মিকামহৈতুকীম্ ॥ ১৬

নমি গুরু জ্ঞানানন্দ পঞ্চতত্ত্বময়,
পঞ্চরশ্মি-স্থিত নিত্য দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়,—
নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে সেবিছে যতনে,
কৃপা করি মহানন্দে রাখিও চরণে ॥ ১৬ ॥

'আনন্দ-ষোড়শীং' সিদ্ধাং মহানন্দ-সমাহিতাম্।
যং পঠেৎ শততং ভক্ত্যা সিদ্ধিস্তস্য বশীকৃতা ॥

"আনন্দষোড়শী" সাধ্যা নিত্যসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধা,
প্রকাশিল মহানন্দে হ'য়ে সমাহিত ;—
সভক্তি যে করে পাঠ, ঘুচে তার কাম-নাট,
হেলায় সে জন হয় সর্ব্বসিদ্ধি-জিত ॥

অভক্তঃ শ্বপচোঽশুদ্ধঃ দুষ্ক্রিয়ঃ পাপকৃত্তমঃ।
ভক্তি-গঙ্গা-সুনিষ্ণাতঃ কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥

অভক্ত-শ্বপচা শুচি, পাপকৃৎ পাপে রুচি,
ক্রিয়াবিধিহীন কিম্বা অতি দুরাচার।
করি ভক্তি-গঙ্গা-স্নান, কর্ম্ম-বন্ধে পায় ত্রাণ,
কৃপা-শক্তি-যুত স্তোত্র পড়ি' বারম্বার ॥

লক্ষ্মীস্তস্য বসেদ্গেহে জিহ্বাগ্রেচ সরস্বতী।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তূর্ণং ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা॥

স্বর্গ-মোক্ষাদিকং হিত্বা মহানন্দেন লীলয়া।
জ্ঞানানন্দং লভেতাসৌ জ্ঞানানন্দ-প্রসাদতঃ॥

লক্ষ্মদেবী গৃহ-রাণী, জিহ্বাগ্রে বিমলা বাণী,
অচলা অটলা হ'য়ে নিত্য করে বসতি।
মমতাদি করি' চূর্ণ, মন্ত্রসিদ্ধি লভি' তূর্ণ,
প্রেম-লক্ষণাদিযুত লভে শুদ্ধা ভকতি॥

স্বর্গ-মোক্ষাদিক ত্যজি' মহানন্দ-রসে মজি,
জ্ঞানানন্দ লভে সে যে জ্ঞানানন্দ-প্রসাদে।
"জাগ্রত" সে নহে আর, নাহি সে 'স্বপ্ন' বিকার
"সুষুপ্তি" হইয়ে পার ভুলে যায় বিষাদে॥

ইতি যোগাচার্য্য-ভগবত্-শ্রীশ্রীমজ্-জ্ঞানানন্দ-অবধূত-শিষ্য-ব্রহ্মচারী-* * *-তত্ত্বার্ণব-বেদান্ত-শেখর--সিদ্ধান্ত--সরস্বতী-সমাহিতা--সমাপ্তেয়ং-আনন্দষোড়শী।

জগতের শান্তি।

মানব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম-জ্ঞানাঙ্কুর হওয়ার পর হইতে অর্থ-সংগ্রহে শান্তির আশায় বিদ্যাচর্চ্চা ও আচারব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা করে। পিতামাতা এবং শিক্ষকও তাহাই শিক্ষা দেন। সঙ্গীও যাহা জুটে তাহাতেও ঐ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্তির আশায় মায়াময় জগতের প্রহেলিকায় পড়িয়া কেবলমাত্র অশান্তিই অর্জ্জিত হয়। যত অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ততই নানা প্রকারে বিশ্বাস, কৌলিক-আচার, সনাতনধর্ম্ম ইত্যাদি হইতে চ্যুত হইয়া হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। সংসর্গ-দোষে কত অহিতাচরণ করিয়া ফেলিতে হয়। শাস্ত্র বলেন,"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" যত-অসৎসংসর্গ সমাবেশ হয় ততই রিপুগুলিকে আয়ত্ত করিবার মনের অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। শেষকালে মানসিক বৃত্তি আসুরিক ও পাশবিক ভাবে পরিণত হয়।

এ জগৎ শ্রীভগবানের 'চিড়িয়া খানা'। এখানে "বহুৎ চিড়িয়া মিলতা হায়।" জীব-জগৎ এমনই মোহান্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষার অহঙ্কার লইয়া বসিয়া আছে। সকলেই মনে করে আমি বড়। কিন্তু বাস্তবিক তুমি কিসের বড়? নানা কুসংস্কারাপন্ন দর্প, অহঙ্কার-বুদ্ধি তোমার আছে; তাহা লোকের নিকট প্রচার করিয়া আপনাকে খুব বড় মনে কর। তোমাকে লোকে খুব মানুক, চিনুক, বড়লোক বলুক, জীবন-মরণের কর্ত্তা বলুক, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা-প্রিয়তা তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি কি তোমার নিজের অবস্থা নিজের ওজন সম্যক বুঝিতে পার, তাহা পার না। তবে কিসের বড়াই কর? অর্থের? কাহার অর্থ? তোমার? তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমাকে দয়া করিয়া দান করিলেন? যিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেন তাঁহার ত দাতা বলিয়া অহঙ্কার নাই। যিনি তোমাকে দিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে সমস্ত লইতে পারেন।

তুমি তোমার কর্ত্তা হইতে পার না। তুমি যদি তোমার কর্ত্তা হইতে তবে তোমার কখনও কোন সময়ের জন্য অভাব-অভিযোগ উপস্থিত হইত না। কর্ত্তা ত অশেষ-শক্তিধর। সে ত' ইচ্ছামাত্র সব করিতে পারে। তাহা হইলে মানবে কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না।

তবে কর্ত্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সেই জগৎ-কর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ কর। ভাবিয়া, বুঝিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রজ্ঞানে তুমি যাহা বর্ত্তমানে আছ তাহা অপেক্ষা এক স্তরও আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। তবে শ্রীভগবৎ-কৃপা-সম্ভূত বিবেক-বলে স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়া দেখ যে, শ্রীভগবানই সত্য বস্তু; আর সমস্ত অসৎ। সৎ যাহা তাহা চিরদিনই নিত্য। অসৎ যাহা তাহা চিরদিনই অনিত্য। জগৎ যখন অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে তখন উহা অসৎ। এই অসৎ বিষয়-বাসনায় মত্ত হইয়া তুমি সত্য ও নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কতটুকু বিবেচনা করিয়া মীমাংসা করিতে পার? একটি বার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। তিনিই একমাত্র সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা এবং সংযোজক তাহার কিছুমাত্র ভুল নাই। কিন্তু জাগতিক বিষয়ের সংস্রবে বাসনা-সংযুক্ত হইয়া তিনি যে নিয়ন্তা, তিনি যে সংযোজক একথা আমাদের স্মরণ থাকে না।

সংসারে যত মজিবে, আশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া কেবল দুঃখ আনয়ন করিবে। যত সাংসারিক আশার বৃদ্ধি হইবে ততই তোমার স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুর-বৃত্তি, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা প্রভৃতি দোষগুলিতে হৃদয় ঢাকিয়া ফেলিবে। আর চেষ্টা করিয়াও ত' স্থান পাইবে না; কেবল অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। তখন দেখিবে তোমার নিকট সমস্ত অন্ধকার। তোমার মন অন্ধকার; তোমার চক্ষু অন্ধকারাচ্ছন্ন; তোমার কর্ণ অন্ধকারের ঝি ঝি রব ব্যতীত আর কিছুই শুনিতেছে না; আর তুমি হাবু ডুবু খাইতেছ; তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত; ভাবিতেছ এইবার তোমার প্রাণ গেল। তখন যদি একটিবার মনে কর, আমার আর কি কেহ নাই? আমি যে অতল জলে ডুবিয়া মরিলাম! তখন একজন আশা দিয়া ক্ষীণস্বরে তোমার কানে কানে বলিলেন,—"ডুবিবে না, মরিবে না, আমি আছি। আমাকে একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক; আমি তোমার নিকটে যাইতেছি ও তোমাকে সাক্ষাতে বুকে করিতেছি" সেই একজন তখন বলিবেন—"আমাকে একবার ডাক না—আমি প্রকাশ্যরূপে তোমার নিকট কেমন করিয়া যাই। আমি তোমার কাছে কাছে থাকি বটে কিন্তু তুমি এমন সব জিনিষ লইয়া সর্ব্বদা কাল যাপন কর, যাহার সংস্রবে আমার উপস্থিতি তুমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পার না। এখন অতল জলে ডুবিতেছ। আমি স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা; এখন আমি তোমার আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাকে যদি আর না ভুল, তবে তোমাকে আর আর্ত্তি করিতে হইবে না। এই আমি তোমাকে তুলিয়া ধরিলাম। এখন বিবেচনা কর, তোমার আপনার জন আমা ব্যতীত আর কে আছে?"

Imitation of Christ গ্রন্থে লিখিত আছে, "Some persons walk not sincerely befor me; but being led with a certain curiosity and pride desire to know the hidden things of my providence and to understand the high things of God neglecting themselves and their own salvation.

গীতা বলেন:—

"অনন্যচেতা সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভং পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা করে সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ।

"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥"

এই প্রকার উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বদুঃখের আলয়-স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন না।

পাঠকভ্রাতৃগণ! তাঁহাকে একবার লাভ হইলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাই বলি তোমার নিত্য ও সত্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই নিত্য শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে সন্নিহিত। একবার প্রাণ খুলিয়া ঐ পদে বিশ্বাস সহকারে নির্ভর কর, সমস্ত লাভ হইবে। জাগতিক শান্তিতে লাভবান হইয়া পরকালে পরাশান্তি লাভ করিবে। আর পুনরায় এ জগতে আসিতে হইবে না।

নিত্যপদাশ্রিত
শ্রীমুকুন্দ লাল গুপ্ত।

ওঁ শান্তি

প্রাণের ঠাকুর।

প্রভো!
তুমি যে সবার প্রাণের ঠাকুর
থাক সকলের প্রাণে।
যতন করিয়ে হিয়ার মাঝারে
রাখে সবে তোমা ধনে॥
তোমাকে লইয়া প্রেমেতে মাতিয়া
থাকে তারা দিবা নিশি।
শোক তাপ আদি সব যায় ভুলি
হেরে তব মুখশশী॥
রাখিতে পরাণে বড় ভাল বাসি
পরাণ পুতলি তুমি।
থাক হে পরাণে প্রেমের বাঁধনে
হইয়ে হৃদয়-স্বামী॥

হৃদয়ে রাখিয়ে প্রেমের প্রসূনে
সাজায়ে মনের মত
ও রাঙ্গা চরণে ভকতিচন্দন
অরপিছে অবিরত
প্রাণের ঠাকুর রাখিয়ে পরাণে,
নানাবিধ উপচারে
পুজিতেছে সদা ভাগ্যবান যাঁরা
কত শত সমাদরে॥

তিলেকের তরে ছাড়ে না তোমায়
নয়নে নয়নে রাখে।
পলক বিহীন নয়নে নেহারি
প্রেমানন্দে ডুবে থাকে॥
তোমার শ্রীরূপ হেরিতে হেরিতে
তোমা-ময় হ'য়ে যায়।
তোমাবিনে কিছু না হেরে নয়নে
তোমা প্রেমে ভেসে যায়॥
অন্তরে বাহিরে তুমিই বিরাজ,
তোমা-গত প্রাণ তার।
ঘটে পটে মাঠে তোমারে নিরখে
গহন কাননে আর॥

যেথা সেথা যায় তোমারে লইয়ে
আনন্দে মাতিয়ে থাকে
তোমার বিকাশ জগৎ ভরিয়া
প্রেমের নয়নে দেখে॥
দেহ মন প্রাণ সঁপে তব পায়
তোমার হইয়ে যায়
তুমি আমি কেবা ভুলে যায় কভু
প্রেমেতে পাগল প্রায়॥

প্রাণের ঠাকুর সবার পরাণে
দিতেছ প্রেমের আলো।
আমি হতভাগ্য আছিনু পড়িয়া
দয়া কি হবে না বলো ॥
আমার পরাণে নাহিক সে প্রেম
নাহি শুদ্ধ ভালবাসা।
নাহিক শকতি নাহিক ভকতি
তবু করি কত আশা ॥
পতিতপাবন তুমি হে ঠাকুর!
কাঙ্গালজীবনধন!
যার কেহ নাই তুমি নাকি তার,
বলিছে ভক্তগণ ॥
শুনে বড় আশা করি এ পরাণে
আমি তো কাঙ্গালজন।
এ ভবের মাঝে কে আছে আমার
জান তো পরাণ-ধন!
দয়া করে যদি দীনের হৃদয়ে
বারেক আসিতে তুমি।
হেরিতাম তবে পরাণ ভরিয়ে
মোহন মূরতি খানি ॥
রাতুলচরণ হৃদয়ে রাখিয়ে
জুড়াব তাপিত হিয়া।
বড় আশা প্রাণে ধোয়াব চরণে
নয়নসলিল দিয়া ॥
সুগন্ধ কুসুমে সাজাব চরণ
চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে।
হবে দিব্য শোভা পদ কোকনদে
দেখিব পরাণ ভরে ॥
সোণার বরণ যুগল চরণে
রকত অলক্ত মাখি।
সাজাব সুন্দর ভুবন-মোহন
নয়ন জুড়াব দেখি ॥
ভুবনভুলান চরণ দু'খানি
পূজিব মনের মত।
ক্ষীর সর ননী দুগ্ধাদি মিষ্টান্ন
খাওয়াব আদরে কত ॥
তোমার শ্রীমুখে মধুমাখা বাণী
শুনিয়ে জুড়াব হিয়া।
তব সুখে সুখী তব দুঃখে দুঃখী
থাকিব তোমারে নিয়া ॥
পরাণে রাখিব পরাণঠাকুর
কেহ না দেখিবে তায়।
তোমাকে লইয়া কাটাইব দিন
বিকাইব তব পায় ॥
আশা পথ চেয়ে আছি প্রাণনাথ!
আসিবে কি এক বার।
প্রাণেরঠাকুর এসহে পরাণে
চরণে ঠেলনা আর ॥

শ্রীশ্রীনিত্য-ভক্ত-পদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্বস্মৃতি।
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ মহা ষষ্ঠী—মায়ের উদ্বোধন। ভক্তগণ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রভাতী সুরে গান ধরিলেন,—

"সঙর শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহিতকারী"

তৎপরে আগমনী। কীর্ত্তনানন্দে বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল। ভিতর হইতে

ঠাকুরের বাল্যভোগের প্রসাদ আসিল; ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ সংবাদ পাইলেন, ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইয়াছে; অমনি একে একে ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ-প্রণামানন্তর সকলে যথা স্থানে উপবেশন করিলেন।

ঠাকুর আজ "যোগবাশিষ্ঠ" শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। জনৈক ভক্ত একটী পেন্‌সিল হাতে লইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর দুই একটী পংক্তি শুনিতেছেন আর সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধি-অন্তে আধ আধ অথচ সুস্পষ্ট স্বরে বলিতেছেন,—"চিহ্ন দাও।" কখনও বা একটী বাক্যের অর্দ্ধাংশ বা একচতুর্থ অংশ মাত্র পাঠ হইয়াছে—ঠাকুর সমাধিস্থ—পাঠক চিহ্ন দিতে হইবে অনুমান করিয়া থ দিতেছেন। নবাগত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব দর্শনে বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, 'মহাপ্রভুর কথা শুনিয়াছি, তিনি "কৃ" বলিতেই অচৈতন্য হইতেন; এ যে ততোঽধিক দেখিতেছি।' নিত্যসেবকবৃন্দ! সার্থক তোমাদের জন্ম! সার্থক তোমাদের জীবন! আর সার্থক তোমাদের নরদেহধারণ!

গ্রন্থ-পাঠককে আর অধিক পাঠ করিতে হইল না। এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল। ঠাকুর বুঝিলেন ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার সময় হইয়াছে; আবার সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে ভক্তপ্রাণে স্নেহের অমিয়ধারা বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"আজ এই পর্য্যন্ত।" ভক্তগণ বুঝিলেন, ঠাকুর সকলকে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিতেছেন। তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে প্রণামান্তে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ উপস্থিত। আশ্রমে বহুভক্তসমাগম হইয়াছে। "তিনি প্রত্যক্ষ পরম দেব, অনন্ত মহান!" পূজার সুদীর্ঘ অবকাশে অনেকভক্ত বাড়ী যান নাই; এই "প্রত্যক্ষ পরম দেবকে" দেখিবার অভিলাষে আশ্রমে আসিয়াছেন। রাজকুমার বাবু ঠাকুরের জন্য একখানি গৈরিক বহির্ব্বাস আনিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইলে, ভক্তবৃন্দ একে একে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর প্রশান্ত-মূর্ত্তি **শ্রীনিত্যগোপাল** অভয় হস্ত তুলিয়া করুণ-কোমল-কণ্ঠে কাহাকে বলিতেছেন,—"তোমার কথা আমার স্মরণ রহিল;" কাহাকেও বা বলিতেছেন,—"নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন;" কোন ভক্ত আনন্দের সহিত, কোন ভক্ত ছল ছল নেত্রে, কোন ভক্ত বা আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে শ্রীশ্রীদেবের এই আশীর্ব্বাদ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর ক্ষণে ক্ষণে মধুর-কণ্ঠে বলিতেছেন,—"নারায়ণ! নারায়ণ!"

ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশই দুস্থ, কল্যকার সম্বলবিহীন! রাজকুমার বাবুও ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কাঙ্গালের ঠাকুর আমাদের, আজ তাঁহার প্রদত্ত গৈরিক বাস পরিধান করিয়াছেন; পরিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"রাজকুমার! তোমার কাপড় খানি বড় সুন্দর হইয়াছে।" এই বলিয়া কাপড় খানি ধরিয়া সমস্ত ভক্তগণকে দেখাইতে লাগিলেন—যেন রত্ন-খচিত বহুমূল্য রাজবাস! পঁচিশ ত্রিশ টাকা মূল্যের গরদের কাপড় কীটদষ্ট হইতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই,—আর এই সামান্য কার্পাসবাসে ঠাকুরের আমার এত আনন্দ! আর সামান্যই বা বলি কি করিয়া,—ভক্ত-

হৃদয়ের প্রীতি-গৈরিকে যে এ বস্ত্র রঞ্জিত! তাই ত' ঠাকুর! দুর্য্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের ভিক্ষার খুদে তোমার লোভ পড়িয়াছিল! বলিহারি, তোমার রুচি!

ঠাকুর একে একে নবাগত ভক্তগণের শারীরিক এবং পারিবারিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া,—'ভবে কে বলে কদর্য্য শ্মশান' এই গানটি শুনিতে চাহিলেন। সহসা ভক্তগণের বুক কাঁপিয়া উঠিল! 'সর্ব্বনাশ! ঠাকুর ত কোন দিন শ্মশানের গান শুনিতে চাহেন না, আজ হঠাৎ শ্মশানের গান শুনিবার সাধ হইল কেন? ঠাকুর কি তবে আমাদিগকে ফাঁকি দিবার সংকল্প করিয়াছেন? সত্য সত্যই কি আমাদের চাঁদের হাট্—আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়া যাইবে? সত্য সত্যই কি আমরা আর এই "অদ্ভুত সাকার" **শ্রীনিত্য-গোপাল**-মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না?' ঠাকুর! সত্য সত্যই কি আমাদিগকে পথের কাঙ্গাল করিবার সংকল্প করিয়াছ? প্রভো! তুমি ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? আমরা আঁস্তাকুড়ের এঁটো হাঁড়ি ছিলাম,—তুমি দয়া করিয়া তোমার ভুবন-পাবন শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্র করিয়া তাহাতে দেবতার ভোগ রন্ধন করিতেছিলে; আমরা সংসার-নরকের অন্ধকার আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া যাইতেছিলাম,—পতিত-পাবন! কাঙ্গালের বন্ধু! তুমি দয়া করিয়া উদ্ধার করিয়াছ; সুধু উদ্ধার নয়,—স্বর্গের বিমলানন্দে মগ্ন রাখিয়াছ; আমাদিগকে কি সে সুখে বঞ্চিত করিবে? ঠাকুর! তোমার কৃপায় বুঝিয়াছি, তুমি মঙ্গলময়! আমরা অজ্ঞ;—আমরা আমাদের মঙ্গলামঙ্গল কি জানি? প্রভো! দয়া করিয়া বুঝিতে দিয়াছ, "তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়!" হে মঙ্গল-নিকেতন! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক! দেব! যাহাতে—দীন আমরা, পতিত আমরা, ভিখারী আমরা—আমাদের মঙ্গল বিধান হয়, তোমার ইচ্ছায় তাহাই সাধিত হউক!

কে জানে, প্রায় চারি মাস পরে যে ভয়ানক শোকাবহ দুর্ঘনার সংঘটন হইবে, ঠাকুর আজ তাহার ইঙ্গিত করিয়া রাখিলেন!

ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। তার শরীরেরই বা কি দোষ দিব? শরীরের না করিলেন তিনি নিজে যত্ন, না করিলাম হতভাগা আমরা। বহুমূল্য মখমল শয্যা যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে—ঠাকুর আমার সামান্য একটী মাদুরের উপর শয়ন করিয়া রাত্রি-যাপন করিতেছেন! তাহাও আবার ছার-পোকায় পরিপূর্ণ! ছারপোকা মারিবার আদেশ ছিল না; একবার কোন ভক্তরমণী অতি কষ্টে বালিসটীর ছারপোকা মারিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর আর সে বালিস ব্যবহার করিলেন না। মশক সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা ছিল। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি—মশক রক্তপান করিতেছে, আর ঠাকুর আস্তে আস্তে মশকটীর* কাছে আঙ্গুল নাড়িতেছেন। ঠাকুর বুঝি ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' এই ভাবে সাধনীয়।" অধিকাংশ সময়ই বসিয়া থাকিতেন—তক্তপোষের উপর একটী মাত্র মাদুর বিছান। তাহার ফলে দক্ষিণ পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে কড়া পড়িয়া ক্ষত হইল। আর তাহাতে আরশুলা, ছারপোকা এবং পিঁপড়ে পাকা ঘর করিয়া বসিল। নিজে ত ভুলেও তাড়া করিতেন না; কোন ভক্ত তাড়া করিতে গেলে, তাঁহাকেই বরং তাড়া করিয়া আসিতেন। কোন ভক্ত ঔষধ লাগাইতে গেলে, "আজ নয়, কাল" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতেন। ভক্তও আদেশ লঙ্ঘনের ভয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। ঠাকুর বলিয়াছেন,—'আজ

নয়, কাল'; ভক্ত আবার কল্য ঔষধ লাগাইতে উপস্থিত, ঠাকুর আজও বলিলেন,—"আজ থাক্, কাল হ'বে।" এইরূপে চারি পাঁচ দিন 'আজ নয়, কাল' করিয়া যখন দেখিলেন, আর ফিরাইবার উপায় নাই, তখন হয় ত' একটু ঔষধ লাগাইলেন। আবার হয়ত দশ বার দিনের মধ্যে ক্ষতস্থানের কাছে কাহাকেও ঘেঁষিতে দিলেন না। ইতিমধ্যে ঔষধে যতটুকু উপকার দেখাইয়াছিল, আরশুলা ছারপোকা এবং পিঁপড়ের কৃপায় ঘা তাহার চতুর্গুণ বাড়িয় উঠিল। ইহার উপরে ছিল বহুমূত্রের প্রকোপ, আর যথোপযুক্ত আহারের ক্রটী। দুধের বাটিটী মুখের কাছে নিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, কোন কারণ বশতঃ কোন ভক্তের সুবিধামত আহার হয় নাই। দুধ মুখের কাছে নিয়াছেন—অধরে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, আর চলিল না; আস্তে আস্তে বাটিটী নামাইলেন, বলিলেন,"—কে দাও, তা'র ভাল আহার হয় নাই।" পাঠক! ইহা হইতে স্নেহের নিদর্শন আর কি দেখিতে চান? ঠাকুর! এত করিয়াও বুঝি আমাদিগকে ভাল বাসিতে পারিলে না, তাই তিরোভাবের কয়েক দিন পূর্ব্বে নিজের রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলে,—"তোমরা ত আমাকে যথেষ্ট ভালবাস, আমি তোমাদিগকে ভালবাসিতে পারিলাম না।" ঠাকুর! তুমি যদি ভালবাসিতে না পারিলে, তবে কে আর আমাদিগকে ভালবাসিবে? স্নেহময়! প্রেমময়! তোমার ভালবাসার, তোমার স্নেহের এক কণিকাও ত এত দিনে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না! আমরা ভাগ্যহীন, আমরা অপদার্থ! না হ'লে, এমন অপার্থিব রত্নে বঞ্চিত হইব কেন? সত্য বটে, ভক্তগণ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং সাধ্য মতে তাঁহার সেবার ক্রটী করেন নাই, কিন্তু আমরা যে জীব! আমাদের কি শক্তি, কি সাধ্য যে ঐ দেব-দেহের যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূসা করি?

ভক্তগণ ঠাকুরকে পর্য্যায়ক্রমে ব্যজন করিতেছিলেন। ঠাকুর পায়ের ক্ষত স্থান কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন—পাছে ভক্তগণ দেখিতে পাইয়া ব্যথিত হন। রাজকুমার বাবু হাওয়া করিতেছিলেন। ভক্তের দৃষ্টি—সাধারণতঃ শ্রীপাদপদ্মের দিকেই পড়িয়া থাকে। রাজ কুমার বাবু দেখিলেন পাখানি কাপড়ে ঢাকা; কোন কারণ খুজিয়া পাইলেন না। তিনি হাওয়া করিতে লাগিলেন; হাওয়ায় কাপড় খানি আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। যে পাদপদ্ম দেখিবার জন্য তিনি আকুল হইয়াছিলেন—দেখিলেন সেই ভক্তবাঞ্ছিত শ্রীচরণ-পঙ্কজের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ক্ষত-বিশিষ্ট, ক্ষত স্থান ছিন্নবস্ত্রখণ্ডে জড়ান। দেখিয়া তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না। ঠাকুরকে হাওয়া করিবার জন্য শত শত ভক্ত লালায়িত। রাজকুমার বাবু পরবর্ত্তী ভক্তের নিকটে পাখা খানি দিয়া বিষণ্ণ-মনে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন, যেন কোন প্রার্থনা জানাইবার ইচ্ছা।

এদিকে ঠাকুর যে গানটী শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কাহারও জ্ঞাত না থাকায় গাওয়া হইল না। তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্য সঙ্গীত হইল। ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে কখনও বা ভাবস্থ, কখনও বা সমাধিস্থ হইতেছেন; আর সময়ে সময়ে মধুর-কণ্ঠে "নারায়ণ," "নারায়ণ" ধ্বনি করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে গান বন্ধ হইল। তখন রাজকুমার বাবু যুক্ত-করে বলিলেন,—"বাবা! আমার একটী প্রার্থনা।" ঠাকুর—স্থির, প্রশান্ত, নির্ব্বাক! ভক্ত—ছল-ছল নেত্র!

'মৌনসম্মতিলক্ষণ' বুঝিয়া ভক্তবর বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের একমাত্র সম্বল ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম। আজ তাহা রোগ-যুক্ত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি ঐ রোগটী ভিক্ষা চাহিতেছি।" ঠাকুর—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, মুদিতনেত্র! এই করুণ-দৃশ্য-দর্শনে ভক্তগণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! ভিক্ষার্থী করপুটে, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার পবিত্রতম, পুণ্যতম দেহে রোগের প্রকাশ কখনও সম্ভব নহে। রোগের কি শক্তি আপনার ঐ দেবদেহ স্পর্শ করে? আমরা পতিত, অধম, পাপপূর্ণ; আমাদের পাপ গ্রহণ করিয়া আপনি রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আপনি ঐ শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়াছেন; তাহারই ফলে আপনার এই রোগ-যন্ত্রনা! আমি বহুদিন পরে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি; জীবনে কখনও কোন প্রার্থনা করি নাই; আজ এই একটী মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। —আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন; রোগটী আমাকে ভিক্ষা দিন!" ঠাকুর—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, সমাধিস্থ! ভক্তবর—শোকে, দুঃখে, অনুতাপে অবরুদ্ধকণ্ঠ! ভক্তগণ প্রাণের আবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তবর আবার বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এত দিন পরে আসিয়া আমার আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ হয় নাই বা ইচ্ছা হয় নাই। আহা, কি দেখিতে আসিয়া কি দেখিলাম! কোথায় আপনাকে সবল সুস্থ দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিব—আর কোথায় আপনাকে রুগ্ন দুর্ব্বল দেখিয়া এ অনুতাপ রাখিবার স্থান পাইতেছি না! আপনার এই রোগ আমাদেরই দুর্ভাগ্য এবং মহাপাপের পরিচয়! আহা আমরা কি দুর্ভাগ্য! এমন লাবণ্য-ঢল-ঢল সুন্দর দেবদেহের এমন দুরবস্থা করিয়াছি; কা'র কাছে এ দুঃখ জানাইব? কে এ শোক-সান্ত্বনা দিবে? বাবা! আপনি নীরাময় হউন; আমাদের বিষাদ দূর করুন, আনন্দবিধান করুন। আপনি নীরোগ হউন, আপনার শ্রীচরণ রোগমুক্ত হউক্, রোগটী আমাকে ভিক্ষা দিন। প্রভো! কত আশা করিয়া আসিয়াছি—ঐ শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব—ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ের শান্তি-বিধান করিব। আহা সে আশায় ছাই পড়িয়াছে; আজ এ কি দেখিতেছি! এ যে আমাদের সংখ্যাতীত পাপের জলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ! ঐ ক্ষত স্থান যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে,—"হতভাগা! দেখ, দেখ, ব্রহ্মবাঞ্ছিত পদের কি দুর্দ্দশা করিয়াছিস্!" আহা আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আপনি ঐ লালটুক্‌টুকে পা দু'খানি যখন দোলাইতেন, আমরা দেখিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিতাম—আজ আমরা সেই সুখে বঞ্চিত! প্রভো! আমাদের আর কি সম্বল আছে? ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ ঐ শ্রীচরণ রোগমুক্ত করুন! রোগটী আমাকে ভিক্ষা দিন; আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন!" ভক্তবর আর বলিতে পারিলেন না; বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, অশ্রুধারায় বুক ভিজিয়া গেল—দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর—ধীর, স্থির, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, অচল, অটল, সমাধিস্থ! ভক্তগণ, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ঘন ঘন সমাধি হইতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে বলিতে লাগিলেন,—"ইনি আমাকে বড় ভালবাসেন, তাই আমার কষ্টে অত্যন্ত

ব্যথিত হইয়াছেন।" কখন বা বলিতেছেন, —"আজ এই পর্য্যন্ত।" ক্রমে ক্রমে ঠাকুর বহির্জগতে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণের কোন কথা বলিবার শক্তি রহিল না—অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন, —"আপাততঃ এই পর্য্যন্ত; এখন বিশ্রাম করা ভাল।" ভক্তগণ ভাবিলেন, তাঁহাদের এই ব্যাকুলতায় হয় ঠাকুর নিরাময় হইবার জন্য রীতিমত ঔষধ ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইবেন, নয় কোন দৈব উপায় অবলম্বন করিবেন। কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের মুখে কোনই আশ্বাস-বাক্য শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর ঘন ঘন সমাধিস্থ হইতেছেন, আর কখন বলিতেছেন—"নারায়ণ" "নারায়ণ", কখন বলিতেছেন—"আজ এই পর্য্যন্ত।" ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন—ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁহারা বাহিরে গমন করেন; সুতরাং সকলেই আর বিলম্ব না করিয়া প্রণামানন্তর বিষাদক্লিষ্ট-হৃদয়ে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। এইরূপে অশ্রু-ধারায় স্নাত হইয়া ভক্তগণ মহাপূজার উদ্বোধন-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ পাল।

নবীন পথিক।

(আজি) তোমারই দুয়ারে নবীন পথিক
(তুমি) লহ গো ডাকিয়া সাদরে।
(আজি) তোমারই নিকটে চাহে কৃপা-বারি
(তুমি) ঢাল কৃপা-বারি তাহারে॥
বহুদূর হ'তে এসেছে সে যে
প্রাণ ভরা আশা ল'য়ে।
ফিরা'ও না নিরাশা-অন্তরে
সে যে আছে তোমা পানে চেয়ে॥
(আজি) দেখিতে তোমারে মনের হরষে
আবেগে এসেছে ছুটি।
(আজি) তোমারই সনে মধুর মিলনে
চরণে পড়েছে লুটি
দেখা দিও তারে থেকো না লুকা'য়ে
খেলো না মায়ার খেলা।
বল দুটি কথা ওহে শান্তিদাতা
সে যে সরলা অবলা বালা॥

শ্রীঅনন্তকুমার হালদার।

ধ্যান।

অষ্টাঙ্গ-যোগে ধ্যান সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। ধ্যান দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়া স্থির ভাব ধারণ করে। ধ্যান দ্বারা মন নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জীব দিব্য-দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ কি কি তাহা যোগসূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে:—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই সব যোগক্রিয়া দ্বারা মন নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অনেকের অনেক মত। কাহার মতে প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; কাহার মতে ধ্যান-ধারণা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। "নানা ঋষির নানা মত," সে সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ কে

সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে চাহি না; তবে আমার বিবেচনা হয় যে ধ্যানযোগই শ্রেষ্ঠ; ইহাতে স্বতঃই যম আদি সর্ব্ব বিষয় অতি স্পষ্টতর রূপে বুঝা যায়। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম যে সত্য তাহা নির্ণয় করা যায় (১)। ধ্যান-যোগাভ্যাসের সাহায্যে সাধক তন্ময় হইয়া পরম গুরু শ্রীনিত্যগোপালে আত্মহারা হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হন। যিনি ধ্যানদ্বারা নিত্য শ্রীনিত্যগোপাল দর্শন করেন তাঁহার আর কোন দর্শনের আবশ্যকতা হয় না। ধ্যান বা সমাধি দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিত্যবস্তুর ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে মনুষ্য সমাধি প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয় ইহা পরমহংস ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতিতে অতি স্পষ্ট প্রমাণ। আমাদের ঠাকুরেরও নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত; ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সমাধি ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন হয়। ধ্যান যাঁহারা করেন তাঁহাদের প্রাণায়াম করিবার আবশ্যক হয় না। ধ্যান দ্বারা কুম্ভক, রেচক, পূরক হয় এবং কুম্ভক দ্বারা সমাধি প্রাপ্তি হয়। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন যে, মনকে সংযত করিয়া উহার নিবেশ দ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া সাধক আমাকে ধ্যানযোগ দ্বারা সর্ব্বব্যাপী দর্শন করেন; এইরূপ করিতে করিতে যখন তিনি একাগ্র হইয়া নিশ্চল ভাবে স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে বিষয়-স্পৃহা-শূন্য হইয়া নিবাতস্থ দীপশিখার ন্যায় অচল, অটল থাকেন তখন তাঁহাকে যোগযুক্ত বা ধ্যানস্থ বলা হয়।

এই যোগদ্বারা কিরূপে চিত্তকে বৃত্তিহীন, সংকল্প-শূন্য ও স্থির করিতে অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ভগবান গীতাতে এইরূপ বলিতেছেনঃ—

"সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত-কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
(গীতা ৬।২৪—২৯।)

সংকল্পযুক্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা ও আশাশূন্য মন দ্বারা এবং ঐ মনকে ইন্দ্রিয় বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধ্যান যোগে অবস্থিত রহিবেন। মনকে প্রশান্ত করিয়া ধীরভাবে মনকে বাহিরের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করতঃ আত্মাতে স্থির রাখিয়া এবং অন্তর্মুখীন হইয়া সচেতন ভাবে নিত্যগোপালের ধ্যান করিবেন। এরূপ যোগী পরমারাধ্য শ্রীনিত্যস্বরূপানন্দে চিরশান্তি লাভ করেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে মনের মলিনতা দূর হইয়া শ্রীনিত্যগোপালে মিশিয়া পরম সুখলাভ করেন। ভগবান গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে বলিতেছেন,—"যে অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা নিত্যবস্তুর ধ্যান করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ।" যখন ভগবান নিজ মুখে অর্জ্জুনকে সেই নিত্যবস্তু (নিত্যগোপাল) সম্বন্ধে এরূপ সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন তখন জীবের আর ইহা অপেক্ষা অতি সুলভ কি হইতে

(১) ইহা সদ্গুরু-উপদেশ-গম্য

পারে? আসল কথা এই যে যিনি মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করতঃ স্থির-ভাবে, না অতি-উচ্চ বা না অতি-নীচ আসনে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া শান্তিময় ব্রহ্মরাজ্যের অভিমুখে লইয়া যাইবেন তিনি কামনাশূন্য হইয়া প্রশান্ত ব্রহ্মদর্শন করেন। তিনি কামনা-রাজ্য ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চির-শান্তি প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রিয় হইতে কিরূপে ত্রাণ পাইয়া মন গুহ্যরাজ্যে প্রবেশ করিবে; কিরূপে ধ্যানাভ্যাসবলে যোগারূঢ় হইবে এবং কিরূপে অনুভব করিবে তাহা ভগবান শ্রীগীতাতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০ম হইতে ১৪শ শ্লোকে যথেষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন। আর ধ্যানে যে প্রাণায়াম হয় তাহা গুরূপদেশগম্য; তাহা লিখিয়া বা ছাপাইয়া বলিবার বিষয় নহে। অতএব গুরুদেব যে পথ দেখাইয়া যাহা বলিয়া দিবেন তাহা অত্যুৎকৃষ্ট; সে বিষয় কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। ভগবান আমাদের জন্য সব দিকে পথ করিয়া দিয়াছেন। হে ভাইসকল! চল আমরা তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহার সঙ্গ লই (তাঁহার সহিত মিলিয়া যাই); তাঁহাকে যিনি একমনে সমস্ত বাহ্যবস্তু হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীনিত্যগোপালরূপে দর্শন করেন, তিনিই ধন্য। অনেকের দেখা যায় যে ত্রাটক-যোগ-দ্বারা সমাধি-প্রাপ্তি হয়। ত্রাটক ও ধ্যান যোগের অংশ বলিয়া কথিত হয়; যাহা ত্রাটক তাহাই একাগ্রতা। এই একাগ্রতার চরম অবস্থাতে সমাধি-প্রাপ্তি হয়। বিনা একাগ্রতাতে ধ্যান হইতে পারে না; ধ্যানের প্রধান অংশ একাগ্রতা। যোগী যে সমাধি লাভ করেন তাহা ধ্যান যোগ দ্বারা স্থির করা যায়। ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মভাবে প্রবেশ করিতে হইলে সামগান, প্রার্থনা ও অবিরাম বৈদিকমন্ত্র জপ কর। সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে সংসার-রাজ্য, প্রকৃতিরাজ্য ত্যাগ করিয়া জীবত্ব ত্যাগ করিবে। জীবত্বত্যাগ করিতে হইলে, সচ্চিদানন্দরূপ নিত্য অমৃতলাভ করিতে হইলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি তাহার উপায়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যে সংসার-আসক্তি ত্যাগ করায়; ধ্যান-সমাধি-দ্বারা জীব সংসার ও জীবত্ব ত্যাগ করিয়া নিত্যগোপালে মিশিয়া নৃত্য করিতে থাকে। তাহাই ব্রহ্মলাভ; তখনই জীব মুক্তিলাভ করে। আসল কথা এই বিচারে যতই গোলযোগ বোধ হউক না কেন, এক লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলে সমস্ত মীমাংসা হইয়া সমাধি-প্রাপ্তি দ্বারা শ্রীনিত্য-সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীলালগোপাল ঘোষ।

গীত।

রাগিণী—ইমন-কল্যাণ।

তাল—তেওয়া।

নিকটেতে আছ তবু দেশে দেশে
আমি ঘুরিয়া মরি হে।
অন্তরেতে আছ তবু দূরে দূরে
তোমারে খুজিয়া ফিরি হে॥

জীবন-প্রভাতে মুগ্ধ-আঁখিতে,
লেগেছে তোমারই কিরণ-রেখা হে।
জীবন-পত্রে, তোমারই হস্তে
লিখেছ কি মধু ছন্দ হে;
ছত্রে ছত্রে উথলে অমিয়
আকুল করে সদা প্রাণ হে;
কোথা আছ তুমি, কোথা আছি আমি,
তবুও সদা টানাটানি হে।
চিরতরে মোরে টেনে লও, সখা!
তোমারই চরণ দুয়ারে হে॥

শ্রীউপেন্দ্র নাথ না,
এল, এম, এস্।

অপূর্ব্ব দর্শন।

গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীধাম নবদ্বীপে আজ কার্ত্তিকী রাস পূর্ণিমার নিশি। চন্দ্রদেব স্বীয় রূপের জ্যোতি বিকীরণ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। গুপ্ত বৃন্দাবনের গুপ্ত রাসলীলা সাধারণের নয়নে গোপন রাখিবার মানসে যোগমায়া দেবী নানারূপে নানা ভাবে বিষয়াস্তরে জীবকুলকে বিমোহিত করিয়া হাস্য করিতেছেন। কলিহত সাধারণ জীব গূহ-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হওত পার্থিব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। রাত্রি অনুমান ৯টা; শ্রীবাস-আঙ্গিনার পথে ৺রামসীতাপাড়া আসিতেছিলাম। বৌ-বাজারের শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনী প্রতিমা দর্শন করিতেছি, অকস্মাৎ কোথা হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া মন আকুল করিয়া তুলিল। প্রতিমা-দর্শনে মন তুষ্ট না হইয়া সঙ্গীতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। রাস্তায় পদার্পণ করিয়াই বোধ হইল, সম্মুখের একটি একতালা বাড়ীর মধ্য হইতে এই মধুর সঙ্গীত-লহরী আসিতেছে। অনেকক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে শুনিতে প্রাণের ভিতর কেমন একটা আবেশ আসিল; উহা আমাকে অবশ করিয়া সেই বাড়ীর যে ঘরে গান হইতেছিল সেই ঘরের প্রবেশদ্বারে আঘাত করাইল। ইহা যে অপরিচিতের ঘর, অনাহূতভাবে প্রবেশ করা অন্যায় তখন আর সে জ্ঞান ছিল না। যাহা হউক দুয়ারে আঘাত করিবা মাত্র, এক ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিলাম, তাহা অপূর্ব্ব; আমার জীবনে সেরূপ দর্শন আর কখনও ঘটে নাই। ঘরের মধ্যস্থলে এক গৌরবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সুপুরুষ যোগাসনে সমাধিস্থ; তাঁহার অন্তর হইতে কোটী কোটী একতান ভ্রমর-গুঞ্জনের সুমধুর স্বরলহরী বহির্গত হইয়া ঘরটীকে মধু হইতেও মধুময় করিতেছে। কার্ত্তিক মাস; অল্প অল্প শীতও পড়িয়াছে; এই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অজস্র স্বেদ ও অবিরাম অশ্রু বহির্গত হইয়া, অঙ্গের বসন সিক্ত করিয়া, আসন ভিজাইয়া চারি ধারে জল গড়াইয়া যাইতেছে। দুইটী যুবা পুরুষ দুই খানি বড় বড় পাখা (তালবৃন্ত) লইয়া অনবরত ব্যজন করিতেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়িয়া জানিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অশ্রু এরূপ প্রবল বেগে বহির্গত হইত যে তাঁহার চতুর্দ্দিকের লোক

সেই অশ্রুতে সিক্ত হইয়া যাইতেন; আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। চক্ষু দিয়া যে এত জল পড়িতে পারে পূর্ব্বে তাহা বিশ্বাসই করিতাম না; কবি-কল্পনা বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। আজ এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আমার শরীর কেমন এক অবশভাবাপন্ন হইতে লাগিল; আমার অবস্থা দর্শন করিয়া একটী ভদ্রলোক (সম্ভবতঃ তাঁহার নাম বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়) আমার হাত ধরিয়া তাঁহাদের আসনের একপ্রান্তে আমাকে একটু স্থান দিলেন; আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া বসিয়া অনিমেষ-নয়নে সেই আনন্দময় মহাপুরুষের দেহ ও বদন-কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেক্ষণ পরে আমার যেন চৈতন্য আসিল; তখন দেখিলাম যে, তুইটী যুবা পুরুষ অবিরাম ব্যজন করিতেছেন; তাঁহারা আমারই আত্মীয়; একটী আমার কনিষ্ঠ সহোদর, নাম শ্রীনাথ গোস্বামী; অপরটী আমার পিতৃব্য-পুত্র, নাম যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী। তাঁহাদের দেখিয়াই এই মহাপুরুষের পরিচয় আমার হৃদয়পটে সম্পূর্ণ সমুদিত হইল; তখনই বুঝিলাম, ইনিই সেই সাধু জ্ঞানানন্দ অবধূত। এই মহাপুরুষের উপর পূর্ব্ব হইতেই আমার অনাদর-ভাব ছিল; কারণ আমার ছোট ভাই শ্রীনাথ সংসার-কার্য্যে অবহেলা করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বসবাস করিতেন। কাজেই সংসার সম্বন্ধে তাঁহা হইতে আমার স্বার্থের হানি হইতেছে মনে করিয়াই তাঁহার উপর আমি বিরক্ত ছিলাম। এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে আমার পূর্ব্বভাব বিদূরিত হইল এবং মনে মনে নিজেকে বহু ধিক্কার দিতে লাগিলাম। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে সেই অবধূত মহারাজের অল্প অল্প সমাধি-ভঙ্গ হইতে লাগিল। একবার আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন,—"গাও"। যাঁহাদের নিকট আমি বসিয়াছিলাম, তাঁহারা আমাকে গান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; আমিও আমার প্রাণের আবেগে গাইলাম,—

"বাঞ্ছা নিয়ত স্বজন সঙ্গে,
ভাসিব সুরস রস-তরঙ্গে,
কৃপা করি প্রভু হের অপাঙ্গে,
নমঃ নমঃ নমঃ শ্রীভুবনেশ্বর।" ইত্যাদি।

গানটী গাহিতে গাহিতে প্রাণের কেমন একটা ভাব আসিল; গানের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে ক য়ক ফোঁটা জল আসিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। সে রাত্রিতে তাঁহার সহজ-ভাব-দর্শন আর আমার অদৃষ্টে ঘটিল না; যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন রাত্রি ৩টা। পর দিবস মনে করিলাম, আবার যাইব। তাঁহাকে দেখিবার জন্য উত্তরোত্তর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও হইতে লাগিল, কিন্তু সাংসারিক ও সামাজিক তাড়না বাধা হইয়া আমাকে বড় দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইল।

একদিন গোপনে শ্রীনাথকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি অবধূত মহাশয়ের নিকট আমার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, আর বলিবে আমি কি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত রহিব? আমি সংসারী; আমার তুই একটী পুত্র, কন্যা হইয়াছে; তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেও সমাজ আমাকে প্রতিরোধ করে; তুমি আমার হইয়া তাঁহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিও।

কয়েক দিন পরে আমার চাকরিস্থান সীতারামপুর চলিয়া গেলাম; এ যাত্রায় আমার দগ্ধ-অদৃষ্টে পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন ঘটিল না। একবৎসর পরে (তখন আম্পুলিয়া পাড়ায় আশ্রম হইয়াছে) আমি বাড়ী আসিলাম এবং সেই দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে পৌছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু তুই একটীকে

দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীযুক্ত অবধূত মহারাজকেও দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার সরলতাপূর্ণ কুশল জিজ্ঞাসা ও সুমধুর কথোপকথনে যারপরনাই আনন্দানুভব করিলাম। সে রাত্রেও কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বাড়ী পৌছিলাম। বাড়ীর সকলেই শুনিলেন, আমি সাধুর-আশ্রমে গিয়াছিলাম। অনেকেই বিরক্ত হইলেন বটে তবে হঠাৎ কেই কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পরদিবস প্রাতে পুনরায় আশ্রমে আসিলাম।

আমি যখন আশ্রমে পৌছিলাম তখন বেলা আন্দাজ ৮টা হইবে। কীর্ত্তন-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি আমার প্রতিবাসী বাল্য-সহচর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া জড়বৎ বসিয়া আছেন; দুই তিন বার ডাকিলাম কিন্তু কোন সাড়া পাইলাম না। আমি তাঁহারই কাছে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, অশ্বিনীবাবু বড় বড় দু'টী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, আর ধর্ম্মদাস রায়, ডাক্তার বাবু, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বাধা দিতেছেন। ব্যাপার খানা কি জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, অশ্বিনীবাবু তাঁহার গুরুদেব অবধূত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন, আশাও পাইয়াছেন অল্প পরে সাক্ষাৎ হইবে। অবধূত মহারাজ কীর্ত্তনবাড়ীর সন্নিকটে আর একটী একতালা পৃথক বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্ব্বে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইত; কখন তিনি নিজেই কীর্ত্তন-বাড়ীতে আসিতেন; কখন বা ডাকাইয়া লইয়া যাইতেন। অশ্বিনীবাবুকে গুরুদেব কৃপা করিয়া দর্শন দিবার আশা দিয়াছেন, এই আনন্দে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন উন্মাদের ন্যায় যেন আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। এই ভাবে আকুল প্রাণে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা ধরিয়া আছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এখন ছাড়িয়া দিলে চলিতে পারিবেন না, হয়ত পড়িয়া গিয়া কোন স্থানে আঘাত পাইতে পারেন; তাই তাঁহারা যাইতে দিতেছেন না। যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই অশ্বিনীবাবুর যাইবার জন্য আদেশ আসিল; ডাক্তার বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমি ডাক্তার বাবুকে বলিয়া দিলাম, আমার কথাটিও ঠাকুরকে বলিও; আমি তাঁহার দর্শন-আশায় বসিয়া আছি। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমার ডাক পড়িল; আমি যখন ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন অপর আর কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্য-বদনে মধুর-সম্ভাষণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, প্রণামানন্তর আসন সরাইয়া নিরাসনে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। বৈষয়িক কয়েকটী কথার পর আমি করযোড়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলাম। এবং নিজের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া অথবা জানি না কি কারণে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সেই ভক্ত-চিত্ত হারী মোহন নয়ন দু'টী হইতে অবিরল অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল পরে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সেই অশ্রুপতন দর্শন আমার সামান্য অশ্রু লজ্জায় অন্তর্হিত হইল। আমি একদৃষ্টে তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে মধুর "নারায়ণ! নারায়ণ!!" শব্দ উচ্চারণ

করিতে লাগিলেন। আমি গরুড়পক্ষীর ন্যায় যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখেই বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আমার প্রার্থনা জানাইয়া বলিলাম,—"আমি মহাপাতকী, আমাকে কি কৃপা করিবেন না?"

ঠাকুর মধুর স্নেহস্বরে বলিলেন,—"তোমার সম্বন্ধে আমার বিশেষ স্মরণ রহিল।"

আমি আনন্দে প্রণত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেছি এমন সময় কয়েক ঠোঙ্গা খাবার আসিয়া পৌঁছিল; তন্মধ্যে অমৃতিই বেশী। শুনিলাম ঠাকুর অমৃতিই কিছু বেশী ভাল বাসেন। যাহা হউক ঠাকুরের সেবান্তে কিছু প্রসাদ পাইয়া আনন্দ-মনে বাড়ী ফিরিলাম।

এখন হইতে প্রায়ই আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। তবে খুব গোপনেই এ কার্য্য হইতে লাগিল। দিবসে বড় একটা যাতায়াত করি না, সন্ধ্যার পরই যাই। আমি গোপন করিলে কি হইবে? ক্রমে ক্রমে অনেকেই শুনিলেন এবং নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। বিরুদ্ধবাদীরা আমার নিকট আসিয়া ঠাকুরের কিছু কিছু কুৎসা-স্থলে আমার মন পরীক্ষা করে; লোকের নানা প্রকার উৎপীড়নে প্রাণে বড় বেদনা পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যে যাহাই কেন বলুক্ না, আমার প্রাণের দৃঢ়তা কিছুতেই নষ্ট হইল না। একদিন শ্রীনাথ আসিয়া বলিল,—"বড় দাদা! ঠাকুর আপনাকে ডেকেছেন, কাল সকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" হঠাৎ ঠাকুর আমাকে কেন ডাকিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, পর দিবস প্রাতে শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। আমি দ্বাদশ বৎসর বয়সে স্নেহময়ী মাতৃদেবীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী (মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়) আমার ১৬ বৎসর বয়সে কৃপা করিয়া আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব ও কিছু কিছু যোগের প্রক্রিয়া উপদেশ করিয়া যান। এই কার্য্যের আনুসঙ্গিক কিছু কিছু হটযোগের ক্রিয়া অর্থাৎ নেতি-ধৌতি ইত্যাদিও করিতাম। পরে সিদ্ধমহাপুরুষ শিব-চৈতন্য বাবা, যিনি বরাকরের সন্নিকটে কল্যাণেশ্বরী পাহাড়ে বাস করিতেন, তাঁহার কৃপায় ও উপদেশে হঠ-যোগের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছি জ্ঞাপন করিলাম। জানি না, ঠাকুর কি অভিপ্রায়ে আমাকে আদেশ করিলেন,—"গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে।"

আমি বাহিরে আসিলে সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর কি বলিলেন?"

আমি বলিলাম,—"স্নানের ফেরতা দেখা করিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।"

সকলে বলিল,—"তোমার মন্ত্র হইবে।"

আমিত অবাক্; আমার ত অনেক দিন 'মন্ত্র' হইয়াছে, তবে আমার মন্ত্র হইবে সে কিরূপ? যাহা হউক্, স্নানান্তে ঠাকুরের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার এই দেবতা, এই মন্ত্র; নয় কি?" আমি মনে ভাবিলাম, হয়ত' শ্রীনাথ মন্ত্র ও দেবতা প্রকাশ করিয়াছে এবং যে বংশে নিত্য-সিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ বিধি, তাঁহাদের সকলেরই প্রায় এক মন্ত্র হয়; সেই হেতু মন্ত্র ও দেবতা বলিতে পারিলেন। আমি কিছু বলিলাম না, তবে চুপ করিয়া থাকিয়া "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" জানাইলাম। ঠাকুর আমার মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন না; কেবল আর একটী মন্ত্র সংযোজনা করিয়া মন্ত্রাভিষেক করিলেন; এবং উহা আমাকে দান করিয়া অভিষিক্ত

করিলেন। কার্য্যান্তে যখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিতেছি, শ্রীদেব তখন স্নেহপরবশ হইয়া আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে হস্তার্পণ করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। আমি নতমুখ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমার বোধ হ'তে লাগিল যেন মস্তক দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি দেহের মধ্যে দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। শরীর ক্রমই শিথিল হ'তে লাগিল; পরে কি হইল বলিতে পারি না; বোধ হয় আমার সংজ্ঞা ছিল না; যখন চৈতন্য হইল, তখন বুঝিলাম আমি খুব কান্দিয়াছি; কিন্তু কেন কান্দিয়াছি তাহা স্মরণ নাই। সামান্য কিছু প্রসাদ পাইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলাম। এখন হইতে আমার নব-জীবন আরম্ভ হইল। সংসার ভাল লাগে না; লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না; যাহা না করিলে নয় তাহাই কেবল অতি বিরক্তির সহিত করি। লোকে পাছে কিছু বলে এই ভয়ে অধিকাংশ সময় মাঠে বা বাঁধের ধারে, আমাদের বাঁশ-বাগানের কাছে, বসিয়া থাকিতাম এবং সন্ধ্যার পর আশ্রমে যাইতাম।

একদিন সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন-ঘরের পীঁড়ায় (খড়ের ছাঁদ দেওয়া ঘরে) বসিয়া দেবেন্ বাবু ডাক্তার, ধর্ম্মদাস রায়, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি এবং আরও কয়েকজন কীর্ত্তন করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবেশে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে পাইয়া সকলেই প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঠাকুর ভাবাবেশে সেই সংকীর্ত্তন-স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন; দেবেন্দ্র বাবু, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি কয়েকজন হাতধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া রাখিলেন; সংকীর্ত্তন-স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যদি পড়িয়া যান এই ভয়ে। ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ একখানা চৌকিতে আসন করিয়া ঠাকুরকে সেইখানে লইয়া বসান হইল। গৃহের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। ঠাকুর সমাধিস্থই আছেন; কখন অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতেছে; আবার পরক্ষণেই ঘোর তন্ময়তা আসিতেছে। যখন অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতে থাকে, তখন আধ আধ জড়তাময় কথায় কি বলে। বুঝা যায় না। এখন জনে জনে গান হইতেছে; কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ রাম, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, যাঁহার যেমন প্রাণে আসিতেছে ভগবদ্বিষয়ক গান করিতেছেন। হঠাৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন ও বামদিকের ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক কি বলিলেন।—ভক্তগণ অবাক্ হইয়া একে অন্যের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যেন অত্যন্ত নেশার ভাষায় বলিলেন—"মদ দাও" এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া অবিরল ফেন নির্গত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর মদের গন্ধে ভরিয়া গেল। কেহ কেহ ফেন আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন, ঠিক মদের অনুরূপ। কেহ একটু বেশী অর্থাৎ অঞ্জলী পাতিয়া লইয়া আস্বাদন করিয়া তিনিও নেশায় বিভোর হইয়াছিলেন।* এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি জীবনে আর কখনও দর্শন করি নাই। রাত্রি প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত সেদিন সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে

* কেশবানন্দ অবধূত ইহা পরীক্ষা করিয়া প্রায় ১২ ঘণ্টা নেশায় বিভোর ছিলেন।

অনেকেই আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছিলেন। সে দিনের কৃপা-প্রকাশ দেখিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের রাত্রি স্মরণ হইল। জয় শ্রীশ্রীপরম-দয়াল নিত্যগোপালের জয়! জয় প্রভু জ্ঞানানন্দের জয়!! জয় পতিতপাবন নিত্যভক্তের জয়!!!

নিত্যদাসানুদাস
অন্নদানন্দ।

সাধ্বী।*

"সাধু" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "সাধ্বী" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সাধু শব্দের অভিধান-গত মৌলিক অর্থ "সভ্য" ও "সজ্জন" (১)। ক্রমে ক্রমে এই শব্দটীর যে সকল অর্থ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটী অর্থ 'বণিক' আর একটি 'কুসীদজীবী'। বর্ত্তমানকালে সাধারণ বণিক-বৃত্তি ও কুসীদ-ব্যবসায়ের অবস্থা দর্শনে কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে এই দুইটী বৃত্তির লোক কিরূপে সাধু-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন? কিন্তু যদি আমরা স্মরণ রাখি যে আর্য্য-সন্তানগণ কাল-স্রোতে ক্রমে ক্রমে যেরূপ লজ্জাকর, ঘৃণিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, ভাষাসৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহাদের সে দুর্দ্দশা ছিল না; অতি প্রাচীন কাল তো দূরের কথা কেবল সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বৈদেশিকগণের স্বহস্ত-লিখিত ভারতবাসীর চরিত্র-বর্ণনা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। তখনকারও ভারতবাসী মিথ্যা চৌর্য্য নরহত্যা কাহাকে বলে জানিত না; দ্বারে দ্বারে প্রহরী-নিবাসের আবশ্যকতা ছিল না; জিলায় জিলায় বহুসংখ্যক ধর্ম্মাধিকরণের প্রয়োজন হইত না; পতিরতিই ভারতললনার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ ছিল (২)। আর্য্য-সন্তানগণের এই দেব-চরিত্রের কথা মনে থাকিলে আমরা বুঝিতে পারি যে আর্য্য বংশের বণিককুল ও কুসীদ-ব্যবসায়িগণ প্রাচীনকালে প্রভূত ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্য-বাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। অর্থ তৎকালে ভারতবাসীর জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল না। উক্ত ব্যবসায়িগণ সর্ব্বথা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন—শাস্ত্রবিধি বিন্দুমাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতেন না। উক্ত ব্যবসায় দ্বিজসংজ্ঞক বেদজ্ঞ বৈশ্যদিগেরই বৃত্তি ছিল; তমোগুণশালী অনৃত-প্রিয় কোন হীনজাতি উক্ত ব্যবসায়ে অধিকার পাইতেন না; অর্থাভাব-গ্রস্ত জনগণের নিকট শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট-রীতি অনুসারে কুসীদগ্রহণ পূর্ব্বক অভাবের সময় ঋণদান করিয়া তাহাদের ও সমাজের প্রভূত হিত সাধন করিতেন; সুতরাং আর্য্যসমাজ তাঁহাদিগকে "সাধু" ও "মহাজন" সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। 'এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই'; আছেন কেবল বাগ্বাদিনী ব্রহ্মস্বরূপিণী 'ভাষা'; আর মা আমাদের আছেন বলিয়াই আমরা মাতার কাছে বসিয়া পূতসলিলা হিমাদ্রিনন্দিনীর তীরস্থিত পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্য-কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার অবসর পাই।

'সাধু' শব্দের প্রকৃত অর্থ যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদ্গুণশালী সজ্জন-মহাজন, তদ্রূপ ঐ সকল গুণ কোন রমণী-রত্নে দৃষ্ট হইলে তিনি "রমণী-সাধু' বা 'সাধ্বী' সংজ্ঞায় যোগ্যা হইলেও এই

* কালীচরণ দে সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। সম্পাদক।

(১) সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ'। ইত্যমর।

(২) গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিস্ কর্ত্তৃক ভারতবর্ণনা দেখুন।

...র একটু বিশেষ অর্থ আছে; যথা 'সতী', 'পতিব্রতা' (৩)। শ্রীভগবানের এই বিশ্ব-সৃষ্টির কোন বস্তু বা ব্যবস্থাই অনর্থক নহে; সবগুলিই আমাদের ক্রমোন্নতির সহায়। এই ধরাতলে মনুষ্যকুল যে মাতা, পিতা ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া বসবাস করিতেছে, ইহা কি উদ্দেশ্য-বিহীন ব্যবস্থা? কখনই নহে। এই জগৎ আমাদের জগজ্জননী আনন্দময়ী 'মহাকালীর পাঠশালা।' এ পাঠ-শালার সব ব্যবস্থা গুলিই আমাদের শিক্ষার বিধান-কল্পে ব্যবস্থিত। সুতরাং কোনটিই অবহেলার বিষয় নহে। পরম জনক জগদীশ্বর তাঁহার জীব-সন্তানগুলির জন্য এ জগতে যত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারই কৃপায় জীবহৃদয়ে সেই তত্ত্বের যতটুকু প্রতিভাত হওয়া সম্ভব তাহাতে বোধ হয় 'সেই ভাবনিধি তাঁহার জীব-সন্তানদিগকে ভাবে ভাবে ধরা দিবার জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়গুলিকে ভাবের ভাবুক করিয়া এই মহাকালীর পাঠশালায় পাঠাইয়াছেন। জীবকুল পিতা, মাতা, সখা, পুত্র, পতি, পত্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ রূপ ভাবসূত্র ধরিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিলে তবে সেই পরমজনক, পরমাজননীর 'খাসকুলেজে' ভর্ত্তি হইয়া নিজ নিজ ভাবে নিত্য সেবা-সাধনায় নিযুক্ত হইয়া ভাবসাধনার চরম সাফল্য লাভ করিতে পারেন। এই ভাবসমূহের একটির নাম 'মধুর-ভাব'; অর্থাৎ রমণী-দেহধারী কোন জীব সেই ভাবনিধিকে পতিভাবে লাভ ও সম্ভোগ করিতে বাসনা করিলে এই মহাকালীর পাঠশালায় তাঁহার পতিই তাঁহার সাধনার অবলম্বন। এই পতি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তবে সেই পরমপতি নন্দকিশোরের নিত্য ধামে নিত্য-মধুর-প্রেমের নিত্য-নব-আস্বাদনে পরম প্রীতিলাভে সমর্থা হয়েন। এই সাধনায় শ্রীভগবান বা তৎসদৃশ তদীয় সাধু মহাজনের শ্রীমুখ নিসৃত শাস্ত্রবিধিই একমাত্র পথ। সেই পথের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সাধনায় কৃত সংকল্পা সাধিকার নামই 'সাধ্বী'।

জীব-হৃদয়ের উচ্ছৃঙ্খলতার দমন করিয়া উহাকে অধীনতা শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্রীয় বিধির সৃষ্টি। শাস্ত্রীয় বিধিগুলি শ্রীভগবান নহে—শ্রীভগবান-লাভের সহায় মাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও উহা উপেক্ষার বিষয় নহে; উপেক্ষায় জীবহৃদয়ে মোহ-সম্ভূত অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইয়া জীব উদ্দেশ্য-লাভে বঞ্চিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন "ধানের খোসায় গাছ হয় না সত্য বটে, কিন্তু পুতিবার সময় খোসাটি সমেত না পুতিলে গাছ হয় না।" আমাদের ঠাকুর শ্রীমুখে শাস্ত্র-বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিতেন "জ্ঞানেন জ্ঞেয়ম লোক্য পশ্চাৎ জ্ঞানম্ (অপি) পরিত্যজেৎ।" "জ্ঞানযোগে হেরি তাঁরে ছাড় ভাই জ্ঞান।" অতএব সাধনামার্গে শাস্ত্রীয় বিধিই সর্ব্বথা সম্যক পালনীয়। এই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পতিই রমণীর একমাত্র দেবতা। একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই ললনাকুল ধর্ম্ম-জগতে বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারেন। পতি-সেবাই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত—একমাত্র তপস্যা—একমাত্র সাধন।

ধর্ম্মশাস্ত্র অপৌরুষেয় ও পরমউদার। করুণ-হৃদয় জনকের ন্যায় জীব-সন্তানকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের বিধি প্রদর্শন পূর্ব্বক উহাদিগকে ধীরে ধীরে নিত্যানন্দধামে আনিবার চেষ্টাই ধর্ম্মশাস্ত্র-নিচয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী সাধক বেশ জানেন অধীনতা-শিক্ষাই সাধনার এক প্রধান উদ্দেশ্য—

(৩) 'সতী সাধ্বী পতিব্রতা'। ইত্যমরঃ।

জৈব-অহংকার-নাশের একমাত্র উপায়। এই জৈব অহঙ্কারই জীবের ভগবৎ-বিস্মৃতির একমাত্র হেতু। সেই অহঙ্কার রূপ মত্ত হস্তীর মস্তকে অঙ্কুশের আঘাত করিয়া উহাকে সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জীব আবার সেই নিত্যধামের হারাণ পথটী প্রাপ্ত হয়। জীবকে এই সেবানন্দ শিক্ষা দিবার জন্যই দীনাবতার খৃষ্টদেব স্বহস্তে শিষ্যবর্গের পদধৌত করিয়া দিয়াছিলেন; পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বহস্তে ব্রাহ্মণ-সাধারণের পাদধৌতের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন; পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণের জন্য জীবগণকে অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন; তাই বুঝি ভক্তচূড়ামণি মহাত্মা তুলসীদাস উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন :—

> অধীন হইয়ে সাচ কহিয়ে ছোড় দিজিয়ে
> পরধন কি আশ্।
> ইস্মে যব্ হরি নেই মিলে তো জামিন্
> তুলসী দাস॥

যে স্থলে প্রীতির অভাব সেই স্থলেই অধীনতায় কষ্টবোধ, সেবায় দুঃখবোধ; অন্যথা প্রীতি স্থলে, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমের পরিণতি-বিশেষ ভাবান্তর-সমূহস্থলে, অধীনতায় কি আনন্দ, সেবায় কত মধুরতা তাহা পুত্র-সেবাপরা জননী, পতিপত্নীসেবানিষ্ঠ প্রেমিক দম্পতিযুগল অনুভব করিয়া থাকেন; আর সেই সেবা-সুখের পূর্ণ অভিব্যক্তি শিবাবতার শ্রীহনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-যুগল-সেবায়, ভক্তবর শ্রীগরুড়দেবের শ্রীনারায়ণসেবায় এবং মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীমদন-মোহনের শ্রীবৃন্দাবনলীলার মানভঞ্জন-খেলায় তাহার পূর্ণতম বিকাশ।

অতএব শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে সন্তানের পক্ষে জনক-জননী-সেবা, পত্নীর পক্ষে স্বামীসেবাই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র সোপান। গার্হস্থ্যধর্ম্ম-নির্দ্দেশে শাস্ত্র বলেন :—

> গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
> পতিরেবগুরুস্ত্রীনাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥
> দ্বিজগণগুরু হন দেব বৈশ্বানর।
> ব্রাহ্মণ-বর্ণের গুরু ভুবন-ভিতর॥
> রমণী জাতির গুরু একমাত্র পতি।
> গুরুভাবে সকলেই পূজিবে অতিথি॥

সুতরাং এই সাধনায় নিযুক্ত সাধক সাধিকার অন্য কোন ব্রত নাই, তপস্যা নাই; অপর কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা হয় না। এই সাধনায় ধর্ম্ম-জগতে কত শক্তি সঞ্চয় হয় তাহা শ্রীমহাভারতে পিতৃভক্ত পুত্র, পতিব্রতা ও ধর্ম্মব্যাধ উপাখ্যানে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। দৃষ্টিনিক্ষেপে 'বকভস্ম' করিবার অথবা অন্তর্য্যামী হইবার শক্তিও উক্ত পুত্র ও সাধ্বীর নিকট অনায়াসলভ্য সুতরাং তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আবার এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রীসাবিত্রীদেবী যমরাজকেও স্তম্ভিত করিয়া যমভবন হইতে পতিকে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এই তপস্যার প্রভাবেই পরংব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীতারাদেবীর অভিশাপে সীতাশোকে হাহাকার করিতে হইয়াছিল; এই সতীর প্রভাবেই শ্রীমধুসূদন গণ্ডকীশৈলে অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীনারায়ণ-শিলারূপে ভীষণ কীট-দংশন-যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াছেন।

এই পরম পবিত্র সতীধর্ম্মব্রত কিরূপে উদ্‌যাপন করিতে হয় তাহা নলরাজ-পত্নী দময়ন্তী ও শ্রীবৎসপত্নী চিন্তাদেবী প্রভৃতি নারীগণ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন; আবার সতীত্বের অবতার শ্রীবিষ্ণুবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মী দেবী শ্রীসীতাদেহে এবং ভিখারী ভোলানাথ-গৃহিণী দক্ষনন্দিনী জগদম্বা শ্রীগৌরীমূর্ত্তি পরিগ্রহ

করিয়া এই পাতিব্রত্যযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান করিয়াছেন। জনক-তনয়া মাতা জানকী রাজার কন্যা, রাজার বধূ, ও রাজার ভার্য্যা হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্য, পরম উপাদেয় রাজভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, জটাবল্কল-ধারী বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের অনুসরণ করত, ভীষণ বনবাস-ক্লেশ সহ্য পূর্ব্বক জগৎবাসী রমণীকুলকে পতিব্রতার কর্ত্তব্যজ্ঞাপন করিয়াছেন; দয়ার ঠাকুর প্রাণপ্রিয়তম পতি-দেবতার হস্তে কঠোর হইতে কঠোরতম যাতনা প্রাপ্ত হইয়াও হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে সেই পরমদেবের শ্রীপাদপদ্ম-পূজায় ক্ষণমাত্রও বিরত না হইয়া জগতে 'পতিব্রত' শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন; আবার করুণাময়ী মা কাত্যায়নী দক্ষযজ্ঞে পতির অবমাননা ও পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষযজ্ঞকে 'পতিব্রতযজ্ঞে' পরিণত করিয়া উহাতে পূর্ণাহুতি দান করতঃ জগৎকে যেন তারস্বরে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন "হে নারীদেহধারী জীবকুল! যদি শিব-সোহাগিনী হইবার বাসনা থাকে, যদি রসিক-শেখরের পরম পবিত্র প্রাণারাম বিশুদ্ধ রসে রসিকা হইতে চাও তবে আমার দৃষ্টান্তে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় স্বীয় পতিচরণে দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অকপটে পতি দেবতার সেবা-সাধনার অভ্যাস কর, তাহা হইলেই তোমাদের সদ্গতি লাভ হইবে এবং স্বীয় স্বীয় অন্তরের ভাবনা অনুসারে পরিশেষে সেই জগৎ-পতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইবে; তখন পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধনে অধিকার লাভ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার সেবিকাদলভুক্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য পরাশান্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে।"

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-স্তোত্র

ওঁ—ওঁকার মধ্যেতে রূপ দিব্য অন্তর্য্যামী।
ন—নরোত্তম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তুমি॥
মো—মোহিত মায়ার ঘোরে আমি তুচ্ছনর।
ভ—ভক্তি দিয়ে ভগবান উদ্ধার পামর॥
গ—গতি নাই তোমা বিনা ওহে শ্রীগোবিন্দ।
ব—বলেছে বেদেতে তোমা সৎচিদানন্দ॥
তে—তেকারণে বলি প্রভু অনাথের নাথ।
নি—নিজগুণে কৃপাকরি কর আত্মসাৎ॥
ত্য—ত্যজিয়া অসার কথা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
গো—"গোবিন্দ" "গোবিন্দ" যেন বলে এ রসনা।
পা—পারের কাণ্ডারী তুমি এ ভবসাগরে।
লা—লাজ-ভয়ে রক্ষ সদা আশ্রিত দাসেরে॥
য়—যমভয়নাশী তুমি অনাদি ঈশ্বর।
স—সরূপে গোকুলানন্দ রসিক-শেখর॥
ভ—ভজন-সাধনহীন আমি দুরাচার।
ক—করুণা বিতরি দাও সেবা-অধিকার॥
তা—তারক-ব্রহ্ম হরিনামে নিষ্ঠা যেন রয়।
য়—যত কিছু কুবাসনা সব দূর হয়॥
ন—নমামি শ্রীরাধানাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মো—মোর এই চিরসাধ করহে পূরণ॥
ন—নয়ন ভরিয়া যেন ওরূপ নেহারি।
ম—মদন-মোহন বামে নবীনা কিশোরী॥
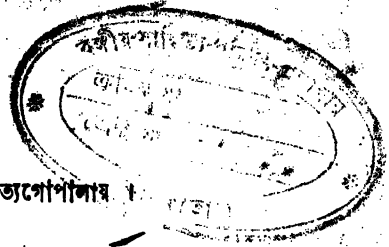
নিত্যদাস শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, ভাদ্র। { ৮ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

অবতার-তত্ত্ব।

প্রথম প্রসঙ্গ।

লূতা যেমন নিজ তন্তু অবলম্বনে নিজ-ইচ্ছানুসারে কখন অধোদিকে অবতরণ করে এবং কখন ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে, সে নিজ ইচ্ছানুসারে অধোগমন কর্ম্মও করে, সে নিজ-ইচ্ছানুসারে ঊর্দ্ধগমন কর্ম্মও করে, ঐ প্রকার নিজ-ইচ্ছানুসারে পরমেশ্বর কখন অবনীতে অবতরণ করেন এবং কখনও বা স্বধামে আরোহণ করেন। ১।

পরমেশ্বর লীলাসূত্র যোগমায়ানাম্নী লুপ্তা-তন্তু অবলম্বনে কখন স্বধাম হইতে মর্ত্তে অবতরণ এবং কখনও বা মর্ত্ত হইতে স্বধামে আরোহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা এবং কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতির মতে পরমেশ্বর মর্ত্তে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; তাঁহার বহু অবতরণ দ্বারা বুঝিতে হইবে তাঁহার বহু আরোহণ হইয়া থাকে। ২।

যাঁহার প্রতি ভক্তি আছে তাঁহার নিকট অতি সতর্কভাবে, অতি সঙ্কোচিতভাবে বাস করা হয়। তাঁহার নিকট থাকিতে হইলে নির্ভয়ে থাকা যায় না, সদাই অপরাধের ভয় হয়। সেইজন্য মনে বেশ স্ফূর্ত্তিও থাকে না। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি কোন গুরুজনের নিকটে থাকিতে হইলেই কত ভয়ে, কত সঙ্কোচিতভাবে, কত সতর্কভাবে থাকিতে হয়। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন অপেক্ষা পরমেশ্বর কত শ্রেষ্ঠ, কত মহান। তিনি যদি নিজ দিব্যরূপে তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিকাশ পূর্ব্বক তোমাদের কাছে বাস করেন, তাহা হইলে তোমাদের কত ভয়েই থাকিতে হয়; তাহা হইলে তোমাদের কত সঙ্কোচভাবেই থাকিতে হয়; তাহা হইলে তোমাদের কত সতর্কভাবেই থাকিতে হয়। সেই জন্যই তিনি তোমাদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া, তোমাদের মতন হইয়া, তোমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বাস করেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন তাঁহারাও সকল সময়ে তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব দেখিতে পান না। তাঁহারাও অনেক সময়ে তাঁহার মানব ভাবই দর্শন করিয়া থাকেন; অনেক সময়ে তাঁহার মানব ভাব বলিয়া বোধ হয়। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে তাঁহারা সেই মহান পরমেশ্বরের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবেন ভাবিয়াই অনেক সময়ে অস্থির হইতেন এবং ভয়, সঙ্কোচ ও সতর্কতা সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যে বিরাজ করিত। ৩।

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য হরি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্রতি যে ভক্তের বাৎসল্য-ভাব তিনি তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন পান করিবার জন্য, তাঁহার প্রতি যাঁহার মাতৃভাব তাঁহাকে স্তন দিবার জন্য মানবীর আকার ধারণ করেন অথবা তিনি কোন শুদ্ধ ভক্তিমতী স্ত্রীতে আবির্ভূত হইয়া মাতার কার্য্য করেন। ৪।

প্রত্যেক অবতারই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ। পূর্ব্বদিক হইতে সূর্য্যের উদয় হয়। প্রত্যেক অবতার-সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়াছিলেন। যিশু-সূর্য্যের উদয়ও পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল। ৫।

যিনি সত্যযুগের আদি অবতার তিনিই অন্যান্য যুগের সমস্ত অবতার। ৬।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারিযুগেই অবতীর্ণ হন। কেবল তিনি দ্বাপরেই অবতীর্ণ হন এরূপ কোন নির্দ্দেশ ঐ গ্রন্থে নাই। আর তিনি বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্তর্গতও নন। ৭।

ঈশ্বর রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ অবতারে ক্ষত্রিয় হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতিও হইতে পারেন। ৮।

ভগবান রাম ও কৃষ্ণ অবতারে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। সেই ক্ষত্রিয় রাম-কৃষ্ণের প্রসাদ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীও ভক্ষণ করেন। তাঁহারা গোপী শ্রীরাধার প্রসাদ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেন। সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন আপত্তি নাই, বরঞ্চ বিশেষ বিধিই আছে। শাস্ত্রানুসারে ভগবান ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ হইলেও তাঁহার প্রসাদ বিশেষ ভক্তি-সহকারে শুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত সদ্-ব্রাহ্মণেরও খাওয়া উচিত। ৯।

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর জগতে ধর্ম্মসংস্থাপন এবং ধর্ম্মসংরক্ষণার্থে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই জন্যই চৈতন্য অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জগতে বৈরাগ্য, পরাভক্তি, পরমপ্রেম, দীনতা, বিনয় এবং দয়ার অত্যন্ত অভাব হইলে চৈতন্য ঐ সকল নিজ চরিত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতে ঐ সমস্ত সঞ্চারিত করিবার জন্যও পরমেশ্বর চৈতন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১০।

ভক্ত-চরিত্র দেখাইতে হইলে ভক্তের ন্যায় কার্য্য সকলও করিতে হয়; তাহা হইলে নিজ চরিত্রে ভক্তের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশেরও প্রয়োজন! যদিও চৈতন্য পরমেশ্বর, তথাপি তিনি যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার আপনাকে ভক্তরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল; তাঁহার আপনাকে বৈরাগীরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আপনাকে দীনরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আপনাকে বিনয়ীরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আপনাকে দয়ালুরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা ভক্তি কি তাহা বোঝান যায় না, কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা প্রেম কি তাহা বোঝান যায় না; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা বৈরাগ্য কি তাহা বোঝান যায় না; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা দীনতা কি তাহা বোঝান যায় না, কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা বিনয় কি তাহা বোঝান যায় না; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা দয়া কি তাহা বোঝান যায় না। ঐ সমস্ত কোন ব্যক্তির চরিত্রে বিকাশিত হইলে ঐ সমস্ত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়; সেই জন্যই জীব-শিক্ষার্থে চৈতন্য-চরিত্রে ঐ সমস্ত বিকশিত হইত। তাঁহার কৃপায় যাঁহারা তাঁহার ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, দীনতা, বিনয় এবং দয়ার অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপায় তাঁহাদের সংস্রবে আবার কতকগুলি লোক কতক পরিমাণে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ প্রকারে শ্রীচৈতন্য-কৃপায় বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, দীনতা, বিনয় এবং দয়া প্রভৃতি কত দেশ-দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ঐ সকলের প্রবলপ্রতাপে কত পাষণ্ড দলনই হইয়াছিল এবং অদ্যাপি অপ্রতিহত-প্রভাবে হইতেছে। ১১।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই রাম-কৃষ্ণ। রাম-কৃষ্ণ নাম তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। তাঁহার আনন্দ-মূর্চ্ছার সময় রামকৃষ্ণ বলা হইত।

"প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যে মতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ রামকৃষ্ণ বলে॥" ১২।

নারিকেল নিজেই বীজ। নারিকেলের স্বতন্ত্র কোন বীজ নাই। চৈতন্য নিজেই বীজ। চৈতন্যের স্বতন্ত্র কোন বীজ নাই। ১৩

চৈতন্য-সূর্য্য উদিত না হইলে কামরূপ ধ্বান্ত ধ্বংস হয় না। ১৪

কাহারও মূর্চ্ছা হইলে জল দিয়াই তাঁহাকে চেতন করা হয়। চৈতন্যের কমণ্ডলুতে ভক্তিরূপ বারি আছে। অভক্তি-মূর্চ্ছিত জীবের অঙ্গে তাহা সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে সচৈতন্য করেন। ১৫।

একই চৈতন্য নানা ভক্তের মধ্য দিয়া নানা প্রকার কার্য্য করাইয়া থাকেন। তিনি কোন কোন শুদ্ধভক্তে প্রকাশিতও হইয়া থাকেন। ১৬।

জীবে চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে তিনি

ভক্ত হইতে পারেন না। চৈতন্যের আবির্ভাব ভক্ততেই হইয়া থাকে। ১৭।

জর্দ্দন-জলে ঈশার অভিষেকের সময় ঈশাতে কপোতরূপী পবিত্রাত্মার (হোলি গোষ্টের) আবির্ভাব হইয়াছিল। বাইবেল-মতে পবিত্রাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন প্রভেদ নাই। ঈশাতে যে প্রকারে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল শ্রীনিবাস আচার্য্যে সেই প্রকারেই ভগবান চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ঈশাতে পবিত্রআত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ঈশাকেও ঈশ্বর বলা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যে ভগবান চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকেও ভগবান চৈতন্যদেব বলা যায়। ১৮।

শিবের 'হুং' বীজ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাভাবাবেশে যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন তখন হুঙ্কার করিতেন। ১৯।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দেশব্যাপী সংকীর্ত্তনে মহাভাবাবেশে সর্ব্বদাই "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেন। যেমন কাশীর মণি-কর্ণিকার ঘাটে গুরু রামানন্দ "রাম কহ, রাম কহ" বলাতে কবির-জীর 'মন্ত্র' হইয়াছিল তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের মুখবিনির্গত 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দে সর্ব্বজীবের 'মন্ত্র' হইত এবং তাহারা উদ্ধার হইয়া ভক্ত হইত। ১৯।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে অনেক শিব দর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য চৈতন্য-সম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ণবেরই শিবদর্শনে বিরত হওয়া উচিত নয়। ২১।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-ভগবান যে কারণে ভক্তাবতার হইয়াছিলেন, ভগবান শিব মহেশ্বরও সেই কারণে মহাযোগী হইয়াছিলেন। ২২

নবদ্বীপে দণ্ডায়মান হইয়া এক গগনচন্দ্রকেই নবদ্বীপচন্দ্র, ভারতচন্দ্র এবং জগচ্চন্দ্র বলিতে পার। নবদ্বীপের চৈতন্য বলিলেও দোষ হয় না, ভারতের চৈতন্য বলিলেও দোষ হয় না এবং জগতের চৈতন্য বলিলেও দোষ হয় না। ২৩।

মহাসাগরও তৃষ্ণার্ত্তের আলয়ে যায় না। চৈতন্য-সাগরে যে প্রেমবারি আছে সেই প্রেমবারির পিপাসা হইলে চৈতন্য সাগর তোমার-মধ্যেপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ২৪।

যাঁহারা রাধাতন্ত্র, গোপালতন্ত্র এবং নারদ-পঞ্চরাত্র অনুসরণ করেন তাঁহারা বৈষ্ণব-তান্ত্রিক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদেশ-ক্রমে যাঁহারা রাধাতন্ত্রোক্ত মহামন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই বৈষ্ণব-তান্ত্রিক বলা যায়। ২৫।

চৈতন্যদেব দণ্ডী হইলেও তাঁহাতে বৈষ্ণবতা ছিল। প্রকৃত মহাপুরুষ শাক্তও বটেন, শৈব ও বটেন, বৈষ্ণবও বটেন, গাণপতও বটেন, সৌর ও বটেন। উদার মহাপুরুষের কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই বিদ্বেষ নাই। বিষ্ণু-পুরাণে ঈশ্বরকেই মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। ২৬।

শচীসুত বিশ্বম্ভর দণ্ডী হইয়াছিলেন। সে জন্যও শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে নারায়ণ বলা যায়। ২৭।

চৈতন্য-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে চৈতন্যকেও বিষ্ণুর অবতার বলা যায়। চৈতন্য-ভাগবতে এবং চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যের অনেক অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ আছে। ২৮।

চৈতন্য-অবতারে রাধাকৃষ্ণ একীভূত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহাতে প্রকৃতি রাধার স্বভাব ও পুরুষ কৃষ্ণের স্বভাব ছিল। সেইজন্য তিনি পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ছিলেন। ২৯।

শক্তিই সমস্ত সহ্য করিয়া থাকেন। সেই জন্য চৈতন্যের উপরে রাধাশক্তি বিরাজিত।

চৈতন্য মহাভাবে ভূপতিত হইলে সেই রাধা-শক্তিই দৈহিক কষ্ট সহ্য করিতেন। ৩০।

সকল জীব চৈতন্যদাস্য স্বীকার না করি-লেও সকল জীবই চৈতন্য-দাস। ৩১।

চৈতন্য-প্রভাবে সমস্ত কার্য্যই সম্পাদিত হয়। চৈতন্য তাঁহার দাস-জীবকে যেরূপ করান সে সেইরূপই করে; সেই জন্য চৈতন্যকে মহাপ্রভু বলা যায়। ৩ ।

চৈতন্য মহাপ্রভু। কারণ চৈতন্য ব্যতীত দশেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং স্থূল দেহ কার্য্য করিতে পারে না। সেই জন্য চৈতন্য উহা-দের মহাপ্রভু, উহারা দাস; চৈতন্য উহাদের যেমন করান উহারা তেমনই করে। উহারা সম্পূর্ণ চৈতন্যের অধীন। ৩৩।

ভক্তের পক্ষে মানব-প্রভু সামান্য প্রভু। ভক্তের পক্ষে চৈতন্য কেবল ভক্তের মহাপ্রভু নহেন। চৈতন্য সকলজীব জন্তুরই মহা প্রভু। অথচ তাহারা তাহা জানেনা। ৩৪।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

গুরু শব্দের 'গ'তেও হ্রস্বউকার যুক্ত আছে, 'র'তেও হ্রস্বউকার যুক্ত আছে; কিন্তু যুক্ত হ্রস্বউকারের সহিত অযুক্ত হ্রস্বউকারের কতই প্রভেদ! উভয় হ্রস্বউকার দেখিলে এক বস্তু বলিয়াও বোধ হয় না। পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতারগণ একই পদার্থ। অথচ সকলের রূপ দেখিলে এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। ১।

এক ব্যক্তি মূর্খ যুক্ত এবং অযুক্ত হ্রস্বউকার দেখিলে উভয়ই যে এক পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে না। পরমেশ্বর এবং তাঁহার পূর্ণ অব-তারগণ একই পদার্থ পরমা বিদ্যা দ্বারাই বোঝা যায়। অবিদ্যা দ্বারা বোঝা যায় না। ২।

নানা শাস্ত্রানুসারে জানা যায় পরমেশ্বরের অসংখ্য অবতার। সেই অসংখ্য অবতারের মধ্যে ভবিষ্যতে যে সকল অবতার হইবেন অবতারের শাস্ত্রীয় লক্ষণ সকল অনুসারেই তাঁহাদের চিনিতে হইবে। ৩।

ভবিষ্যতে দশ অবতার ব্যতীত অন্য অব-তারকে যদি অস্বীকার, অশ্রদ্ধা কিংবা অভক্তি করা হয় সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে, মৎস্য-পুরাণে, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পরমেশ্বরের অসংখ্য অবতার বলা হইয়াছে। সেই অসংখ্য অবতারের মধ্যে অবতার বুঝি-বার সহায়তার জন্য দশ অবতারের স্বভাব-চরিত্র এবং তাঁহাদের নানা প্রকার গুণকর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। ৪।

শ্রীমদ্ভাগবত, মৎস্য-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে পরমেশ্বরের অসংখ্য অবতার। অসংখ্য অবতারের স্বভাব-চরিত্র এবং গুণকর্ম্ম সকল কোন সীমাবিশিষ্ট গ্রন্থেই বর্ণিত হইতে পারে না। সেই জন্যই ঐ সকল গ্রন্থে অসংখ্য অবতারের স্বভাবচরিত্র এবং গুণকর্ম্ম সকলের বর্ণনার প্রয়াস পাওয়া হয় নাই। অসংখ্য অবতারের স্বভাব চরিত্র ও গুণ-কর্ম্ম সকল রাশি রাশি গ্রন্থে লিখিত হই-লেও সে সমস্ত সমাপ্ত হইবার নহে। সেই-জন্যও সে সমস্ত বর্ণনায় রত হওয়া হয় নাই। ৫।

অসংখ্য অবতারের স্বভাব-চরিত্র-গুণকর্ম্ম-সকলের বর্ণনায় প্রবৃত্তি এক প্রকার বাতুলতা। সেই জন্যই বেদব্যাসের ঐ প্রকার প্রবৃত্তি না হওয়া সঙ্গত ও হইয়াছিল বটে। কারণ তিনি ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। তাঁহার অস-ম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্তি না হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে। ৬।

দ্বাপরে কৃষ্ণ, বলরাম ও বেদব্যাস এই

তিন জনই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনজনই বিষ্ণুর অবতার। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম। শঙ্কর-দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থমতে শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বাড়াইয়াছেন। তিনি বেদব্যাসকে অদ্ভুত-কৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিয়াছেন। বেদ-ব্যাস অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বপ্রমাণ কিছু নাই। অনেকেই বলেন বলরাম বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার। উক্ত প্রমাণানুসারে এক সময়ে, এক যুগে বিষ্ণুর একাধিক অবতার হইতে পারে। এই কলিতে তিনি চৈতন্য-অবতার হইয়াছিলেন। চৈতন্য-অবতারে তিনি বলিয়াছিলেন আরও দুইবার এই কলিতে অবতীর্ণ হইবেন। চৈতন্য-ভাগবতানুসারে শ্রীচৈতন্যের আরও দুইবার এই কলিতে অবতীর্ণ হইবার কথা আছে। ৭।

মহাভাবময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দশ প্রকার দশা হইত সেই জন্য তাঁহাকেই দশাব-তার বলা যাইতে পারে। অগ্নিপুরাণের দশাব-তার এবং মৎস্যাদি অবতারগণের লক্ষণ বলা হইতেছে,—

"দশাবতার-মৎস্যাদি-লক্ষণং প্রবদামিতে।
মৎস্যাকারশ্চ মৎস্যঃ স্যাৎ কূর্ম্মঃ
কূর্ম্মাকৃতিস্তথা।
নরাহো বাথ কর্ত্তব্যো নৃবরাহো গদাদিভৃৎ।
দক্ষিণে বামকে খড়্গং লক্ষ্মীং বা পদ্মমেববা॥
শ্রীর্বামকুর্পরস্থা তু ক্ষ্মানন্তৌ চরণাযুধোঃ।
নরসিংহো বিবৃত্তাস্যো বামোরুধৃত-দানবঃ;
তদ্বক্ষোদারণাস্মালী স্ফূর্জচ্চক্রগদাধরঃ।
ছত্রী দণ্ডীবামনং স্যাদথ বাস্যাচ্চতুর্ভুজঃ॥
রামশ্চাপেষু হস্তঃ স্যাৎখড়্গী পরশুনান্বিতঃ।
রামশ্চাপি শরী খড়্গী শঙ্খী বা দ্বিভুজঃ স্মৃতঃ॥
গদালাঙ্গলধারী চ রামো বাথ চতুর্ভুজঃ।
বামোর্দ্ধে লাঙ্গলং দধ্যাদধঃ শঙ্খং সুশোভনং॥
মুষলং দক্ষিণোর্দ্ধে তু চক্রংবাধঃ সুশোভনং।
শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।
ঊর্দ্ধ-পদ্মস্থিতো বুদ্ধো বরাভয়-প্রদায়কঃ।
ধনুর্ব্বাণান্বিতঃ কল্কীম্লেচ্ছোৎসাদকরোদ্বিজঃ॥ ৮"

বলরামের হস্তে গদা, লাঙ্গল এবং চক্র আছে। বলরাম অনেক যুদ্ধও করিয়াছেন। বলরাম অনেক সময়েই কাদম্বরী-পানে মত্ত থাকিতেন। সেই জন্য বলরামকে শান্তাত্মা বলা যায় না। তিনি অনেক সময়েই বরঞ্চ অশান্তভাবেই থাকিতেন। বলরামকে গৌরাঙ্গও বলা যায় না। কারণ কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রেই বলরামকে গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট বলা হয় নাই। অনেক শাস্ত্রেই বলরামের শ্বেতবর্ণই ছিল বলা হইয়াছে। সেইজন্যই "শান্তাত্মালম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ" বলরামকে বলা যায় না।৯

অগ্নি-পুরাণে গদালাঙ্গলধারী চতুর্ভুজ রামাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবতারের উল্লেখ আছে। ১০।

অগ্নি পুরাণের মতেও গৌরাঙ্গ এক অব-তার। অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে "শান্তাত্মা-লম্ব-কণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ"। ১১।

গৌরাঙ্গ অবতারের যত প্রমাণ আছে তত প্রমাণ কোন অবতারের নাই। অনন্ত-সংহিতামতে গৌরাঙ্গ অবতার। সাধনোল্লাস-তন্ত্রমতে গৌরাঙ্গ অবতার। অগ্নিপুরাণ মতে গৌরাঙ্গ অবতার। কৃষ্ণযামল মতে গৌরাঙ্গ অবতার। ব্রহ্মযামল-মতে গৌরাঙ্গ অবতার। বৃহন্নারদীয়-পুরাণ-মতে গৌরাঙ্গ অবতার। ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতা-মতে গৌরাঙ্গ অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতমতে গৌরাঙ্গ অবতার। বিশ্বসার-তন্ত্রমতে গৌরাঙ্গ অবতার। বায়ুপুরাণ-মতে গৌরাঙ্গ অবতার। কাপিলতন্ত্র-মতে গৌরাঙ্গ অবতার। ১২।

আহা সাধনোল্লাসতন্ত্রের কি উদার মত;

সাধনোল্লাসতন্ত্রমতে কালী, তারা, ত্রিপুরা-মহাদেবী, রাধা, কৃষ্ণ এবং শচীসুত শ্রীগৌরাঙ্গ অভেদ। সে তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"যা কালীসৈব তারাস্যাৎ যা তারাত্রিপুরাহি সা।
ত্রিপুরাযা মহাদেবীসৈব রাধা নসংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচী-সুতঃ" ॥ ১৩ ॥

কালী বরাভয় প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহাকে বরদা এবং অভয়া বলা হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বরাভয় প্রদান করিয়া থাকেন। উর্দ্ধাম্নায়সংহিতায় ব্যাস বলিয়াছেন,—

"দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং বরাভয়-করন্তথা।"
প্রেমালিঙ্গন-সম্বদ্ধং গৃহ্নন্তং হরিনামকং ॥ ১৪।

একসঙ্গে একব্যক্তির পুরুষ প্রকৃতির স্বভাব থাকিতে পারে না। চৈতন্যের তাহা ছিল। সেইজন্যই চৈতন্যকে পরমেশ্বরের অবতার বলা যায়। ১৫।

চৈতন্যে রাধার সমস্ত ভাবও ছিল, কৃষ্ণের সমস্ত ভাব ও ছিল। অতএব চৈতন্য রাধা-কৃষ্ণের অবতার। ১৬।

শ্রীকৃষ্ণ দশ অবতারের অন্তর্গত নহেন বলিয়া তাঁহাকে ত পরমেশ্বরের অ-অবতার বলা হয় না। চৈতন্যের নাম দশ অবতারের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া চৈতন্যকেই বা অ-অবতার বলিবে কেন? যে সকল লক্ষণ থাকার জন্য পরমেশ্বরের অবতার বলা হয় চৈতন্য মহাপ্রভুতেও সেই সকল লক্ষণ ছিল। সেই জন্য তাঁহাকেও পরমেশ্বরীয় অবতার বলা যায়। ১৭।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে কৃষ্ণ মহাবিষ্ণুর অবতার ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে মহাবিষ্ণু সেইশ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের মতে বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের অপর এক অংশ। ১৮।

কৃষ্ণ দশ অবতারের অন্তর্গত এক অবতার নহেন। মহাপ্রভু চৈতন্য সেই কৃষ্ণের অবতার; সুতরাং তাঁহাকেও বিষ্ণুর অবতার বলা যাইতে পারে না। ১৯।

মহাভারত এবং জৈমিনিভারত বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সে সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায়। ২০।

চৈতন্য যে বিষ্ণুর অবতার সে সম্বন্ধেও অনেক প্রমাণ আছে। মহাভারতে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র-নাম-স্তোত্রে চৈতন্য নাম পর্য্যন্ত আছে। কলিতে বিষ্ণু সুবর্ণবর্ণে সুশোভিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচলিত করিবেন তাহা পর্য্যন্ত ভাগবতে আছে। ২১।

শ্রীচৈতন্যের জড়দেহ অভক্তেরাই প্রাকৃত দেখিত। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার জড় দেহও অপ্রাকৃত ছিল। কারণ তাঁহার লীলা সম্বরণ হইলে তাঁহার জড়দেহ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কোন কোন ভক্তের মতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সাক্ষীগোপালে লীন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন জড়দেহ প্রভু জগন্নাথ তাঁহার দেহে মিশাইয়া গিয়াছিলেন। ২২।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কেবল পুরুষের স্বভাব ছিল না। তাঁহার পুরুষপ্রকৃতির স্বভাব ছিল। ২৩।

চৈতন্যই পুরুষ। চৈতন্যই প্রকৃতি। চৈতন্যই পুরুষ-কৃষ্ণ। চৈতন্যই প্রকৃতি-রাধা। চৈতন্যই শক্তি। চৈতন্যই শক্তিমান। ২৪।

চৈতন্য কামকামিনীর সঙ্গে লিপ্ত নন্। কামকামিনীতে তাঁহার বীতরাগ। তিনি নির্লিপ্ত এবং উদাসীন। ২৫।

চৈতন্যদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে চৈতন্য আছেন যিনি বিশ্বাস করেন, ব্যাসদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যাসদেব আছেন যিনি বিশ্বাস করেন তিনি তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁহাদের দর্শন করিয়াই

বিশ্বাস করেন। চকমকীর পাথরে আগুন আছে যাহারা জানে তাহারাই চকমকীর পাথরে আগুন আছে বিশ্বাস করে। ২৬।

সাধারণ এক ব্যক্তির পাপ অপর সাধারণ এক ব্যক্তি লইতে পারে না। কিন্তু জগাইয়ের পাপ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব লইতে পারেন। ২৭।

যে শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয় সেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধ-মানসে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে কত বৈষ্ণব গ্রন্থে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলা হয়, সেই কৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণব দুর্গা অথবা কালীশক্তিকে অমান্য করেন না। ২৮।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে কালীই কৃষ্ণ হইয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালী কৃষ্ণ হইবার কথা মহাভাগবতে আছে। মহাভাগবতের কৃষ্ণ, কালীর অবতার। তিনি শ্রীবিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ অথবা গোলকেশ্বর কৃষ্ণ নন্। ২৯।

মহাত্মা জয়দেবের মতে বলরামও শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দশ অবতারের মধ্যে ধরেন নাই। ৩০।

এক প্রদীপ হইতে অন্যান্য প্রদীপ জ্বালিলে সে গুলিও ইহার ন্যায় হইবে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অবতারই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন। ৩১।

পরশুরাম ও রাম উভয়ই শ্রীবিষ্ণুর অবতার। একই সময়ে বিষ্ণু রাম এবং পরশু-রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একটী জীবের দুই হইবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে একই সময়ে বহু হইতে পারেন। তিনি বাস্ত-বিক রাসে বহু হইয়াছিলেন। ৩২।

সাধারণ লোক যেভাবে স্ত্রী-সম্ভোগ করেন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে করেন নাই। তাহা করিয়া থাকিলে সে সকল ঘটনা লেখা হইত না; সে সকল ঘটনা শাস্ত্র হইত না। যাঁহারা স্ত্রীর মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই তাঁহারা অতি সমাদরে তাঁহাকে পূজা করিতেন না। তাহা হইলে তাঁহাকে অবতারও বলা হইত না। ৩৩।

রাম ও বিষ্ণুর অবতার, পরশুরামও বিষ্ণুর অবতার। সেই জন্য রাম অপেক্ষা পরশুরামকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। পরশুরামও যে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্তর্গত এক অবতার। ৩৪।

শ্রীকৃষ্ণের সকল বিকাশই শ্রীকৃষ্ণ। ৩৫।

জামলের মতে যেমন একই সময়ে দুই কৃষ্ণ প্রকাশিত ছিলেন তদ্রূপ অন্য কোন সময়ে এবং বর্ত্তমান সময়েও একই পরমেশ্বর একাধিক রূপে প্রকাশিত থাকিতে পারেন। ৩৬।

ব্যাকরণের প্রত্যেক ব্যঞ্জন-সন্ধির সূত্র অনুসারে অনেক শব্দই আছে। প্রত্যেক সূত্রে উদাহরণ দিবার সময়ে সে সমস্ত গুলিই দেওয়া হয় নাই। ভগবানের অবতার হইলে কি প্রকার স্বভাব চরিত্র হয় তাহা বুঝাইবার জন্য উদাহরণ-স্বরূপ ভগবানের কএকটী অবতারের স্বভাব, চরিত্র, গুণ এবং কর্ম্মসকল কোন কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ৩৭।

গীতার মতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বেদান্ত-প্রণেতা। তিনি স্বয়ংই গীতার ১৫শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহং"। ৩৮।

ভগবান যত অবতার হইয়াছেন, যত হইবেন তাঁহারা সকলেই তোমার পূজনীয় ও বন্দনীয়। কারণ তাঁহারা সকলেই সেই এক ভগবানের বিকাশ। ৩৯।

স্মৃতি

কেন স্বপনের মাঝে দেখা দিলে মোরে
আকুল করিতে প্রাণ।
কেন দেখা দিয়ে নিমিষের মাঝে,
তুমি হ'লে অন্তর্দ্ধান॥
কেন হেসে হেসে মনোহর বেশে,
দাঁড়ালে নিকটে আসি।
কেন বুক পেতে দিলে প্রেম-আলিঙ্গন,
হাসিলে মধুর হাসি॥

কেন শোক-সন্তাপিত হৃদয়খানিতে
বাহুতে জড়িয়ে ধরি।
বুকে টেনে নিয়ে পিরীতি-চুম্বনে
লইলে পরাণ কাড়ি।
সবই যদি ভুলি ভুলিব না সেই
তোমার করুণা-দানে।
তব চুম্বন-স্মৃতি রাখিয়াছি গাঁথি
(মম) মরমের মাঝখানে॥

শ্রীঅনন্তকুমার হালদার।

বৈরাগ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

কামই কামিনীর সহিত পুরুষের ভর্ত্তৃ-ভার্য্যা সম্বন্ধের কারণ। কামিনীই পুরুষের কামচরিতার্থ করিবার আধার বা পাত্র। বাহ্যজড়বস্তু সম্ভোগেই ইহার তৃপ্তি। আসক্তিই সম্বন্ধের কারণ। পুরুষের কামাসক্তি বা কামাত্মিক অনুরাগ দ্বারাই কামিনীর সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ বিকৃত হইলেই তদ্দ্বারা জীব সংসারাসক্ত হইয়া অতিপাতক, মহাপাতকাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এইরূপ কামাত্মক সম্বন্ধ দ্বারাই হতভাগ্য জীবের নরক প্রবেশের পথ সুগম হইয়া থাকে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণি-রত্নমালা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"দ্বারং কিমেকন্নরকস্যনারী"।

প্রঃ—নরকের একমাত্র (১) দ্বার কি?

উঃ—নারী।

যে কামিনী-সঙ্গ-সুখ লালসায় মোহান্ধজীব হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় কত

(১) একং—কেবলং—একমাত্রং; টীকাকারগণ এই স্থলে একং অর্থে "এক মাত্র" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ঠাকুরের প্রকটকালে প্রকাশিত 'মণিরত্নমালা' নামক গ্রন্থেও ঐ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরাও ঐ অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু এস্থলে "একং"—'প্রধানং' এই অর্থেই বোধ হয় শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ নারী ব্যতীতও নরকের অনেক হেতু আছে ইহাই শাস্ত্র-মত।

সম্পাদক

গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এমন কি নিজ জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না, একবার যদি স্থির-চিত্তে সেই মোহিনী নারীর দেহ বিশ্লেষ করিয়া দেখে এবং দেহান্তে শ্মশানক্ষেত্রে তাহার রূপলাবণ্যের পরিণতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখে, তাহা হইলে শিরা, মল, মূত্র, ক্লেদ, রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, পূযবিশিষ্ট পুত্তলি এবং চিতাভস্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। যাহার কুটিল-কটাক্ষ কামাসক্তজীবকুলের চিত্ত-বিকার উৎপাদন করিয়া মদনোন্মাদনায় তাঁহাদিগকে রমণ-উৎসাহী করিয়া থাকে একবার ভাবিয়া দেখে না তাহা কোন্ উপাদানে গঠিত। রমণীগণের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শনে জীবরূপ বিহগকুল প্রলোভিত এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা যে শিরা, রক্ত, পূয ও বসাদির বিকার মাত্র ক্ষণেকের তরেও তাহারা সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখে না।

দুর্ভেদ্য জটিল নারী-চরিত্র (ক) সম্যক্‌রূপে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র বাহ্য-প্রণয়-ভঙ্গিমা দর্শনে এবং রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করে সে যে মোহিনী-নারী দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হয় তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নারী নিজ-স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কুকার্য্য নাই যাহা করিতে পারেনা। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা আছে,—

"শরৎপদ্মোৎসবং বক্ত্রং বচশ্চ শ্রবণামৃতম্।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং স্ত্রীণাং কোবেদ চেষ্টিতম্।
নহিকশ্চিৎ প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা স্বাশিষাত্মনাম্।
পতিং, পুত্রং, ভ্রাতরং বা ঘ্নন্ত্যর্থে ঘাতয়ন্তি চ" ॥
৬।১৮।৪১—৪২

অর্থাৎ কামিনীগণের বদন শরৎকালীন কমলের ন্যায় মনোহর এবং বাক্য কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধারের ন্যায়—তাহাদের চেষ্টা জানিতে পারে কাহার সাধ্য? রমণীরা স্বার্থসাধনাভিলাষে আপনাদিগকে আত্মীয়ের ন্যায় দেখায় বস্তুতঃ তাহাদের কেহ প্রিয় নাই। তাহারা অর্থের জন্য পতি, পুত্র ও ভ্রাতাকেও বিনষ্ট করিতে পারে। হায়! অসংযমী হত-বুদ্ধি জীবকুল মোহবশতঃ কুহকিনী-প্রমদাচরিত্র অবগত না হইয়া রূপ-যৌবন-সম্ভোগ লালসায় কত হীনতাই না স্বীকার করিয়া থাকে, কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়া থাকে! ভুলেও একবার চেয়ে দেখেনা যে এই মায়াবিনী মোহিনীই তাহার শীতল শাণিত মারণাস্ত্র। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সেবা-পরায়ণা। এই সেবা (কোন কোন স্থলে) তাহাদের পুরুষ-বশীকরণের যন্ত্র বিশেষ হইয়া থাকে। আমি জানি, কোন অল্প-বয়স্ক যুবক ঐ বশীকরণ যন্ত্রদ্বারা এক বৃদ্ধা রমণীতে আসক্ত হইয়া অকাল-মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

(ক) বিরাগী পুরুষের পক্ষে স্ত্রীজাতি যেরূপ ঘৃণ্য, বিরাগী স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-জাতিও তুল্যরূপে ঘৃণ্য।

আমাদের বোধ হয় লেখক এই প্রবন্ধে ভগবদ্বিমুখ মোহান্ধ সাধারণ রমণীকুলকেই লক্ষ্য করিতেছেন নতুবা শ্রীভগবচ্চরণসর্ব্বস্ব, শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষ নারীদেহধারী মীরাবাই প্রমুখ ভক্তরমণীরত্ন অথবা শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীনবদ্বীপলীলা কিম্বা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যলীলার সহায়-স্বরূপা ভক্তরমণীগণ কাহারও ঘৃণারবিষয়ীভূত হইতে পারেন না।

সম্পাদক।

"যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃকূপমিবাবৃতং।"

অর্থাৎ যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়া শুশ্রূষাদিচ্ছলে ধীরে ধীরে নিকটে গমন করে, আত্মবান পুরুষ তাহাকে তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যু-স্বরূপ জানিবে। আমাদের পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—"ঘরে কাল সাপ থাক্‌লে যেমন সাবধানে থাক্‌তে হয় স্ত্রীলোকের নিকট সেইরূপ থাক্‌বে"। অনেকে প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের সহিত মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পরিশেষে দুরতিক্রম্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অবশ হইয়া ঘৃণিত পশুর ন্যায় তাহাতেই রত হইয়া থাকে। যে যোনি হইতে উদ্ভূত তাহাতেই আবার রমণ-স্পৃহা! অহো! অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কি প্রভাব! ভগবান দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—

"ত্রৈলোক্যজননী ধাত্রী সা ভগী নরকো ধ্রুবম্।
তস্যাং জাতোরতস্তত্র হাহা সংসার সংস্থিতি"॥
অবধূত গীতা।

অর্থাৎ নারী ত্রৈলোক্যজননী ও ধাত্রী, পরন্তু সে নিশ্চয়ই নরক, যাহাতে জন্ম হইয়াছে তাহাতেই রত হওয়া? হাহা! একি সংসার-সংস্থিতি!

ঐ প্রকার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের রমণী হইতে দূরে অবস্থান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি সর্ব্ব-স্ত্রী-জাতিতে কালকামিনী মহাকালীর প্রকাশ দেখিয়া থাকেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং নির্ব্বিকার হইয়াছেন, যিনি অপ্রাকৃত দিব্যমৈথুনদ্বারা আত্মারাম হইয়াছেন তাঁহারই বিকৃত জৈবমৈথুনে অরুচি হইয়াছে; সুতরাং স্ত্রীলোক-সঙ্গ তাঁহার কোন ক্ষতি বা আনন্দের কারণ হইতে পারে না। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দদেব মহারাজ বলিয়াছেন,—

"মাকেই মা বলি এবং মা বোধ করি। অপর কোন স্ত্রীলোককে মা বলি ও না, মা বোধ করি ও না। ঈশ্বরকেই ঈশ্বর বলি এবং ঈশ্বর বোধ করি। অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলি ও না এবং ঈশ্বর বোধ ও করি না। ভগবান্ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়া সকল ক্ষত্রিয়কে ভগবান্ বল না। ভগবান্ মৎস্য; কূর্ম্ম, বরাহ হইয়াছিলেন বলিয়া সকল মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহকে ভগবান্ বল না। তবে কালী স্ত্রীরূপিণী বলিয়া সকল স্ত্রীলোককেই মা কালী বলিবে কেন?" "আগে মদন ভস্ম ক'রে শিব প্রকৃতি-সঙ্গ ক'রেছিলেন। মদন ভস্ম যতদিন না হয়, ততদিন প্রকৃতি-সঙ্গ কোরনা। সাধারণের ভিতরে মদন রয়েছে, সাধারণে কোন্ সাহসে প্রকৃতি সঙ্গ করিতে সাহস পান? এই প্রকৃতির ভিতর থেকে পরমাপ্রকৃতি দেখা যায়, যদি মদন ভিতরে না থাকে"। "ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের নিকট বিশেষ সাবধানে থাক্‌বে' কারণ তাঁর ভক্তি, তোমার তাঁর প্রতি আকর্ষণের কারণ হইতে পারে"।

মহাত্মা তুকারাম বলিয়াছেন,—

"কজ্জল্‌কি ঘরমে যেত্তা সেয়ান্ হোয়ে থোড়া বুঁদ্ লাগে পর্ লাগে।
যুবতী কি সাতমে যেত্তা সিয়ান্ হোয়ে থোড়া কাম্ জাগে পর্ জাগে॥"

অর্থাৎ কালির ঘরে যত কেন সাবধান থাক না গায়ে দাগ লাগ্‌বেই লাগ্‌বে। যুবতীর কাছে যতই কেন সাবধান থাক না কিছু কাম জাগ্‌বেই জাগ্‌বে।

মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—

"মেয়েমানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয় তবুও কোন মতে তাকে বিশ্বাস করবে না"।

প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—
"কল্পয়িত্বাত্মনাযাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।
দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততোহস্য বিপর্য্যয়ঃ॥
এতৎসর্ব্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি॥

৭।১২।১০—১১

অর্থাৎ যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন ততদিন ভেদজ্ঞান (স্ত্রী ও পুরুষে ভেদজ্ঞান) করিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়। ভোক্তা ও ভোগ্য-এই ভেদজ্ঞান থাকে ত স্ত্রী-সঙ্গ-পরিহার কর্ত্তব্য। এ সকল ধর্ম্ম গৃহস্থ এবং যতির পক্ষেও জানিবে।

অহঙ্কার-প্রসূত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অনেক সময় সংসার-পাশের কারণ হইয়া থাকে। অকর্ত্তা হইয়া কর্ত্তা বোধ করা-এটী মোহিনীমায়ার কর্ম্ম-কুশলতা এবং বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বটে। শৈশবাবস্থায় যখন তোমার কোন প্রকার কর্ম্ম করিবার শক্তি ছিল না, তখন তোমার আত্মীয়বর্গকে কে রক্ষা করিয়াছিল? জীবন চঞ্চল এবং দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর; কাল কখন তোমায় আহ্বান করিবেন তাহা তুমি জান না; যদি তুমি অকস্মাৎ করাল কাল-কবলে পতিত হও তখন কি তোমার লিঙ্গশরীর উপস্থিত হইয়া তোমার প্রিয় আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণাদির ব্যবস্থা করিবে? এই পৃথিবীতে তোমার জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই স্নেহময়ী জননীর স্তন-যুগলে অমৃতময় দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া কে তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল? কে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আত্মীয়-স্বজন-গণের ব্যবস্থা করিয়াছিল? এখনও তুমি কোন্ শক্তি-প্রভাবে জীব-সমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ বোধ করিতেছ? ইহা কি সেই মঙ্গলময় পরমকারুণিক জগদ্বন্ধু শ্রীভগবানের ইচ্ছা-শক্তি এবং অহৈতুকী কৃপাশক্তির পরিচয় নহে? তবে কেন তোমার দাস হইয়া মিছে প্রভু সাজিবার সাধ? তবে কেন তোমার এ অনধিকার চর্চ্চায় এত রুচি? ইহা কি তোমার বাতুলতার পরিচয় নহে? হা হতভাগ্য মোহান্ধ জীব এত দেখেও কি তোমার অবিশ্বাস এবং অহংবুদ্ধির তিরোধান হয় না? Bible এ New Testament St. Mathew, 6 এ ঈশ্বর-পুত্র মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন,—

"Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; not yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? 25.

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? 26.

Which of you by taking thought can add one cubit unto the stature? 27.

And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin? 28.

And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these? 29.

Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and to-morrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? 30.

'Therefore take no thought, saying, what shall we eat? or, what shall we drink? Or, wherewithal shall we be clothed? 31.

(For after all these things do the gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth what ye have need of all these things. 32.

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. 33.

Take therefoe no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. 34.

এক প্রাণ দ্বারা দুই প্রেমাস্পদের সেবা কখনই হইতে পারে না। যে প্রাণ অনিত্য বিষয়ে অর্পিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে প্রেমময় নিত্য-ভগবানে অর্পিত হইতে পারে? একই সময়ে হাঁসি কান্না দু'য়ের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। Bibleএ New Testament এ ঈশ্বর-পুত্র মহাত্মা যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon." Thomas E. Kempis তাঁহার Of the Imitation of Christ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"Thy Beloved is of that nature that He will admit of no rival but will have thy heart alone and sit on His own throne as King. Thou oughtest to leave thy beloved for thy Beloved."

শ্রীভগবানে যাঁহার অনুরাগ হইয়াছে তাঁহার অন্য কোন বস্তুতে অনুরাগ হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ দ্বারা নিত্য-প্রেমামৃতের একবার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহার বিষয়-বিষ্ঠা-রসে কি প্রকারে রুচি হইবে? ক্রমশঃ

শ্রীমহেশ্বরানন্দ অবধূত।

অনুতাপ

আমি যে পাপিনী, চির-অভাগিনী
কেমনে পাইব গোরা গুণমণি?
নাহিক ভকতি, নাহিক সে মন
ভজন বিহীনে পায় কি সে ধন?
একেত দুর্ম্মতি, তাহে নানা দোষ,
কোন্ গুণে বল হবেন সন্তোষ?
কুপথেতে মন সতত যে রয়,
শ্রীপদেতে মন নাহি হয় লয়;

সংসার-বাসনা প্রবল যাহার
তাঁরে পাওয়া তার মরীচিকা সার।
সৌরভ-বিহীন কুসুমে যেমতি
ভ্রমরার কভু নাহি হয় স্থিতি,
তেমতি আমার হৃদয়-কমল
বিহীন-সৌরভ হীন-পরিমল
এ হেন কমলে কেন বা আসিবে;
কেন বা আসিয়ে কেন বা তুষিবে?

আমি যে নিঠুর অতি পাপাশয়;
এ হেন হৃদয় তাঁর যোগ্য নয়।
আমারি বেদনা শতত বাখানি,
তাঁর সুখ দুঃখ তিল নাহি গুনি।
ঘোর স্বার্থপর আমি গো জগতে;
কভু নাহি হই রত পর-হিতে।
পর-শ্রী-কাতর আমার মতন
নাহি দেখি কোথা আছে হেন জন।
পিরীতি কেমন কিছু নাহি জানি,
তবু হয় সাধ পেতে গুনমণি।
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ শতবার,
কিছু মাত্র প্রেম নাহিক আমার।
জগতে যে জন হয়েছে নিঃস্বার্থ
সেই পেতে পারে সেই পরমার্থ।
আমার বাসনা শুধু স্বার্থময়;
আপনি নিঃস্বার্থ সেই দয়াময়।
কতশত পাপী মহাপাপী আর
অবহেলে তারা হয়েছে উদ্ধার।
নাহি জানি কত করিয়াছি পাপ,
তাইতে পেতেছি বিষম সন্তাপ।
হয়ত কাহার বাসনার ধন
নাহি দিয়ে তারে করেছি গোপন;
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দিয়েছে গো শাপ,
তাই সে বুঝি বা পাই মনস্তাপ।
করমের ফল আপনি ভুগিব,
নিজ দুঃখ তরে পরে না দুষিব।
যত দুঃখ ধাতা দিবে গো আমারে
অবহেলে তাহা পাতি লব শিরে।
বড়ই কঠিন আমার হৃদয়,
কিছুতেই ইহা কোমল না হয়।
শুনেছি বজর বড়ই কঠিন;
বুঝিব হৃদয়ে পশিবে যে দিন।
বৃথা কেন মন কাঁদ শত ধারে,
ইথে কি যাবে মলিনতা দূরে?

আগে না ভাবিয়ে করিয়াছ কাজ,
এখন কাঁদিতে হয় না কি লাজ?
নিরদয় তুমি, তোমার মতন
কে আছে জগতে বল হেন জন?
যাহারে দেখিবে সেই তোমা হ'তে
শত গুণে ভাল; নাহি আন ইথে।
তুমি যদি মন হইতে আপন,
তবে কি বিপদ ঘটিত এমন?
এবে যে কাঁদিয়ে হতেছ ব্যাকুল?
যত মম দুঃখ তুমি তার মূল।
কুসঙ্গ করিয়া আপনি মজিলে;
মজিয়ে আপনি আমারে মজালে।
কত যে তোমারে করেছি বারণ
এখন সে সব হয়কি স্মরণ?
পাপ-প্রলোভনে করি বিমোহিত
অনায়াসে তুচ্ছ হরে নিলি চিত।
যে কাজ করেছি তোমা সহ সুখে
শেল সম এবে বাজিতেছে বুকে।
করমের ফল আমারে ফলিবে;
তোমারে দোষিলে কি ফল হইবে?
পাপেতে এ তনু ঘিরিছে যখন
ত্যজিতে পরাণ, উচিত এখন।
পাপ ভারে হ'লো অবশ এ দেহ;
রাখ দুঃখিনীরে যদি থাক কেহ।
ঘোর অন্ধকার হেরি সমুদয়;
আপনার দোষে মরিলাম হায়!
ভাবিতে ভাবিতে ধনী ঊর্দ্ধ-পানে চায়।
নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ বলি পড়িল ধরায়॥
চেতন পাইয়া ধনী ইতি উতি চায়।
আকুল-পরাণে শুধু করে হায় হায়॥

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী

"অবতার"।

অবতার এই শব্দটির অভিধানগত অর্থ কোন উচ্চতর স্থান বা প্রদেশ হইতে কোন নিম্নতর স্থানে আগমন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল ধর্ম্মমতেই শ্রীভগবানের নিত্যধাম এই জগৎ হইতে কোন অজানিত অতি উচ্চতর প্রদেশে অবস্থিত। আনন্দময়ের সেই আনন্দধাম হইতে কখন কখন শ্রীভগবান নরবপুধারণ করিয়া এই ধরাধামে জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য আগমন করেন; ইহাকেই শ্রীভগবানের অবতার-গ্রহণ কহে। সাধারণতঃ মুসলমান ও খৃষ্টানগণ শ্রীভগবানের অনেকবার এজগতে অবতার-গ্রহণ স্বীকার করেন না কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে অতি প্রচ্ছন্ন-ভাবে ঐ সম্বন্ধে কি মত প্রকাশিত আছে তাহা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। পরন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবানের এইরূপ অবতার-গ্রহণ অসংখ্য বার হইতে পারে। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, যখনই ধর্ম্মপ্রাণ সাধুগণ অধর্ম্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে থাকেন;—যখন মোহান্ধ জীবকুল ধর্ম্ম-রাজ্যে, সাধন রাজ্যে ভ্রষ্টাচার আরম্ভ করে, হিন্দুশাস্ত্রমতে তখনই শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের সময় হয়!

কি জানি ভারতের কোন ভাগ্যোদয়ে আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের বড়ই আশাপ্রদ অবস্থা। শুধু হিন্দুধর্ম্ম কেন বর্ত্তমান কালে সকল ধর্ম্মের সাধকগণের প্রাণেই যেন কি এক আনন্দের খেলা দেখা যাইতেছে—সকলেই যেন স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে একটু বিশেষ নিষ্ঠাবিশিষ্ট। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরমণীগণকে অথবা সরলবিশ্বাসী পার্থিবশিক্ষায় অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত হিন্দুগণকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ উপহাস করিতেন। ধর্ম্মের আচার-ব্যবহারগুলি অজ্ঞ, ভ্রান্ত, স্বার্থপর ধর্ম্মধ্বজিগণের কল্পনাপ্রসূত কৌশল মাত্র, ইহাই অধিকাংশ যুবকের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সন্ধ্যা-গায়ত্রী অথবা নমাজ প্রভৃতি শ্রীভগবানের উপাসনায় আস্থাবান, ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচার-ব্যবহারাদি পরিত্যাগে ও ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট আহার-বিহারাদিতে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান উচ্চশিক্ষিত যুবকের সংখ্যা কম নহে। অবশ্যই বলিতে হইবে বসুন্ধরা ঈদৃশ সন্তান-রত্নলাভে নিশ্চয়ই ভাগ্যবতী। কিন্তু ইহার কারণ কি? এই ক্ষুদ্র লেখক ও তাহার বন্ধুবর্গের ধারণা এই যে শ্রীভগবান বা তাঁহার অভিন্নহৃদয় অবতারকল্প মহাপুরুষগণের এই ধরাধামে পাদস্পর্শই ইহার একমাত্র কারণ। বায়ুরগতি যেন ফিরিয়াছে—অজ্ঞান, অবিদ্যা, মোহ প্রভৃতি অন্ধকার যেন জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে, আনন্দময়ীর আগমনে ভীত, সঙ্কুচিত ও পলায়নোন্মুখ।

এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ম্মবিষয়ে জগতের এমন কি অবস্থা হইয়াছে যাহাতে শ্রীভগবান বা তাঁহার কোন প্রিয়পার্ষদের অবতার প্রত্যাশা করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে, চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সেই প্রেমনিধির প্রেমবন্যায় ভারত ভূমিতে এক মহাপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার একশত বৎসর পরেও সেই প্লাবনতরঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীশ্যামানন্দ এই প্রভুত্রয় ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

তৎপরে সেই প্রেম-ভক্তি-সিক্ত বসুন্ধরা জীবের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ম্মতিজনিত কলুষতাপে আবার ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে আরম্ভ

হইল;—শুধু কঠিন নহে অসুরগণের ভ্রষ্টাচারে ক্রমে ধরণী-বক্ষ কলুষিত ও পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিল। সরলপ্রাণ ধর্ম্মপ্রিয় জীবগণও আসুরী মায়ার কুহকে পড়িয়া অন্ধকারে পথহারা হইয়া "হা জগদীশ" "হা দয়াময়," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এই আসুরীমায়ার প্রতাপ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষ কোন মহাপুরুষ হিন্দুকুলের কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাণের প্রাণ কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বিসর্জ্জনের প্রয়াসেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মের গ্লানি আর কি হইতে পারে? ৪০৷৫০ বৎসর পূর্ব্বে আচার-নিষ্ঠ হিন্দু-কুলের মুখপাত্র উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ হিন্দুআচারে পদাঘাত করিয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ, নিষিদ্ধ আহার প্রভৃতি কার্য্যে গৌরব মনে করিতেন। যজমান ও শিষ্যগণের ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও অনাস্থা দেখিয়া পুরোহিত ও শিষ্যব্যবসায়িগণ স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদরান্নের জন্য ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষপাতশূন্য হইয়া সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্য বলিতে হইবে হিন্দুসমাজ ভ্রষ্টাচার ও কপটতার নিম্নতমস্তরে নামিয়াছিল। শাস্ত্র-বিশ্বাস, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভারতভূমি ত্যাগ করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দুধর্ম্ম আচার প্রভৃতির জন্যই প্রসিদ্ধ সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মেরও গ্লানি ও অবনতি স্বীকার করিলেও আচার নিষ্ঠাদি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মই প্রথম উল্লেখের যোগ্য। কেবল তাহাই নহে পরমদয়াল ভোলানাথ ও করুণাময়ী মা গিরিজা জীবের প্রতি অশেষ করুণাবশত কলিজীবের অতি সহজসাধ্য যে তন্ত্রসাধনাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহার মধ্যেও আসুরী-মায়া প্রবেশ করিয়া জীবকুলকে ছারেখারে দিবার উপক্রম করিয়াছে। এই মায়াবিনীর মোহে পড়িয়া কত শত ধর্ম্মপ্রাণ সরল সাধক ও কত শত সরলা সাধ্বী কুলকামিনীকে ভীষণ নরকের পথে অগ্রসর হইতে হয়। আবার কলিহত দুর্ব্বল জীবের দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দয়ালের শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দরাম জীবের উদ্ধারের যে অতি সহজ উপায় দিবার জন্য জীবের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অসুর-কীট প্রবেশ করিয়া উহার অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত ভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের আবেশাবতার শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যে শ্রীবৈষ্ণবের অধরামৃত লাভের জন্য উন্মত্তবৎ ব্যাকুল ছিলেন (১) আজ সেই শ্রীবৈষ্ণবের নাম হইয়াছে "বর্‌গী।" প্রদেশ বিশেষের (২) প্রকাশ্য বেশ্যাগণের মধ্যে অনেকের উপাধি "বৈষ্ণবী"। বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষায় আসিলে গৃহস্থগণ নিরাপদ মনে করেন না। এই ক্ষুদ্র লেখক স্বকর্ণে শুনিয়াছে—বঙ্গদেশের কোন প্রদেশে কোন বিশিষ্ট উচ্চকুলসম্ভূত ভদ্রসন্তান তাঁহার বয়স্থা কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে বলিতেছেন "না হয় সাধন-ভজন করিবার জন্য মেয়েটী কোন বাবাজীকে দিব"। আর এক সময় ঐ প্রদেশের কোন একটী বন্ধু এই লেখককে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত মনে করিয়া এক সময় জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয় কিশোরী ভজন (?) কি প্রকার?" বল দেখি ভাই এই ঘোর

(১) "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মনোনিষ্ঠ
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"

(২) কুচবিহার

ব্যাভিচারের স্রোতে পরম ভক্তিমতী শ্রীমাধবী দাসীর হস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিঞ্চিৎ তণ্ডুল-ভিক্ষা-অপরাধে ছোট হরিদাসের আজীবন-বর্জ্জন কি জীবকুলের স্মরণ থাকিতে পারে? শ্রীচৈতন্যের কোন লীলাভূমির অধিবাসী বিরক্তবেশী সাধু মোহান্তের মোকদ্দমাদিতে উক্ত জেলার ধর্ম্মাধিকরণ পরিপূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বল দেখি ভাই! ইহার মধ্যে থাকিয়া মহাপ্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য কণামাত্র হরিতকী-সঞ্চয়ের অপরাধে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের বর্জ্জন স্মরণ করিতে পারা যায় কি? শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি শ্রীধামনবদ্বীপে তীর্থযাত্রীবেশে সমাগতা, অবৈধ-সংযোগে গর্ভবতীর গর্ভনাশ ও ভ্রূণহত্যা-নিবারণ উদ্দেশ্যে জেলার প্রধান রাজপুরুষ-প্রমুখ করুণ-হৃদয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণকে উক্ত শ্রীধামে "মাতৃমন্দির" স্থাপন করিতে হইল; বল দেখি ভাই ভক্তগণ! তোমাদের শ্রীচৈতন্যের আসিবার কি সময় হয় নাই? একটিমাত্র সন্ন্যাসী গৃহে পদার্পণ করিলে গৃহস্থের পুণ্যের অবধি থাকে না; সেই সন্ন্যাসী-দলের হস্তরেখা-গণনা, ঔষধদান প্রভৃতি কার্য্য নিবারণজন্য গৃহস্থগণকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়—রাজসরকারকে উঁহাদের গতি-বিধিতে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হয়; বল দেখি ভাই জ্ঞানীসমাজ! কৌপীন-সর্ব্বস্ব পাণিপাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আগমন আবশ্যক হইয়াছে কি না?

মুসলমানগণের ইদ্ বকরিদ্ প্রভৃতি -পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ সংঘর্ষ-নিবারণ-জন্য রাজপুরুষদিগকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তবে বল দেখি সাম্যবাদী! একহস্তে পুরাণ, একহস্তে কোরাণ, একহস্তে বাইবেল ও একহস্তে শ্রীনিত্যানন্দের উদারনীতি লইয়া, সেই চতুর্ভুজের অবতারের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা? দেশের ধর্ম্ম-বিপ্লব লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সাধারণজনসমাজও শ্রীভগবানের অবতারের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধি-ধারী, হিন্দু সমাজে পদস্থ ভারতের একজন প্রধান কবি (৩) বলিয়াছেন "জগতের সকল ধর্ম্মে জড়ত্ব প্রবেশ করিয়া ভারতে ও জগতে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আবার ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। কালপূর্ণ; এখন সেই মহাপ্রতিজ্ঞা আমাদের একমাত্র আশা; "সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস এই মহা আশা-স্রোতে জাতীয়তরণী ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার আবাহনের জন্য আমরা ভারতসন্তানগণ অগ্রসর হই।" শুধু আমরা বলিতেছিনা ঐ দেখুন সুদূর মার্কিনরাজ্যে শ্রীভগবানের ভক্তগণ "তারা-সমিতি" (৪) সংগঠন করিয়া সিংহনাদে জগতে ঘোষণা করিতেছেন "আমরা (সেই) নক্ষত্র পূর্ব্বদেশে দেখিয়াছি।" "we have seen the Star in the East" (৫) ঐ দেখুন খৃষ্ট-সমাজও প্রকাশ্য পত্রিকায় জগতে প্রচার করিতেছেন যে, যে কয়টী লক্ষণ পূর্ণ হইলে খৃষ্টদেবের পুনরাগমনের কথা খৃষ্টশাস্ত্রে লেখা আছে সেগুলি পূর্ণ-প্রায়। ভারতবাসীর ধর্ম্মাবনতি দর্শনে কিছুদিন পূর্ব্বে বাসন্তীয় বরপুত্রী যে বেশান্ত-দেবী (৬) প্রকাশ্য সভায় সজলনয়নে বলিয়াছিলেন "হায় রে, ভারত-সন্তানের কি দুর্দ্দশা! আমি

(৩) কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

(৪) The Star Society.

(৫) যে নক্ষত্র দর্শনে পূর্ব্বদেশীয় ভক্তগণ প্রভু যীশুখৃষ্টের অবস্থিতি নিরূপণ করিয়াছিলেন।

(৬) Anne Besant.

আমাকে কিনা ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারত-ভূমিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানগণের সমক্ষে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতে হইল ?" শ্রীভগবানের সেই পুত্র-হৃদয়া চিহ্নিতা-সেবিকা দাক্ষিণাত্য-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমারকে শ্রীযীশুর (?) অবতার সন্দেহ করিয়া প্রকাশ্য-ভাবে প্রচার করিতেছেন। মুসলমানগণেরও সেই সুর। আর হিন্দু সাধক-সমাজের তো কথাই নাই। অবতার দর্শন ভারত-সন্তানের পক্ষে নূতন কথা নহে। বর্ত্তমান সময়ে এই ভারতবর্ষের বিশেষ বঙ্গদেশের অদ্ভুত-নিষ্ঠাবান, পরমভক্তিমান ভিন্ন ভিন্ন সাধক-সম্প্রদায় আপন আপন গুরুদেবকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে এবার শ্রীভগবানের গীতোক্ত 'আচার্য্য'-রূপী "গুরু-অবতার। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ তাঁহাকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার সেবকবৃন্দ 'অবতার' বলিতেছেন। মহাত্মা 'পাগল হরনাথ'কে তাঁহার অনুচরবর্গ অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন। উৎকলে সাধু 'বিশ্‌কিষণ' আপনাকে 'অবতার' বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সোঽহংস্বামী'-নামে আপনাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদ বলিয়া রটনা করিতেছেন। শ্রীমৎ জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য প্রভুকে তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, শ্রীপাদ রাধারমণ চরণদাসবাবাজী মহাশয়কে তাঁহার আশ্রিত সেবকগণ অবতার বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন আর শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত মহারাজকে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। অনধিকারী ধর্ম্মবিমুখ ব্যক্তিগণ হয় ত রহস্য করিয়া বলিবেন যে অবতারের ছড়াছড়ি; আমরা কিন্তু তাহা বলি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দীনভাবসিদ্ধ কোন একটী চিহ্নিত ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা বলিতে চাই যে শ্রীভগবান আছেন, তাঁহার দেখা পাওয়া যায়, এই ধরাধামে তাঁহার অবতার হওয়া সম্ভব ইত্যাদি বিশ্বাস বহুভাগ্যে হইয়া থাকে সুতরাং ধরণীদেবী ও তাঁহার সন্তানগণের বড়ই সৌভাগ্য যে জগৎবাসী আজ মহাপুরুষগণকে অবতার সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিতেছে। শ্রীভগবানের ভক্তগণ মধুচক্র-বিচ্যুত মধুকর,—মধুর আস্বাদ তাঁহারা বেশ জানেন; তাঁহাদের বদনে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ মধু লাগিলেই তাঁহাদের মধুচক্র স্মরণ হয়। ফলত তাঁহারা ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুব কম। তাঁহারা মধুচক্র-অনুসন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া আপাততঃ একটু ভ্রান্তি-ভাব দেখাইতে পারেন বটে কিন্তু পরিণামে তাঁহারা যে নিশ্চয়ই মধুচক্রের অনুসন্ধান পাইবেন সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন "যে সূতার কারবার করে সে সূতা দেখিলেই বলিয়া দিতে পারে কত নম্বরের সূতা।" শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহারাজ বলিতেন "স্বামী যেরূপ ছদ্মবেশেই নিরুদ্দেশ হউন না কেন পতিব্রতা রমণী তাঁহাকে দেখিলেই চিনিবে।" সুতরাং আমাদের বিশ্বাস পরিণামে ভক্তমধুকরগণ স্বীয় স্বীয় গুরুকৃপায় সেই গুরুর মধ্যদিয়াই পূর্ণ-পূর্ণ-পূর্ণ-অবতার সেই জগৎগুরুর সন্ধান পাইবেন। বর্ত্তমানে স্বীয় স্বীয় গুরুদেবকে শ্রীভগবানের অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া কোনই অন্যায় করিতেছেন না; বরং ঐরূপ না করিলে শাস্ত্র-

অনুসারে অন্যায় করা হইবে ; কারণ হিন্দুশাস্ত্র-মতে শ্রীগুরুতত্ত্বই শেষ তত্ত্ব এবং—

"গুরৌমনুষ্যবুদ্ধিস্তু নরকং ব্রজেৎ"

"গুরুতে মনুষ্য-জ্ঞান মহা অপরাধ"

ইত্যাদি শাস্ত্র-শাসন অনুসারে

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরংব্রহ্ম"—

এই মন্ত্ররাজটী হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া উহার সাধন করিতে সাধক ও ভক্ত মাত্রেই বাধ্য। অন্যথায় অভীষ্ট-লাভ অসম্ভব। আমরা কিন্তু কেবল এইটী চাই :—

"মাতিয়ে দে আনন্দময়ী একেবারে মেতেযাই।
তবপ্রেম-সুরাপানে আনন্দেতে নাচিগাই ॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামসুরাপানে।
মাতুক যত নরনারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই॥"

হায়! আমাদের কি সে দিন হবে, যে জগৎবাসী উন্মত্ত হইয়া "জয় গুরু" "জয় গুরু" রবে দিক্‌মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিবে? আবার কত দিনে দেখিব—

"সংকীর্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের বোহারি?"

তাহা হইলে এই অধম লেখক সেই অলৌকিক গুরুভক্ত, হরিভক্ত, শিবভক্ত, শক্তিভক্ত সেবকগণের চরণ-ধূলি অঙ্গে মাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। উপসংহারে বলি ভাই সাধকবর্গ, ভক্তবৃন্দ! এ ব্যাপার আজ নূতন নহে। শ্রীচৈতন্য-অবতার-কালেও ঠিক এই কাণ্ড হইয়াছিল। তখনও সাধকদল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষকে অবতার বলিয়াছিলেন। শেষে শ্রীচৈতন্যমহাসাগরে সব-নদী, নালা মিলিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। এমন কি শ্রীভগবানের অভিন্নদেহ শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু ও আপনারা প্রভু-সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়া শ্রীচৈতন্যকে "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু" সংজ্ঞাদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

তাই বলি এসভাই জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত, প্রেমিক—এসভাই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান—আমাদের সেই ননীচোরা—বসনচোরা মনচোরা—চোরা অধর-চাঁদ-খানি কোথায় কি বেশে আমাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন দেখি।—ধরা না দিলে তো ধরা যাইবে না—তবু একটু চেষ্টা করি। চাঁদ একানহে ; অনেক গুলি উজ্জ্বল নক্ষত্রও সঙ্গে আছেন ;—যতক্ষণ চাঁদের দেখা না পাই ততক্ষণ নিজ নিজ মনের মত একএকটী নক্ষত্রের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল ; কেন না সে অচেনা আকাশের দেশে একাকী যাইবার উপায় নাই। আর যত দিন চাঁদ না দেখি ততদিন এই নক্ষত্রই আমাদের চাঁদ। এই নক্ষত্রগুলি বড়ই দয়াল। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অনুগত আশ্রিত পথিকগুলি সঙ্গে লইয়া ক্রমশঃ-অগ্রসর হইতে হইতে যথাকালে পূর্ণিমা-রজনীতে পূর্ণ-চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিপূর্ণালোকে স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র আলোক মিশাইয়া অনুগত সেবকগুলির হস্তধারণ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্র বেষ্টন করিয়া সুধানিধির প্রেম-সুধা অজস্র পান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া রহিবেন—আমাদেরও চিরকালের অতৃপ্ত বাসনা চিরতরে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

শ্রীঃ—

"সব্‌ সিয়ান কো এক বাৎ।"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর)

No man is safe to speak but he who loves to hold his peace.

No man is safe to command but he who has learned well how to obey.

সযতনে যেই করে রসনা দমন।
সেই জন জানে ভাই কহিতে বচন॥
সকলের সেবা করে দিয়ে মন প্রাণ।
সেই জন হ'তে পারে সবার প্রধান॥

Never promise thyself security in this life, however good and religious and devout and solitary thou mayest seem to be.

যতই ধরম-ভাব হউক তোমার।
একান্তে ভজন কিম্বা কর অনিবার॥
মায়াময় এই ভবে যতদিন রবে।
"আপনাকে" কভু নাহি প্রত্যয় করিবে॥

Oftentimes they that were highly esteemed, have been in the greater danger by reason of their too great confidence.

কতশত মহাজন হেরি এ জগতে।
প্রতিষ্ঠা, সম্মান, পূজা লভি নানা মতে॥
অহঙ্কার-বশে করি 'আপনে' বিশ্বাস।
জগদীশে ভুলি শেষে পাইলা বিনাশ॥

Oh, how great peace and tranquility would he possess who should cut off all vain anxiety and think only of the things of God and his salvation and place his whole hope in God.

অনিত্য সংসার-চিন্তা করি পরিহার।
দয়াময় হরিসেবা করে অনিবার॥
একান্ত বাসনা যার মোক্ষ-ধামে বাস।
হরিপাদপদ্মলাভ একমাত্র আশ॥
অচিরেই পায় সেই হরি প্রাণারাম।
পরমা শান্তির কোলে লভয়ে বিশ্রাম॥

No man is worthy of heavenly comfort who has not diligently exercised himself in holy compunction.

নিজের জীবনে যত হয়েছে কুকাজ।
ভাবি সব যেই নাহি পায় বহু লাজ॥
দয়াময় শ্রীহরির স্মরি শ্রীচরণ।
অনুতাপ-নীরে নাহি ভাসে অনুক্ষণ॥
ভবের জ্বালায় তার প্রাণ জ্বলে যায়।
শান্তিসুধা সেই জন কভু নাহি পায়॥

If in the beginning of thy religious life, thou accustom thyself to remain in thy chamber, and keep to it well, it will be to thee afterwards a dear friend and a most agreeable solace.

সাধনার পথে যেই নবীন সাধক।
বিজনে বসতি তার অতি আবশ্যক॥
এই রীতি সযতনে করিলে পালন।
পরিণামে হয় পরা-প্রীতির কারণ॥

"শিশুকালে তরুগণে করিলে রক্ষণ।
জীব জন্তু তারে আর না করে ভক্ষণ॥
বড় হ'লে সেই তরু শীতল ছায়ায়।
তাপিত জীবের ভাই পরাণ জুড়ায়॥ (২)

In silence and quiet the devout soul advances and learns the hidden things of the scripture.

It is better to lie hid, and take care of one's self than neglecting one's self to work even miracles.

নীরবে প্রশান্ত-ভাবে ভক্তিমান নর।
সাধন করিলে পায় জ্ঞানের আকর॥
একান্তে বিজন-বাসে আত্ম-আলোচন।
পরম মঙ্গলকর সাধনা-লক্ষণ॥
আত্মতত্ত্ব ভুলি শুধু সিদ্ধির প্রয়াসে।
পণ্ডশ্রম হয়, সাধু যায় সর্ব্বনাশে॥

Leave vain things to vain people ; but mind thou the things which God has commanded thee.

বিষয়ীর হাতে দাও অনিত্য বিষয়।
অনিত্য-বিষয়ে কভু সুখ নাহি হয়॥
ঈশ্বর-আদেশে ভাই এসেছ হেথায়।
প্রাণমন সঁপে দাও সেই রাঙ্গা পায়॥

Give thyself to compunction of heart and thou shall find devotion.

অনুতাপনীরে কর হৃদয়-শোধন।
তবে ত ভকতি দেবী দিবে দরশন॥

Happy is he who separates himself from all that may burden or defile his conscience. Strive manfully ; habit is overcome by habit.

কলুষিত হয় যাহে বিবেক-রতন।
দূর হ'তে তাহা যেই করয়ে বর্জ্জন॥
সেইত সুবুদ্ধি আর সেই সাবধান।
সংসারের মাঝে জানে সুখের সন্ধান।
অদম্য উৎসাহে ভাই করহ যতন,
"যতন নহিলে কভু মিলে কি রতন ?"
দুর্দ্দান্ত প্রবল যত এই রিপুগণ।
"অভ্যাস-যোগেতে ভাই কর সংযমন॥" (১)
'ভালবেসে সারমেয়ে করেছ যতন,
লম্ফ দিয়া তাই কোলে উঠিছে এখন॥
পুনঃপুনঃ তা'রে যদি করহ প্রহার।
অবশ্য যাইবে দূরে, পাবে প্রতীকার॥ (২)

* যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী ইংরাজি জানেন না তাঁহাদের ও ভক্তপরিবারের বালক বালিকার জন্য "Of The Imitation of Christ" নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের বাছা বাছা 'পদ' গুলির ভাবার্থের বঙ্গানুবাদ।

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(২) শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ।

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস

জয় গুরু

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই দুইটি শ্লোক জীবের পক্ষে বড়ই আশা ভরসার কথা। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রবলরূপে অনুভূত হয়, সেই সময়ে করুণাময় জগদীশ্বর সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও অসাধুদিগকে বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করেন। আজ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই কলিকাতা মহানগরীতে বৈদেশিক ধর্ম্মের প্রবলস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, সেই স্রোতে কৃষ্ণবন্দ্য আদি করিয়া কত শত বিদ্বান-সজ্জন বিদেশী-দিগের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বংশীয়েরা বৈদেশিক বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরধর্ম্মের গ্রন্থাদি অভ্যাস ও আলোচনায় বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া হিন্দুরাই ঘোষণা করিতে লাগিলেন "হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা-পূর্ণ ও অসার; গুরু পুরোহিতগণ প্রবঞ্চক ইত্যাদি ইত্যাদি।" এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি যখন হাটে, ঘাটে, প্রান্তরে, চতুর্দ্দিকে, গ্রাম-গ্রামান্তরে পূর্ণ-কোলাহলে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাজন সকল হিন্দুধর্ম্মের সার "ব্রহ্মতত্ত্ব" লইয়া 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের' সংস্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু ও খৃষ্টান উভয়ের মধ্যস্থলে একটি 'আল' প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া হিন্দু-গণকে ধর্ম্মান্তর-অবলম্বন হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাৎকালিক হিন্দুদিগের হৃদয় অতিশয় শুষ্ক হওয়ায় ভক্তির অভাবে সকল ধর্ম্মই—'গোঁড়ামিতে' পরিণত হইল। কাহারও হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই; কর্ম্ম ও আচরণে ধর্ম্ম দেখা যাইত না; মুখে যে ধর্ম্মবিষয়ে দু'কথা বলিতে পারে সেই তখন মহাধার্ম্মিক। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা সেই সময়ে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানকে জগতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কঠোর তপস্যা করেন। রামকৃষ্ণদেবের কঠোর তপস্যায়, গোস্বামী মহাশয়ের উচ্চ ক্রন্দনে, কেশব সেনের উচ্চ হুঙ্কারে ও রাজা রামমোহনের প্রবল আর্ত্তিতে সেই দয়ার সাগর নিত্য, সত্য, পূর্ণব্রহ্ম "**শ্রীনিত্যগোপাল**"-রূপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিয়া থাকেন।

আকৃতে প্রকৃতে জ্ঞান স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান হয় তটস্থ লক্ষণ॥ চৈঃ চঃ।

ভাই সব, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছ একবার মনে ভাবিয়া দেখত তেমন রূপ কি আর কখন কোথাও দেখিয়াছ; না দেখিতে পাও? মরি মরি রূপের বালাই লইয়া মরি! ভুবন-মোহন রূপ! বর্ণ যেন কাঁচা সোনা ঢল ঢল করিতেছে। প্রশস্ত বক্ষস্থল; প্রশস্ত ললাট। করিশাবকশুণ্ডের ন্যায় বাহু-যুগল; চাঁপা ফুলের কলির মত আঙ্গুলগুলি। সত্য সত্যই "রাম রম্ভা জিনি উরু" তায় যোড়া ভুরু। পরিধান লালপেড়ে সাদা বস্ত্র। মরি মরি কতই শোভা! দেখিলেই বোধ হয় এ অমানুষি রূপ! এ অপ্রাকৃত রূপ! এরূপ যেন এদেশের

নয়! সেই ভুবনভুলান রূপের এক অমানুষী শক্তি এই যে উহা দৃষ্টিমাত্রেই শত সহস্র নরনারীর চিত্তকে হরণ করিয়া শ্রীচরণের চিরকিঙ্কর করিতে সমর্থ। জীবের এমন রূপমাধুরী হইতে পারেনা। দৃষ্টিমাত্রে শত সহস্র নরনারীকে শ্রীচরণের কিঙ্কর করিতে পারে এ শক্তি শ্রীভগবান ভিন্ন জীবের হইতেই পারে না। এখন তাঁহার কার্য্যের পরিচয় দিয়া জগতে তাঁহার আশীর্ব্বাদসূচক মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিব। নিত্যপরিকর, নিত্যভক্ত সব আশীর্ব্বাদ করুন; শক্তিসঞ্চার করুন আমি যেন "নিত্যলীলা" প্রচার করিতে পারি। নিত্যভক্তের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি নিশ্চয়ই অপারগ। আজ শ্রীনিত্যদেব ও তাঁহার ভক্তচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যদ্বারা জগৎকে দেখাইব যে তিনি কি বস্তু।

ঠাকুর যে সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে একবার বিশেষ-সূর্য্যগ্রহণ হয়। ঠাকুর সেই সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া কালীবাবুর (ষ্টীমারের ষ্টেশন-মাষ্টার) আফিসে প্রথমে একটু বসিয়া তৎপরে গঙ্গাতীরে আসিলেন। দেখিলাম কতশত নরনারী গ্রহণ-সময়ে জপ করিতেছেন; গঙ্গাতীরে দলে দলে সংকীর্ত্তন আসিতেছে। এককালে সূর্য্যগ্রহণ-দর্শন, দলে দলে সংকীর্ত্তন এবং চতুর্দ্দিকে হরিণাম শ্রবণ করিয়াই ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে এককালে অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক-বিকারলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। এমন সময় কালিদাস বাবু (নবদ্বীপ নিবাসী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী (১) মহাশয়ের সহিত বহুলোকসমাবৃত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চরণদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়াই ঠাকুরের চরণপ্রান্তে দীর্ঘ-দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া রাঙ্গাচরণ দুইটী বক্ষে ধারণ করিলেন; সেই সময়ে ঠাকুর গৌরাঙ্গ-আবেশে এমন সুন্দর ভাবে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইলেন যে বোধ হইল যেন সত্য সত্যই নদীয়াবিহারী গৌরহরি জাহ্নবী-পুলিনে দাঁড়াইয়া নদীয়াবাসীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অল্প-সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া অজস্র

(১) ইনিই শ্রীপুরুষোত্তমে সুপরিচিত স্বনামধন্য "বড় বাবাজী মহাশয়।" ইহাঁর আশ্রিত সেবকগণ কেহ কেহ ইহাঁকে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কোন সখীর অবতার বলিয়া সন্দেহ করেন; কেহ কেহ বা শ্রীভগবানের অবতারও বলিয়া থাকেন।

"নদ নদী সব আসি মিলিলা সাগরে"
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণে।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণে॥
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যাঁর অংশে জন্ম যার॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

সম্পাদক।

কীর্ত্তন করিতে লাগিল; স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ঠাকুর মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন; কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উদ্দণ্ড নৃত্য; অশ্রু, কম্প, পুলকে সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত। সে শোভা যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন তিনিই তাহার সাক্ষী—জড় লেখনী সে ভাব-বর্ণনায় অক্ষম। সেই সময়ে ঠাকুর এমনই করুণা-নেত্রে সর্ব্ব-জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন যে দেখিলাম ঠাকুর যে দিকে তাকান সেই দিকের লোকই "হা গৌরাঙ্গ হরি" বলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; সকল লোকের চক্ষেই অশ্রু—সকলের দেহেই পুলক—সে আনন্দের 'ওর' নাই।

সেই সময়ে মনে হইতেছিল আমরা ভূলোকে না গোলকে? তখন আনন্দে ভূলোক গোলক এক হইয়া গিয়াছে। ভাই সব! বন্ধু সব! এখন বিচার কর। শ্রীধাম নবদ্বীপে অনেক সাধুর সমাগম হয়; সংকীর্ত্তনও অনেক সময় হইয়া থাকে; গ্রহণও অনেক সময় হয়; কিন্তু যুগপৎ এই সংযোগ—এই ব্যাপার—এককালে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম—সকলেই প্রেমানন্দে আত্মহারা—ইহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? কি অদ্ভুত বাপার! কি অমানুষী শক্তি!! "যেই হেরে এই লীলা সেই ভাগ্যবান"।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর ইত্যাদি ভেদে যেমন হিন্দুধর্ম্মের নানা পন্থা দেখা যায় তদ্রূপ প্রত্যেকের আচার-ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়। যিনি একপন্থা শিক্ষা দেন তিনি এক-পন্থী গুরু; যেমন শাক্ত গুরু—তাঁহার শক্তিতেই সর্ব্বসমাধান। অন্য পন্থাতে তাঁহার তদ্রূপ আস্থা বা অনুরাগ দেখা যায় না। বৈষ্ণবগুরুর বিষ্ণুতেই অনুরাগ অন্যতে তদ্রূপ দেখা যায় না। এইজন্য বলি এক এক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি আচার্য্য তিনি গুরু আর যিনি সর্ব্বধর্ম্ম সম্বন্ধে আচার্য্য তিনি গুরোর্গরীয়ান—মহান্‌গুরু—তিনিই '**শ্রীনিত্যগোপাল**'। অদ্ভুত, অপূর্ব্ব গোপাল; সর্ব্বধর্ম্মেই সমান বিশ্বাস, সর্ব্বধর্ম্মেই সমান আস্থা, সমান অনুরাগ; সর্ব্বনামেই সমান প্রীতি; সকল নাম শুনিতেই তুল্যরূপ চিত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি। শ্রীভগবানের যে কোন একটি নাম শ্রবণমাত্রেই অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্য,—দিব্য-সমাধির ভাবসমূহ যেন মূর্ত্তিমান-রূপে প্রকট। এখন বলভাই "শ্রীনিত্য-গোপাল" বস্তুটি কি?

শাক্ত হউক, শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক, গাণপত্য হউক, সৌর হউক; সাকারবাদী হউক, নিরাকারবাদী হউক; হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বৌদ্ধ হউক, জৈন হউক; পশ্বাচারী, বামাচারী, কৌলাচারী, দিব্যাচারী কি বৈষ্ণবাচারী যে কোন আচারবান হউক, তাঁহার নিকটে আসিলে প্রত্যেকেই তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ করিত।

একদিন নবদ্বীপ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক যদুবাবু ঠাকুরের নিকট একখানি বাইবেল হাতে করিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "মাষ্টারমশায়ের হাতে ওখানি কি"? তিনি উত্তর করিলেন "বাইবেল"। "দাও, দেখি" বলিয়া ঠাকুর যেই হস্তপ্রসারণ করিলেন অমনি ঠাকুরের দুইচক্ষু স্থির হইয়া গেল—চক্ষু-ধার দিয়া যেন গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহ ছুটিল—সর্ব্বশরীর রক্তবর্ণ ধারণ করিল—বোধ হইল যেন 'লাল গণেশটী'। চক্ষু এমন স্থির যে বোধ হইল যেন চক্ষুর উপর জাল পড়িয়া আসিতেছে। চক্ষু দেখিলে বোধ হয় যেন মৃতদেহ। হরি হরি! কি অদ্ভুত! কায়স্থ-কুলশীর্ষ বসুবংশরত্ন গুরুজ্ঞানানন্দ-রূপী শ্রীনিত্য

গোপাল আজ যীশুখৃষ্ট-উদ্দীপনে সমাধিস্থ। (২) তাই বলিতেছিলাম শ্রীভগবানের সর্ব্ব-নামে সর্ব্ব-রূপে ও সর্ব্ব-ভাবে বিভাবিত-চিত্তেন্দ্রিয় জগতে এই একটি নূতন বস্তু। তাঁহার নিকটে সকল ধর্ম্মেরই লোক আসিয়া বড়ই তৃপ্ত হইত। সর্ব্ব-ধর্ম্মের ধর্ম্মী শ্রীনিত্যগোপাল! তোমার জয় হউক!

ঠাকুর বজরাপুর হইতে পাঁচু গাড়োয়ানের গো-গাড়ীতে সাধুহাটী-মাগুরা যাইতেছেন। পশ্চাৎ ৩।৪ খানা গাড়ীতে ভক্তবৃন্দ। পাঁচু গাড়োয়ান জাতিতে মুসলমান; বেশ ধার্ম্মিক; মুসলমানধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। পাঁচু যেই মুখে "আল্লা খোদাতালার" নাম লইয়াছে অমনি শ্রবণমাত্রেই ঠাকুরের দুই চক্ষু দিয়া তীরের মত বেগে জল ছুটিতে লাগিল; সমস্ত শরীর প্রভাতকালের ব্রাহ্মমূর্ত্তির বর্ণজ্যোতিঃর ন্যায় শোভাধারণ করিল। পাঁচু তাহা দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে সে এমন অস্থির হইয়া পড়িল যে সে আর গাড়ীতে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। অবশেষে সে ও ঠাকুর গাড়ী হইতে নামিলেন মাঠের মধ্যে একটা অশ্বত্থবৃক্ষতলে যাইয়া ঠাকুরের চরণ ধরিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। পরিশেষে ঠাকুর তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সে কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল।

ঠাকুর যখন নবদ্বীপে আম্পুলিয়াপাড়াতে থাকেন সেই সময়ে একদিন শ্রীরামনবমী তিথি উপলক্ষে আমরা ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে আছি। কীর্ত্তন শ্রবণে ঠাকুরের কত রকমের ভাবা-বেশ ও সমাধি হইতে লাগিল, ঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গের পর তিনি বলিলেন "আজ রামনবমী; রাম সম্বন্ধে কীর্ত্তন হউক"। ভক্তেরা রামনামকীর্ত্তন করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের শরীরে স্বভাবসিদ্ধ অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার উদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখাগেল ঠাকুরের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি হইতে হস্তের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের গায়ের যেমন বর্ণ সেইরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মদাস বাবু বাতি লইয়া দেখিতে লাগিলেন; সকল ভক্তই দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগাইয়াছিল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! যাহা কখন দেখিনাই সেদিন তাহাই দেখিলাম; চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল।

ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের সন্নিকটে রামচন্দ্র সাহার বাড়ীভাড়া করিয়া আছেন। সঙ্গে সেন সতীশ বাবু, ঘোষ সতীশ বাবু, দেবেন্দ্র বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, কালীদাস বাবু, রঘু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। প্রথমে হরিসংকীর্ত্তন হইল, পরে ঠাকুরের আজ্ঞায় কালীনাম হইতে লাগিল। সেদিন ঐ সময়ে "সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে। মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে॥" এই গানটি গাওয়া হইতেছিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের 'শিব-সমাধি' হইল। তৎপরে ঠাকুরের অধরের দুইপাশ দিয়া লালা-স্রাব হইতে লাগিল; ঘরে মদিরার গন্ধ ছুটিল; বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ ঘরের মধ্যে ২।৪টা ব্রাণ্ডির বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। আমি অঞ্জলি পাতিয়া সেই লালা ধারণ করিলাম। অনেক ভক্তই সেই লালাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ মাত্রই ভক্তদের দেহে অপূর্ব্ব আনন্দের স্ফূর্ত্তি দেখা গেল এবং অল্প অল্প নেশা সমস্ত রাত্রি ও পরদিন পর্য্যন্ত আমি বোধ করিয়াছিলাম। সেইদিনকার রাত্রিতে ঠাকুর ধর্ম্মদাস বাবুকে

---

(২) সেই সময়ে উপস্থিত ভক্তগণ:— সতীশচন্দ্র সেন, দৈবচরণ দে, দেবেন্দ্র বাবু (ডাক্তার), সত্যনাথ বিশ্বাস আর বিশেষ স্মরণ হইতেছে না। লেখক।

কোলে বসাইয়া সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। এই সমাধি-মগ্ন-অবস্থায় ধর্ম্মদাস বাবু বেশ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন যে ঠাকুর শ্রীভগবান।

নবদ্বীপে আম্পুলিয়াপাড়ার বাটীতে ঠাকুর আছেন। ভক্তবৃন্দ একে একে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অমনি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন হওয়ার পর মা'র নামও কীর্ত্তন হইল। তৎপরে মোক্তার বীরেশ্বর বাবু (ঠাকুরের একজন ভক্ত) আব্দার করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"ঠাকুর! আমরা কলির জীব; সাধন-ভজন-শূন্য; কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই।" এই বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মোক্তার বাবুর ক্রন্দন শুনিয়াই ঠাকুর মাতৃভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং অবশেষে বীরেশ্বরবাবুর দুখানি হাত ধরিয়া আবেশের মুখে বলিলেনঃ—"আমি তোদের মা।" (৩) এই বলিয়াই আবিষ্ট হইলেন, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। আমি বেশ দেখিয়াছি সেই সময়ে তাঁহাকে একটি স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল—অঙ্গের লক্ষণ সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া গেল এবং মাতৃহারা সন্তান বহুকাল পরে মার দেখা পাইয়া যেমন ক্রন্দন করে সেদিন ভক্তগণেরও সেইরূপ প্রেম-ক্রন্দন দেখিয়াছিলাম। সেইদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ—"তোদের কিছুই করিতে হইবেনা, আমার উপর তোদের 'বংকলমা' রহিল।" এই কথাটি ঠাকুর আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে, হাসিমাথামুখে, করুণামাখাস্বরে এমন ভাবে বলিলেন যে উহা শ্রবণমাত্রই ভক্তগণের প্রাণ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

কেশবানন্দ অবধূত

"ওঁ নমো ভগবতে জ্ঞানানন্দায়।"

"আঁধারে আলোক"
বা
"বেদান্ত-রহস্য।"

দৈহিক বিজ্ঞান মন ভাব একবার।
কেবা আমি, কোথা হ'তে আসিয়াছি কি কাযেতে
কার্য্যভোগ শেষে পুনঃ যাইব কোথায়?
অনিত্য সকলই ভাই নশ্বর ধরায়॥

পঞ্চভূতময় দেহ জড়ের নিদান,
পঞ্চবিংশ প্রাণ যার, যে হয় মীমাংসা সার,
সবার চালক কিন্তু মনোময় প্রাণ।
মনের সমষ্টি * জ্ঞানে কহেত বিজ্ঞান॥

(৩) "পিতাহমস্য জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ" শ্রীগীতা। ৯ অঃ ১৭
"মাতাপুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইমত সবারে দিলেন পুত্রভাব॥" চৈঃ ভাঃ
সম্পাদক।

* "মনঃসমষ্টি ব্রহ্ম" ইহাই পূর্ব্ব মীমাংসার মত। উত্তর মীমাংসাতে "আত্মা স্বপ্রকাশ" ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পঞ্চভূতে পঞ্চতত্ত্ব আছে বিদ্যমান ;
অস্থিমেধে ক্ষিতিতত্ত্ব, রক্তরসে জল-তত্ত্ব,
চক্ষুমুদে যাহা দেখ ধ্যেয় জ্যোতিষ্মান্‌ ।
"তেজস্তত্ত্ব" তাহা কহে চিন্ত চিন্তাবান ॥

"ধ্যানং ঊর্দ্ধমূলং বেত্তি" ইহা সুনিশ্চয় ;
ইহা হয় বায়ুতত্ত্ব, চিন্ত হ'য়ে প্রকৃতিস্থ,
ধ্যানের সময় দেখ কেন্দ্র শূন্যময় ।
ইহা হয় ব্যোমতত্ত্ব কহিনু নিশ্চয় ॥

যাহা নাহি ইহে তাহা ত্যাগ কিসে হয় ?
বুঝহ প্রকৃতিতত্ত্ব, (১) না রবে কামিনীতত্ত্ব,
আধার আধেয় ভাবে সব একময় ।
"একত্বেতে" দ্বিত্ব ভাসে তব কল্পনায়

(যথা) ইকার সংযোগে তবে 'শিব' শব্দ হয় ।
ইকার (প্রকৃতি) বিলয় হ'লে, শিব নাহি লোকে বলে,
শবরূপ থাকে "দ্বৈত" রহেত তখন ।
(পুনঃ) প্রকৃতি মিশিলে হয় অদ্বৈত-মগন ॥

৭

একা তুমি চিরদিন অনাদি অনন্তপ্রায় ।
প্রকৃতি মানিয়া দুই, দ্বিত্ব হ'লে ভাব এই,
একি তোর ভ্রম-ঘোর কেন ভাব আর ?
দূর কর, মুছে ফেল, হোক একাকার ॥

কূটস্থ হইলে তবে জীবভেদ যায় ;
মলিনতা মুছে গেলে, শূন্যে শূন্যে মিশাইলে,
ধ্যানধ্যাতা ধ্যেয় নাই দৃশ্য ঘুচে যায়
সত্বামাত্র থাকে আর শুদ্ধ আমি রয় ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীদাশরথি ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিরত্ন

প্রতিবাদ

উপক্রমণিকা

শ্রীভগবানের সমগ্র সৃষ্টিই বৈচিত্র্যময়। এখানে প্রত্যেক জীবনই ভিন্ন-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ; প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্র ধারণা ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি। উপযুক্ত সাধন-সংযম অভাবে এই স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা আমরা সময়ে সময়ে এতদূর বৃদ্ধি করিয়া ফেলি যে নিজের সেই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, অতিসামান্য স্বাতন্ত্র্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সময়ে সময়ে অপৌরুষেয় বেদ, পুরাণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেও লজ্জাবোধ করিনা। শ্রীভগবানের ধর্ম্মপ্রাণ, শাস্ত্রবিশ্বাসী, দাসমাত্রের পক্ষেই ইহা দর্শন করা কষ্টকর। ধর্ম্ম-বিষয়ে তর্ক সর্ব্বথা নিন্দনীয় হইলেও "শ্রুতিশিরস্তর্কানু-

(১) কামিনীতত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি হইলে সাধকমাত্রেরই কামিনীভোগবাসনা নষ্ট হইয়া যায় তখন তার 'ইয়ং স্ত্রী' 'অয়ং পুমান্‌' এ জ্ঞান ও থাকেনা এবং তখন যথার্থই "সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। তাহারই নাম যোগীদিগের 'আত্মসম্ভোগ' বা 'আত্মরতি'। লেখক।

সঙ্কয়তাং" শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উপদেশ অবলম্বনে ধর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতামূলক, নিন্দাব্যঞ্জক বা অশাস্ত্রীয় মতপ্রচারসূচক ধর্ম্ম-মীমাংসা সকলের প্রতিবাদ করিতে আমরা মানস করিয়াছি। আমাদের এই প্রতিবাদ "কাহাকেও গালি দেওয়া নহে; কাহারও নিন্দাপ্রচার নহে;" ইহা কেবল উক্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মীমাংসাগুলিকে শাস্ত্র-সঙ্গত তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা, অথবা উক্ত বৈধ উপায়ে আমাদিগকে ঐগুলি বুঝাইয়া দিবার প্রার্থনা মাত্র। অতএব ভরসা করি শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিকগণ ঐরূপ অশাস্ত্রীয় মীমাংসা হস্তগত হইবামাত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন ও উপযুক্ত শাস্ত্রযুক্তি আমাদিগকে অবগত করাইয়া আমাদের কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও করিবেন। আর বিরুদ্ধবাদিগণও আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আমাদের অপরাধ (?) নিজগুণে ক্ষমা করিবেন; কারণ শাস্ত্রমত ও ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করাও যেমন পুণ্যপ্রদ, ভ্রান্তমত প্রচারও তেমনই পাপজনক আর উক্তরূপ অসঙ্গত মতপ্রচারের গতিরোধ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করাও তুল্যরূপে কর্ত্তব্য-হেলন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঃ—

C/o সম্পাদক।

লেখকগণের প্রতি—

লেখকগণ সম্ভবতঃ একেবারেই ভাল কাগজে পরিষ্কার করিয়া তাঁহাদের প্রবন্ধগুলি লিখেন না। বোধ হয় প্রথমে অপরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পরে ঐগুলি ভাল করিয়া লিখেন; যদি তাহা হয় তবে তাঁহাদের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে প্রবন্ধগুলি পরিষ্কার করিয়া লিখিবার সময়ে একটু ভাল কাগজে প্রেসকপির মত করিয়া (অর্থাৎ ফুলস্‌ক্যাপ বা শ্রীরামপুরের কাগজের মত কাগজ আধ তাকে দীর্ঘভাবে দুইখণ্ড করিয়া) উহাতে প্রবন্ধগুলি লিখেন বা লিখান। তাহা হইলে পত্রিকা-পরিচালন-সমিতিকে একটু সাহায্য করা হইবে। তবে সময়াভাবে বা অন্য কোন বিশেষ কারণে যাঁহারা ঐরূপ করিবার সুযোগ পাইবেন না তাঁহারা যেরূপ সুবিধা মনে করিবেন সেই ভাবেই প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

সম্পাদক।

ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে আমাদের ঠাকুর যখন প্রকট লীলায় শ্রীধাম নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যেকেই যেন স্বীয় স্বীয় জীবনী স্বহস্তে লিখিয়া রাখেন। এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিবার শক্তি আমার মত সামান্য জীবের থাকিতে পারে না তবে উক্ত ইচ্ছার কএকটি উদ্দেশ্য এই ক্ষুদ্র আধারে যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা নিম্নে ব্যক্ত করিলাম।

১। শ্রীভগবান বা তাঁহার প্রেরিত কোন মহাপুরুষ যখন জগতে আসেন তখন তাঁহাদের ভক্ত বা সেবকগণের জীবন-চরিতই তাঁহাদের ভগবত্ত্বা বা মহাপুরুষত্বের পরিচয় দেয়। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীজগাই, মাধাই প্রভৃতি মহাভক্তগণই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণব্রহ্মাবতারত্বের পরিচায়ক!

২। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় সাধন-ভজনের বলে শ্রীশ্রীদেবকে লাভ করেন নাই (যেমন আমি) অনন্তকরুণাময় শ্রীগুরুরূপী শ্রীশ্রীদেবের অহৈতুকী দয়াই যাঁহাদের 'লৌহময়দেহ কাঞ্চন'

হইবার একমাত্র কারণ, সেই পরমদেবের কৃপাকটাক্ষ আমার মত যাঁহাদের ঘৃণিতজীবনের বিশুদ্ধির একমাত্র হেতু, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনচরিত স্বহস্তে লিখিয়া পর্য্যালোচনা করিলে নিজ নিজ অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া সেই করুণা-নিদানের মহিমা সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ হইবে আর সেই সঙ্গে অকুলসাগরে ভগ্নতরী আমার মত কলিহত কতশত পথিক আশা ভরসার সন্ধান পাইবে।

৩। আমাদের ঠাকুরের এবারের ভূলীলা-বর্ণনে ঠাকুরের সেবকগণের বড়ই সাহায্য ও সুবিধা হইবে। ঐগুলি ভক্তগণের 'কড়চার' কার্য্য করিবে। এতদিন "শুভস্য শীঘ্রং" এই মহৎ উপদেশ আমরা উপেক্ষা করিয়া ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র শম্ভুদাদা নগেনদাদা, বেণীদাদা, মাষ্টার মহাশয় ও বিপিন বাবু প্রমুখ ভক্তগণকে হারাইয়াছি ; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনের অপূর্ব্ব অনুভূতিরূপ ঠাকুরের কৃপা-রহস্য-লীলার আস্বাদন-সুখে বঞ্চিত হইয়াছি।

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ এই বিষয় অবগত হইবামাত্র উক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া আপন আপন জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি স্বহস্তে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ঠাকুরের সমগ্র ভক্তমণ্ডলী যাহাতে এই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া উহা কার্য্যে পরিণত করেন সে বিষয়ে যেন সকলেই যত্নবান হন। উক্ত জীবন-কাহিনী বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকায় বা অন্য কোথাও প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিনা তবে ঐগুলি লিখিয়া নিজের নিকটে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। শ্রীঃ—

C/o সম্পাদক।

ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণের প্রতি—

এই শ্রীপত্রিকাপ্রকাশ ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্য পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডে সম্যক বর্ণিত আছে। ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিলেই শ্রীপত্রি-কার কলেবর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে আমরা চেষ্টা করিব সুতরাং ব্যয় বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে চলিতে হইবে। প্রবন্ধগুলি প্রেস কপির উপযুক্ত করিয়া নকল করিতে সাহায্য করিতে পারেন এরূপ কএকটি লোকের আবশ্যক। ঠাকুরের সেবকগণের মধ্যে যিনি যিনি ঐ কার্য্যে সাহায্য করিতে সক্ষম তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। যে কোন স্থানেই তাঁহারা থাকুন ডাকযোগে প্রবন্ধ গুলি আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

এ সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। ভক্তগণ সকলেই উহা অবগত আছেন। মধ্যে ঠাকুরের কোন একটি দাস ভাবাবিষ্ট হইয়া আশ্রমবাসী ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া সোহাগের তিরস্কার-ছলে উঁহাদিগকে উপদেশ দেন যে আশ্রমে ঠাকুরের সেবার যে কোন কার্য্যই সাধনভজন। আশ্রমসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনভজনেচ্ছায় দূরদেশাদি অথবা তীর্থাদি ভ্রমণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপীসমাজ শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা কালে যাহাতে প্রেমানন্দে বিভোর, বিহ্বল ও অবশ হইয়া শ্রীযুগল-সেবায় বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেন। ধন্য সেবা নিষ্ঠা !

সুতরাং শ্রীপত্রিকার পরিচালনা কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করাও বোধ হয় ঠাকুরের সেবার অঙ্গ। ঠাকুরের আশ্রিত সকলেই যহ

রথী। আমি ক্ষুদ্র কীট; তাঁহাদিগকে উপদেশ দিব এ দুষ্প্রবৃত্তি আমার যেন কখন না হয়; তবে শ্রীপত্রিকা প্রচাররূপ সেবাকার্য্যে যে কারণে একটু বিঘ্ন হইতেছে তাহাই ঠাকুরের সেবকবৃন্দের গোচরে আনিলাম মাত্র। "ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।"

সম্পাদক।

বিলাপ

হরি হরি বিফলে জনম চলি গেল।
বিনা নিত্য-পদ সেবা, নিস্তার করিবে কেবা,
ইহ জ্ঞান যদি না হইল॥
সত্য সত্য সুনিশ্চয়, সর্ব্বদেব-দেবীময়,
পরব্রহ্ম নরাকার ধরি।
পাপী-জনে দিতে ত্রাণ, 'নিত্য'-রূপে ভগবান্
অবনীতে আইলা অবতরি॥

শত সুধাসার মথি', নবনীত হইল তথি,
তাহা পুণঃ প্রেমরসে মাজি!
নিরমিল কলেবর, মুনি-জন-মনোহর,
নবভাবে 'নিত্য'-দেহ সাজি॥
মন্মথ-মন্মথ রূপ, রাস-রঙ্গ-রস-কুপ,
ঝলকে ঝলকে প্রেম-ঝরে;
সেইরূপ নিরখিয়া, যেই থাকে পাসরিয়া,
সে জন কেমনে প্রাণ ধরে?

অমিয় জিনিয়া ভাষ, তাহে মৃদু মৃদু হাস,
বিম্ব জিনি সুরঙ্গ অধরে।
কমল নয়ন দ্বয়ে, করুণার ধারা বহে,
পাপী জন-পরিত্রাণ-তরে॥
সুবলিত করদ্বয়, তাহে শোভে বরাভয়,
গৈরিক বসনে ঢাকা তনু।
সে রূপের নাহি সীমা, অতুলনা অনুপমা,
সিন্দুর-আবৃত যথা ভানু॥
অমল কমল পদ, জিনি রক্ত কোকনদ'
প্রতি নখে চাঁদের উদয়।
পিয়ে সে চাঁদের সুধা, দূরে যায় ভব-ক্ষুধা,
জগ-জন-পরম-আশ্রয়॥
নিত্য-দাস যুক্তকরে, সদা চায় সকাতরে,
ওচরণ সেবা কবে পাব।
অথবা নুপুর হয়ে, বাজিব যুগল পায়ে,
রুণু ঝুণু রবে গুণ গাব॥

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

"রামলাল দত্ত।"

বিগত একশত বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা দেশে পাঁচজন শক্তি-সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচিত শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত আজ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর মনপ্রাণ বিমোহিত করিতেছে। এই পাঁচটী সাধকের জীবনচরিত ও সঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাবে সংগ্রহের জন্য অদ্যাপি বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা এই পাঁচটী সাধকের নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম:—

১। শ্রীযুক্ত রাজমোহন ৺কালঙ্কার প্রকাশ্য

রাজমোহন আম্বুলী। নিবাস—কাইচাল—বিক্রমপুর।

২। ৺ভুবনচন্দ্র রায়। নিবাস শ্যামগ্রাম ত্রিপুরা।

৩। ৺গোবিন্দ চন্দ্র রায় চৌধুরী। নিবাস—বগুরা, সেরপুর।

৪। ৺রামকুমার নন্দী। নিবাস বেজুরা

রামলাল দত্ত। নিবাস ভদ্রকালী—হুগলী।

বিগত চৈত্র মাসের সৌরভ নামক মাসিক পত্রিকায় মল্লিখিত ৺ভুবন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য আমরা রামলাল বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলাম। বর্ত্তমান সময় আমি উৎকট রোগে শয্যাশায়ী। এ অবস্থায় আমার মত বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে লেখনী সঞ্চালন করা দূরে থাকুক বাচনিক মনের অবস্থা ব্যক্ত করিতেও আয়াস বোধ করিয়া থাকি। অতিকষ্টে রামলাল বাবুর জীবনী যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহাই আজ প্রকাশ করিতেছি।

১২৫৫ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র তারিখে সাধক প্রবর শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত হুগলি জেলার অন্তর্গত ভদ্রকালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺নবীনচন্দ্র দত্ত; ও মাতা আনন্দময়ী। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তিনি জনাইর নিকটবর্ত্তী "কালাছড়া" গ্রামের হরিদাস মিত্রের কন্যা মোক্ষদায়িনীকে বিবাহ করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্থাপিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতঃ ৬ বৎসর কা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও উদয় চাঁদ গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর বৈদ্যনাথ মিশ্রের নিকট ৩ বৎসর ও শিবনাথ মিশ্রের নিকট ৫ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করতঃ রামলাল বাবু সঙ্গীত বিদ্যায় কৃতীত্ব লাভ করেন। তাঁহার যশ-সৌরভ বিস্তৃত হইলে কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের কণ্ঠসঙ্গীত শ্রেণীর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি দশ বৎসর কাল উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তিনি বিবিধ সদাগরী অফিসে ৩১ বৎসর কাল কেরাণীর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতাস্থ ফরাসী বেঙ্ক হইতে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপর আর তিনি বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হন নাই। মোক্ষদায়িনীর গর্ভে তাঁহার ৫টী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। মোক্ষদায়িনী অল্পকাল হইল পতির সমক্ষে প্রয়াগধামে নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ এখন বিষয়কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যৌবন কালেই রামলাল বাবুর ধর্ম্মানুরাগ জন্মে। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার কুলগুরু আঁটপুর নিবাসী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় দ্বারা দীক্ষিত হন। তৎপর গোঁদলপাড়া নিবাসী ৺কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা তাঁহার শাক্ত্যাভিষেক হইয়াছিল। তাঁহার ৪৩ বৎসর বয়সে সারদা মঠ অন্তর্গত জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ তাঁহাকে কৃপা করেন। এই মহাপুরুষ দ্বারা তাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ দ্বারা তিনি সাধনামার্গে বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ, বিদ্যারত্ন।

[কাঁহা বৃন্দাবন-ধন।]

(১)

হে মুরারি !
কত দিনে সে বাঁশরী তব
শুনে নাই ব্রজবাসী জনে,
আর যমুনা উজানে, সেই বিমোহন তানে
প্রীতি লহরী না উঠে জাগি ;
তাই প্রশ্ন,—"কোথা বৃন্দাবনে—
সেই বংশীধারী ?"

(২)

হে মাধব !
ললিত কুঞ্জশ্রী হীন আজি ;
যমুনায় নাহি জল-কেলি ;
আছে মাত্র সিংহাসন, নাহি নট-নারায়ণ
তাল, তমাল,—আছে পিয়াল,
না তুলে বিহগে তার শাখে—
"রাধা" "কৃষ্ণ" রব ॥

(৩)

রাধানাথ !
নাহি আর শ্রীদাম সুদাম,
উপানন্দ নাহি বলরাম,
নাহি সে কদম্ব ড'লে, বাস-চুরি কুতূহলে,
লুকাইলে তুমি, আর সঙ্গে—
তব লুকা'ল কি সব রঙ্গ
একে একে নাথ !

(৪)

হে কাণ্ডারি।
গোলকের হরি তুমি ছাড়ি'
ভূলোক, লুকাইলে কি প্রাণে ?
নিত্যলীলা যে অবধি, দেখাইলে হে প্রাণনিধি
পূর্ণভাবে ভকতের প্রাণে,
সে অবধি তুল কৃষ্ণনামে
অমৃত লহরী !

(৫)

মনচোর !
তাই বুঝি ভকতের প্রাণে
জাগাইয়াছ তুমি নানা ভাবে
বৃন্দাবন—রস-কথা, রাধা-কৃষ্ণ-মধুগাথা
দেখাইয়া সেই ধড়াচূড়া,
রাসেতে সেই রাই কিশোরী
মিলন মধুর !

(৬)

ভকতেশ !
রাস-বিহারী হরি, কর রাস
দিবানিশি লয়ে ব্রজেশ্বরী,
ভক্তপ্রাণ-মঞ্চেতুলে' সদা প্রেমের হিল্লোলে
নিত্য-প্রেম-বস্তু—তুমি অহরহ
ভক্ত-হৃদি নিত্য বৃন্দাবন
কর হৃদয়েশ !

(৭)

হে কৌশলি !
ভক্তিহীন সাধন দরিদ্রে
এই জীবনের অবসানে—
হ'য়ে হরি বনমালী, বাজাইয়া সে মুরলী
বা'মে ল'য়ে রাধিকা সুন্দরী
দেখা দিও বারেক আসিয়া,
যা'ব কুতূহলী ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

নিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, আশ্বিন। { ৯ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

(ক)

আমি আত্মা। তুমিও আত্মা। তিনিও আত্মা। শ্রুতিবেদান্তানুসারে একাত্মাই বিদ্যমান আছেন। শ্রুতিবেদান্তানুসারে আমি আত্মার সহিত তুমি আত্মার এবং তিনি আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আমি শব্দ, তুমি শব্দ এবং তিনি শব্দ একই আত্মার তিন প্রকার উপাধি মাত্র। ঐ ত্রিবিধ মায়িক উপাধিবশতঃ একই আত্মাকে ত্রিবিধ বলিয়া বোধ হয়। আমি বা অহমুপাধিবিশিষ্ট আমি, তুমি বা ত্বমুপাধিবিশিষ্ট তোমার

সহিত আমার ভেদ আছে বোধ করিয়া থাকি। অহমুপাধিবিশিষ্ট আমি, সোপাধিবিশিষ্ট তাঁহার সহিত আমার ভেদ আছে বোধ করি। আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব এবং তাঁহার তিনিত্ববশতঃ একাত্মার ত্রৈবিধ্য বোধ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান হইলে ঐ প্রকার ত্রৈবিধ্য বোধ হয় না। তখন আমি, তুমি এবং তিনি যে পরস্পর অভেদ ইহাই বোধ হইয়া থাকে। তখন আমি যাহা, তুমি তাহা, তিনিও তাহা বোধ হইয়া থাকে। তখন আত্মার আমি উপাধিও হানিজনক হয় না, তুমি উপাধিও হানিজনক হয় না এবং তিনি উপাধিও হানিজনক হয় না। তখন আমাকেও আমি বোধ হয়, তুমিকেও আমি বোধ হয়—এবং তিনিকেও আমি বোধ হয়। অথচ ব্যবহারকালে তুমি যাহাকে বলা উচিত, তাহাকে তুমি বলিতে হয়, তিনি যাহাকে বলা উচিত, তাহাকে তিনি বলিতে হয়। কেবলমাত্র জ্ঞানে আমি, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব বুঝিতে হয়। ব্যবহারকালেও আমি আমাকে আমিই বলি। কিন্তু তৎকালেও আমি আমাকে তুমি কিম্বা তিনি বলি না। অথচ আমিই আমি, তুমি এবং তিনি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি আমাকেই তুমি বলিয়া থাকে। আমি তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত রহিলে, সেব্যক্তি আমাকেই তিনি বলিয়া থাকে। সেইজন্যও আমি আমিও বটি, আমি তুমিও বটি, এবং আমি তিনিও বটি। সেইজন্য অনেক আত্মদর্শী ব্যবহারকালেও আমি, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব স্বীকার করেন। ঐ কারণেই পরমহংস শঙ্করাচার্য্য,—"জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ" বলিয়াছেন, ইহা অনেকের[illegible]। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ঐ প্রকার বলিবার স্বতন্ত্র কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মকার সাহায্যে অগ্নির সহিত লৌহের বিশেষ সংস্রব হইলে, লৌহও অগ্নি হয়। অথচ যেমন সে অবস্থায়ও লৌহ, লৌহ থাকে তদ্রূপ জীব শিব হইয়াও ঐ প্রকারে জীবও থাকিতে পারে। যেমন লৌহের অগ্নিত্ব হইলেও তাহার লৌহত্ব থাকে তদ্রূপ জীবের শিবত্ব হইলেও জীবত্ব থাকিতে পারে। শিবত্ব বিশিষ্ট জীবকেও জীবশিব বলা যায়। শাস্ত্রানুসারে নরও জীব, শিবও নারায়ণ। সেই জন্য জীবশিবকে নরনারায়ণও বলা যায়। অনেক শাস্ত্রমতে নারায়ণ শব্দও ব্রহ্মবাচক, শিব শব্দও ব্রহ্মবাচক। অতএব জীবশিব যিনি, তিনিই জীবব্রহ্ম বটেন। যিনি জীবব্রহ্ম, পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা যাইতে পারে, —"জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ।" যেমন লৌহ অগ্নি হইলে, লৌহও অগ্নি হয় তদ্রূপ জীব ব্রহ্ম হইলে জীবও ব্রহ্ম হয়। জীব ব্রহ্ম হইলে তখন তাহাকে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু বলা যাইতে পারে না। জীব ব্রহ্ম হইলে, তাহাকে অব্রহ্ম কি প্রকারে বলা যাইবে? জীব ব্রহ্ম হইলেও তাহার জীবত্ব থাকিলে, তাহাকে অজীবই বা কি প্রকারে বলা যাইবে? তখনও তাহাকে জীব বলিতে হইবে। জগতে যে জীবের আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জীবশিব বা জীবব্রহ্ম। জগতে যে জীবের আত্মজ্ঞান হয় নাই, তিনি কেবল মাত্র জীব। অতএব তিনি কেবল মাত্র অজ্ঞান দ্বারাই আচ্ছন্ন। তাঁহারও আত্মজ্ঞান হইলে, তিনিও শিব বা ব্রহ্ম বা নারায়ণ হইবেন। তখন আর তাঁহাকে অজ্ঞান অভিভূত করিতে পারিবেনা। কিন্তু তখন তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় কেবল মাত্র নিরাকার ব্রহ্ম হইবেন না।

তখন তিনি সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম হইবেন। যেহেতু শ্রুতি-বেদান্ত এবং অন্যান্য অদ্বৈতমতের গ্রন্থ সকলানুসারে জীব নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় নহে। ঐ সকল গ্রন্থ মতে কেবল নির্ব্বিকার ব্রহ্মই নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয়। অতএব জীবত্ব থাকিতে কেহই নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইতে পারেন না। যাঁহার জীবত্ব সত্ত্বেও ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়াছে, তিনি জীবব্রহ্ম, জীবনারায়ণ বা জীবশিব। যিনি জীবত্ব বিহীন হইয়াছেন তিনিই অজীব হইয়াছেন। তিনি নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় অলিঙ্গ শিব হইয়াছেন। তিনি নিগুর্ণ নিক্রিয় ব্রহ্ম হইয়াছেন। তাঁহারই জীবত্ব নামক বিকার তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহারই কৈবল্য লাভ হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকেই কেবলাত্মা বলা যায়। তাঁহাকেই শুদ্ধাত্মা বলা যায়। তাঁহার সহিতই পরমাত্মার অভেদত্ব! যতকাল পর্য্যন্ত কোন হস্তপদাদিবিশিষ্ট আত্মার জীবত্ব থাকে, অনেক আচার্য্যের মতে ততকাল পর্য্যন্তই, সেই আত্মাকে জীবাত্মা বলা হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে সেই আত্মা জীবত্ব বিহীন হইলেই, তাঁহাকে কেবলাত্মা বলা যায়। তখন সেই আত্মা দেহস্থ হইয়াও বিদেহী হন। তখন তাঁহার প্রকৃতির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব তখন তিনি প্রাকৃত কোন ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন না। অদ্বৈত মতে গুণকর্ম্মও প্রাকৃত। সেইজন্য তখন তাঁহার কোন প্রকার গুণকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। একটী ক্ষুদ্রাধারবিশিষ্ট মশিকে যদ্যপি বৃহৎ সাগরে নিক্ষেপ্ করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রাধারবিশিষ্ট মশিও সাগর হয়। তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তখন সেই মশির মশি নাম থাকে না, তখন সেই মশির মশিরূপ থাকে না, তখন সেই মশির মশির গুণ থাকে না, মশিদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তখন আর সেই মশি দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তখন তাহা অরূপ হয়। তখন তাহা নির্ণাম হয়, তখন তাহা নিগুর্ণ হয়, তখন তাহা নিষ্ক্রিয় হয়। তখন তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার নিজের রূপ, নাম, গুণ এবং ক্রিয়া থাকে না। ঐ প্রকারে জীবরূপ মশি শিবসাগর হয়, ঐ প্রকারে জীবরূপ মশি ব্রহ্মরূপ সাগর হয়। তখন জীবরূপ মশি 'সোঽহং' বলে না। যেহেতু সোঽহংত্বেও দ্বৈতত্ব আছে। তিনি আমি বলিলেও তিনির এবং আমির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। অতএব সেইজন্য 'সোঽহং' বলায় দ্বৈতত্ব স্বীকার করা হয়। যখন জীবরূপ মশি শিবসাগর হয়, যখন জীবরূপ মশি ব্রহ্মরূপ সাগর হয়, তখন জীব নিরহঙ্কার হয় বলিয়া, সে 'সোঽহং' বলিতে পারে না। তখন তাহার অহঙ্কার থাকে না বলিয়া, সে তখন 'সোঽহং' বলিতে পারে না। তখন তাহার পক্ষে 'স' উপাধিবিশিষ্ট-ব্রহ্ম থাকে না বলিয়া, তখন সে 'স' ও বলিতে পারে না। তখন তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বা পৃথকত্ব থাকে না বলিয়া সে তখন ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে 'স' শব্দেরও প্রয়োগ করিতে পারে না। জীব শিব হইলে বা ব্রহ্ম হইলে আর তাহার জীবত্ব থাকে না। অতএব তখন সেইজন্য জীবের অহঙ্কারও থাকে না। অতএব সে অবস্থায় আমি বলিবারও কেহ থাকে না। পূর্ব্বে যে জীব শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব বশতঃ 'সোঽহং' বলিত সেই জীব জীবত্ব বিহীন হইলে সে আর জীব থাকে না। সে জীব থাকে না বলিয়া সে ব্রহ্মবাচক 'স' শব্দের প্রয়োগ করে না। জীব না থাকিলে জীবের গুণকর্ম্মও থাকে না।

অতএব সেইজন্য সে সময়ে নির্গুণত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব বিদ্যমান থাকে। যে আত্মা জীবত্ব বিশিষ্ট ছিলেন, তিনি জীবত্ব বিহীন হওয়ায় নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন। তিনি জীবত্ব বিহীন হওয়ায় তাঁহার নাম ও আকারও নাই। তজ্জন্য তাঁহার কোন প্রকার উপাধিও নাই। তিনি জীবত্ব বিহীন হইয়া নির্ণাম-নিরুপাধি নিরাকার হইয়াছেন। আর তাঁহার গুণকর্ম্মে প্রয়োজন নাই। আর তাঁহার নাম, রূপ অথবা অন্য কোন উপাধিতে প্রয়োজন নাই। আর তাঁহার প্রাকৃত আকারে প্রয়োজন নাই। এক্ষনে তিনি নিষ্প্রয়োজন। ।১।

দৃষ্টির চাঞ্চল্য রহিত করার নামই ত্রাটক ।১।

একাগ্রতা দ্বারা দৃষ্টির স্থিরতাই স্বাভাবিক ত্রাটক ।২।

একাগ্রতা দ্বারা দৃষ্ট স্থির হইলে সমাধি হয় ।৩।

দুই প্রকার ত্রাটক আছে। বহিস্ত্রাটক এবং অন্তস্ত্রাটক। বহিস্ত্রাটক দ্বারা কোন বাহ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট হইতে পারে। অন্তস্ত্রাটক দ্বারা ভগবানে দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়া থাকে ।৪।

পরমেশ্বরকে নিত্যকারণ বলা যায়; পরমেশ্বরকে মহাকারণ বলা যায়, পরমেশ্বরকে পরমকারণ বলা যায়. পরমেশ্বরকে আদি কারণ বলা যায়, পরমেশ্বরকে অনাদিকারণ বলা যায় ।১।

পরমেশ্বরের দুই প্রকার লীলা আছে। সেই দুই প্রকার লীলার মধ্যে একপ্রকারের নাম লৌকিকী লীলা এবং অপর প্রকারের নাম অলৌকিকী লীলা ।২।

মনুষ্য যে সকল কার্য্য করে, সেই সকল কার্য্যের ন্যায় শ্রীভগবান যে সকল কার্য্য করেন, সেই সকল কার্য্য তাঁহার লৌকিকী লীলার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধণগিরিধারণ প্রভৃতি অসাধারণ কার্য্য সকলই তাঁহার অলৌকিকী লীলার অন্তর্গত ।৩।

শ্রীভগবানের একটী নাম গৌর। সেই গৌরের শক্তি গৌরী। গৌর শ্রীকৃষ্ণের অবতার। নারদপঞ্চরাত্র মতে রাধা এবং দুর্গা পরস্পর অভেদ। শাস্ত্রানুসারে দুর্গাই গৌরী। সেইজন্য গৌরীকে গৌরের শক্তি বলা যায় ।৪।

দুর্গাকে গৌরী বলিলে শিবকেও গৌর বলিতে হয়। ব্যাকরণানুসারে গৌর শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক। সেই গৌর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গৌরী ।৫।

শিবের শক্তি গৌরী। সুতরাং শিবকেও গৌর বলিতে হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীশচী-নন্দনকেও গৌর বলা হয়। সেই শ্রীশচী-নন্দনকে গৌরাঙ্গও বলা হয়। গৌর যাঁহার অঙ্গ তিনিই গৌরাঙ্গ। শিব গৌর, সুতরাং শচীনন্দনের অঙ্গ শিব ইহাও বলা যাইতে পারে। অতএব গৌর এবং শিবকে অভেদ ভাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোন আম্র এবং সেই আম্রের ত্বক কি পরস্পর অভেদ নহে? আম্র এবং আম্রের ত্বক যে প্রকারে অভেদ সেই প্রকারে শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ এবং তাঁহার অঙ্গস্বরূপ শিবগৌর পরস্পর অভেদ। শ্রীশচীনন্দনগৌরাঙ্গ এবং শিবগৌর পরস্পর অভেদ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-কেও শ্রীগৌর বলা হইয়া থাকে ।৬।

শিবের বীজ হুং। শ্রীশচীনন্দনগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে সময়ে সময়ে হুঙ্কার করিতেন। শ্রীশচীনন্দনমহাপ্রভুর মহাভাবের সময়ে স্বভাবতঃ তাঁহার আস্যবিবর হইতে হুঙ্কার

স্ফুরিত হইত। অতএব শ্রীশচীনন্দনগৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দের পক্ষে শিবও অপূজ্য নহেন।৭।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শিব-গৌরের শক্তি শিবাণী গৌরী। শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌর, কৃষ্ণের অবতার। গায়ত্রী তন্ত্রেরমতে শিব-কৃষ্ণ অভেদ। শিব-কৃষ্ণ অভেদ বলিয়া শিব-গৌরও অভেদ।৮।

অগ্নিসংযোগে অঙ্গার অগ্নি হইয়াছে। এখনি ঐ অগ্নিসংযুক্ত অঙ্গারে জল নিক্ষেপ করিলে কেবলমাত্র অঙ্গারই থাকিবে। যখন যশোদার-বাৎসল্যভাবযুক্ত কোন ভক্ত হন তখন তাঁহার আপনাকে যশোদা বলিয়াই বোধ হয়। সেই ভাবের অভাব হইলে আর আপনাকে যশোদা বলিয়া বোধ হয় না। তবে যে শুদ্ধভক্ত নিত্যকালের জন্য যশোমতীর বাৎসল্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর কোন কালে আপনাকে অযশোদা বলিয়া বোধ করিতে হয় না। তাঁহার ভাবের নিত্যত্ববশতঃ তিনি নিয়তই ভগবানকে শুদ্ধ বাৎসল্য ভাব দ্বারা সম্ভোগ করিয়া থাকেন।৯।

কুতার্কিকেরই সঙ্গত কথায় প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তিনি প্রতিবাদও করিয়া থাকেন।১০।

যাঁহার যে বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহার সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুখ বোধ হয়। তিনি সেই বিষয়ে আলোচনাও করিয়া থাকেন।১১।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক মত আছে। সেই জন্য তোমার মতের সঙ্গে অন্যান্য মতের অনৈক্যও আছে। তোমার মতাপেক্ষা অন্যান্য মতকে নিকৃষ্ট বলিও না এবং অন্যান্য মত সকলের প্রতিবাদও করিও না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাঁহার যে মতে বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে সেই বিশ্বাস হইতে বিচলিত করিও না। ঐ প্রকার করিলে তোমার অপরাধ হইবার সম্ভাবনা আছে।১২।

যিনি চর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত চর্ম্মকার। চর্ম্ম সৃজনও পরমেশ্বর করিয়াছেন। সেইজন্য পরমেশ্বরকেই প্রকৃত চর্ম্মকার কহা যায়।১৩।

শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা একই কালের তিন প্রকার বিকাশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একই ব্রহ্মের তিন প্রকার বিকাশ। সেইজন্য ঐ তিনকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হয়।১৪।

গণ শব্দ বহুবাচক। গণ অর্থে সমূহ। সেইজন্যই গণেশ শব্দের অর্থ সর্ব্বেশ্বর। গণেশ কেবলমাত্র একব্যক্তিরই ঈশ্বর নহেন। জগতের সকল দেশের সকল লোকেরই গণেশ পূজায় অধিকার আছে।১৫।

কোন প্রকার কর্ম্মফল যাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না তিনিই পরমেশ্বর।১৬।

যাঁহাতে পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তি এবং মহিমা বিকাশিত দেখা যায়, তাঁহাতেই পরমেশ্বরের পূজা করা যাইতে পারে। সূর্য্যে পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তি ও মহিমা প্রকাশিত। সেইজন্য সূর্য্যাবলম্বনে সূর্য্যে পরমেশ্বরের পূজা করা হয়। অগ্নিতে পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তি ও মহিমা প্রকাশিত। সেইজন্য অগ্নি অবলম্বনে অগ্নিতে সেই ব্রহ্মসূর্য্যের বা পরমেশ্বরের পূজা করা হইয়া থাকে। বায়ুতে পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তি ও মহিমা প্রকাশিত। সেইজন্য বায়ুতে পরমেশ্বরের পূজা করা হয়।১৭।

ধর্ম্ম যাঁহার প্রভু, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাসেরই ধর্ম্মবল আছে। ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মবল আছে বলিয়া ধর্ম্মদাসের সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে অবিশ্রামনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রামনগরে

যাওয়া যায়। বিদ্যানগরে প্রবেশ করিতে পারিলে বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবকে দর্শন করা যায়। তাঁহাকে একবারমাত্র দর্শন করিলে আর অবিদ্যানগরে প্রবেশ করিতে হয় না।১৮।

সকল প্রকার পাপ পুণ্যে যিনি বিরত তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ। তাঁহার প্রতি বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা।১৯।

পাপ মালিন্য। মালিন্য কৃষ্ণবর্ণ। গৌরাঙ্গ নিষ্পাপ। সেইজন্যেই তিনি অকৃষ্ণবর্ণ, সেইজন্যই তিনি অমলিন।২০।

সূর্য্য উদয় হইবার সময় সূর্য্য হইতে অল্প কিরণই বিকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে অধিক সূর্য্যকিরণ প্রকাশিত হইতে থাকে। তোমার হৃদাকাশে চৈতন্য-সূর্য্যোদয় হইয়াছে বটে তবে তাঁহার কিরণ এখনো পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। কোন শুদ্ধ ভক্তের হৃদাকাশে পূর্ণরূপে চৈতন্য-সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সে সূর্য্য আর অস্তমিত হন না।২১।

যে বস্তু আহার করিলে নিজের এবং অন্যের অপকার হয় না, তাহাই আহার করা উচিত। তাহাই বিশুদ্ধ আহার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।২২।

যে বস্তু আহার করিলে শরীর এবং মন সম্বন্ধে অপকার হয় না সেই বস্তুই আহার করা উচিত।২৩।

যাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাঁহার আহার্য্যে প্রয়োজন নাই বলিতে পার না এবং তিনি আহার না করিলেও তাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে এই কথাও বলিতে পার না। যাঁহার তৃষ্ণার উদ্রেক হয় তাঁহাকে জল পান করিতে হয় না বলিতে পারনা এবং তিনি জল পান না করিলেও তাঁহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে একথা বলিতে পার না। সামান্য জীব ক্ষুধাতৃষ্ণার সম্পূর্ণ অধীন। জীব তবে কি প্রকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা বিহীন হইয়া সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তি জন্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে? ক্ষুধাতৃষ্ণা বিহীন হইলেই বা সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কি সুবিধা হইবে? নানা প্রকার জড় বস্তুর ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। সেজন্য তাহারা কি সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়াছে? সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ভক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, বিশেষ অনুরাগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পানাহার পরিত্যাগ দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ সম্বন্ধে বিশেষ আনুকূল্য হয় না। বরঞ্চ পরিমিত পানাহার করিয়া তাঁহার ভজনা সম্বন্ধে আনুকূল্য হইয়া থাকে। যেহেতু পানাহার করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতে হয় না এবং তন্নিবারণ জন্য ঔৎসুক্য হয় না। অতএব পানাহার দ্বারা ভজনার কোন বিঘ্ন হয় না। তবে বিশুদ্ধ পানীয় এবং সাত্ত্বিক ভাবের অনুকূল ভক্ষ্যদ্রব্য সকল ভজনা পক্ষে আনুকূল্য করিয়া থাকে। কলিকাল শাস্ত্রানুসারে কোন প্রকার কঠোর তপস্যার উপযোগী নহে। অতএব পানাহার পরিত্যাগে তপস্যাবলম্বনে ভগবানকে পাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু কাশীখণ্ডে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে,—

"ন সিদ্ধতি কলৌ তপঃ।"

নানা শাস্ত্রানুসারে কলিকল্মষযুক্ত জীবগণের অন্নগত প্রাণ। সেইজন্য অন্নপরিত্যাগে সাধন ভজন করা অতি দুষ্কর হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—

"কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসপ্রশস্যতে"।২৪।

যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ভোজনের প্রয়োজন হয়, তৃষ্ণার উদ্রেক হইলে জলপান করিতে হয় তদ্রূপ কোন প্রকার পীড়া হইলেও

ঔষধি সেবন করিতে হয়। ভগবান যেমন বিবিধ প্রকার পীড়ার সৃজন করিয়াছেন তদ্রূপ তিনি সেই সকল নিবারণ জন্য বিবিধ ঔষধেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।

যিনি সংসার সম্বন্ধে বিরূপ হইয়াছেন, তাঁহার যিনি অক্ষস্বরূপ তিনিই বিরূপাক্ষ। জড় অক্ষ দ্বারা জড় দর্শন করা হয়। গুরুরূপ অক্ষ দ্বারা নিজ ইষ্টদেবতাকে দর্শন করা হয়। সেইজন্য গুরুকেও বিরূপাক্ষ বলা যায়। গুরু স্বয়ং শিব। সেইজন্য শিবই বিরূপাক্ষ। ১।

বিরূপ শব্দের অর্থ অরূপও হইতে পারে। সেইজন্য বিরূপাক্ষ শব্দের অর্থ অরূপাক্ষ। জ্ঞানের রূপ নাই। সেইজন্য জ্ঞানকেও অরূপ বলা যায়। অনেক শাস্ত্রে জ্ঞানকেও একপ্রকার অক্ষ বা অক্ষি বলা হইয়াছে। সেইজন্য বিরূপাক্ষ অর্থে জ্ঞান চক্ষুও বলা যায়। কিম্বা যাঁহার জ্ঞানচক্ষু আছে তাঁহাকেও বিরূপাক্ষ বলা যায়। শাস্ত্রানুসারে শিবেরই জ্ঞাননেত্র। সেইজন্য বিরূপাক্ষ অর্থে শিবই বুঝিতে হয়। কারণ শিবেরই জ্ঞান চক্ষু। ২।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার মাহাত্ম্য।

পরমেশ্বর কর্তৃক যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে, মহাত্মা জগন্নাথপুত্র শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু দ্বারা সেই সমস্ত ক্রিয়ার ন্যায় অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার লীলা সময়ে অনেক ভক্তিমানই তাঁহার অপরূপ-দিব্যমূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীবলরামের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার যে দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কহা যাইতেছে,—

"তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্‌ভুজ দর্শন॥
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শার্ঙ্গ বেণুধর॥
তবে চতুর্ভুজ হইল তিন অঙ্গে বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায় দুয়ে শঙ্খ চক্র॥
তবেত দ্বিভুজ কেবল বংশী বদন।
শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

যাঁহারা ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অলৌকিকী-লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাতে রত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অহৈতুকী দয়ার তুলনা ছিলনা; তিনি জগন্নাথ মাধবের ন্যায় সর্ব্বপাপের পাপীগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও তিনি বরাভয় প্রদান করিয়াছিলেন। অতিপাপী জগাই মাধাই তাঁহার কৃপাপাত্র হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকেও প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া স্বীয় আজানুলম্বিত বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি মহানিন্দুক চাপাল গোপালেরও অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত হইয়াও কি প্রকারে পরমভক্ত হইতে হয়, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পণ্ডিত হইয়া, পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তি এবং দিব্যপ্রেমের কত ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাও তিনি পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি সামান্য পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত আত্মারাম বিষয়ক শ্লোকের যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সকল ব্যাখ্যা কোন মনুষ্য-পণ্ডিত করিতে পারেন না। সেই জন্যই অসাধারণ পণ্ডিত বাসুদেবসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সেই মহা প্রভু চৈতন্যদেবকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে রূপ সনাতন প্রভৃতি

অনেক মহামহোপাধ্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। উদ্ধত নবাব হোসেন্ সা পর্য্যন্ত, তাঁহার অমানুষী ক্ষমতা বলে, তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রেমে অতি পাষণ্ডও তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ যে প্রেমের সমুদ্র ছিলেন। সেই সমুদ্রের বন্যাতে জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের পরমপ্রেম সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছিল। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সেই দিব্যপ্রেম কেবল মাত্র বিশেষ কোন ব্যক্তিতে আবদ্ধ ছিলনা।

বিবিধ তত্ত্ব।

যিনি তোমাকে কোন গর্হিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন তিনি তোমার মিত্র নহেন। তুমি যদি উন্নতি করিতে চাহ তাহা হইলে তাঁহার সংসর্গ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ১।

যাঁহার অধিক রাগ তাঁহার রাগই প্রধান শত্রু, সেই রাগই তাঁহার সহিত কত লোকের শত্রুতা করাইবার কারণ হয়। যাঁহার অধিক কাম সেই কামই তাঁহার প্রধান শত্রু; সেই কামই তাঁহার সহিত কত লোকের শত্রুতা করাইবার কারণ হয়। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতিও জীবের সামান্য শত্রু নয়। উহাদের দ্বারা ও অভ্যান্য শত্রু হইতে পারে। ২

যাঁহার অধিক অভিমান আছে তাঁহার অধিক রাগ ও আছে। অভিমানের সঙ্গে রাগের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ৩।

অবমাননা বোধ যাঁহার হয় তাঁহার রাগও হয়। ৪।

তোমার যাহার প্রতি রাগ হইবে তাহারও তোমার প্রতি রাগ হইবে। তোমার রাগ থাকার জন্য তুমি তাহার শত্রু হইবে, সেও তোমার শত্রু হইবে। শত্রু হইবার কারণ ও রাগ। ৫।

তোমার ভিতরের কএকটী শত্রুই বাহিরের অনেক শত্রু করিবার কারণ হয়। ভিতরের শত্রু থাকিতে বাহিরের শত্রু কমিবার সম্ভাবনা নাই। ৬।

যাঁহার ভিতরে শত্রু নাই তাঁহার বাহিরে শত্রু হইলেও সে শত্রু প্রবল হইতে পারেনা। ৭

অন্যের দোষ প্রকাশ করিবার জন্য তোমার যেমন অতিশয় ব্যগ্রতা তদ্রূপ আত্মদোষ গোপন করিবার জন্য তোমার সেই প্রকার ব্যগ্রতা। তোমার আত্মদোষ গোপনে যে প্রকার যত্ন অন্যের দোষ গোপনে সেই প্রকার যত্ন হয় না কেন? ৮।

যিনি তোমার প্রশংসা করিয়াছেন তোমার প্রতি অসন্তোষ প্রযুক্ত তিনি তোমার আর প্রশংসা না করিলে, কেবলই তিনি তোমার নিন্দা করিলে জানিবে তিনি মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চক উভয়ই বটেন্। তাঁহার প্রশংসা কিম্বা নিন্দায় আর তুমি প্রতারিত হইও না। ৯

তোমার প্রশংসাতেও বিশ্বাস করিনা। কারণ তুমি অন্য যাহার প্রশংসা করিতেছ, অন্য সময়ে তুমিই তাঁহার নিন্দা করিতে পার। লোক স্বার্থবশতঃই প্রশংসা এবং নিন্দা করিয়া থাকে। ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, সত্যের অনুগত হইয়া যিনি প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা করেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহাকেই সত্যবাদী বলা যাইতে পারে। ১০।

এক সময়ে তোমার যিনি প্রশংসা করিয়াছেন ইদানী তিনিই তোমার নিন্দা করিতেছেন। তাই বলি কেহ প্রশংসা করিলে যেন তোমার আনন্দ বোধ না হয়, এবং কেহ নিন্দা করিলেও যেন নিরানন্দ না হয়। প্রশংসা নিন্দা উভয়েই মিথ্যা প্রশংসা নিন্দা

উভয়েই বিশ্বাস যোগ্য নহে। প্রকৃত জ্ঞানীর উভয়েতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। তাঁহার প্রশংসাতেও আনন্দবোধ নাই, নিন্দাতেও নিরানন্দ বোধ নাই। ১১।

তোমার অসময়ে যে উপকার করে নাই তাহার অসময়ে তোমার সাহায্য যদি তাহার প্রয়োজন হয় তাহাও করিবে। তোমার সাহায্য সে করে নাই বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া তাহার সাহায্য করিবে না তাহা করায় অপরাধ ও প্রত্যবায় আছে। ১২।

তোমার শৈশবের কোন কথা স্মরণ নাই বলিয়া কি তোমার শৈশব হয় নাই? তোমার জীবনে, শৈশবে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, সে সমস্ত তোমার স্মরণ নাই বলিয়া কি তোমার জীবনে, শৈশবে কোন ঘটনাই হয় নাই? জীবের বিগত কোন জন্মের কথাই স্মরণ থাকেনা বলিয়া কি বলিতে হইবে বারম্বার জন্ম হয় না? ১৩।

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রের মতে পাপক্ষয় করিবার জন্য পাপীকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়! সেই জন্য মহামহা পাপ করিয়া মৃত্যু হইলেও উদ্ধারের উপায় আছে। ১৪।

যেমন সকল মনুষ্যের একপ্রকার স্বর নহে, তদ্রূপ সকল মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবও নয়। ১৫।

আক্ষেপ।

যদি দেখা হ'লো, কেন আশা পূরি;
দেখিলাম নাহি চাহিয়া।
কেন বা সরমে অবনত মুখে,
রহিলাম পাছু ফিরিয়া॥
যদিও সে সখা ছিলগো দাঁড়া'য়ে,
আমারি পানেতে চাহিয়া।
(তবে) আমি কেন হায়, দ্রুত পদে পদে
আসিলাম দূরে সরিয়া॥

কেন মুখ তুলে তার মুখ পানে,
রহিলাম নাহি চাহিয়া।
কেন তার আশা নিরাশা করিয়া
আসিলাম আমি চলিয়া॥
(আহা) সখা কত ব্যথা মরমে মরমে
পেয়েছে আমারি লাগিয়া
শেষে মরমের ব্যথা জানাতে আমারে
এসেছিল সেথা ধাইয়া॥

শ্রী—

আগমনী।

আনন্দময়ী মা! এস মা! এস মা! আমরা সারাটী বৎসর যে আকুল প্রাণে কেবল মা তোমার পানে চেয়ে আছি। এস মা গণেশ জননি! তোমার আদরের গণপতিকে কোলে লইয়া ভুবন-মোহিনী বেশে এস মা! গণেশ কোলে তোমাকে দেখ্‌তে যে বড়ই ভাল বাসি মা! মায়ের কোলের অলঙ্কারইতো সন্তান; তাই মা তোমার কোলে গণপতি দেখতে বড়ই আনন্দ হয় মা! বিশ্বজননি! এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই তো মা একমাত্র প্রসূতি; তাই মা আজ এ ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিয়া তোমার মধুর আহ্বানধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলে তোমারই সন্তান; তাই আজ তুমি আস্‌বে ব'লে সকলেই কত আনন্দিত হইয়াছে; সকলেই তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছে! ঐ দেখ মা! তুমি আস্‌বে ব'লে বিহঙ্গকুল আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে ডালে ব'সে কেবল মা তোমারই সু-মধুর আগমনী গান করিয়া ভুবন মাতাইতেছে! ঐ দেখ মা! তুমি আস্‌বে ব'লে তরুলতা সমস্ত নানাবিধ মনোহর ফলফুলে শোভিত হইয়া তোমারই আগমনবার্ত্তা জগতে ঘোষিত করিতেছে। মা শারদে! আবার ঐ দেখ মা শারদাকাশের শশী, তারা সকলেই আজ কেমন সুন্দর প্রাণমন-মুগ্ধকর কিরণরাশি বিস্তার করিয়া তোমার আগমন-উল্লসিত বিশ্বকে কেমন আলোকিত করিয়াছে! এস মা! মা ছাড়া হ'য়ে সন্তান আর কতকাল থাক্‌তে পারে মা? একদিন নয়, দুদিন নয়, এ সুদীর্ঘ বৎসর তোমায় না দেখে আছি মা! আর যে থাক্‌তে পারি না মা! মাগো! তুমি যে খেলানা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেগিয়েছিলে দেখ মা! তোমার সেই খেলা খেল্‌তে গিয়ে তোমার সন্তানের কি দুরবস্থাই না ঘটেছে! চেয়ে দেখ মা, সর্ব্ব-শরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ জীর্ণ শীর্ণ; কেবল প্রাণে বেঁচে আছি মা! তাই আজ খেলা ছেড়ে তোমার কথা মনে পড়েছে। একবার এস মা! বড় সাধ একবার তোমায় প্রাণভরে মা মা বলে ডাক্‌ব, আর তোমার ঐ দুঃখ-ভুলান মুখ পানে চেয়ে থাক্‌ব। মা! একবার কি এ দীনহীন কাঙ্গাল সন্তানকে ধূলো ঝেড়ে কোলে করবি না মা? মাগো! সন্তানের যে মা বিনে আর গতি নাই; তুমি, কোলে না নিলে আর কার কাছে যাব মা? আর কার কাছে দাঁড়াব মা? আর কে আদর ক'রে আমার অশ্রুজল মুছায়ে দিবে মা? কু সন্তান হ'লেওতো মা তুমি তাকে তোমার দিব্য-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত করনা, তাই বলি মা এস!

নিত্যময়ী মা! তুমি পতিতপাবনী, অধম-তারিণী সত্য, কিন্তু তুমি যে আমাদের মা; আমরা তোমার সন্তান, আমাদের যে তোমার উপর চিরদিনের দাবি! মা আর ভু'লে থেকনা, একবার এস মা! সন্তানের দুঃখ মা বিনে আর কে বুঝিবে? তাই মা কত দুঃখের পশরা মাথায় ল'য়ে আকুল প্রাণে কেবল তোমার দিকে চাহিয়া আছি মা! এস মা শান্তি-দায়িনী! একবার এসে তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি-সুধা ঢেলে দাও মা! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তোমার সমস্ত সন্তান তোমার সেই দিব্যশান্তি-সুধা পানে মাতৃপ্রেমে বিহ্বল হয়ে আত্মহারা হ'য়ে যা'ক্।

করুণাময়ি ! এস মা ! তোমার মা নামের এমনি শক্তি, এমনি গুণ যে ঘোরতর বিপদে পড়েও যদি আকুল প্রাণে মা মা বলে ডাকি অমনি যেন সে বিপদ কোথায় চলিয়া যায়। আজও বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে মা মা বলে ডাকৃছি একবার এস মা। মাগো প্রাণ আর তোমায় ছেড়ে থাকৃতে চায় না। মা! আবার যেন তোমার ভুবন-ভুলান খেলানা দিয়ে আমাকে ভুলায়ে ফেলে যেও না ! মাগো ! আমার যে মা বলার সাধ এখনও কিছুই মিটে নাই মা ! কবে তুমি কোলে তু'লে লবে আর তোমার দুঃখ ভুলান মুখ পানে চেয়ে আনন্দে প্রাণভরে মা মা ব'লে ডাকবো ? মা গো ! তোম'হেন মা পেয়েও আমার মা বলার সাধ মিটিল না, এ দুঃখের কথা আর কার কাছে বলিব মা !

আনন্দময়ী মা ! আর আমাদিগকে নিরানন্দে রেখনা মা ! একবার এসে দাঁড়াও মা ! জগৎ তোমার ভুবন-ভরা মাতৃরূপ দর্শন ক'রে প্রেমানন্দে মাতিয়া যা'ক্। অনন্তরূপিণি। তুমিইতো মা ! ত্রেতাযুগে সীতারামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হ'য়ে জগতে দিব্য-শান্তি প্রদান করিয়াছিলে। তুমিই তো মা ! দ্বাপরে ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে জগতে দিব্যপ্রেম, দিব্যানন্দ শিক্ষা দিয়াছিলে। তুমিই তো মা সে দিন শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌর-নিতাই রূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবের ঘরে ঘরে তারকব্রহ্ম মধুর হরিনাম বিলাইয়া হরিনামের বন্যায় নদীয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলে ! আবার তুমিই মা জ্ঞানানন্দ-রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জীবকে নিত্য-প্রেমে বিভোর করিতেছ। তাই বলি মা ! একবার এসে আনন্দ দাও মা !

জগজ্জনি !

একবার তোমার ভুবন-মোহিনী মাতৃরূপে এসে দাঁড়াও মা ! আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সন্তান তোমায় ঘিরে দাঁড়াই ; সন্তানবেষ্টিতা হইয়া মা তোমার আজ কি অপূর্ব্ব শোভাই হইবে। মা ! এস মা ! একবার দাঁড়াও মা ! তোমার আদর-সোহাগে রঞ্জিত, মুখ খানি দেখে সকল দুঃখ ভুলে যাই, আর সকলে একতালে একস্বরে ব্যাকুল প্রাণে প্রাণভরে "মা, "মা" ব'লে প্রাণ জুড়াই। জয় আনন্দময়ী মা আমার ! জয় জ্ঞানানন্দরূপিণী নিত্যময়ী মা আমার !!

কাঙ্গাল ছেলে
বিনয়।

"একটী কথা"।

ভক্তি না শিখায়ে ভক্ত আবরণে
বাঁধিয়া রেখেছ কেনগো মোরে।
প্রেম না বুঝায়ে, প্রেমের নিগড়ে
রেখেছ কুটিল প্রেমিক করে॥
পথ না দেখা'য়ে, পথিক ক'রেছ
জটিল সংসার-অরণ্য-পথে।
বাসনা দিয়েছ, সাধনা দাওনি,
কত প্রলোভন দিয়েছ সাথে॥

শকতি নাহিক, বহিতে দিয়েছ
পাপ-তাপ-বোঝা মাথায় তুলে।
বিষয়ে মজিয়ে অর্থ-চিন্তা নিয়ে
আছি শুধু "নিত্য-গোপাল" ভুলে॥

অভাগা
শ্রীঅমূল্যমোহন চৌধুরী।

বৈরাগ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিত-অংশের পর।)

দিব্যজ্ঞান বৈরাগ্যের কারণ। দিব্যাভক্তি ও দিব্যপ্রেমের সহিত ও বৈরাগ্যের বিশেষ সম্বন্ধ। এক বৈরাগ্যই ভগবদ্বিষয়িনী সর্ব্বভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ। এমন সঞ্জীবনী সুধা ত্যাগ করিয়া যে, বিষয়-বিষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেনঃ—

"দোষেণ তীব্রোবিষয়ঃ কৃষ্ণ-সর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপরম্‌" ॥

অর্থাৎ—বিষয়পদার্থ দোষাংশে কালসর্প-বিষাপেক্ষাও তীব্র, কেননা বিষ যে সেবন করে সেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ তাহা দর্শন দ্বারা দর্শকের নাশ সাধনে সক্ষম হয়।

অগ্নির সন্নিকটে থাকিলে যেরূপ তাহার উষ্ণতাশক্তি শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংসারের নিকটে থাকিলেও সাংসারিক ভাব সকল সংক্রামিত হইয়া থাকে। যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিয়াছেনঃ— "ঐ অবস্থায় (অপরিপক্কাবস্থায়) ঘোর সংসারীর নিকট সর্ব্বদা সাবধান হইবে। ঐ অবস্থায় একেবারে সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করিবে। ঐ অবস্থায় সংসার এবং সংসারী মহা-বিঘ্ন-জনক। ঐ অবস্থায় নরের পক্ষে নারী এবং নারীর পক্ষে নর কালসর্পাপেক্ষা ভয়ানক অনিষ্টকর"। এই জন্য বৈরাগ্যপথের পথিকের বিষয়ীর সংসর্গ নিষিদ্ধ। সর্ব্বত্যাগী-বৈরাগী-সঙ্গ বিধেয়। উক্ত প্রকার পথিকের শুকদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রূপগোস্বামী' সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পরমবৈরাগী মহাত্মাগণের জীবনী এবং উপদেশাবলী পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অধিক লোক-সঙ্গ চিত্ত-বিক্ষেপ এবং বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং বৈরাগ্য-পথিকের তাহা বর্জ্জনীয়। বৈরাগীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই উপদেশ আছে,—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হৈয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

সর্ব্ব প্রকার দলেই বন্ধন আছে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকায় মুক্ত করিয়া দিলেও উড়িতে পারে না, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল কোন দলভুক্ত থাকিলে মুক্ত হইয়াও দল-সংস্রব-জনিত সংস্কার-বশে নিজকে বদ্ধ বিবেচনা করিয়া

বদ্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা মন সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে, যেহেতু তদ্দ্বারা নিজ অনিচ্ছাসত্বেও অন্যের অনুরোধে অনেক সময় সৎ এবং স্বাধীন মতকে পদদলিত করিয়া বাধ্য হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। "সুবর্ণশৃঙ্খল এবং লৌহশৃঙ্খল উভয়েই একই শৃঙ্খল ব্যতীত অপর কিছু নহে; বন্ধন উভয়েরই কার্য্য"; কেবল বর্ণমাত্র ভেদ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দলের সংস্রবে থাকাও মহা বন্ধন। সুতরাং **সাধক বৈরাগীর কোন প্রকার দলের সংস্রবে না থাকাই মঙ্গল। সাধক বৈরাগীর সিদ্ধাবস্থা লাভের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিয়ত একস্থানে বাস না করিয়া পর্য্যটন ও ভিক্ষাকরা কর্ত্তব্য"।** কারণ, নিয়ত একস্থানে বাস করিলে আসক্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সাধক বৈরাগীর ধনী, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্তব্যক্তি, তার্কিক, নাস্তিক এবং নারী প্রভৃতির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।

মৃত্যু যেমন অভ্যাসের বস্তু নয়, মৃত্যু যেমন জাতি নির্ব্বিশেষে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ় পুরুষ, নারী, ধনী, নির্ধনী প্রভৃতি বিচার না করিয়া যে কোন সময়ে উপস্থিত হইতে পারে, বৈরাগ্যও তদ্রূপ জাতি নির্ব্বিশেষে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়, পুরুষ, নারী, ধনী, নির্ধনী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সর্ব্বকালেই উপস্থিত হইতে পারে। মৃত্যু যেরূপ পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজ কার্য্য সাধিত করে, দারা-পুত্রকলত্রাদি যেরূপ তাহার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের কারন হইতে পারে না, প্রকৃত বৈরাগ্যও তদ্রূপ অনিত্য সংসারের অপেক্ষা না করিয়া এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অনন্ত ত্যাগের পথে টানিয়া লইয়া যায়। স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদি তাহার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের কারণ হইতে পারে না। যেরূপ নিদ্রা, ও সুখ ও মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক, সাধন-সাপেক্ষ নহে সেইরূপ বৈরাগ্যও স্বাভাবিক, সাধ্য নহে। যেমন নিদ্রার সময় উপস্থিত হইলেই নিদ্রা আসিয়া থাকে, জন্মের সময় উপস্থিত হইলেই জন্ম হয়, এবং মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তদ্রূপ বৈরাগ্য উদয়ের সময় উপস্থিত হইলেই বৈরাগ্য হইতে থাকে। সমস্তই সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য্য ও বিশ্বাসই সিদ্ধির উপায়। উচ্ছ্বসিত পূত-প্রবাহিনী বৈরাগ্য-সুরধনী যে ব্রহ্মসাগর-সঙ্গমের জন্য উন্মাদিনী তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? সে মিলনের প্রতিবন্ধক কে হইতে পারে? প্রেমাস্পদই প্রেমিকার টান জানে। সেযে একটানা স্রোত; প্রাণনাথ ভিন্ন তাহার যে অন্য কামনা নাই; প্রাণারামেই যে তাহার কেবল আরাম; তিনি যে তাহার একমাত্র গতি; তিনিই যে তাহার একমাত্র হৃদয়-রাজ-প্রাণবল্লভ পতি; তাহার সর্ব্বস্ব যে সেই সর্ব্বপ্রাণ প্রাণারামে অর্পিত; প্রাণ-পতি ভিন্ন যে তাহার অন্য কিছুই নাই; সে যে নিত্যধনে ধনী। সুতরাং অনিত্য বিষয়াদি কি প্রকারে তাহার রুচি উৎপাদনের কারণ হইবে?

প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ট রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণে উক্ত হইয়াছেঃ—

"ন ধনেন ভবেন্মোক্ষঃ কর্ম্মণা প্রজয়া ন বা।
ত্যাগ মাত্রেণ কিন্ত্বেকে বতয়োঽশ্নান্তি চামৃতম্।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেনঃ—

"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"। ১২।১২।

মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং, কুলেচ্যুতি-ভয়ং বিত্তে

নৃপালাদ্ভয়ং মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ং।

শাস্ত্রে বাদি-ভয়ং গুণে খলভয়ং কালে কৃতান্তাদ্ভয়ং সর্ব্বং বস্তুভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈরাগ্যেই অভয়, শান্তি এবং অমৃত নিহিত আছে। সংসার-ভোগাদি দ্বারা মনের মনত্বের লোপ হইয়া থাকে, সুতরাং সেই মৃত মন দ্বারা কি প্রকারে পরমপ্রেমাস্পদ প্রাণারাম শ্রীনিত্য-ভগবানের সেবা হইতে পারে? যে প্রাণে বৈরাগ্যরূপ চৈতন্যশক্তি নাই, সে প্রাণের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সে প্রাণ মৃত, অসার; এমন মৃত-প্রাণ-ধারণের আবশ্যকতা কি? যে বৃক্ষ নীরস, সুমধুর-ফল ফুল শূন্য শুষ্ক কেনা তাহার ইত্যাদর করিয়া থাকে?

বৈরাগ্য-হীন জীবন যে পশু জীবন অপেক্ষাও হেয়, সদ্ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা অনুমোদিত। নৈরাশ্যই বৈরাগীর ভূষণ। যিনি শ্রীগুরু-কৃপায় দিব্যজ্ঞানাগ্নি দ্বারা বাসনা দগ্ধ করিয়া নিরাশ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত বৈরাগী; তিনিই সদা নিত্যানন্দে নিমজ্জিত, তিনিই যথার্থ পরা-শান্তির কোলে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া শ্রান্তি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সংসারের সঙ্কীর্ণ বদ্ধকূপে থাকিয়া যিনি তৎ-সংস্কারে সংস্কৃত তিনি অনন্ত বৈরাগ্য-সিন্ধুর মহিমা এবং প্রভাব সম্বন্ধে কি ধারণা করিবেন? বৈরাগ্য ব্যতীত বৈরাগ্যে যে কত সুখ, কত শান্তি, কত আনন্দ তাহা সংসারাবদ্ধ জীব কি প্রকারে ধারণা করিবে? মুক্ত-বিহঙ্গ ব্যতীত মুক্ত-বিহঙ্গের অবস্থা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী কি প্রকারে উপলব্ধি করিবে? আমাদের পরম কারুণিক দয়াময় শ্রীগুরুদেব কোন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"**বৈরাগ্য-পথের বন্ধু অতি বিরল।" বৈরাগী যে আত্মজ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, নিরঞ্জন, বিদেহী তাহার যে অদ্ভুত ত্যাগানলে সর্ব্ব-বাসনার পূর্ণাহুতি হইয়াছে,** উচ্ছ্বসিত বৈরাগ্য-প্রবাহে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই ভাসিয়াগিয়াছে। তিনি যে শ্রীগুরু-দেবের অহৈতুকী কৃপাশক্তি-প্রভাবে ষড়রিপু প্রভৃতি মহারিপুগণকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়াছেন।

অনেকে দরিদ্রতাবশতঃ কলহ প্রযুক্ত, আত্মীয়স্বজনগণের বিনাশ হেতু এবং বৈরাগীর সম্মান প্রাপ্তির আশায় বৈরাগ্যের বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা সরল-বিশ্বাসী জীবগণকে প্রতারিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাহারাও এই প্রকার কপটতাপূর্ণ মর্কট-বৈরাগ্যাচরণ দ্বারা আত্ম-প্রতারিত হইয়া পতনের পথ সুগম করিয়া থাকে। অভিনয়কালে কত লোক শ্রীকৃষ্ণের বেশ ধারণ করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে, সেই জন্য কি তাহারা শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছে? তাহারা কি জানে না, যে তাহারা বেশ ধারী মাত্র? স্ত্রী-বেশ ধারণে কি কোন পুরুষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কোন দরিদ্র ব্যক্তি রাজবেশ ধারণে কি, রাজা হইয়া থাকে? সে কি জানে না যে, সে দীনদুঃখী একমুষ্টির প্রত্যাশী? অভাব-গ্রস্ত দরিদ্র ভিখারী তৈলাদি ব্যবহার করেনা, নগ্ন পদে থাকে, বৃক্ষমূলে, জীর্ণকুটীরে বাস করে; ছিন্ন-কন্থামাত্র সম্বল করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে, সেই জন্য কি সে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়াছে? দরিদ্রতাই কি তাহার ঐ প্রকার হইবার কারণ নহে। দিব্য-জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত বৈরাগ্যলাভ হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত বৈরাগী যে সর্ব্ব-বাসনা-নিবৃত্তি-দ্বারা স্বাধীন হইয়াছেন। শ্রীভগবানই

যে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি যে নিত্য-ব্রহ্মেযুক্ত, অনিত্য বিষয়ে বিরক্ত! তাঁহার যে এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ মিথ্যা এবং তুচ্ছ বোধ হইয়াছে। বৈরাগ্যচিতায় তাঁহার জীবত্বের নির্ব্বাণ হইয়া, তিনি সদাশিব জ্ঞানানন্দ হইয়াছেন। "বৈরাগ্য যে মঙ্গলময় করুণাসাগর শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী দান"; বৈরাগ্য যে পতিতপাবন, অভক্ত-বৎসল শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাশক্তির অদ্ভুত বিকাশ; বৈরাগ্য যে অজ্ঞান-নাশিনী, জীব-চৈতন্যকারিণী শিবগুরু জ্ঞানানন্দের চিৎশক্তির অভাবনীয় প্রকাশ! এমন দিব্য-জ্ঞানদায়িনী চৈতন্যকারিণী পরম বৈরাগ্য-প্রসবিনী শান্তিরূপা—শ্রীগুরুকৃপাশক্তির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোন হতভাগ্য জীব তপনোত্তপ্ত কর্কশ বালুকা-পূর্ণ সংসার-মরুকে শান্তিনিকেতন বোধে আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক?

"জ্ঞানদাতা গুরু সাক্ষাৎ সংসারার্ণব-তারকঃ।
শ্রীগুরু-কৃপয়া শিষ্য স্তরেৎ সংসার বারিধিম্॥
(শান্তিগীতা।)

অর্থাৎ গুরুই সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা এবং সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ-কর্ত্তা। একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাবশতঃই শিষ্য সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্! গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্!!!

আমাদের ঠাকুর বলিয়াছেনঃ—

"যেতে হ'লে বহুদূর,
পাথেয় লহ প্রচুর।
পরলোকে যেতে হবে
পাথেয় যে চাই।
শুদ্ধ-বিবেক-চৈতন্য,
সে পথের আহার্য্য অন্ন,
সে পথের বৈরাগ্য হয়
পরম পাথেয়॥
প্রেম-ভক্তি-স্নিগ্ধ-জল,
সে পথের পেয় কেবল;
উভয়ে কর সম্বল।
শীঘ্র যেতে হবে"॥

মহেশ্বরানন্দ অবধূত।

স্বপ্ন।

(১)

দাসীরে দিতে হে দেখা, যদি এলে প্রাণ সখা,
কেন আছ দূরে দাঁড়াইয়ে?
বড় সাধ আছে মনে, পূজিব হে তোমা ধনে,
হৃদয়-আসনে বসাইয়ে॥

(২)

হৃদয় আসন হবে, কুশলবার্ত্তা মন কবে,
আঁখি-নীরে ধুয়াব চরণ।
অর্ঘ দিব এ যৌবন, ভালবাসা আচমন,
মধুপর্ক সুমিষ্ট বচন॥

(৩)

পুনঃ আচমন দিব, প্রেম-জলে নাওয়াইব,
পরাইব প্রীতির বসন;
প্রণয় সু-আভরণে, সাজাইব সযতনে,
যথা যথা সাজিবে যেমন॥

(৪)

ভক্তি-গন্ধ মাখাইয়ে, আনন্দ-কুসুম দিয়ে,
প্রবৃত্তি-তুলসী দিব পায়।
পৃথ্বী-তত্ত্বে দিব ধূপ, দীপ-দানে দিব রূপ,
বাসনা নৈবিদ্য দিব তায়॥

(৫)

পানীয় রসের তত্ত্ব, আচমনে বায়ু তত্ত্ব,
তাম্বুলেতে প্রাণ সমর্পণ।
পুনঃ আচমন কালে, দান দিব স্নেহ-জলে,
সর্ব্ব-পূর্ণে আত্ম-নিবেদন॥

(৬)

বন্দনার শুন সার, লহ দুঃখিনীর ভার,
স্থান দিয়ে চরণ-কমলে।
অন্য সাধ কিছু নাই, কেবল তোমারে চাই,
আশা-পূর্ণে নিবাও অনলে॥

(৭)

এতেক শুনিয়া বাণী, কহে গোরা গুণমণি,
মহাভাবে হইয়ে বিভোর।
অব্যক্ত চৈতন্য আমি, অতি ক্ষুদ্র জীব তুমি,
অসম্ভব আশা দেখি তোর॥

(৮)

আমারে যে পেতে চায়, স্বার্থ-শূন্য আগে তায়,
হ'তে হবে ; নৈলে নাহি হয়।
এ জগৎ স্বার্থ-ভরা, তুমি তাহা নহ ছাড়া,
বাসনা তোমার স্বার্থময়॥

(৯)

যে জন নিঃস্বার্থ হবে, সেই সে আমারে পাবে,
শুন শুন সারোদ্ধার বাণী।
নিজ কর্ম্ম অনুসারে, ফলাফল ভোগ করে ;
কর্ম্ম মত ফল পাবে ধনি!

(১০)

পর্য্যটন-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সব ঠাঁই আছি সমভাবে।
স্থাবর-জঙ্গম আদি, আমাতেই নিরবধি,
আছে, ছাড়া নাহি কিছু ভবে॥

(১১)

দেবতা, নর, বানর, যক্ষ আদি কিন্নর,
সবে করি সৃজন-পালন।
কালেতে এ সমুদয়, আমাতেই হবে লয়,
ইথে আন নহে কদাচন॥

(১২)

তাই বলি যাও ফিরে, কেন ভাস আঁখিনীরে?
সেব গিয়া নিজ পতিধনে।
রমণীর সার পতি, পতি রমণীর গতি,
সর্ব্ব সিদ্ধি পতির সেবনে॥

(১৩)

কুলের ধরম যাহা, সাধে কেন ত্যজ তাহা?
লোকে দিবে কলঙ্কিনী নাম।
কুলের কামিনী হয়ে, পতি-পুত্র তেয়াগিয়ে,
থাকিলে গো দুঃখ পরিণাম॥

(১৪)

আমার বচন লও, ঘরেতে ফিরিয়া যাও,
সেব গিয়া পতির চরণ।
সে বিনে পতির পদ, পরিণামে মোক্ষ পদ,
কেন দুঃখ পাও অকারণ?

(১৫)

শুনিয়া গোরার বাণী, পুনরায় কহে ধনী,
চাতুরালী কেন কর আর?
তুমি অগতির গতি, তুমি সবাকার পতি,
পতির পতি তুমি মূলাধার॥

(১৬)

প্রকৃতি হইতে যাহা, প্রকৃতিই হয় তাহা,
পাথরে কাঞ্চন কেবা কয়?
আব্রহ্ম-ভুবনত্রয়, সকলি প্রকৃতিময়,
একমাত্র পুরুষ নিশ্চয়॥

(১৭)

ভাবিয়া দেখিনু সার, তুমি সেই সারাৎসার,
পরম পুরুষ নির্ব্বিকার।
প্রকৃতি তোমার দাসী, তাই প্রকৃতিতে আসি,
প্রকাশহ রূপ চমৎকার॥

(১৮)

তুমি সকলের সার, তুমি সর্ব্ব মূলাধার,
কিছু নাহি তোমা ছাড়া অন্য।
দেবাদি মানব জীব, তোমা তরে উদ্‌গ্রীব,
দরশন পেয়ে হয় ধন্য॥

(১৯)

শ্রীমুখে কহিলা যবে, সকলি তুমি সে ভবে,
সৃষ্টি স্থিতি তুমি কর লয়।
ছলেতে কেন হে আর, করিতেছ পরিহার?
ক্ষমা কর দীন অবলায়॥

(২০)

শুনিয়া ধনীর ধ্বনি, শ্রীগৌরাঙ্গ গুণমণি,
হাঁসি হাঁসি বলিলা তখন।
বুঝিয়া দেখিনু মর্ম্ম, নিষ্কাম তোমার ধর্ম্ম,
কিবা চাহ দিব এইক্ষণ?

(২১)

যাহা চাহ দিব তোরে কহিলাম সত্য ক'রে,
নাহি ভাস আঁখি-নীরে আর।
যদি থাকে প্রেম-ভাব, তবে ভবে কি অভাব?
ধন মধ্যে প্রেম সারাৎসার!

(২২)

অপূর্ব্ব তোমার প্রেম, কষিত বিমল হেম,
কর ইহা কৃষ্ণ-পদে দান।
লওগে শরণ তাঁর, যিনি ভবে কর্ণধার,
নিত্যানন্দ সেই মোর প্রাণ॥

(২৩)

কিছু নাহি কর সন্ধ, আমি আর নিত্যানন্দ,
এক প্রাণ, এক অবতার।
জীবের হিতের জন্য, হইলাম ভিন্ন ভিন্ন,
অধিক বলিব কিবা আর॥

(২৪)

কেন থাক নিরানন্দ? ভাব সেই নিত্যানন্দ,
মুখে সদা বল 'কৃষ্ণ-নাম'।
ভাবিতে ভাবিতে যবে, আপনা ভুলিয়ে যাবে,
তবে দেখা পাবে গুণধাম॥

(২৫)

যিনি জগতের গুরু, কৃপাময় কল্পতরু,
নিত্যানন্দ সেই অবতার।
দুঃখ করি পরিহার, লওগে শরণ তাঁর,
মনস্কাম পূরিবে তোমার॥

(২৬)

নিদ্রাবশে দেখে ধনী, অন্তর্দ্ধান গুণমণি,
উচ্চরবে কাঁদিয়া জাগিল।
দীন হীনে কহে রমা, ক্রন্দনেতে দেহ ক্ষমা,
গোরা-প্রেম তোমাতে পশিল॥

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী;

প্রতিবাদ।

বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়" প্রতিবাদের উত্তর।

প্রথম প্রস্তাব।

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমাদের শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার সমালোচনা পাঠে শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেবের শিষ্যমণ্ডলী হয়ত বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা বৈষ্ণব জগতের পরম আদরের বস্তু—বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী। এই পবিত্র ধর্ম্ম-পত্রিকায় ভদ্রসন্তানকে "অজ্ঞ" "মূর্খ" প্রভৃতি ইতরভাষা প্রয়োগ বোধ হয় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রদর্শিত পথের সাধনার অনুকূল নহে। সংযত রসনায় যত ইচ্ছা তিরস্কারও করা যায়। আমরা কিন্তু শ্রীগুরুচরণ স্মরণপূর্ব্বক প্রতিহিংসাবৃত্তিকে পদদলিত করিয়া সমালোচক মহাশয়ের সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া "দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ" এই শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি যে আমরা যেন 'তৃণাদপি' ও 'তরোরিব' মন্ত্রের সাধক হইয়া অটলভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আমরা সমালোচক মহাশয়ের কোন দোষ দেখি না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা শ্রীভগবান চৌদ্দ পোয়া নরদেহ ধারণ করিয়া জগতে আসেন, জীব তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিতে পারে ও তাঁহার সেবাদি করা যায় ইত্যাদি বিশ্বাস বহুভাগ্যে, বহুপুণ্যফলে মহাত্মগণের বহুকৃপাবলে জীব হৃদয়ে উদয় হয়। আবার শ্রীভগবান বা তাঁহার অভিন্নদেহ, অবতার-কল্প মহাপুরুষগণ যখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন এই অবিদ্যাকলুষিত জীবজগতে জীবের মোহান্ধকার দূর করিবার প্রয়াস পাইতে গিয়া তাঁহাদিগকে কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। জগতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া মহম্মদকে দন্তগুলি হারাইতে হইয়াছিল; খৃষ্টদেবকে লোমহর্ষণ ক্রুশযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরকে অতি ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, এমন কি শ্রীঅনন্তদেব, কাঙ্গালের হৃদয়-সর্ব্বস্ব, দয়ালের শিরোমণি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরও ললাট-দেশে ভীষণ প্রহার হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও ভ্রান্ত জীব মনে করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণকিঙ্কর শ্রীসার্ব্বভৌম মহাশয় ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপ্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাকে প্রথমে সন্দেহ, উপহাস ও পরে সাধনপন্থা উপদেশ দিতে বিরত হন নাই (১) সুতরাং

---

(১) "নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম।"
"শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাঁসিলা।"
শ্রীচৈঃ চঃ।

যত্রান্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দ্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা।
* * *
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥
প্রবোধনন্দের স্বহস্ত-লিখিত শ্লোক।

সার্ব্বভৌম কহিলেন—
"কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান"।
* * *
বেদান্ত শ্রবণ হয় সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ। শ্রীচৈঃ চঃ।

* এই লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ দে সরকার মহাশয়ের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

আমাদের অবধূত চূড়ামণিকে যিনি প্রত্যক্ষ সম্ভোগ করিবার অবসর পান নাই তিনি তাঁহাকে সহজে এত উচ্চ আসন দিতে প্রস্তুত হইবেন কেন? অন্যের তো দূরের কথা আমাদের মহাপ্রভুর শ্রীচরণে যাঁহারা চিরজীবনের জন্য বিক্রীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একটির জীবনের ঘটনা কিছু কিছু প্রকাশ করিলেই বুঝা যাইবে সমালোচক মহাশয়ের বড় বেশী দোষ নাই। ঠাকুরের কোন একটি ভক্ত তাঁহার কৃপালাভের পূর্ব্বে, অবিদ্যারাণীর ঘোর তামসী দাসীর মন্ত্রণায় ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি-চিত্রপটের (ফটো) দিকে একদিন (অবজ্ঞা করিয়া) পশ্চাৎ ভাগ রাখিয়া প্রণাম করেন, আর যাবি কোথা? বিষ-মিশ্রিত স্তন্য দানজন্য পুতনাকে শ্রীভগবানের মাতৃগতি দানের মত আমাদের ঠাকুর অচিরেই তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উঁহাকে শ্রীচরণের চিরদাস করিয়া কুমার বয়সেই তাঁহাকে সন্ন্যাস দানকরতঃ অশেষ করুণার পরিচয় দিয়াছেন। অপর এক সময়ে ঠাকুরের কএকটি ভক্ত ঠাকুরের ভগবত্তা-বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন; সেই সময়ে কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত আলোচনায় বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন; অল্পদিন পরেই ঠাকুরটি তাঁহারও গলদেশে কৃপা রজ্জু দিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রেমভক্তি-স্রোতে জন্মের মত ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই লেখক একদিন ঠাকুরের কয়েকটি ভক্তকে ঠাকুরের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে শুনিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়াছিল "এ কি! ইঁহারা শ্রীহরিনাম, শ্রীগৌরনামের পরিবর্ত্তে ইঁহাদের গুরুর নামকীর্ত্তন করেন কেন? কিন্তু পরক্ষণেই যে ব্যাপার দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম যে ঐরূপ করিবার তাঁহাদের যথেষ্ট হেতু আছে; আর শাস্ত্র অনুসারে কোন দোষও হয় না। তখনও আমি ঠাকুরকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধুব্যতীত অন্য কোন ভাবে উপলব্ধি করি নাই। ঠাকুর শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের একান্ত পক্ষপাতী অথচ তান্ত্রিক-আচারী কোন সাধককে ছাগাদি বলিদান সম্বন্ধে কিছু নিষেধ করেন না জানিয়া সন্দিহান হইয়া তাঁহার কোন ভক্তকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট যুক্তি শুনিয়া সন্দেহ প্রায় দূর হইল, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ঠাকুরটী অচিরেই তাহা দূর করিয়া আমারও সর্ব্বনাশ করিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং এ ক্ষেত্রে সমালোচক মহাশয়ের দোষ কি?

আমাদের শ্রীপত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সমালোচনা পাঠ করেন নাই তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সমালোচনার প্রধান অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম:—"এই পত্রের একস্থানে লিখিত আছে 'শ্রীশঙ্কর আসিয়া কেবল জ্ঞানপথের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া কেবল কৃষ্ণ ভক্তিরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমার জ্ঞানানন্দে জ্ঞানও যেমন প্রেমও তেমনই।" এই তুলনা অজ্ঞতা ও মূর্খতারই শোচনীয় নিদর্শন। ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহারা শাস্ত্রীয় শাসনের অনধীন। ইহাদের গুরুর উপদেশ এই যে, "তোমরা যত পার আর না পার, আমার উপর সব ভার রহিল"। সহজীয়া-ধর্ম্ম আর কাহাকে বলে?"

আমরা সমালোচনার প্রতিবাদস্থলে সমালোচককে ইতর ভাষায় গালি দিতে পারিব না, কারণ উহা আমাদের সাধনা-বিরুদ্ধ; তবে সমালোচনাটির যথা-শাস্ত্র আলোচনা করিব মাত্র। আমাদের লেখক মহাশয়ের লেখার কোন অংশটুকু সমালোচক-

মহাশয় "অজ্ঞতা ও মূর্খতা" মনে করিয়াছেন দেখা যাউক :—"শ্রীশঙ্কর আসিয়া কেবল জ্ঞান পথের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন" এই উক্তি টুকু বোধ হয় শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খের উক্তি বলিতে পারেন না। এবং উহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে বেশী শাস্ত্র প্রমাণও দিতে হইবেনা। শ্রীবারাণসীধাম প্রভৃতি স্থান যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শ্রীশঙ্কর কৃপায় এখনও শিবের ছড়াছড়ি; শঙ্কর সম্প্রদায়ী অবলাকুল পর্য্যন্ত বলেন "শিবোহহং।" শ্রীভগবানের জ্ঞানমূর্ত্তির অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানমতে যেই জীবের কুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া হিতে বিপরীত আরম্ভ হইল তখনই শ্রীভগবানের শ্রীগৌর-বিগ্রহে ভক্তিপ্রচার আরম্ভ হয়; তদ্বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীচৈতন্য ভাগবতের দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। ইহাতেই বেশ জানা যাইবে যে আমাদের লেখক "শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া কেবল কৃষ্ণ ভক্তিরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।" বলিয়াও বেশী মূর্খতার ও অজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই "গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নহি তাহার জিহবায়।" * *

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ-পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।"

* * * *

"ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার"।

* * * *

(অদ্বৈত প্রভু) "বাখানে বশিষ্ঠ-শাস্ত্রে জ্ঞান প্রকাশিয়া" * * *

"আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় জ্ঞানমাত্র॥"

* * * *

"ক্রোধ মুখে বলে প্রভু আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান ভক্তি হইতে কেবা বড়া॥
অদ্বৈত বলয়ে সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান।
যার নাহি জ্ঞান তার ভক্তিতে কি কায॥
জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শ্রীশচীনন্দন॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পড়িয়া॥"

শ্রীচৈঃ ভাগবত।

সুতরাং শ্রীশঙ্করের জ্ঞান-প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি-প্রচার অশাস্ত্রীয় উক্তি নহে। তাহার পর "আমার জ্ঞানানন্দে জ্ঞানও যেমন প্রেমও তেমন" এই উক্তি টুকু সম্বন্ধে বলিতে চাই যিনি জীবনে কখন বারাণসী দর্শন করেন নাই তিনি যদি উক্ত ধামের দেব-মন্দির ও অট্টালিকাদির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন অথবা তৎবিষয়ে তর্ক করিতে রত হন তবে বিজ্ঞসমাজ তাঁহাকে কি বলিবেন? সমালোচক মহাশয় কি কখন আমাদের ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন? তাঁহার জীবনে কতদিন কত সময় তিনি ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছেন? তাহা যদি না করিয়া থাকেন তবে ঐ মহাত্মার জ্ঞান-প্রেমের ইয়ত্তা করিতে যাওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে? শুধু তাহাই নহে; রহস্য-ব্যঞ্জক ভাষায় মহচ্চরিত্রের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত সেবক, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিশির বাবুর সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কার্য্য হইয়াছে? সমালোচক মহাশয় অবগত নহেন যে যে ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের অমৃত-স্রাবিণী লেখনী দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা-রসে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার অঙ্গপুষ্টি করেন তাঁহাদের মধ্যে আমাদের এই ঠাকুরটির শ্রীচরণ কিঙ্কর বড় কম নাই।

শ্রীভগবানের প্রেম ও জ্ঞান-সাগরের তুলনায় আমরা সকলেই মূর্খ—সকলেই অজ্ঞ; কিন্তু পার্থিব বিদ্যা ও জ্ঞান-হিসাবে দিগ্‌গজের অভাব আমাদের মধ্যে নাই—বি, এ, এম্ এ, বিদ্যালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি জগতের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট জীবের অভাব আমাদের মধ্যে নাই; সুতরাং সমালোচক মহাশয় আমাদিগকে যত সহজ "অজ্ঞ" ও "মূর্খ" মনে করিয়াছেন আমরা তাহা নহি; এবং জগতে কেবল একজন ব্যতীত অপর কেহই আমাদের এই বিদ্যা-বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইবেন না ইহাই আমাদের বিশ্বাস; এবং কোন মহাত্মাকে চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করিতে দেখিলেও আমরা তাঁহাকে ভগবান বলি না; আমাদের ভগবান চিনিবার একটি গুপ্ত-মন্ত্র আছে।

আমরা যে "ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় শাসনের অনধীন" সমালোচক মহাশয় তাহা কিরূপে জানিলেন? আমাদের কৃত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম কি শাস্ত্রে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান শ্রীভগবান-সর্ব্বস্ব কোন ভক্তের প্রাণে কোনরূপ ব্যথা দিয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে আমি তজ্জন্য করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে ঐ বিষয়টি আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হইবার চেষ্টা করিব; আমরা জীবদেহ সুতরাং ভুল ভ্রান্তির অতীত নহি; অধিক কি আমাদের সবই মন্দ; আমাদের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে তাহার একমাত্র হেতু "শ্রীগুরু-কৃপা"।

তার পর আমাদের লেখকের আর একটি উক্তির উপর সমালোচক মহাশয় বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন; যথা "ইহাদের গুরুর উপদেশ এই "যে তোমরা যত পার আর না পার সব ভার আমার উপর রহিল"। কথাটি যে অতিশয় গুরু সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু সমালোচক মহাশয় ও তাঁহার মতাবলম্বী যদি আর কেহ থাকেন তবে তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে কেবল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই "জগতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত গুরু-মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ধরাতলে যত মহাপুরুষের পদার্পণ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বা তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রিত কিঙ্করগণকে এই অপার্থিব, অলৌকিক অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব অভয়বাণী দিয়াছেন? যদি কেহ দিয়া থাকেন তবে আমরা বলিব হয় তিনি শাস্ত্র-অবিশ্বাসী, মহা-অধার্ম্মিক, মহাকপট, মহা-নাস্তিক; নয় তিনিই পতিত জীবের হৃদয়-সর্ব্বস্ব কাঙ্গালের বন্ধু দয়াময় "শ্রীভগবান।" এই দুইটী বস্তু পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের ঠাকুর আমাদিগকে একটুকু কষ্টি-পাথর দিয়া গিয়াছেন; আবশ্যক হইলে আমরা সেইটুকু ব্যবহার করি।

আমরা আমাদের গুরুদেবকে শ্রীভগবান বলিতেছি বলিয়া বোধ হয় সমালোচক মহাশয় বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুধু তিনি কেন ঐ তত্ত্ব লইয়া আমাদিগকে যে সমগ্র জগতের সহিত বিচার করিতে হইবে তাহা আমরা বেশ জানি এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে এই বিচারাবসানে শ্রীভগবান-লাভেচ্ছু, অকপট দীনস্বভাব কত শত "হরিদাস" আমাদের ঠাকুরকে চিনিয়া তাঁহার চরণে আত্ম-বিক্রয়-পূর্ব্বক আমাদের সুরে সুর মিশাইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, আমাদের সহিত উচ্চ-কণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইবেন "জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু শ্রীজ্ঞানানন্দ নাথ"। এক্ষণে বিরুদ্ধবাদিগণকে সবিনয়ে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি আমরা আমাদের একমাত্র প্রাণের

কাণ্ডারী শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবান বলিয়া আনন্দ লাভ করি বলিয়া কি শাস্ত্র অনুসারে আমাদের কোন অপরাধ হয়? আমাদের মত ক্ষুদ্রদেহীর যতদূর শাস্ত্রমত অবগত হওয়া সম্ভব তাহাতে আমরা জানি ঐরূপ না করিলে বরং পাপস্পর্শ হয় শুধু পাপ কেন? তাহার ফলে নরকগমন অনিবার্য্য! এসম্বন্ধে দুই একটি শাস্ত্র মত উল্লেখ করিতেছি মাত্র;—বোধ হয় পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ও বিরক্তি হইতেছে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই আবেগময়ী লেখনীকে অল্প সময় মাত্র মার্জ্জনা করিবেন।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরমং = পরমং। পরমঃ = শ্রীকৃষ্ণঃ

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ"

ব্রহ্মসংহিতা।

"যো গুরুঃ সঃ হরিঃ সাক্ষাৎ।" নারদীয় পুরাণ।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

শ্রীগীতা।

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি"॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

"প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিঃ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকঃ।
গুরৌ মনুষ্য বুদ্ধিস্তু মানবো নরকং ব্রজেৎ"॥

শ্রীবৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত ২য় নামাপরাধ যথাঃ—

"বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক্ ঈশজ্ঞান।
গুরুদেব মানে যথা মনুষ্য সমান"॥

ইত্যাদি।

এই নাম-অপরাধ প্রেমভক্তি-লাভের মহান্ প্রতিবন্ধক।

"সেবা অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নাম অপরাধে ধ্রুব নরকে গমন॥"

অতএব এ ক্ষেত্রে আমার ভ্রাতৃবর্গ শাস্ত্র অনুসারে তাঁহাদের গুরুদেবকে শ্রীভগবান বোধ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ না বলিয়া অপরাধী বা শাস্ত্রদ্বেষী কিরূপে বলিতে পারা যায়?

এক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের শেষ উক্তি যথাঃ—"সহজীয়া-ধর্ম্ম আর কাহাকে বলে?"

সত্য সত্য—সত্যই আমরা "সহজীয়া-সম্প্রদায়" "আমরা অতিশয় সহজীয়া" "আমরা সহজ সহজীয়া" আর আমাদের ঠাকুরটিও "সহজীয়ার পরাকাষ্ঠা" বলিয়া আমাদের মত ঘৃণিত, কলুষিত, মোহান্ধ কলিহত জীবে বেদ-গোপ্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদির অলভ্য, যোগী-ঋষির অচিন্ত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান লাভে আশাবান হইতে পারে। তবে আমাদিগকে যে সহজীয়া মনে করা হইয়াছে আমরা তাহা নহি। আমরা কিরূপ সহজীয়া শুনুন :—

আমাদের মা করুণাময়ী তাঁহার জীব সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আহা! মা রাজরাজেশ্বরী চির-শান্তিময় নিত্যধামে বুঝি ক্ষণমাত্রও স্থির থাকেন না! জীবের করুণধ্বনি কর্ণে প্রবেশ হইবামাত্র মা আমার অস্থির হইয়া উঠেন। কখন পুরুষ, কখন নারী যখন যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা সমীচীন বোধ করেন তখন তাহাই হইয়া ধরাতলে নামিয়া মা আমাদিগকে কেবল সহজ—সহজ—সহজ পন্থা দেখাইয়া বাড়ী লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। যে সন্তানগুলি মাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া হস্ত উত্তোলন করে, মা আমার সেই সন্তানগুলিকে কোলে করিয়া এই ভৌমনরক হইতে স্বধামে প্রস্থান করেন; যাহারা আপন পায়ে হাঁটিয়া যাইতে ইচ্ছুক, কেবল পথ দেখিতে চায় মাত্র, তাহাদিগের সমক্ষে আমাদের সেই বিদ্যুৎ-বরণী নিজ অঙ্গকান্তির জ্যোতিতে কণ্টকপঙ্ক বিলুপ্ত পথগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়া

"আয়—আয়—আয়রে" বলিয়া রোরুদ্যমান দুর্ব্বল শিশুসন্তানগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া স্বধামে চলিয়া যান। মার আমার সেই গভীর অথচ অতি সুমধুর "আয়—আয়—আয়" শব্দ বহুদিন পর্য্যন্ত এই জগতে প্রতিধ্বনিত হয়। ক্রমে যখন ঐ ধ্বনি আমরা আর শুনিতে পাই না—মার অঙ্গজ্যোতি আর আমরা দেখিতে পাই না "এলো ভুলো"ও "বালগ্রহ"-গণ বিকৃত-কণ্ঠে আমাদের সেই জননীর স্বর অনুকরণ করিয়া আমাদের সমক্ষে ভৌতিক আলোক ধরিয়া আমাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে তখন মার সুসন্তানগুলি উহাদিগকে চিনিতে পারিয়া আবার মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে; মা আমাদের আবার ছুটিয়া আসেন।

আমাদের প্রকৃতির বলের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মা আমাদের ধ্যান, যোগ যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি সহজ—সহজ—সহজ পন্থা দেখাইয়া দিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন হইল শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরবিগ্রহ ধারণ করিয়া মা আমাদের সহজতম পন্থা দেখাইয়া দিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে নিত্যানন্দবিগ্রহ ধারণ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে করযোড়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া বেড়াইয়া গিয়াছেন—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"বাপ্ সকল! শুচি নাই, অশুচি নাই, মুখে বল "জয় গৌর নিত্যানন্দ" আর জপ কর "হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" আরও সহজ "কর হাতে কর্ম্ম মুখে নাম" "জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" আরও সহজ:—

ঘর যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল,
মুখে হরি হরি বোল। (২)

কিন্তু আমরা এতই দুর্ব্বল, এতই ঘৃণিত যে এই সহজতম পন্থাও ডুবিয়া গিয়াছি। অসুর-কীটে এই সহজ পন্থা পরিপূর্ণ; তাই আমাদের মা আবার জানি না কত মূর্ত্তিতে ধরাতলে আসিয়া আমাদের হাত হইতে সাধনভজন-ভার কাড়িয়া লইয়া ভবসাগরের তীরে প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। এতদিন মার আমার জগদ্‌গুরু জ্ঞান-মূর্ত্তি শ্রীশিববিগ্রহ ছিল। দ্বাপরে অদ্ভুত অতিগুহ্য রসে জগৎ প্লাবিত করিবার জন্য মার আমার আনন্দ-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-বিগ্রহ হইয়াছিল (৩)। শ্রীধাম নবদ্বীপে মা আমার অচিন্ত্য ভেদাভেদ শক্তি-প্রয়োগে এই জ্ঞান-মূর্ত্তিকে (৪) বামে রাখিয়া আনন্দ স্বরূপিণী শ্রীরাধা-বিগ্রহ অঙ্গে মাখিয়া এক অপূর্ব্ব খেলা খেলিয়া গিয়াছেন;—এবার আবার আমাদের ক্ষীণমস্তিষ্কে ক্ষীণ ধারণার দুর্দ্দশা দেখিয়া জ্ঞান ও আনন্দ এই উভয় বিগ্রহই অঙ্গে মাখিয়া আচার্য্যরূপে "শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ" নামে জগতে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। সত্যযুগের "বিষ্ণুগোপাল" ত্রেতাযুগের "রামগোপাল" দ্বাপরযুগের "কৃষ্ণগোপাল" নবদ্বীপের

(২) যথাশাস্ত্র বিবাহিত ভার্য্যা যথাশাস্ত্র ব্যবহার কর; দেশাচার সম্মত রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সহজলব্ধ মৎস্যাদি ভোজ্য (ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া) গ্রহণ কর এবং শ্রীভগবানের নাম জপ ও কীর্ত্তন কর।" বৈধকাম সাধন-বিরোধী নহে—"কামোঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি।" শ্রীগীতা।

সাধুবেশী অসুরগণ এই "ঘর যুবতী" স্থলে স্বকপোলকল্পিত "ভোর যুবতী" শব্দদ্বয় প্রক্ষিপ্ত করিয়া পরস্ত্রী-গ্রহণাদি পাপাচার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছে। লেখক।

(৩) মহাভাগবত মতে শিবই রাধা। ঠাকুরের উক্তি।

(৪) শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগদাধর।

"গৌরগোপাল" মা আমার চিরকালই "গোপাল" (৫)। "গোপাল" তাঁহার সাধারণ উপাধি। তিনি "নিত্যই" "গোপাল" নামে অভিহিত। তাই মা আমাদের কাছে এবার বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, গৌর এই গোপালচতুষ্টয়ের সমাবেশ শ্রীশ্রীগুরুরূপী "শ্রীনিত্যগোপাল" (৬)। এই নিত্যগোপাল আমাদের কাহারও পিতা, কাহারও মাতা কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও পতি। এই নিত্যগোপাল অপূর্ব্ব কঠোরী, অদ্ভুত শুদ্ধাচারী, অলৌকিক সংযমী কিন্তু আমরা যখনই সজলনয়নে, কাতর প্রাণে ঠাকুরের যে কোন আচার, যে কোন ব্যবহার, যে কোন আহার দর্শনে বাসনা প্রকাশ করিয়াছি ঠাকুর আমাদের সেই বাসনাই পূর্ণ করিয়াছেন।

আমাদের এই ঠাকুর বলিয়াছেন "বেদ সত্য, পুরাণ সত্য, তন্ত্র সত্য, আগম সত্য, নিগম সত্য, কোরাণ সত্য, বাইবেল সত্য, সর্ব্ব অবতার সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আহার বিহারে একাকার করিবার আবশ্যক নাই"। আমরা কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ গাণপত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব; কেহ দক্ষিণাচারী, কেহ পশ্বাচারী, কেহ বীরাচারী; কিন্তু আপন আপন গুপ্ত সাধানের অতিরিক্ত সময় শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত মধুর মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে ঠাকুরের সব কিঙ্করগুলি একত্রে শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করি। আমরা কালীনাম গাই, শিবনাম গাই, হরিনাম গাই, গৌরনাম গাই, নিতাইনাম গাই, গুরুনাম গাই। আমরা শক্তির প্রসাদ খাই, শিবের প্রসাদ খাই, কৃষ্ণের প্রসাদ খাই, গণপতির প্রসাদ খাই, গৌরের প্রসাদ খাই, নিতাইএর প্রসাদ খাই। আমরা সম্মান-প্রাপ্তির ভয়ে প্রকাশ্য-ভক্ত-চিহ্ন ধারণ করি না কিন্তু সকল সাধুবেশ, সমস্ত ভক্ত-বেশকেই (ধরা প'ড়্বার ভয়ে) মানসিক প্রণাম করি। আমরা বাহিরে সাধুর চিহ্ন ধারণ করিয়া ভিতরে মৎস্য, মাংস, মদ্য ও পরস্ত্রী গ্রহণ করি না। আমরা কেহ যোগী, কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ বৈরাগী, কেহ গৃহী, কিন্তু সব এক পিতার সন্তান। আমাদের মধ্যে যাহারা গৃহী তাহারা শ্রীভগবানের কৃপায় যাহা সংগ্রহ হয় তাহাদ্বারাই (অর্থাৎ হিন্দুর নিষিদ্ধ আহার ব্যতীত) পরিবারবর্গের ও নিজের উদর পূরণ করে। অবস্থানুসারে আমরা কেহ সঘৃত, সদুগ্ধ, আত-পান্ন; কেহ নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন; কেহ মাছের ঝোল ভাত; কেহ মাংসের ঝোল ভাত; শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কেহ জয় মা আনন্দময়ীরূপিণী গুরুদেব, কেহ জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী গুরুদেব, কেহ জয় শ্রীরাধাগোবিন্দরূপী গুরুদেব ইত্যাদি নাম অবস্থানুসারে কেহ সংস্কৃতে, কেহবা মাতৃ-ভাষায় উচ্চারণপূর্ব্বক উক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি। আমরা কেহ জবাপুষ্পে, কেহ বিল্বদলে, কেহ তুলসীপত্রে ঠাকুরের শ্রীচরণে স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইষ্ট দেব-দেবীর অর্চ্চনা করি। শাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিধি নিষেধে আমরা প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করি। ঠাকুরের প্রকট অবস্থায় আমা-দিগকে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালনে অক্ষম বুঝিয়া এই কলিহত দুর্ব্বল কিঙ্করগুলিকে অভয়

(৫) গো-ধর্ম্ম; পৃথিবী; গাভী; যজ্ঞ; গায়ত্রী ইত্যাদি।

(৬) নিত্য-সৎ-শাশ্বত-অব্যয়--ব্রহ্ম; "বৃন্দাবনস্থং যুবতীশত-বৃতং ব্রহ্ম গোপালবেশং" লেখক।

দিয়া ঠাকুর আমাদের করুণামাখা স্বরে বলিয়া গিয়াছেন "তোমরা যত পার আর না পার আমার উপর ভার রহিল"। কখনওবা আরও আশা ভরসা দিয়া বলিয়াছেন "তোদের কিছু করিতে হইবে না"। আমাদের মুখ শুষ্ক দেখিলে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিত; আমাদের কষ্ট শুনিলে নয়নজলে "তাঁর বুক ভাসিয়া যাইত"। ঠাকুরের ভাব দেখিলে পূজনীয় শিশির বাবুর শ্রীকালাচাঁদ গীতায় লিখিত সাধকের সাধন-ভজনের কথা মনে পড়ে; যথাঃ—

সাধু—

উপবাস কর, শরীর শুকাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।
কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে॥

সখী—

মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সুখী হবে,
এ'ত কভু হ'তে নারে?
দুঃখের কাহিনী, শুনিলেই তিনি,
কান্দি হন আত্মহারা।
দুঃখ মোরা নিব, তাঁরে কান্দাইব,
এ ভজন কেমন ধারা?

সাধু—

কেশের মমতা, ঘুচাইতে হবে,
মুড়াইতে হবে মাথা।
তুলসী তলাতে, মস্তক কুটিলে,
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ-পিতা॥

সখী—

কেশ ঘুচাইব, বেণী না বাঁধিব,
কোথা গুঁজি থোব চাঁপা।
মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা॥
যেভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর,
দেখি যত সুখ পাবে।
যমন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে॥

* * * *

কেশ মুড়াইয়া, কৌপীন পরিয়া,
ধরিলে দুঃখিনী বেশ।
কান্দিয়া আকুল, হবে কালাচাঁদ,
আমি তারে জানি বেশ?

আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মের স্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; তীর্থস্থানগুলি অসুরকীকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, দেবমন্দিরগুলি ভণ্ড-কপটী দানবের পদভরে টলমল করিতেছে, দেবদর্শনেচ্ছু কুল-কামিনীগণও তথায় নিরাপদ নহেন। কি শাক্ত-সম্প্রদায়, কি বৈষ্ণব-সমাজ, কি শঙ্কর-পন্থা সর্ব্বত্রই ভ্রষ্টাচারের চরমসীমা উপস্থিত। পরম বিরক্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও চরমনিষ্ঠাবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রদর্শিত সাধনপন্থা আর চিনিবার উপায় নাই;—পরস্ত্রী পরপুরুষ গ্রহণ-পূর্ব্বক লোকে প্রকাশ্যভাবে "বৈষ্ণব বৈষ্ণবী" "ভৈরব ভৈরবী" সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধর্ম্মাচার্য্যের স্থান অধিকার করিয়াছে; 'তন্ত্রসাধান,' 'কর্ত্তা-ভজন' প্রভৃতি ব্যাখ্যার আবরণে আবৃত ভণ্ড, কপূষিত, দস্যুগণের হস্ত হইতে সতীর সতীত্ব-রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন হৃদয়-বান্ ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষের প্রাণ জগতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া থাকে, আমরাও তাঁহার সহিত একত্রে সমভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করি এবং শ্রীভগবানের কৃপায় যদি কোন শক্তিমান্ পুরুষ আমাদের পার্থিব রাজা বা কোন রাজপুরুষের সাহায্যে ঐ অসুরগুলিকে একটি একটি করিয়া বাছিয়া, রোষ-কষায়িত লোচন বেত্রহস্ত খৃষ্ট-দেবের ন্যায় পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দির হইতে, বিশুদ্ধ তীর্থস্থান হইতে গলহস্ত দান পূর্ব্বক জনশূন্য পুলিপোলাও দ্বীপে চালান দিবার ব্যবস্থা

করিতে পারেন তবে আমরা পরম আনন্দে তাহাদের বৈধ সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বুঝিলেন আমরা কেমন সহজীয়া ? সমালোচক মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। আশা করি আমাদের সহিত ক্রমশঃ অধিক পরিচয় হইলে তাঁহার ভ্রান্তি দূর হইবে। তবে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি যে সমালোচক মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ মত-পথের কলঙ্কস্বরূপ ঘৃণিত দূষিত-সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রভৃতির উপর ঘোর বিদ্বেষী, বর্ত্তমানকালের ধর্ম্মবিপ্লবের সংস্কার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে। শ্রীভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে অকপট, সরলহৃদয়, শুদ্ধস্বভাব এইরূপ ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমরা সহজীয়া-সম্প্রদায়ের কেবল একটী বাক্য ঋণ করিয়াছি মাত্র; যথা—"সইরে, সাধন ভজন সকল আমার শ্রীগুরুচরণ।"

ভক্তিভিক্ষু
শ্রী———
C/o সম্পাদক।

'প্রার্থনা"

ভাল বেশে তুমি দেখা দিয়ে সখা,
কোথায় লুকায়ে রহিলে হে।
বহু আশা প্রাণে করেছি হে সখা,
আশা কি বিফল হইবে হে ?
এ মোহ-সাগরে ভাসিতেছি আমি,
সখা ব'লে সদা ডাকি হে।
এ বিপদ-সময়ে দীনবন্ধু হ'য়ে,
আতুরে তুলিয়া লও না হে॥
প্রেম-নয়নে হেরিব তোমারে,
নয়নে নয়নে রাখিব হে।
তব রূপ ধ্যানে শ্রবণে কীর্ত্তনে,
হৃদি মাঝে সদা জাগিবে হে।
(তব) মধুর সমধি-পূজিত-চরণে,
মন যেন পড়ে লুটিয়া হে।
তোমারি প্রেম-কুসুম-সৌরভে
হৃদয় মাতিয়া উঠিবে হে॥
সখা সখা ব'লে ডাকিব যখন,
দে'খ সখা ভুলে থেকো নাহে।
অন্তিম সময়ে হৃদয়ে আসিয়ে,
দুরন্ত কৃতান্তে নাশিও হে।

শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য

ভক্তের মত্ততা।

যাহা আমি বুঝি না তাহাকেই পাগলামি বলি। পাগলামির ভাল নাম মত্ততা। দেখ তোমার মাথার উপর ১৬ মণ বোঝা রহিয়াছে একথা বলিলে তুমি আমাকে কি পাগল বলিবে না? কিন্তু বায়ুর চাপ (Atmospheric pressure) মাপ করিয়া দেখ আমার কথা সত্য কিনা? আকাশ নীলবর্ণ কিন্তু বাস্তবিক আকাশের কোন রং নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা যত ছোট দেখায় তাঁহারা তত ছোট নহেন। এজন্য বলিতে হয় কোন বিষয় বুঝিতে হইলে 'মাপ-কাটি' চাই। ভক্ত বুঝিবার মাপ-কাটি দিব্যাভক্তি। শ্রীভগবানের প্রতি যে ভক্তি তাহাই দিব্যাভক্তি। এই ভক্তি বলেই ভক্তকে জানিতে ও চিনিতে পারা যায়। ভক্ত দিব্য-মত্ততায় জগৎকে যে অভিনয় দেখান তাহা না বুঝিলে তাহা পাগলাম বলিয়াই মনে হয়। দেখ কোন তন্ময়তা-প্রাপ্ত ভক্ত-মহাত্মা জগতের সমস্ত নারীতে জগন্মাতার প্রকাশ দেখাইতেছেন। তিনি নিজের বিবাহিতা ভার্যাকেও মাতৃ সম্বোধন করিবেন; ইহা কি পাগলাম মনে হয় না? কিন্তু আমি জানি এরূপ লোক এখনও জগতে আছেন। আমার কোন পরমার্থ ভ্রাতার আলয়ে মদীয় গুরুদেব ভগবান যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব এক সময় সাঙ্গোপাঙ্গ-সহিত গমন করেন। তৎকালে আমার ঐ গুরুভাইটীর একমাত্র পঞ্চমবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বিসূচিকারোগে দেহত্যাগ করে। আমার ঐ পূজনীয় ভ্রাতাটী তাঁহার সন্তানটীকে একটা গৃহে রাখিয়া সমস্ত দিন কীর্ত্তন-নর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করেন। অন্তর্যামী গুরুদেব এ সমস্ত জানিয়া তাহাকে বলিলেন ও তৎপরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পন্ন করা হইল। ইহা কি পাগলাম মনে হয় না?

রাজা রামকৃষ্ণ নাটোরের রাজবংশের মাণিক। দেখ তিনি "মা মা" করিয়া রাজ-সিংহাসন ছাড়িলেন। যখন তাঁহার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইতে লাগিল তখন তিনি বক্রী বিষয়গুলি বিক্রয় করিয়া মা জগদম্বার পূজা ও ভোগ দিতে আদেশ করিলেন। ইহা এক প্রকার পাগলাম নয় কি? তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া গাহিতে হইবে:—

"যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল,
বল মূল হারাবে কেমনে"?

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে মামা ও ভাগিনার ঘটনা বিবৃত আছে। সাধুসেবার জন্য মামা ও ভাগিনা একত্রে কোন গৃহস্থের আলয়ে চুরি করিতে গিয়াছেন; উভয়ে একত্রে গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি বাহির করিয়াছেন। অপর তাহা লইতেছেন। গৃহস্বামী এমন সময় জাগ্রত হইয়া পড়িলেন। সিধের ফাঁক দিয়া ভক্তরাজ বহির্গত হইতেছিলেন এমন সময় গৃহস্থ পা ধরিলেন। বিপদ ভাবিয়া ও পাছে সাধুসেবার বিঘ্ন হয় ইহা মনে করিয়া ভক্তরাজ অপরকে বলিলেন আমার মাথা কাটিয়া তুমি দ্রব্যগুলি লইয়া সাধু মহাত্মাদের সেবা কর। তাহাই করা হইল। ধন্য ভক্তরাজ! তুমিই বুঝিয়াছ—

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে জনাঃ॥'

সাধুর কৃপায় মৃত মনুষ্য জীবন পাইল। যাঁহার গলদেশ ছেদন করা হইয়াছিল অপর ভক্তটী দেখিলেন তিনি গৃহে আসিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগত। দীনবেশে দীনতার প্রতিমূর্ত্তি বৃক্ষতলে বসিয়া আছে ঐ কে? তুমি কি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ সারাদিন সে কিছু খাইয়াছে কি না? সে পাগল তবে আর আমার জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি? আমি উপেক্ষা করিলাম কিন্তু তুমি ভক্ত, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলে উনি আর কেহ নহেন উনি মুসলমান সম্রাট বায়েজিদ্। আহা এক সময় খোদা তাল্লা বলিলেন "বায়েজিদ্! এমন কিছু লইয়া আমার কাছে এস যাহা আমার নাই"। বায়েজিদ্ বলিলেন—"**প্রভু তোমার নাই এমন দ্রব্যটী কি**? উত্তর হইল **দীনতা**"।

শ্রীহরিপদানন্দ অবধূত।

"শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি"।

তোমার শ্রীনাম করিয়া স্মরণ,
প্রভাতে যেন গো জাগি॥
চরণ দুখানি হৃদয়ে ধরিব,
সুগন্ধি-কুসুম চয়ন করিব,
সুচিকণ হার অতি সযতনে
গাঁথিব তোমার লাগি,
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

বিষয় বিলাসে, বিপদে বিয়োগে,
যাহা কিছু পাই, তোমার নিয়োগে
হাঁসিমুখে যেন মাথা পেতে লই,
না হই তাহে বিরাগী।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

তোমার শ্রীনাম তোমার কথায়
তব জনসনে দিন কেটে যায়;
তোমাহীন জন হ'তে দূরে রেখ,
ক'রনা সে দুঃখ-ভাগী।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

কাণে যাহা শুনি, চোখে যাহা দেখি,
তোমা সনে যেন থাকে মাখা মাখি;
মন সদা ভাবে তোমার ভাবনা,
ভাবেনা কাহারো লাগি,
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

যাহা কিছু পাই তোমার প্রসাদ,
তাহে যেন কভু ঘটেনা বিষাদ,
তোমার আসার আশার শয়নে;
সতত রহিব জাগি।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

করে করি সেবা, শিরে প্রণিপাত,
হৃদয়ে বিহর এই কর নাথ,
যতদিন ভবে রাখিবে তোমাতে
হই যেন অনুরাগী।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

জলন্ত বিশ্বাস, অনন্ত নির্ভর,
দাও দাও প্রাণে ওহে প্রাণেশ্বর,
তুমি তোমা বিনা আর যাহা কিছু
তাহে কর বীতরাগী।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি॥

তোমার দয়ার নাহি পরিমাণ,
প্রতি পদে যাহা করিতেছ দান,
জনমে জনমে তুমি প্রভু মোর,
থেকোনা গো তেয়াগি।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি
তুমি যথা থাক মহাতীর্থ ধাম,
আনন্দ নিলয় তোমার শ্রীনাম,
পরম দয়াল 'শ্রীনিত্যগোপাল',
গাহুক জগতে জাগি।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি
প্রভাতে তোমার প্রিয়দাসী হব,
শ্রীঅঙ্গ-সেবায় নিয়ত রহিব,
কস্তুরী চন্দন মাখায়ে যতনে
হইব সে সুখভাগী।
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি।
ক্ষুধার সময় হইবে যখন,
সুখাদ্য সুপেয় করি আহরণ,
জননী-যতনে তোমার সদনে
চলিব তোমারি লাগি॥
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি
দিবা অবসানে সায়াহ্নকালে,
বিনোদিয়া হার গাঁথি দিব গলে,
কর্পূর, তাম্বুল যোগাব যতনে
সারাটি যামিনী জাগি।
শুধু একটি ভিক্ষা মাগি
শ্রী—

"রামলাল দত্ত।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

আমাদের যে (বেস্ত) সমসাময়িক সাধক-বর্গ মধ্যে ভুবনচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত মহাশয় বিশেষ ভাগ্যবান্। তাঁহাদের রচনা শক্তি যেরূপ সুন্দর কণ্ঠও সেইরূপ মধুর। ভুবনচন্দ্র মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন।

রামলাল বাবু অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অল্প কয়েকটী সঙ্গীত মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪।৫ বৎসর হইল আমার সহিত রামলাল বাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার নিকট শ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার রচিত সঙ্গীতের এক খণ্ড খাতা অপহৃত হইয়াছে। বোধ হয় তস্কর মহাশয় বৃদ্ধ রামলাল বাবুর মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছিলেন।

রামলাল বাবুর সঙ্গীতগুলি ভক্তির বিমল উৎস এবং অতিশয় শ্রুতিমধুর; আমরা এস্থলে তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। উল্লিখিত পাঁচজন সাধকের রচিত সঙ্গীত সমূহের তুলনার সমালোচনা করিবার প্রবল বাসনা রহিয়াছে। রোগশয্যা-শায়ী এ বৃদ্ধের সে সাধপূর্ণ হইবে কিনা তাহা মা জগজ্জননীই জানেন।

ভৈরবী—যৎ।

(১)

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে কেবলি দয়া তোমার জেনেছি মা দুঃখহরা॥
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে শিরে দুঃখের পসরা॥

তুমি অমূল্য রতন, ব্রহ্মময়ী নামধন,
তারা ব'লে ডাকি যখন হইগো আপনহারা।
তুমি গো দীন তারিনী, শরণাগত-পালিনী
আমি ঘোর পাতকী ব'লে তোমারে হয়েছি হারা॥
আমি তোমার পোষা পাখী,
যা শিখাও মা তাই শিখি;
রামে শিখায়েছ তারাবুলি,
তাই ডাকি মা তারা তারা॥

ভৈরবী—দ্রুত একতালা।

(২)

দেহি দেবী দরশন।
আর দুঃখ দিওনা দীনে, দীন-দয়াময়ী।
দনুজদলনী দেবী দেব-হৃদয় ধন॥
দীন-তারিণী মম দিন আগত দেখি।
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি।
জানিনা জননী আর কতদিন বা আছে বাকি।
দয়া করি আসি কর দীনের দুঃখ বিমোচন॥
জানিগো তব চরণ ভবপারের সুখতরি,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ওপদ পাসরি।
তাই মা তোমার তরে আকুল প্রাণে নেহারি,
লুকায়ে থেকোনা কর দ্রুতপদে আগমন॥
সভয়ে ডাকি অভয়ে করমা অভয় দান,
ভব ভয় হ'তে দীন রামে কর আসি পরিত্রাণ,
তোমা বিনে শিবে কে করিবে দুঃখ অবসান,
কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা নহে কখন॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(৩)

হর দীন-দুঃখ হররাণী।
দীনদয়াময়ী দিন যে আগত মম,
বল আর কবে শিবে ঘুচাবে ভবের ভ্রম,
মিটাবে মম বাসনা, নাশিবে যমবেদনা,
দেখাবে সে চরণ দুখানি॥
দীন তারিনী কবে দানবদলনী বেশে,
আসিবে তাপিত সুতে তুষিবে মধুর ভাষে,
পশিবে মম আবাসে আর কবে নাশিবে,
সে চিররিপু দুর্জ্জনারে জননী॥
আর কবে বনমালা দিব মা তোমার গলে,
কবে পূজিব ওপদ জবা-গঙ্গা-বিল্বদলে,
প্রেমাশ্রু ভাসায়ে ধরা লুটাব পদকমলে,
(কবে) কেঁদে কৃত অপরাধ জানাব জননী॥
কবে শুনিব প্রাণে ও মুখে মাভৈবানী,
চৈতন্য হইবে কবে ও চৈতন্যরূপিণী,
দীন রামে আর কবে কোলে লবে নিস্তারিণী,
ছাড়াবে মায়ার কোল শমনবারিণী॥

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ—বিদ্যাভূষণ।

বৈষ্ণব-অপরাধ।

একদিন শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং শালগ্রাম নিজক্রোড়ে লইয়া বিষ্ণুর সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান আপ্তবর্গও সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রেমে গদ গদ হইয়া করযোগে মহাপ্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং প্রেমভক্তি বিলাইয়া আপনার সকলকে প্রেম-

স্রোতে ভাসাইবার জন্যই যে, তিনি এ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিলেন। যথা—

মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রামরূপে কৈনু সাগর বন্ধন॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিল যে নাড়ার হুঙ্কারে॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ!
যাগ যাগ আরে নাড়া যাগ শ্রীনিবাস॥
(চৈতন্য ভাগবত—মধ্যখণ্ড)।

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দর্শন করিয়া শ্রীমৎ নিত্যানন্দ অবধূত শ্রীচৈতন্যদেবের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। তখন গদাধর বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাম্বুলাধার ধরিলেন। অন্যান্য ভাগ্যবান বৈষ্ণবগণ চামর ঢুলাইতে আরম্ভ করিলেন। এরূপে গোলোকনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব লীলা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশ পাইয়া প্রত্যেক ভক্তই স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কেহ জননীর জন্য, কেহ বা জনকের জন্য, কেহ পত্নীর জন্য, কেহ বা পুত্রের জন্য, কেহ বন্ধুর জন্য, কেহ বা সেবকের জন্য, প্রেমভক্তি ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু সহাস্য বদনে সকলকেই প্রেমভক্তি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভগবানের এই লীলা দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস গোস্বামী মহাপ্রভুর জননী শ্রীশচীদেবীর নিমিত্ত প্রেম-ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শচী-মাতাকে প্রেমলাভের বরপ্রদানে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—

"বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি বাধ"॥

সমবেত ভক্তগণ এই অচিন্তনীয় বাক্য-শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। সকলে অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া শ্রীমুখে বলিলেন,—অদ্বৈত প্রভুর নিকট শচীদেবীর অপরাধ হইয়াছে। একমাত্র আচার্য্য মহাশয়ই সে অপরাধ ক্ষমা করিলে তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন হইবে; প্রেমভক্তি লাভ হইবে।

"নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত চরণ ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ উল্লাসিত হৃদয়ে আচার্য্যদেবকে ঘিরিয়া বসিলেন। অদ্বৈত প্রভু এই সংবাদে মৃয়মান হইলেন; কহিলেন,—যে দেবীর গর্ভে আমাদের প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি আমার জননী। আমি তাঁহার পুত্র। হে শ্রীপাদবর্গ, আপনারা যদি আমার জীবন লইতে ইচ্ছা করেন এক্ষণে তাহা গ্রহণ করুণ। আমি মিনতি করিতেছি, আপনারা এ-হেন নিদারুণ কথা আর মুখে প্রকাশ করিবেন না। আপনারা কি অবগত নহেন ইনি জগন্মাতা, ইনি গঙ্গাসদৃশা;—ইনিই যে দেবকী! ইনিই যে যশোদা! এইরূপে শচীদেবীর 'তত্ত্বকথা', বলিতে বলিতে আচার্য্যদেব ভাব-মগ্ন হইয়া ধূলি-ধূসরিত হইলেন। এ হেন সুযোগ লাভ করিয়া শচীদেবী অদ্বৈতপ্রভুর চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন—করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হই-লেন। উভয়ের প্রভাবে উভয়েই বিহ্বল—উভয়ই সংজ্ঞাহীন। ভক্তমণ্ডলী এ-দৃশ্য দর্শন করিয়া পুলকিত অন্তরে হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে অদ্বৈত প্রভুর চরণ-রেণু স্পর্শ করিয়া শ্রীশচীদেবী বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতেছেন।—

"এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।"

ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাস-বাণী-শ্রবণে বৈষ্ণবগণ কৃত কৃতার্থ হইলেন। "জয় জয়" "হরি হরি" রবে শ্রীধাম নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লোক শিক্ষার জন্য আপনার জননীর প্রতি দণ্ড-বিধান করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সত্য উপাখ্যানটি প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়! আমরা সর্ব্বদা কত সাধু-মহাত্মার নিন্দা করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি, তাহা একবার ভ্রমেও চিন্তা করিতে অবকাশ পাই না।— অদ্বৈত প্রভুর নিকট শচীদেবীর কি অপরাধ হইয়াছিল তাহা শুনিবার জন্য কোন কোন পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদের কুতূহল নিবারণার্থ অতি সংক্ষেপে সেই অপরাধ কাহিনী বিবৃত করিবা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডে ইহার সবিস্তার বর্ণনা রহিয়াছে। ভক্তিমান পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকা সেই অংশ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

তৎকালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশে একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। নগরটি পণ্ডিত-বর্গের লীলানিকেতন ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থিগণ সমবেত হইয়া নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ব্যবসায়িগণ নবদ্বীপে আবাস বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা ধনাগার পূর্ণ রাখিতেন। নানা দেশীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই উক্ত নগরে এক একটি বাস ভবন ছিল। সে সময় নবদ্বীপ— ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই বাসস্থল ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই নগর উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ হেন সমৃদ্ধিশালী নগরে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ স্ব স্ব চতুষ্পাঠীতে শ্রীশ্রী-ভাগবত অধ্যাপনা করিলেও ভক্তিকথা বড় কেহ ব্যাখ্যা করিতেন না। প্রায় কেহই ভক্তি-পথাবলম্বী ছিলেন না। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তদীয় চতুষ্পাঠীতে ভক্তি ব্যাখ্যা করিতেন। ভক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈত প্রভুর ছাত্র। তিনি আচার্য্যদেবের নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়া ভক্তিমার্গের অনুরাগী হন। এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া 'অনন্তপথে' গমন করেন। পুত্র বৎসলা শচীদেবী অদ্বৈত প্রভুকেই তাঁহার পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিলেন না। বিশ্বম্ভরকে বুকে লইয়া শোক তাপ ভুলিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন শচীদেবী লক্ষ্য করিলেন যে, এ পুত্রও আর সংসারে থাকিবার নয়—যখন দেখিলেন যুবতী পত্নীর পানে বিশ্বম্ভর ফিরিয়াও চাহেন না—যখন শুনিলেন পুত্র সর্ব্বক্ষণ অদ্বৈতভবনে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে তৎপর, তখন তাঁহার ধৈর্য্য তিরোহিত হইল। তিনি অন্তরে অন্তরে আচার্য্যপ্রভুর প্রতি বড়ই বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন কেন লোকে ইঁহাকে "অদ্বৈত" বলেন; ইনি যে "দ্বৈত" ভাবাপন্ন। আমার এক পুত্র ঘরের বাহির করিয়াছেন এ পুত্রকেও ঘরে বসিতে দিবেন না। আমার প্রতি তাঁহার একটু দয়া হয় না? লোকে কেন তাঁহাকে অদ্বৈত বলে বুঝিতে পারি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব লোকশিক্ষার নিমিত্তই যে, শচী-দেবীর এই মনোগত ভাবটিকে বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্রমশঃ

শ্রীমনিন্দ্র কিশোর সেন।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ।

সত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন ;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, কার্ত্তিক। { ১০ম সংখ্যা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

সমুদ্রে অনেক তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গই সমুদ্রের অংশ সমুদ্র থাকে, মন হইতেই মনোবৃত্তিগণের বিকাশ। সেই জন্য প্রত্যেক মনোবৃত্তিই মনের অংশ মন।১৬।

কোন অলক্ষিত বিষয়ের পর্য্যালোচনায় কালাতিপাত হইলে অনেকেরই সুখবোধ হয় না। বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহেন। ১৭।

ভারতবর্ষে যত ধর্ম্মোপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন তত ধর্ম্মোপদেষ্টা অন্য কোন দেশেই আবির্ভূত হন নাই। ভারতবর্ষ যেন ধর্ম্মের অক্ষয় খনি। ১৮।

ঈশ্বরকে যিনি দেখিয়াছেন কোন প্রলোভনই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারেনা। ১৯।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম পুস্তক মনুষ্যলিখিত নহে। তাঁহার পুস্তক এই স্বভাব। এই স্বভাব হইতে মনুষ্য নিজ রুচি এবং বুদ্ধি অনুযায়িক বিবিধ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক কত ধর্ম্মপুস্তক রচনা করিয়াছেন। ২০।

ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার জননী। ভারতীয় বেদও সকল ধর্ম্মের জনক। ২১।

যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের ব্যবসা চলিতেছে তাঁহারা দল বৃদ্ধির অনুরোধে সকল কথাই বলিতে পারেন, সকল কার্য্যই করিতে পারেন। ২২।

প্রথম পত্নীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকিলে দ্বিতীয়বার আর পুরুষ বিবাহ করিতে পারেন না। তোমার ইষ্টে ভক্তি থাকিলে অপর ইষ্টের আকাঙ্ক্ষা করিতে না। ২৩।

কর্ত্তার ভজন সকল জাতিই করিতে পারেন। কর্ত্তার ভজন যাঁহারা করেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি গুরু হইবার উপযুক্ত তিনিই গুরু হইতে পারেন। ২৪।

কোন মহাপুরুষের নিকট অল্প সময়ের জন্য বসিলে যে সমস্ত জ্ঞানের কথা শোনা যায় কোন সামান্য সাধুর নিকট সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও সে সমস্ত কথা শোনা যায় না। ২৫।

অনন্তরূপিনী মহাকালীর কোন ভক্তই সমস্তরূপ দর্শন করেন নাই। ২৬।

স্বরূপ দর্শন কেহ কোন কালে করেন নাই। প্রত্যেক সিদ্ধ সাকারবাদীই ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিয়াছেন। ২৭।

কোন কোন জাতীয় সুপক্ক আম্রের বর্ণও অপরিপক্কের ন্যায়। কোন কোন সাধুর বাহ্য আচরণ অসাধুর ন্যায়। ২৮।

যে সাধুর অধিক সত্ত্বগুণ আছে তিনি গুপ্তভাবে থাকিতে ভালবাসেন। ২৯।

যিনি মায়া আবরণে আবৃত নহেন তিনিই প্রকৃত দিগম্বর। ৩০।

পিতা কারণ। পবিত্র আত্মা সূক্ষ্ম। পুত্র স্থূল। ৩১।

আমি অজড়। আমার মাতা জড়া-প্রকৃতি স্বীকার্য্য হইতে পারেনা। জড়া-প্রকৃতি হইতে নানা জড় সামগ্রীরই উৎপত্তি হয়। জড়, অজড়ের উৎপত্তির কারণ হইতে পারেনা। ৩২।

আমি নিজেকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কি প্রকারে থাকিব? আমি অন্যকে ত্যাগ করিতে পারি, আমি দেহত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি নিজেকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিনা। আত্মত্যাগ কেহ কখন করিতে পারেন না। ৩৩।

অহঙ্কার থাকিতে মমতাবিহীন হইতে পার না। অহঙ্কারের অভাবেও মমতা থাকিতে পারেনা। ৩৪।

আমি থাকিতে নিরহঙ্কারও হইতে পারিনা, আমি থাকিতে নির্ম্মমও হইতে পারিনা। অগ্নি থাকিতে অগ্নি দাহিকাশক্তিবিহীন হইতে পারেনা। ৩৫।

আমার এমন অজ্ঞান অবস্থাও উপস্থিত হয়, যে অবস্থায় আমি থাকিয়াও আমি আছি বোধ করিনা। যে অজ্ঞান বশতঃ আমি থাকিয়াও আমি আছি বোধ করিনা সেই অজ্ঞান বশতঃ ঈশ্বর থাকিলেও ঈশ্বর নাই বোধ করিব তাহার আর আশ্চর্য্য কি? । ৩৬।

এই জগতে এমন কত সামগ্রী আছে যে সকল সামগ্রীর তুমি নাম পর্য্যন্ত জান না।

তবে অম্লান বদনে দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি বিবিধলোক কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? ইহলোকের ন্যায় দেবলোক এবং পিতৃলোকও আছে। ৩৭।

এমন অনেক কার্য্য আছে, যে সকল কার্য্য আমরা ইচ্ছা করিলে করিতে পারি না। তবে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি প্রকারে বলিব? ৩৮।

বাক্-রোধ হইলে মানুষ ইচ্ছা করিলেও কথা কহিতে পারে না। তবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি প্রকারে বলিব? ৩৯।

প্রকৃত রাজাকে রাজা বলিলে তাঁহার অহঙ্কার হয় না। যে রাজা নয় তাহাকে রাজা বলিলেও তাহার অহঙ্কার হওয়া উচিত নয়। নরদেহধারী ভগবানকে ভগবান বলিলে তাঁহার অহঙ্কার হয় না। যে নর ভগবান নয় তাহাকে ভগবান বলিলেও তাহার অহঙ্কার হওয়া অনুচিত। ৪০।

নিজভাবের লোকের কাছে নিজভাব ব্যক্তব্য। অ-ভাবের লোকের কাছে তাহা বক্তব্য নহে। ৪১।

নিরাকারবাদীর নিকট সাকারবাদ ঘোষণা করিলে নিরকারবাদী সাকারবাদীর প্রতিবাদই করিয়া থাকেন। সাকারবাদী নিরাকার বাদীর নিকট নিজমত প্রচার করিবেন না। ৪২।

হাস্য, ক্রন্দন উভয়ই মায়ার কার্য্য। দুইটাই মায়ার কার্য্য হইলেও তবু হাসিটা ভাল, কারণ তাহাতে কিছু সুখ আছে। ৪৩।

এমন সামগ্রী দেখা ভাল যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ৪৪।

কেবল কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতে পারিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যাহাকে পণ্ডিত বলা হইয়াছে সে পণ্ডিত কোথায়? ৪৫।

ইদানী ব্যবস্থা দিবার কর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অপণ্ডিত। অথচ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান বিলক্ষণ আছে। প্রকৃত পণ্ডিতের অহঙ্কার নাই, সুতরাং তাঁহার অভিমানও নাই। ৪৬।

ঐ ব্যক্তির নাম শ্রীকৃষ্ণ অথচ সে শ্রীকৃষ্ণ নয়। অনেককে সাধু বলা হয় অথচ তাহারা সাধু নয়। ৪৭।

সংসারে পাগল কে নয়? সকলেই যদি নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলেন তাহা হইলে জানিতে পারা যাইবে অপাগল কেহই নয়। ৪৮।

শরীরের মধ্যে আত্মা যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ তিনি আহার না করিলে শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়। আহার না পাইলে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। ৪৯।

অগ্নি সাকার, জল সাকার, পৃথিবী সাকার। যখন অগ্নি অব্যক্তভাবে থাকে তখন অগ্নি নিরাকার হয়। জল এবং পৃথিবী নিরাকার হয় না। ৫০।

পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ এবং বায়ু আকারও নহে সাকারও নহে। আকাশও নিরাকার; বায়ুও নিরাকার। ৫১।

বায়ুর রূপ নাই। তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ৫২।

জগতের বায়ু স্থূল। তাহার স্পর্শগুণ, তাহার অস্তিত্ব স্পর্শ দ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে। ৫৩।

বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ উভয়বিধ গুণই আছে। গাত্রে বায়ু লাগিলে তাহাতে স্পর্শগুণ আছে অনুভূত হয়। প্রবল বায়ু বহিলে এক প্রকার শব্দ হয়। সেই জন্য বায়ুর শব্দগুণও আছে বলা যায়। ৫৪।

দুই প্রকার সাকার। জড় সাকার আর চেতন সাকার। ৫৫।

জীবের জড় দেহই জড় সাকার। জীবের জড় দেহ আকার বিশিষ্ট বলিয়া তাহাকে জড় সাকার বলা হয়। ৫৬।

দেহী-জীবাত্মা নিরাকার। তিনি আকার বিশিষ্ট দেহে থাকিয়া নানা প্রকার কার্য্য করেন। ৫৭।

জল এবং জল যে কলসীর মধ্যে থাকে তাহারা পরস্পর অভেদ নহে। জীবাত্মা নারায়ণ নহে। পরমাত্মা-নারায়ণ জীবাত্মায় আছেন। ৫৮।

কোন ব্যক্তির সহিত, কোন জড়ের সহিত কোন চেতনের সহিত সম্বন্ধ বোধ না থাকাই মুক্তি। ৫৯।

যে নিদ্রায় থাকিলে শোক, অশোক, সুখ দুঃখ কিছুই বোধ হয় না, সেই নিদ্রাই কৈবল্যের কারণ। ৬০।

সকল শুক্তির মধ্যেই মুক্তা নাই, সকল লোকেরই দিব্যজ্ঞান নাই। ৬১।

শেষ মীমাংসা কোন বিষয়েরই হইতে পারে না। ৬২।

প্রত্যেক মনোভাব প্রকাশ করিতে যে কএকটী কথার আবশ্যক সেই কএকটী কথাই ব্যবহার করা উচিত। ৬৩।

যাহাকে তুমি স্নেহ কর বল, তাহার অবর্ত্তমানে তুমি যদ্যপি তাহার অভাব বোধ না কর তাহা হইলে তাহার প্রতি তোমার স্নেহ নাই বলিতে হইবে। ৬৪।

মদ্যে যে মাদকতা আছে তাহা অজ্ঞানেরই কারণ হয়। ৬৫।

আশা ভঙ্গ হইবা মাত্র উদ্যম শূন্য হইতে হয়। ৬৮।

সুখোদয় হইলেই দুঃখের উপশম হইয়া থাকে। ৬৭।

পাপ জ্বররূপে লোককে পীড়ন করে। পাপই নানা প্রকার পীড়ার কারণ। ৬৮।

হিন্দু মুসলমানে যে প্রভেদ সংসারী এবং সাধুতে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ৬৯।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে কলির চঞ্চলচিত্ত জীবের জন্য পরব্রহ্মের অথবা আদ্যাকালীর উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৭০।

গর্ভস্থ শিশুকে যে ভগবান পালন করিতেছেন, সমুদ্র গর্ভস্থ জলজন্তুগণকে যে ভগবান পালন করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যস্থিত কীট-পুঞ্জকেও যিনি পালন করিতেছেন, মহা-পাপীকেও যিনি পালন করিতেছেন, পাষণ্ড নাস্তিককেও যিনি পালন করিতেছেন, যাঁহার দয়ার সীমা নাই, তাঁহার শরণাপন্ন যিনি, তাহার প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস ও নির্ভর আছে তুমি কি মনে কর তাঁহাকে তিনি পালন করিতে পরাঙ্মুখ হন ? ৭১।

উত্তম বিষয়ের অনুকরণ করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। ৭২।

গৃহে যদি উত্তম খাদ্যসামগ্রী থাকে আর অনুত্তম খাদ্যসামগ্রীও থাকে স্নেহাস্পদকে. কেহ সেই উত্তম খাদ্যসামগ্রী না দিয়া অনুত্তম দিতে পারে না। প্রেম আর অপ্রেম যাহার উভয়ই আছে তিনি সচ্চিদানন্দকে প্রেম না দিয়া অপ্রেম দিতে পারেন না॥ ৭৩।

নিজেকে নিজে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারনা। কারণ তুমি নিজেকে দেখিতেছ না। ৭৪।

নিজের সম্বন্ধে সমস্ত জানিলেই যে শান্তি হইবে ইহারই বা প্রমাণ কি ? নিজের সম্বন্ধে সমস্ত না জানিলেও কি ভগবান শান্তি দিতে পারেন না ? ৭৫।

অহঙ্কার ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। অহঙ্কারশক্তি প্রভাবে তুমি আছ বোধ কর।

যদি তুমি নিরহঙ্কার হও তাহা হইলে তুমি আছ বোধও করিবে না। ৭৬।

কোন জড়বস্তুরই অহঙ্কার নাই। তুমি নিরহঙ্কার হইলে তোমার গৌরবের কি কিছু বৃদ্ধি হইবে? আত্মাকে নিরহঙ্কার বলিলে প্রকারান্তরে আত্মাকে অচেতন জড় বলা হয়। অথচ তোমার মতেই বলা হইতেছে আত্মা ব্যতীত অপর সমস্তই কল্পনা ও মিথ্যা। তোমার মতে জড় কল্পিত ও মিথ্যা। ৭৭।

নানা গুণে এক বহু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক জল নানা সামগ্রী যোগে নানা আস্বাদন বিশিষ্ট হয়। ৭৮।

এ জনের আমার প্রতি যত প্রেম আমার তাঁহার প্রতি তত প্রেম থাকিলে তাঁহার প্রেম ও আমার প্রেম অভেদ। কিন্তু তিনি আর আমি অভেদ নই। তোমার নিজের প্রতি যত প্রেম তত প্রেম সর্ব্বজীবে থাকিলেও তুমি আর সর্ব্ব জীব এক ও অভেদ নও! ৭৯।

একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ। নিজের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ নাই। কেবল একই থাকিলে আর কার সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে। আমার, তোমার এবং তাঁহার এই তিনই সম্বন্ধবাচক। আমার তুমির সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁহার তিনির সঙ্গে সম্বন্ধ। ৮০।

কোন জীবেরই অশোক জীবন নয়। জীব-জন্তু ব্যতীত আর কিছুর জীবনও নাই। ৮১।

জীবের তাহাদের রক্ষা করিবার প্রয়াস বৃথা। স্বয়ং ভগবান তাহাদের রক্ষা করিতেছেন। ৮২।

সামান্য শাকান্ন বা লবণ মিশ্রিত পর্য্যুসিত অন্ন দ্বারা যাঁহার উদর পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাকে বমন করাইয়া পলান্ন প্রভৃতি উত্তম আহার্য্য সকল আহার করাইবার চেষ্টা করিলেও বমন জনিত দৌর্ব্বল্য বশতঃ তৎকালে আহার করিতেও পারেন না। স্বাভাবিক নিয়মে ভুক্ত শাকান্ন প্রভৃতি জীর্ণ হইয়া বিষ্ঠা রূপে নির্গত হইলে পরে তাঁহাকে উত্তমোত্তম আহার্য্য সকল আহার করাইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। যাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সাংসারিক সুখাস্বাদন করিতেছেন তাঁহাদের সে সুখ জীর্ণ হইলে তবে তাঁহাদের ভগবৎসুখাস্বাদন করাইবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। ৮৩।

তুমি যদি অনাসক্ত, নির্লোভ ও নির্লিপ্ত মহাপুরুষ হইতে তাহা হইলে তুমি আহার করিতে না। ক্ষুধা নাই যাহার, অন্নে রুচি নাই যাহার, অন্নে লোভ নাই যাহার সে অন্ন ভক্ষণও করে না। আমরা জানি ক্ষুধা, রুচি ও লোভ ব্যতীত কেহ আহার করে না। তৃষ্ণা ব্যতীত কেহ জল প্রভৃতি পেয় পানও করে না। পানাহার করিয়াও যদি তুমি নির্লোভ ও নির্লিপ্ত মহাপুরুষ হইয়া থাক তাহা হইলে শৃগাল কুক্কুরও তোমার ন্যায় মহাপুরুষ বলিতে হইবে। ৮৪।

শুক, শঙ্করাচার্য্যের শৈশব হইতে বিবেক হইয়াছিল। তাঁহারাত কখন সংসারী হন নাই তবে কি প্রকারে তাঁহাদের বিবেক ও সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছিল? তাঁহারা কি প্রকারে সংসার ও সংসার ত্যাগের তারতম্য বুঝিয়াছিলেন? ৮৫।

নিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডী বলা যায় না, কারণ দণ্ডী অবধূত নন্। বৈষ্ণবদিগের কোন মতের সন্ন্যাসীকেই শাস্ত্রে অবধূত বলা হয় নাই। ৮৬।

কত প্রধান প্রধান সাধু এক স্থানে দীর্ঘ কাল থাকেন। তাঁহারা সন্ন্যাস প্রকরণ অনুসারে নগরে তিন দিন ও ক্ষুদ্র গ্রামে এক দিন থাকেন না। সুবিখ্যাত পরমহংস তৈলঙ্গ স্বামী একস্থানে বহুকাল ছিলেন। পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীও একস্থানে দীর্ঘকাল ছিলেন।

কাশীনগরীর অনেক মঠের অনেক স্বামী কাশীতে দীর্ঘকাল আছেন। যিনি আত্মারাম হইয়াছেন তাঁহার কোন স্থানেই ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই। ৮৭।

তোমার যদ্যপি ভগবানে ভক্তি থাকিত, তুমি যদ্যপি আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া জানিতে তাহা হইলে তোমাকে ভগবান বলিয়া ভক্তি করায়ঃ এত উল্লাস হইত না। প্রকৃত প্রভুভক্ত দাসকে প্রভু বলিলে সে কথনই সন্তুষ্ট হয় না। ৮৮।

বর্ত্তমান মহারাণীর রাজ্যাভিষেক হইতে কত বিধিই সৃষ্টি হইয়াছে। ইদানী সে সমস্ত বিধির অনেক বিধিই অপ্রচলিত হইয়াছে, ইদানী সে সমস্ত বিধির কত বিধির কত ধারার পরিবর্ত্তে কত নূতন ধারা হইয়াছে অথবা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ পরিত্যক্ত বিধি ও ধারা গুলির রচনা কালে ঐ সকল বিধি ও ধারা কবে প্রচলিত ও পরিত্যাগ করা হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই ঐসকল বিধিতে কিম্বা সকল ধারার সঙ্গে লেখা হয় নাই। কলিতে বেদ, পুরাণ অকর্ম্মণ্য ও অপ্রচলিত হইবে বলিয়া কোন নির্দ্দেশ কোন বেদে কিম্বা পুরাণে নাই. সেই জন্য কলিতে কেবল তন্ত্রের মতই কর্ম্মণ্য ও প্রচলিত হইবে একথাও চতুর্ব্বেদে এবং কোন পুরাণে নাই। ৮৯।

ঋগ্বেদে. সাম, যজু এবং অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই, সেই ঋগ্বেদে কোন পুরাণ, কোন তন্ত্রেরও উল্লেখ নাই। তুমি যদি সাম, যজু এবং অথর্ব্ববেদীয় অনুষ্ঠান সকল করিতে পার তাহা হইলে তোমার পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক বিধি সকলই বা অনুষ্ঠেয় হইবে না কেন? ৯০।

সত্য, বেদে কোন মূর্ত্তি পূজারও বিধি নাই, বেদে কোন মূর্ত্তির উল্লেখও নাই। ঋগ্বেদ অন্য ত্রিবেদের উল্লেখ নাই তবে তুমি অন্য ত্রিবেদ মান কেন? তোমার ঋগ্বেদের সঙ্গে অন্য ত্রিবেদ মানা যদি অসঙ্গত না হয় তাহা হইলে আমাদের মূর্ত্তি পূজাও অসঙ্গত নহে। ৯১।

স্বয়ং কৃষ্ণ চিৎ। তাঁহার বৃন্দাবন ধাম চিন্ময়। চিৎ অর্থে জ্ঞান চিন্ময় অর্থে জ্ঞানময়। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত জ্ঞান এবং জ্ঞানময়ের বিদ্বেষী হইতেই পারেন না। ৯২।

সৎ কৃষ্ণ। আনন্দ রাধা। কৃষ্ণ রাধা। রাধা কৃষ্ণ। সৎ আনন্দ। আনন্দ সৎ। সদানন্দ। ৯৩

কাল অনন্ত। সেই অনন্তকালে ব্যাপ্ত যে শক্তি তিনিই কালী। ৯৪।

আমার মতে নারায়ণ জড় নহেন। আমার মতে নারায়ণ চৈতন্য তোমার মতে দেখিতেছি নারায়ণ জড়। ৯৫

স্যাক্‌সন ভাষার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার জন্ম। অনেক ভাষাবিৎ পণ্ডিৎ সংস্কৃত ভাষাকে স্যাক্‌সন ভাষারও জননী বলেন। অতএব সেই জন্য গড শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত গুহ শব্দ হইতে হইয়াছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ৯৬।

উচ্চশ্রেণীর সাধুদিগের বালকের ন্যায় সারল্য, যুবকের ন্যায় অধ্যবসায় এবং বৃদ্ধের ন্যায় স্থৈর্য্য। ঐ প্রকার সাধু হইতে হইলে ঐ সকল সৎগুণ লাভ করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ১।

সাধু হইতে হইলে ধৈর্য্যশালী হইতে হয়। ২।

লঙ্কাপতি রাবণ কপটবেশে সীতাহরণ করিয়াছিলেন। কপটবেশও ধর্ম্মসঙ্গত নহে, কপটাচরণ ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যাঁহারা কপট-

বেশী হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কপটাচারী হন, তাঁহারা অবিশ্বাসের যোগ্য। কপটতার সহিত অসত্য এবং প্রবঞ্চনার বিশেষ সম্বন্ধ। ৩

একজনের পুত্রমরণজনিত শোকদর্শনে অপর একজন পুত্র লাভ জন্য লালায়িত হয় কেন? ৪।

অদ্বৈত মতে একজনকে বধ করাও মায়ার কার্য্য, একজনের প্রতি দয়া করাও মায়ার কার্য্য। জীব সৎকার্য্যও করে মায়াতে অসৎ কার্য্যও মায়াতে করে। ঐ সকল ব্যাপারের অতীত যিনি তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। অদ্বৈত মতানুসারে শরীরের ধ্বংস হয়। আত্মার ধ্বংস নাই। কোন কোন শাস্ত্র মতে সেই আত্মাই জীবত্ব সম্পন্ন হইলে, তাঁহাকেই জীবাত্মা বা জীব বলা হইয়া থাকে। ৫।

এক শ্রেণীর মীমাংসকদিগের মতে জীব চি কাল জীবিত থাকিবে। তাহাদের মতে জীবের ধ্বংস নাই। ৬।

বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। তন্মধ্যে ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানং এবং অনন্তং বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মের ত্রৈবিধ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মতে "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" যিনি ত্রিবিধ তাঁহার কেবল এক প্রকারতা নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি কেবল এক প্রকার হইত বেদে তাঁহার ত্রৈবিধ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে ব্রহ্ম ত্রিবিধ মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রমতে তাঁহাকে বহুবিধ বলিলেও দোষ হয় না। উক্ত তন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"স এক এবসদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈত পরা পরঃ।
সপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
গূঢ়সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥
লোকাতীতো লোকহেতুরবাংমানসগোচরঃ।
সবেত্তিবিশ্বং সর্ব্বজ্ঞং ন জানাতি কশ্চনঃ॥
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ।
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ংবতো মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং সএকঃ পরমেশ্বরঃ॥" ৭।

আত্মা।

আত্মা চৈতন্য, আত্মা সত্য, আত্মা আসল। সেইজন্য আত্মাকে নকল করাও যায় না। সেই-জন্য আত্মার ছবি তুলাও যায় না। শরীর জড়, শরীর অচৈতন্য, শরীর আসল নয়। সেইজন্য শরীরের নকল করা যায়।

জড় অচৈতন্য। জড় আসল নয়। সেই-জন্য তাহার নকলও হইতে পারে। শরীর জড়। শরীর আসল নয়। সেইজন্য শরীরের নকল হইতে পারে।

আত্মজ্ঞান।

সাধনাবস্থায় বিধি নিষেধ উভয়ের অনুসরণ করিতে হয়। যে সাধকের পক্ষে যে সকল বিধি উপযোগী তাহার সেই সকল বিধির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যে সাধকের পক্ষে যে সকল নিষেধ উপযোগী তাঁহার সেই সকল নিষেধ মানিয়া চলা কর্ত্তব্য।

সাধনার সীমার মধ্যে থাকিয়া কেহই বিধি নিষে-ধোত্তীর্ণ হইতে পারেন না। আত্মজ্ঞান বশতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় হইলে, কোন বিধির

কোন নিষেধেরই অধীন হইতে হয় না।

পরমেশ্বর ও তাঁহার বিবিধ বিকাশ।

একই ক্রিয়া। তাহার কত প্রকার বিকাশ। সেই সকল বিকাশের পরস্পর অত্যন্ত অনৈক্য। একই পরমেশ্বরের অনন্ত বিকাশ। সেই সকল বিকাশেরও পরস্পর কত অনৈক্য।

ক্রিয়ার সৎ এবং অসৎ বিকাশ আছে। ক্রিয়া এক হইলেও যেমন তাহার পরস্পর বিপরীত দুই বিকাশ হইতে পারে তদ্রূপ পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই বিকাশ আছে।

ভক্তি ও তাঁহার মাহাত্ম্য।

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তাহার বিশেষ কষ্ট হয়। তাহার প্রসব করিবার সময় ততোধিক কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু সে সন্তান প্রসব করিলে তাহার বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ হইতে থাকে। সন্তান দর্শনে তাহার বিশেষ সুখানুভব হইতে থাকে। বহু কষ্টে যে ধন প্রাপ্তি হয় সে ধনে বড়ই আদর ও যত্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে সাধনকালে অনেক সময়ে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সাধক জ্ঞানরূপ পুত্র লাভ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তিলাভ হইলেও আনন্দের সীমা থাকে না। যেহেতু সেই কন্যাই তাঁহার ভগবচ্চরণ দর্শনের এবং তাঁহার সেবা করিবার কারণ হইয়া থাকে। সাধকের ভক্তি লাভ হইলেই পরমাসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধিসম্পন্ন সাধক ভক্তিবলেই ভগবানকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই ভক্তাচার্য্যগণ বারংবার সেই মহীয়সী ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভক্ত।

শ্রীভগবান কিম্বা তাঁহার ভক্ত মহাপুরুষগণ জীবগণের প্রতি যে কোন প্রকার ব্যবহার করেন তাহাই জীবগণের মঙ্গলের কারণ হয়।

সাধু।

জ্ঞানীর তপস্বীর ন্যায় কোন প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান নাই. ভক্তেরও তপস্বীর মতন কোন প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান নাই। রাজযোগী প্রভৃতিরও কোন প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান নাই। কেবল নানাপ্রকার তপস্বীগণই অনেক প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোক সমূহ মধ্যে অনেকেই জ্ঞানীরও কঠোর অনুষ্ঠান সকল দেখিতে চাহেন। তাঁহারা ভক্তেরও কঠোর অনুষ্ঠান সকল দেখিতে চাহেন। তাঁহারা যোগীরও কঠোর অনুষ্ঠান সকল দেখিতে চাহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় জ্ঞানীর তপস্যা না থাকিলে তিনি প্রকৃত জ্ঞানী নহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় ভক্তের তপস্যা না থাকিলে তিনি প্রকৃত ভক্ত নহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় রাজযোগী প্রভৃতি মহাত্মাগণের তপস্যা না থাকিলে তাঁহারা প্রকৃত যোগী নহেন। ঐ সকল ব্যক্তির বিবেচনায় যে জ্ঞানী অতপস্বী তিনি প্রকৃত সাধু নহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় যে ভক্ত অতপস্বী তিনিও প্রকৃত সাধু নহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় যে যোগী অতপস্বী তিনিও প্রকৃত সাধু নহেন কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সকল সাধুই এক শ্রেণীর নহেন। তাঁহাদিগের জানা উচিত নানা শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানী সাধুতে এবং তপস্বী সাধুতে পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে।

বিজয়া।

(গীত।)

নয়নে আমার হেরি যে আঁধার, উমাশশী আমার চ'লে যেতে চায়।
বলগো বুঝায়ে, বল উমা মায়ে, উমা যেন মোরে ছেড়ে নাহি যায়॥
সোণার প্রতিমা শোনগো মা উমা, মায়েরে ত্যজিয়ে কি ব'লে যাবি মা।
মাহওয়া যে জ্বালা তুমিত বোঝ মা, জগত ডাকে মা মা ব'লে তোমায়॥
পাষাণ-নন্দিনি, হ'সনা পাষাণী, তোর মা যে উমা বড় অভাগিনী।
তবু ত্রিভুবনে আছি গরবিনী, জগতের মাতা মা ব'লে আমায়॥
সারাটা বছর থাকি পথ চেয়ে, মহানন্দময়ী আসিবে সে মেয়ে।
জ্ঞানানন্দে যাবে ত্রিভুবন ছেয়ে, তিনদিনে সাধ মিটিল না হায়॥
বছর ভরিয়া করি আই ঢাই. তোর চাঁদমুখ ভাবিয়া না পাই।
বল্ দেখি তুই কো'থা আমি যাই, এ জগতে শান্তি কে দিবে আমায়॥
মরমের ব্যথা মানস-কল্পনা, কত ভাঙ্গা গড়া কত যে জল্পনা।
বলি বলি করি বলাত হ'ল না, ভাবিতে সে কথা বুক ভেঙ্গে যায়॥
বড় সাধ ছিল এবার মা এলে, পরাণের কথা কহিব বিরলে।
মু-খানি ধোয়াব নয়নের জলে, সকলই ফুরাল মূক-স্বপ্ন প্রায়॥
তুষ্ট থাক তুমি জবা-বিল্বদলে—অনুরাগে রাঙ্গা হৃদি জবা ফুলে।
বিশ্বাস-ত্রিপত্র সিক্ত প্রেমজলে—দরিদ্রের আশা যেন কুয়াসার প্রায়।
দরিদ্রের গৃহে নাহিক সম্বল, নাহি "ভক্তি প্রেম" হৃদি মরুস্থল।
আছে তপ্তশ্বাস নয়নের জল, ব্যজনার্ঘ্য তাই দিলাম তোমায়॥
"জগত-জননী" তুমি যে আমার, কি দিয়া তুষিব নাহি উপচার।
পূজ্য, পূজা তুমি, সকলই তোমার, তোমা বিনে 'তোমা' কি দিব পূজায়॥
কিকুক্ষণে এল "বিজয়া দশমী", যাবে যদি মাগো কি বলিব আমি।
আয় কোলে আয় ও বদন চুমি, দেখিস যেন মা ভুলোনাগো মায়॥

শ্রীমহানন্দ অবধূত।

"কোথা তুমি"।

(১)

কোথা তুমি, কোথা আমি, নাহি নিজজন,
তবু কেন মনে হয়, পাব দরশন।
সেই আশায় বেঁধে বুক,
ভুলিয়াছি সব দুঃখ ;—
জানিনা সে দয়া কবে হবে বরিষণ ॥
তাই শুধু তব পানে,
একান্ত ব্যাকুল মনে ;—
সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি অনুক্ষণ।
বারেক সে মূর্ত্তি যদি পাই দরশন ॥

(২)

কোথা তুমি কোথা আমি নাহি নিরূপণ।
তবু কেন প্রাণ এত হয় উচাটন।
তুমি তো নাহিক দূরে,
তবু কেন ঘুরে ফিরে ;
বিশ্বাস-বিহীন হ'য়ে করি অন্বেষণ।
হৃদয়ের অভ্যন্তরে,
নিভৃত গোপন ঘরে ;
পরমাত্মা রূপে তুমি কর বিচরণ।
তবু কেন চারিধারে খুঁজি অনুক্ষণ ॥

(৩)

হে দেব!—
এ মোহ-অজ্ঞান মোর কর বিমোচন।
থেকোনা লুকায়ে আর দিয়ে আবরণ—
মোহরূপ অন্ধকারে,
রেখেছ আবৃত ক'রে ;
তাইতে তোমার নাহি পাই দরশন।
জানিনা হে দয়াময়,
কবে হবে ভাগ্যোদয় ;—
মিটাব মনের সাধ করি নিরীক্ষণ।
অভাগার ভাগ্যে তাহা আছে কি কখন ?

অনন্ত।

"কামিনী-কাঞ্চন।"

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

"অনুরাগই সৃষ্ট জগতের মৌলিক উপাদান ইহা নিত্যসিদ্ধ। অদৃষ্ট, অপৌরুষেয় সুতরাং সৎ ভিন্ন আর জগতের সমস্ত পদার্থই সৃষ্ট সুতরাং নশ্বর ক্ষণবিধ্বংসী অতএব অসৎ। কারণ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যের কোন উপায় বা নিয়মাবলিই অনুধাবন করিতে না পারিয়া যখন গভীর নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, যখন তিনি কেবল "তপ স্তপঃ তপ স্তপঃ" এই দেব-বাণী মাত্র শুনিয়া গম্ভীর চিন্তানিমগ্ন হইলেন ; সেই সময় স্বতঃই তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ উত্থিত হইবামাত্র সেই প্রভু সয়ম্ভূ দ্বিধা হইয়া একাংশে স্বভাবে পুরুষ ও অপরাংশে উক্ত অনুরাগ ভাবে অনুরাগাত্মিকা প্রকৃতিরূপে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সৃষ্টিই অনুরাগাত্মিকা প্রকৃতি-সমন্বিতা হইয়া গেল। আ-ব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনু-পরমাণুই এক অনুরাগসূত্রে বিজড়িত ও সংশ্লিষ্ট

পরস্পরের অনুরাগ বন্ধন বিচ্যুত হইয়া

গেলে, জগতের কোন জীব, কোন পদার্থই ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। এমন কি জীবনমুক্ত মহাত্মারাও সৃষ্টির অতীত অপ্রাকৃত জগতে মায়াতীত অবস্থায় পৌঁছিয়া ব্রহ্মীভূত হইয়াও ব্রহ্মানুরাগ ছাড়িতে পারেন না। এই অনুরাগ যখন সৃষ্ট সমস্ত মায়িক বস্তু উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভগবদ্ভাবে পরিণত হয়, ব্রহ্মানুগ হয় তখন তাহার নাম ভক্তি বা প্রেম; আর যখন মায়িক জগৎকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন তাহারই নাম কাম। সুতরাং এই কামের বা সৃষ্ট্যনুগ অনুরূপের আধার যাহা তাহাই রমনীয়, কমনীয় বা তাহারই নামান্তর রমণী বা কামিনী। তাই ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্ত্তিতে দয়াময়ী সাজে শ্রীমন্তের জন্য যখন মর্ত্তে মশান ভূমিতে প্রকাশিত হইলেন তখন তিনি নাম ধরিলেন "কমলে কামিনী।"

বৃন্দাবনে যখন আসিলেন তখন রাধাবিনোদিনী; নিকুঞ্জকেলী-কামিনী অযোধ্যায় রাঘব-রমণী; আর সংসারের ঘরে ঘরে যখন বিরাজমান তখন তিনি মানবদেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী কুল-কামিনী। এই কামিনীই আবার কাঞ্চনালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব সংঘটন হয়; পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক সুখ-সম্মিলন হয়। কারণ পৌরাণিকভাবে নিত্যনিরঞ্জন-প্রেমময় বিভু দেব-দেব মহাদেবের হিরণ্যরেতার মায়াতীত নিত্য প্রেমানুরাগ মায়াও মর্ত্ত ভূমিতে রেতরূপে নিপতিত হইয়া কাঞ্চন নাম ধারণ করেন। তাই কাঞ্চন-কামিনী এত আদরের জিনিষ; তাই মা "কমলে কামিনী" আমার কাঞ্চনলতিকা, স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা স্ত্রীমূর্ত্তি; যেন একাধারে হরগৌরীরূপে বিরাজিতা বা গৌরহরিরূপে সমুদিতা, পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মিকা। রাম-ধনুআকাশে গিরিশ্রেণী মধ্যে গোলাকারে উঠিলে ভুটিয়া প্রভৃতি তত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খেরা যেমন তাহাকে ভূত মনে করিয়া কত কটূক্তি করে, মারিবার জন্য তদ্দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, অমূলক বৃথা চিন্তা ও ভয়-যুক্ত হয়। কিন্তু বিচারজ্ঞ বিজ্ঞপুরুষগণ এই হৃদয়-রঞ্জক শোভা দেখিয়া আনন্দিত হন, সেইরূপ মায়ান্ধমূঢ় জীবগণ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা পুরনারীগণকে আপন ভোগ্যবস্তু বোধে অযথা কটূক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি করে এবং কাম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আপনারাই বৃথা ব্যথিত ও উদ্বেলিত হয়; কিন্তু শুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানী মহাত্মাগণ সেই বিশ্বাধার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, প্রেমময় ঈশ্বরের অলোক সামান্য সৌন্দর্য্যচ্ছটা ভৌতিক প্রত্যেক জীব-কণিকা-মধ্য দিয়া প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত দেখিয়া অলৌকিক প্রেমানন্দে মাতিয়া নাচিয়া উঠেন।

আশ্চর্য্য কথা! ভগবানের এ এক অপূর্ব্ব মায়ালীলা যে, অতি নীচাশয় মায়ামুগ্ধ মানবমণ্ডলীও স্বচ্ছ-সরোবর-সলিলোপরি সন্তরিত সহাস-সরোজ-সুন্দরীর শান্তি-সুখদ, সুকোমল শোভা যে চক্ষে যে ভাবে দেখে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর সস্মিত সুধামাখা চাঁদমুখের সৌন্দর্য্য ও তাহার ললিত-লাবণ্য-লহরী-লীলা যে চক্ষে যেভাবে দেখে, একটী স্থূলকায় নধর পয়স্বিনীগাভীর কোমল কান্তি যে চক্ষে যে ভাবে দেখে, সে চক্ষে সে ভাবে একটী পীনোন্নত-পয়োধরা সুকেশী গুরু-নিতম্বিনী পুর-সুন্দরীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব-শোভা সন্দর্শন করিতে পারে না কেন? সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরের মোহন সৌন্দর্য্যের সাজিভরা সকল শোভা হেরিয়াই মানব! তুমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছ, মনে প্রেমময়ের প্রেম জাগাইতেছ আর কেবল এই নারী-সৌন্দর্য্যের কাছে আসিয়াই তুমি চর্ম্মকিলা —ঝলসিয়া যাও কেন? হে বিদ্বন্! অত

ভয় পাও কেন? হে সাধক! তাহার প্রতি এত ঘৃণা কেন?* সংশয় কেন? যদি বল পূজ্যপাদ ঋষি আর্য্যগণ যে নারীকে "নরকস্তদ্বারম্", "স্বর্গার্গলম্" বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছেন, তাই করি; তবে আমি বলিব আপনার দোষ না দেখিয়া একেবারে ঋষিদের দোষ দেখা কি ভাল? যে ঋষি-মুনিগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও স্ত্রীকে সঙ্গে রাখিতেন, স্বর্গকামী যে ঋষিগণ "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" বলেন, স্ত্রী ভিন্ন অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইবে না যাঁহারা বলেন, বশিষ্ঠ, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রয়োজক মহাত্মা ঋষিগণ যে স্ত্রীকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং মহর্ষিজনক মহারাজও যে স্ত্রীমণ্ডলী-মধ্যে সর্ব্বদা থাকিতেন, এমন কি বীরাচারী, কুলাচারী প্রভৃতি সিদ্ধমহাত্মা ও সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ অবধূতগণের মধ্যেও যাঁহারা ভৈরবী শক্তিস্বরূপিণী বলিয়া সম্মানিতা, আদৃতা, অধিক আর কি বলিব স্বয়ং পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও যে প্রকৃতির দায়ে, রাধাভাবে রাধাকান্তি যুক্ত হইয়া রাধা-প্রেম-হিল্লোলে নবদ্বীপ টলমল্ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীকে সেই ঋষিরাই যে আবার একেবারে "নরকস্তদ্বারম্" "স্বর্গার্গলম্" বলিলেন ইহা কি জগজ্জীবকে ছলনা করিবার জন্য? ভুলাইবার জন্য? না বাঁচাইবার জন্য? না রক্ষা করিবার জন্য? ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের এক বিষম প্রহেলিকা। হঠাৎ শুনিলেই যেন বোধ হয় ঋষিগণ বলিতেন এক, করিতেন আর এক; এ যেন সম্পূর্ণ কপটাচার! কিন্তু একথা বলিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, পাপস্পর্শ করে। তাই বলিতেছি হে কৃপালু পণ্ডিত, হে সাধকোত্তম, পূজ্যপাদ ধীরেন্দ্রগণ? এ সম্বন্ধে যাহা আমার মীমাংসা ও মনের ধারণা তাহা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া সংশোধন বা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব। আমার বিশ্বাস, ঋষিদিগের বাক্য অমোঘ-সত্য; তবে কেবল আমাদের বিপর্য্যয় বুদ্ধিতে মিথ্যা সত্যের ছায়ায় ঢাকা থাকে। অতএব স্থির-চিত্তে আজ তাহা কাটিয়া ছিঁড়িয়া দেখিব ও ঋষি বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র স্ত্রীকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা মুক্তদ্বার কি বদ্ধদ্বার, তাহা বিচারসিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। অতএব বুঝিতে হইল ইহা নরকে পড়িবার মুক্ত দ্বারও হইতে পারে আবার নরক পথ রোধ করিবার বদ্ধ দ্বারও হইতে পারে। এখন স্ত্রী পদার্থটা কি প্রথম বুঝিলেই ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন হইতে পারে। এই দৃশ্যমানা পীনোন্নতপয়োধরা, রক্তোষ্ঠ-বিম্বাধরা, সুকোমল ভুজ-মৃণাল সমন্বিতা দেহ-যষ্টিকি স্ত্রী? না তাহার স্বভাবসিদ্ধ, পুরুষের দুরারাধ্য বহু-সাধন-সাধ্য-সেবা, শুশ্রূষা, সরলতা, নম্রতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, সৃষ্টি-শক্তি-মত্তা স্নেহ ও ভালবাসা প্রভৃতি অপূর্ব্ব গুণরাশির পুঞ্জীকৃত নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিশেষের নাম স্ত্রী? এই আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক

* যে ব্যক্তি পথ ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে, তাহাকে কেবল পথ হারা হ'য়ে ঘুরিতেছ কেন, বলিলে তাহার কি উপকার হইবে? তাহার গন্তব্য পথ যদি জান দেখাইয়া দাও। সংসারী হ'য়ে থাকা মন্দ বলিয়া সংসারীকে দূষিলে কি হইবে? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহার সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও। (সাধনা ও মুক্তি ২য় ভাগ ১ম অঃ ২)। পাপীকে ঘৃণা করিও না পাপকে ঘৃণা কর (বাইবেল)।

অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই স্ত্রী পদবাচ্য বটে কিন্তু পণ্ডিত ও জ্ঞানী সাধক মাত্রই এই শেষোক্ত শরীরকে যথার্থ স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিবেন। অতএব বুঝিতে হইবে, যাঁহারা এ সকল ভাগবতীয় শ্রেষ্ঠ-গুণমালাকে অপূর্ব্ব শক্তি সমষ্টিকে সৃষ্টি-স্থিতি-স্বরূপিণী ভাবে প্রাণ-মন সহ আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সেইভাবে আপ্লুত হইয়া প্রকৃত্যাত্মক শুদ্ধ-বুদ্ধ হইতে বলেন অথচ এই স্থূল স্ত্রী মূর্ত্তিটীর সহিত কোন সম্বন্ধ বা মানসিক সংস্পর্শ না রাখেন, তাঁহা-দিগের জন্য স্ত্রীরূপ নরকের দ্বার সদাবদ্ধ অথবা স্ত্রী বা প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের নিকট সেই মহাত্মা যোগযুক্ত পুরুষের নিকটেই সর্ব্বদা বদ্ধ থাকেন। তিনি তাঁহাদিগের হাত এড়াইতে পারেন না; তাহাদের প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকেন; আর যাহারা সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমানা স্ত্রীর স্থূল মূর্ত্তিটীতে—অস্থি; মাংস, ক্লেদে আসক্ত তাহাদের জন্যই স্ত্রীরূপ নরকের দ্বার সদামুক্ত। অথবা স্ত্রী বা প্রকৃতিদেবী তাহাদিগের হস্ত হইতে সদা বিমুক্ত। তাহাদের প্রেমে কখনই বদ্ধ হন না। আর স্ত্রীকে "স্বর্গার্গলম্" যে বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। স্ত্রীর উভয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর রমণ-প্রিয় পুরুষদিগের পক্ষেই "স্বর্গার্গলম্" স্বরূপ; স্ত্রীর আধ্যাত্মিক লিঙ্গ শরীর ভাবাপ্লুত জ্ঞানী-পুরুষগণের পক্ষে স্বর্গার্গল স্বরূপ; কারণ যোগ-যুক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিনিষ্ঠ মহাত্মাগণ স্বর্গতুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মেলীন হন; স্বর্গাদি ভোগের পথে যাইতে হয় না। আর স্ত্রীর এই আধিভৌতিক স্থূল শরীরের ভাববিভোর, বিমূঢ় লম্পট পুরুষগণের পক্ষেও ঐ স্ত্রী স্বর্গার্গল-স্বরূপ। স্ত্রীমূর্ত্তি প্রকৃতই আনন্দময়ী মা জগজ্জননী দয়াময়ীর বিভূতিমাত্র; তাই তাঁহারা আপন শরীর-সম্ভূত দুর্ব্বল অসহায় শিশু-জীবগণকে অতীব মূঢ় দেখিয়া যেন দয়াপূর্ব্বক, পাছে আপনার স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ শক্তির তেজে বিদগ্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই ভাবিয়া স্বভাবতঃ আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তথাচ রে লম্পট কীটানুকীট মূঢ় জীব! যদি তুমি অগ্নি শিখাকে ফুল্লচম্পক-কলিকা-ভ্রমে আলিঙ্গন কর তবে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া সুতপ্ত-তৈল কটাহ নরকে নিমগ্ন হইবে। তাই সেই দুঃখী কামার্থ, মূঢ় জীবগণকে ভয় দেখাইবার জন্য, রক্ষা করিবার মানসে শ্রীমচ্ছ-ঙ্করাচার্য্যস্বামী সুকৌশল-পূর্ণ উপদেশ করিলেন যে, তোমরা রাজ-রাজেশ্বরীর উচ্চদরবারে আসিবার উপযুক্ত নও; দূরে দণ্ডায়মান হও। ঐ মূর্ত্তিকে স্থূলদর্শী জীব! তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে; উহা তোমার সুতপ্ত-তৈল কটাহ নরক! কিন্তু যদি কোন মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায়, সুধন্বার ন্যায়, বীর থাকেন তবে তিনি তাহাতে ভয় করিবেন কেন? তিনিই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া সুখে মায়ের কোলে ঘুমাইবেন।

তাই বলিতেছি স্ত্রী-মণ্ডলী যে তেজঃপুঞ্জ রূপের ছটা পাইয়াছেন তাহা যে তুমি নীচ-প্রকৃতি জীব সহ্য করিতে পার না, তাহা দেখিবা মাত্রই যে তুমি মুগ্ধ ও অন্ধ হইয়া পড় তজ্জন্য স্ত্রী-মূর্ত্তির দোষ কি? স্ত্রীরই বা অপরাধ কি? তাহাকে নীচ, হেয় বল কোন সাহসে? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের সুতীক্ষ্ণ সমুজ্জ্বল কিরণ জাল তুমি সহ্য করিতে পার না; সে দিকে চাহিবা মাত্র তুমি ঝলসিয়া যাও, অন্ধ হইয়া যাও, এ জন্য কি সূর্য্য তোমা অপেক্ষা নীচ হইবেন? যদি বল যাহা জীবের হানি-কর সন্তাপ-প্রদ, তাহা সৃষ্ট না হইলেও ত হইত। তদুত্তরে বলিতে পারি বিকারগ্রস্ত রোগী তৃষ্ণায় ছট্‌ফট করিতেছে; অনবরত জল না।

খাইয়া থাকিতে পারে না, অথচ জল খাইলেই মরিবে, এই জন্য ভগবানের জল সৃষ্টি করা অন্যায় হইয়াছে এ কথা কে বলিবে? তোমার বিকার কাটিয়া যাউক তখন তুমি বুঝিবে জল বিনা জীবন রক্ষার স্বতন্ত্র উপায় নাই। তুমি স্ত্রী-বিদ্বেষ্টা হইয়া যত স্ত্রী সঙ্গ ও স্ত্রী ভাব অন্যায় এবং স্ত্রী অস্পর্শীয়া ভাবিবে, মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে' ততই তোমার মন অন্যাপেক্ষা অধিকতর বেগে অনুক্ষণ স্ত্রী ভাবাপ্লুত, স্ত্রীসঙ্গনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। ফলতঃ কাম-দৃষ্টি, ব্যাভিচার-ভাব তাড়াইবার চেষ্টা কর, সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে। তোমার মাতৃমূর্ত্তি ও কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতা-মূর্ত্তিও স্ত্রীমূর্ত্তি; তবে তাহাতে তোমার কাম বৃত্তি উত্থিত হয় না কেন? তাই বলি বৃথা স্ত্রী মূর্ত্তির উপর দোষারোপ করিও না। ইহাদিগকে যেভাবে দেখিলে কামের পরিবর্ত্তে প্রেমের ভাব উদিত হয়, সেই ভাবে স্ত্রীমূর্ত্তি মাত্রকেই দেখিতে চেষ্টা কর; ভাবিতে থাক; বিচার করিতে থাক; কামের পরিবর্ত্তে প্রেম মিলিবে, ধন্য হইয়া যাইবে।

সাধকেন্দ্র পুরুষগণ সাধন-কৌশলে প্রজ্ঞা-প্রভাবে আপনার শরীর, মন, বুদ্ধি, শুদ্ধা প্রকৃতির ভাবে বিভাবিত করিয়া, প্রকৃতির ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিয়াছেন (যেমন পরম পূজ্যতম আরাধ্যদেব শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বহুদিন নারী বেশে, নারী-ভাবে, নারী-মণ্ডলী-মধ্যে থাকিয়া তদুচিত সাধন প্রভাবে প্রকৃত্যাত্মক হইয়াছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা স্ত্রীকে শিবালিঙ্গন-ভূতা জগজ্জননী বোধ করিয়া চৈতন্যে চৈতন্যময়ীকে দেখিয়া বিভোর হইয়া যাইতেন; এবং ময়ূর পুচ্ছ বা নব-মেঘ দর্শন করিয়া শ্রীরাধাবিনোদিনীর যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভাব উদ্দীপিত হইত, প্রণয়ীকে দেখিবা মাত্র প্রণয়িনীর যেমন সাত্ত্বিক রসোচ্ছ্বাস হইত সেইরূপ হিরণ্যকে হিরণ্য-রেতা ভগবান ভূতভাবন বীর্য্যৈশ্বর্য্য মনে জাগিলে তখন সেই প্রকৃত্যাত্মক সাধকগণের সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হইতে পারে। তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে কাঞ্চন গার্হনীয়; তাই তৎস্পর্শে শুদ্ধ চিত্ত সাধকগণ বিকৃত, বিরূপ হইয়া যান। কারণ জগতে তাঁহাদের গর্হণীয়, দ্বেষ্য, অপ্রিয়, কিছুই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ কাঞ্চন বা রৌপ্য ধাতুটা পরিত্যজ্য কিরূপে হইতে পারে? ইহাতো বহু বিমিশ্র বস্তুর মধ্যে মানব শরীর মধ্যে লৌহাদি ধাতুর ন্যায় নিহিত আছে। আর লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু পরিত্যজ্য গর্হণীয় নয়, কেবল স্বর্ণ রৌপ্যটি তজ্য-নিন্দিত একথা একজন মূঢ়ের বাচ্য বটে; প্রকৃত সাধকেন্দ্র পুরুষের পক্ষে সে দ্বন্দ্বভাব কিরূপে সম্ভব? তাই বলি কামিনী বা কাঞ্চন ঘৃণার্হ নহে, পরিত্যজ্য নহে; ঘৃণার্হ পরিত্যজ্য আপনার কুভাব, কুসংস্কার, কুৎসিৎ কামনা।"

প্রকাশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুনয়।

(১)

প্রাণনাথ তোমাবিনে কে আছে আমার ?
দয়া ক'রে দেখা দাও দাসীরে তোমার।
ক্রমেই যাতনানল, ধরিছে প্রবল বল,
অভাগীর প্রাণে বল কত সহে আর,
পরাণ পুড়িয়া হয়ে হ'লো ছার খার॥

(২)

বিনা তব দরশনে কি যাতনা হায়,
প্রকাশিতে গেলে কথা নাহিক জুয়ায়।
তুমিই আমার বল, আর না করিহ ছল,
তোমা বিনে কি সম্বল আছে দয়াময় ?
কাতরে করুণা কর, নাহি ঠেল পায়॥

(৩)

দুর্জ্জয় বাসনা আর মায়ার বন্ধন,
সমভাবে থাকি তারা করে জ্বালাতন;
অকৃতী সাধন-হীনে, দয়া কর নিজগুণে,
মায়া-পাশ তোমাবিনে কে করে ছেদন ?
শ্রীচরণে এ অবলা লয়েছে শরণ॥

(৪)

পতিত-পাবন নাথ জগতে প্রচার,
মোসম পতিত ভবে কেহ নাহি আর,
ঘোর পাতকিনী আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
তুমিহে জগৎস্বামী, তুমি সারাৎসার।
অভাগিনী ব'লে নাথ হের একবার॥

(৫)

জগাই মাধাই আদি যত পাপী ছিল,
তোমার করুণা-গুণে তারা ত'রে গেল;
আর কেন দয়াময়, দুঃখ দাও অবলায় ?
হিয়া মোর যাতনায় বড়ই পীড়িল;
জীবনে-মরণে-দাসী পদে বিকাইল॥

(৬)

অনন্ত দয়ার নিধি তুমি গুণধাম,
সবারে সদয় তুমি, মোরে কেন বাম ?
চরণ পাবার আশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে
ঘুরিয়াছি তবোদ্দেশে ল'য়ে তব নাম;
দয়া ক'রে কর মোরে পূর্ণ-মনস্কাম।

(৭)

কত দিনে পুনঃ আমি পাব দরশন ?
কহিয়ে মনের ব্যথা জুড়াবে জীবন
আমি বড় অভাগিনী, দীন হীন কাঙ্গালিনী,
দীনে দয়াকর জানি আছয়ে জীবন;
অকলঙ্ক স্মরি তব কমল-নয়ন॥

(৮)

জীবে দয়াধর্ম্ম তব সকলেতে কয়;
কেমনে ত্যজিবে তবে মোরে দয়াময় ?
জগতে যতেক প্রাণী, তা সবার মধ্যে গণি,
দয়াকর গুণমণি দুঃখ নাহি সয়,
পাতকী তরাতে যদি হয়েছ উদয়!

(৯)

যেজন তোমাতে মন করেছে অর্পণ,
কাচ বিনিময়ে সেত পেয়েছে কাঞ্চন,
আমার সে মননাই. কেমনে তোমারে পাই ?
তোমারে জানাই তাই জগৎজীবন।
পতিত-পাবন দাও দাও শ্রীচরণ।

(১০)

সতত আমার মন পাপেতে মগন,
তোমার বাসনা সদা করিতে মোচন;
কতকাল এই ভাবে, অভাগীর দিন যাবে ?
তোমাবিনে দুঃখার্ণবে কে করে তারণ ?
রাখ বা মারহ পদে নিলাম শরণ।

(১১)

আশ্রিত জনেরে যদি দয়া না করিবে,
তবে দয়াময় বলি কে আর ডাকিবে ?
তুমিহে দয়ার সিন্ধু, তুমি অনাথের বন্ধু,
বিনাতব কৃপাবিন্দু কেমনে তরিবে
কলি-কলুষিত জীব যারা এই ভবে ?

(১২)

তাই বলি দয়াময় ! ক্ষমি অপরাধ,
আসিয়ে হৃদয় মাঝে ঘুচাও বিষাদ ;
তোমাহেন দ্বিজরাজে, সাজাইয়ে নানাসাজে,
বসাইতে হৃদি মাঝে আছে বড় সাধ ;
পুরাতে দাসীর সাধ নাহি ক'র বাদ ॥

(১৩)

তুমি সকলের পতি, তুমি শিরোমণি ;
কিসে তব হয় তোষ কিছুই না জানি ;
শুনি তব গুণ-গান, আপনি স'পেছি প্রাণ,
করিয়ে প্রাণের প্রাণ সতত বাখানি ;
তব তুলনায় প্রাণ তিল নাহি গণি ॥

(১৪)

শ্রীগোরাঙ্গ ! ছাড়রঙ্গ ; কত সব আর ?
তুমি যে দয়ার নিধি অবিদিত কার ?
যে আসে তোমার দ্বার দুঃখ নাহি রয় তার,
নাহি হয় বার বার আসিতে তাহার ;
কেবল কাতর নিতে অভাগীর ভার ?

(১৫)

যদি বল আমা সম পাপী কেহ নাই ;
তাই বলে নিঠুর কি হইবে গোঁসাই ?
ঘুচাইয়ে মনের গোল, আচণ্ডালে দিলে কোল,
বিলাইলে "হরিবোল" প্রেমেতে মাতাই ;
আমারে বঞ্চনা কেন ভাবিয়া না পাই।

(১৬)

আমারে করিলে কৃপা কি ক্ষতি তোমার ?
মোসম তরালে কত হাজার হাজার ;
এতই করেছি দোষ, কিছুতেই নহ তোষ ;
কিসে হবে সন্তোষ বল একবার ;
চরণে লুটায়ে তাহা করি শত বার ॥

(১৭)

কিসে যে সন্তোষ তব কে বলিতে পারে ?
দয়া ক'রে বল যারে সে বলিতে পারে।
কি দোষে হয়েছি দোষী, সদা আখিনীরে ভাসি,
ব'লে দাও, তব দাসী এই ভিক্ষা করে ;
কি করিলে তব-রোষ যাইবেক দূরে ॥

(১৮)

দয়াময় হ'য়ে যদি করহ ছলনা,
তবে কার কাছে গিয়ে যুড়াব বলনা ?
অপার করুণা নীরে ভাসাইয়া ধরণীরে
সুখী করি সবাকারে রাখিলে ঘোষণা।
এবার জানিব নাথ ! কত যে করুণা ॥

(১৯)

অধমে যগুপি দয়া কর দয়াময়,
তবেত দয়াল ব'লে জানিবে সবায়।
ভকতের ভগবান, ভকত তাঁহার প্রাণ
এইরূপ প্রাণে প্রাণ গাঁথা দুজনার
সকলেই জানে ইহা-অবিদিত নয় ॥

(২০)

পাপীরে তরাতে যদি বাসনা তোমার,
তবে কেন দুঃখ আর দাও বারে বার ?
অধীন অবলা জনে, দয়া কর নিজ গুণে :
কেহ নাই, তোমা বিনে এভবে আমার ;
চরণে ঠেলনা লহ এ দাসীর ভার ॥

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী

"শিওরে জাগিছ তুমি।"

হে অন্তর্যামী। এমন করিয়া মন অধিকার করিয়া রহিয়াছ, যে কতদিন চক্ষে ও মোহনরূপ দেখি নাই; তবুও যেন দিব্য, জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া সম্মুখে আমার দাঁড়াইয়া আছ। লীলা ফুরাইল, পাপী উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইল, কত জগাই মধাই প্রেমে কাঁদিল আর কলেবর ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলে কিন্তু এমন জীবন্ত স্মৃতিটী জগতে রাখিয়া গেলে যে, সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও সে মাধুরীপূর্ণা আনন্দ-মূর্ত্তি নয়নের আগে সদাই ভাসিতেছে। শরীর ত্যাগ করিয়াও অলক্ষ্য হইতে এত ভালবাসা দেখাইতেছ—প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেছ—হৃদয়বন আলো করিতেছ—তাই সময়ের সদ্ব্যবহার কর নাই বলিয়া প্রাণে অনুতাপ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। যখন ডাকিয়া ডাকিয়া হৃদয় দ্বারে প্রতিঘাত করিতেছিলে—নিতাইএর মত গৌরএর মত "হরিনাম সুধা" পান করাইতেছিলে, তখন এ মোহ-হত চিত্ত কেন ঘুমাইতেছিল? তাই আজ বড়ই ব্যথা হৃদয়ে বাজিতেছে—অন্তর্যামী সশরীরে প্রেমের লীলাখেলা করিয়া গেলেন—না বুঝে—না দেখে—না শুনে মোহের ঘুমে অচেতন হইয়া অযাচিত ভালবাসারস্মৃতিতে দুঃখিত হইতেছি। দুঃখের কারণ তুমি শরীর ত্যাগ করলে বলিয়া নহে—তোমায় আমাদের মধ্যে আমাদের স্বগোলকে পাইয়া কেন মনের মত করিয়া তোমাকে ভালবাসিলাম না—অভয় চরণ কেন সংসারের জ্বালা-মালায় ক্লিষ্ট হইয়া বক্ষে ধরিলাম না—এই দুঃখের কারণ। তাই কবির সঙ্গে অনুতাপের সুরে বলিতেছিলাম :—

"এত কোলাহলে প্রভু ভাঙ্গিল না ঘুম।
কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,
এ জীবন শুধু নীরব নিঝুম॥"

কিন্তু দয়াময়! তুমি—পাপীর বন্ধু—অনাথশরণ—আশ্রিতে অপার দয়া তোমার, তাই অলক্ষ্য হইতেও মোহের ঘুম আমার ভাঙ্গিবার উপায় করিতেছ। তোমার দয়া আজ অনুভব করিবার শক্তি দিয়াছ তাই তোমাকে যেন সকল সময়ে, সকল স্থানে, সুখে, দুঃখে, শোকে, আঁধারে,আলোকে,কোনমা কোনভাবে, ক্ষণের জন্য হৃদয়ে পাইয়া অপার আনন্দ পাইতেছি। তাই আজ দুঃখের ভিতর সুখ মিশাইয়া দিতেছ, কষ্ট বোধে আসিতেছে না গরলে অমৃত ঢালিতেছে। সংসারের আড়ামড়ার মাঝে পড়িয়াও লক্ষ্য স্থির রাখিতে সমর্থ হইতেছি। তুমি এত সুন্দর—এত অমৃত—এত মধুময়। এ কারণে আজ নীরবে গান করি :—

"তুমি এত দয়াময়, এত প্রেমময় কে জানিত
বলহে হরি
(আমি না জেনে ভুলে ছিলাম) (আমি
না জেনে তোমায় ভজি নাই হে)
আজ শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে আর কি
ভুলিতে পারি॥"

আহা! তুমি এত মিষ্ট—এত স্পষ্ট মধুর—এত জীবন্ত ভালবাসার খনি, তাকি আগে জানিতে পেরেছি? তোমার কথা মনে করিয়া যেদিকে চাই সকলই আনন্দময় দেখি—
"সুন্দর তব সুন্দর সব যে দিকে ফিরাই আঁখি"
এ প্রসঙ্গে বাইবেলের (Bible) সেই শক্তিময়ী গাথায় বিশ্বাস আসিতেছে, তাই না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না :—

'The Lord showed him a tree, which when he cast into the waters, the waters were made sweet. Exod, XV, 25.

সত্যই তোমার এমন কৃপা অধীনের প্রতি, যে স্মরণ মাত্রেই আজ কুসংস্কার চলিয়া যায়—হৃদয় পবিত্র হয়। তোমার কথা কহিলে যেন তোমার সেই নিত্য-নব-সুন্দর মোহনরূপ নয়নের সম্মুখে খেলিতে থাকে—তাই যে কাজে যখনই রাখ, সন্তোষের সহিত শির অবনত করিয়া যাইতে ইচ্ছা আসিতেছে বোধ আসিতেছে "তুমি আছ তাই আছে জগৎ আমার।" অনন্ত ভগবৎ-শক্তির ও দয়ার পরিচয় পাইয়া তাই বুঝি কবি সংসারের উত্থান পতনের মধ্যে পড়িয়া বলিয়াছিলেন :—

"Thus my sorrow turns to music,

And my cry to sweetest song weeping to eternal gladness.

Night in short—The day is long" (Richard Ralley.)

তুমি যে এত দয়াময়—সকলকে ডাকিয়া —বলিতে ইচ্ছা হইতেছে তাই তোমার "দয়াল ঠাকুর" নামটীর মাধুর্য্য ভাই বন্ধু সকলকে একদিন ক্ষুদ্র জীবনের অনুভূতির ভিতর দিয়া ভিখারীর-বেশে ডাকিয়া শুনাইয়াছি। আমার বড়ই আনন্দ হয়—তোমার কথা ছুটে ছুটে বল্‌তে যাই—বোধ হয় তোমার পরিচয় দিতে যাইয়া তোমাকে ছোট করিয়া ফেলিতেছি—কেননা একমুখে তোমার কি পরিচয় দিব। স্বয়ং শিব তোমায় চিনিতে শ্মশানবাসী—নারদ চিরবৈরাগী। তুমি শুধু আমার "দয়াল" নহে জগতের দয়াল—তা জগতের বুঝিবার সময় আসিতেছে—তোমার আদেশানুসারে টহলদারের মত তাই একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছি। তুমি বুঝিতে শক্তি না দিলে কাহারও কিছু বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই ও হইবে না। এ অধমকে কোন্ মোহসাগরের অতল জল হইতে তুলিয়া কি প্রেম ও আনন্দ প্রাণে ঢালিয়া দিলে—প্রাণের যাবতীয় দুর্ব্বলতা সরাইয়া নিয়া কি অনন্ত বলে বলীয়ান করিলে যে আজ জোর করিয়া নির্ভয়ে জগতের সম্মুখে বলিতে সামর্থ আসিতেছে :—

"Thou art altogether lovely"—Cant. V. 16.

হে প্রাণ-মন-হরণকারী বিশ্বগুরু হৃদয়ের দেবতা আমার: তোমার স্মৃতিশক্তির ক্রিয়াও কি অদ্ভুত: কতদিন আমাদিগকে ফেলিয়া গেলে—কিন্তু মনে হইতেছে সেই আনন্দপূর্ণ তোমার দিবারাত্র ধরিয়া উৎসব চলিতেছে—সেই ভাই ভাই মিলিয়া তোমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছি। তোমার স্মৃতি এত জাগ্রত হইয়াছে যে তোমার মন্দির আজ মহাতীর্থস্থল হইতে বসিয়াছে। কি পরিচিত কি অপরিচিত দেশ বিদেশ হইতে ছুটিয়া তোমার সেই রাতুল চরণ উদ্দেশে লুটাইয়া পড়িতেছে! তুমি যেন আমাদের লইয়া কেমন বাজীকরের মত অন্তরীক্ষে মহতী শক্তি বিস্তার করিয়া খেলা করিতেছ—ভাই ভাই একত্র হইয়া এক লক্ষ্য করিয়া আনন্দে নাচিতেছি—সকলেরই প্রাণে এক আনন্দ—নিত্যানন্দ খেলা করিতেছে—তাই নয়ন মুদিয়া নির্ব্বাক হইয়া বলিতে পারিতেছি :—

"Lord I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth"—P. S. XXVI. 8.

দেব! তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমাকে যে যা মনে করিয়া মন্দিরে সমাগত হয় সে সেইরূপই দর্শন করে। সকলের মনোবাঞ্ছা কেমন স্থির ধীরভাবে অন্তরাল হইতে পূর্ণ করিতেছ। আমাদের বড় আশা তোমার এই মন্দিরের পতাকা এমনভাবে উড়াইয়া দাও যেন সকলেই বলিতে পারে তুমি "দয়াল ঠাকুর"—"বিশ্বগুরু!" এই পতাকায় তোমার মধুর "জ্ঞানানন্দ" নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রাত্রদিন জ্বলিতে থাকুক—অন্ধ জীবের নয়ন খুলুক—দৃষ্টিপাত করিয়া পতিত উদ্ধারের আশা পাক। জগৎ জুড়ে "জয় জ্ঞানানন্দ" "জয় জ্ঞানানন্দ" রব উঠুক। হে পূর্ণ! হে দেবতা! সে আশা পূর্ণ করিবার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছ তাই প্রাণে প্রাণে আশা জাগিতেছে বাঞ্ছাকল্পতরু আমাদের সে আশা পুরাইবেন।

দয়াময়! তোমাকে আমরা না চাহিলেও তুমি দিবানিশি আমাদিগকে চাহিতেছ। তোমার কথা মনে না আনিলেও স্বইচ্ছায় প্রেমের ভরে মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। অতএব তোমার নিকট আমরা কি আর প্রার্থনা করিব বল? একটী প্রার্থনা যেন তোমার চরণে আমাদের অব্যাভিচারিণী ভক্তি থাকে; আমরা আত্মসুখ যে চাহিনা—ধন, জন, মান কিছু চাহি না—চাহি কেবল তোমার নাম করিতে—শুধু এখন নহে—তখন নহে—এ জনমে নহে—জীবনে মরণে—জনমে জনমে; যেন তোমার প্রতি আমাদের অহৈতুকী ভক্তি থাকে। যখন যে ভাবে রাখনা আমায়, যেন তোমার কথাটী মনে থাকে। রাজপ্রাসাদে বা দীন দরিদ্রের কুটীরে, স্বর্গে বা নরকে, দেবযোনিতে বা তির্য্যগযোনিতে, যখন যে ভাবে থাকি না কেন—যেন তোমার মোহন মূর্ত্তিটী আমার প্রাণের মাঝে উদয় হয়। কোন দুঃখ আমার থাকিবে না। সাধন ভজন আমার নাই—আমার আছ কেবল "তুমি"—ওগো সুন্দর তুমি—মধুর তুমি—সংসারের তাপ-জ্বালায় শান্তি দিতে একমাত্র "তুমি"! তোমাকে হৃদয়ে জাগরূক দেখিলে আমার আনন্দ—চিরআনন্দ—নিত্যানন্দ—তাই বলি :—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতুভক্তিরহৈ
তুকীত্বয়ি॥"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গুরু।

প্রথম প্রস্তাব।

গুকার স্তন্ধকারস্যাৎ রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারং তিরোধত্তে তস্মাংগুরু রিতিস্মৃতঃ।
"গু"কারের অর্থ হয় মনের আঁধার।
"রু"কার বলিতে বুঝি বিনাশ তাহার॥
মনের ভীষণ তমনাশে শক্তি যাঁর।
এভব সাগরে ভাই—তিনি কর্ণধার॥
বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীর ভাণ্ডারে "গুরু"
ও "লঘু" এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাই।
একটীর অর্থ অন্যটীর বিপরীত।

পরমকৌশলী শ্রীভগবানের এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে এক সেই নরোত্তম ব্যতীত অন্য কেহই বলিতে পারেন না "আমি গুরু" বা "আমি লঘু"। আমি হয়ত তোমার তুলনায় গুরু, কিন্তু অপরের তুলনায় লঘু; আবার তুমি হয়ত আমার তুলনায় লঘু কিন্তু অপরের তুলনায় গুরু। এইরূপে এই বিশ্ব সংসার গুরু ও লঘুভাবের এক মহারহস্যময় খেলা। ইহার মধ্যে যিনি সবচেয়ে লঘু বা সবচেয়ে গুরু তিনিই আমাদের সেই "অধর চাঁদ।" তাঁহারই নাম "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" সুতরাং এই বিশ্ব সংসারে বাস্তবিক কেহই কাহারও গুরু নহেন; অথবা সকলেই সকলের গুরু। এক পরিপূর্ণতম শ্রীভগবান ব্যতীত "জগদ্গুরু" নাম পাইবার আর কাহারও অধিকার নাই। এ দিকে আবার এই "গুরু-তত্ত্ব" আশ্রয় ব্যতীত এই গোলক-ধাঁধাঁ হইতে বাহির হইবারও আর দ্বিতীয় উপায় নাই এমন কি এই গুরু-চরণ-আশ্রয় ব্যতীত জীব উন্নতি-পথে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। এই গুরু-তত্ত্বই আবার জীবের বুদ্ধি-দোষে তাহাদের উন্নতি পথের কণ্টক-স্বরূপ হন। যে বুদ্ধিমান জীব পরম-গুরু শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ নিজের লঘুত্ব জানিতে পারিয়া "শিষ্য" সাজিতে পারিয়াছেন তিনিই চতুর। দুরত্যয়া মায়ার কৌশল হইতে মুক্ত হইয়া পরম-গুরু শ্রীভগবানের বিরাট বিগ্রহ সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টিকে গুরুর আসনে বসাইয়া করযোড়ে শিক্ষা লাভ করিতে করিতে তড়িদ্বেগে নিত্যানন্দ ধামের পথে তিনিই অগ্রসর হইতেছেন;—শ্রীমদ্ভাগবতের 'অবধূতের' ন্যায় মত সামান্য কীটপতঙ্গকেও শ্রীগুরুর বিকাশ স্বীকার করিয়া উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে তিনিই সক্ষম। অবধূত মহাশয় বক, চিল, কামিনীকঙ্কণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক বস্তুর নিকট গুরূপদেশ লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আর যিনি অবিদ্যারাণীর মোহ-কুহকে পড়িয়া ঐ কুহকিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কারকে পরম বন্ধুবোধে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিজের লঘুত্ব ভুলিয়া স্বয়ং গুরু সাজিয়া বসিয়াছেন—যে দুর্বিনীত পুত্র পরমদয়াল, সর্ব্বশক্তিমান পিতার সেবা ভুলিয়া পিতার আসনের দিকে লক্ষ্য করিতে লজ্জা বোধ করে না তাহার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা থাকে বলিয়া বোধ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও গুরুগিরির ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীলোকনাথ ও শ্রীরঘুনাথ দাস গুরুগিরির ভয়ে বিজনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীগোলকধামের দশদিকে দশটি শূল আছে বলিয়া বর্ণিত আছে। অণিমা লঘিমাদি-সিদ্ধি-লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি জৈব অহঙ্কার গোলকধামে প্রবেশ-কালে ঐ শূলে বাধা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা নেহি মিলে এক।" বাস্তবিক বর্ত্তমানকালে অসুর-কীটে শ্রীগুরুধাম ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রবর্ত্তক সাধক এমন কি ভণ্ড কপটী পর্য্যন্তও আপনাকে "গুরু" বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। তীর্থস্থানগুলি এইরূপ গুরু-কুটীরে পূর্ণ-প্রায়! এই গুরুকুল প্রতি বৎসর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে স্বীয় স্বীয় গহ্বর হইতে বাহির হইয়া নিরীহ মেষরূপী-অজ্ঞসাধক ও অবলাকুলের পূত-কোমল মাংসে উদর ভরণ করিতেছে। "জয় গৌর নিত্যানন্দ" "শ্রীরাধা গোবিন্দ" প্রভৃতি শ্রীভগবানের শ্রীনাম-অঙ্কিত মস্তকে এই শ্বাপদগুলি অবিচলিত-হৃদয়ে পা তুলিয়া দেয়। দয়াময়!

আর ক'দিন অবশিষ্ট আছে? ভাই গুরুকুল শিষ্য, সাধক, ভক্তনামে পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ হয় বুঝি! তাই গুরু সাজিয়াছ? শঙ্কর-শিষ্য ষণ্ডামার্কের মত গুরু শ্রীশঙ্করকে শিবোঽহং বলিতে শুনিয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমাদেরও "শিবোঽহং' বলিতে সাধ হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীশঙ্করের ন্যায় কামার-শালে প্রতপ্ত লৌহ সহাস্য বদনে ভক্ষণ করিতে পারিবে কি না তাহাও একবার চিন্তা করা ভাল নয় কি? আসুরিক অহঙ্কারে তুমি "পারিব" বলিলেও তোমার আচার-ব্যবহার দেখিলে যে আমাদের বিশ্বাস হয় না। সব জানি আর না জানি আমাদের পিতার কাছে যে "গুরুর" দুই একটি লক্ষণ শুনিয়াছি। আমাদেরই পিতা যে সূতার মহাজন— আমরাও যে সূতা দেখিলেই কোন্ নম্বরের সূতা বাবার কৃপায় একটু একটু বলিয়া দিতে পারি। জগজ্জীব সকলেরই এক গুরু। গুরু যে জ্ঞানদ পিতা—আনন্দ-দায়িনী মাতা। গুরু যে "জ্ঞানানন্দের" পূর্ণ-বিকাশ। পিতার আসনে লক্ষ্য? ছি! ঐ দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ কর। আমাদের পিতা জগদ্গুরুর অনেক সন্তান—অনন্ত সন্তান—অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান। তোমাদের মত অবিজ্ঞ অকৃতজ্ঞ জীবের ধৃষ্টতা বন্ধ করিতে সক্ষম বাবার এমন সন্তান এবার যথেষ্ট। তাই বলিতেছি ভাই যা কর আর তা কর "বাবার আসনের দিকে লক্ষ্য করিও না", শ্রীগুরুতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এবার আমার বাবার জগতে আগমন। গুরু কি বুঝাইবার জন্য বাবার অসংখ্য খেলার মধ্যে একটি খেলার উল্লেখ করিতেছি—বুঝিয়া দেখ; শিক্ষা লাভ কর! সুবুদ্ধি আশ্রয় কর! সেবার ভীষণ ভূমিকম্পের সময় আমাদের ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপে বিরাজ করিতেছিলেন। ভূমিকম্পের সময় ঠাকুর খাটের উপর বসিয়া কি লিখিতেছিলেন. ধরণী দেবী অস্থিরতা দেখিয়া ঠাকুর শ্রীপাদাশ্রিতা শ্রীচরণাশ্রিতা অনৈক ভক্ত রমণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার জুতা দাও তো"; জুতা সরাইয়া দেওয়া হইলে জুতা পায়ে দিয়া ঘরের বারান্দায় আসিয়া মহামল্লের মত এক পা আগে ও এক পা পিছনে দিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন—চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইয়া যেন জ্বলিতে লাগিল। যতক্ষণ পৃথিদেবী কম্পিতা রহিলেন, ঠাকুর ততক্ষণ এই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন; পরে ধরিত্রী শান্তভাব প্রাপ্ত হইলে ঠাকুর "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিতে বলিতে নিজ আসনে গমন করিলেন। উক্ত ভক্তরমণী কিছু পরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। আপনার ছেলেরা সব কত দেশ-বিদেশে রহিয়াছে—কি হ'বে?" ঠাকুর গম্ভীর-মূর্ত্তিতে বলিলেন ভয় নাই— তাহাদের কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না। সত্য—সত্য—সত্যই তাহাই হইয়াছিল"। "সেই ভীষণ ভূমিকম্পে ঠাকুরের কোন ভক্তের কোন অনিষ্ট হয় নাই"। শুধু তাহাই নহে; এই ঘটনার পর তিন চারি দিন পর্য্যন্ত ঠাকুরের শরীরে বেদনা ছিল। হে গুরুকুল! বুঝিলে কি গুরু কে? গুরু কি? গুরু কাহাকে বলে? ভাই তোমাদের ঐ দুঃশাসন ত্যাগ কর—শিষ্য হও, গুরু হইও না—শিষ্য রাজ্যে সিদ্ধি লাভ কর। ভাইরে "গুরু' যে মহা-ভার-বিশিষ্ট। "গুরু"ই গুরু, লঘু কি গুরু হইতে পারে? স্মৃতি-দেবীর সাহায্যে শৈশব হইতে বর্ত্তমান জীবন পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখ "তুমি" গুরু না লঘু; ভাবিয়া দেখ সেই পরম দয়াল পতিত পাবন দীন-

বৎসলের অসীম দয়া না থাকিলে আমাদের মত ঘৃণিত অস্পৃশ্য জীবের স্থানের জন্য কোন ভীষণ নরক-কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইত সুদূর ভবিষ্যতের তো কথাই নাই—কা'ল কি হ'বে বলিতে পার কি? বলিতে পার কি এই অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা দোষে কা'ল কোন ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে? তখন হয়ত কুকুরেও স্পর্শ করিবে না। ভাইরে ষষ্ঠী দেবীকে পৃষ্ঠে বহন ক'রে বলিয়া লোকে ষষ্ঠীর সঙ্গে বিড়ালের পূজা দেয়—ষষ্ঠী দেবীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে বিড়ালের অদৃষ্টে কি হইবে? সচন্দন পুষ্প না যষ্টি? বন্ধুগণ! "জয়গুরু" মন্ত্র ছাড়িয়া 'জয় আমি" বুলি ধরিলে পরিণাম কি হয় জান তো? অহঙ্কার-লাভে সম্মান না অহঙ্কার-নাশে সম্মান?

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিত্রে আমরা দেখিয়াছি অহঙ্কার—মান—অভিমানের নাশেই প্রকৃত সম্মান। আহা! দয়ালের শিরোমণি নিতাই আমাদের করযোড়ে গলবাসে জীবের দ্বারে দণ্ডায়মান;—দন্তে তৃণ ধরিয়া জীবের সম্মুখে রাজপথে দণ্ডবৎ ধূলায় পতিত। আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাই আজ ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুল "হা নিতাই, প্রাণ নিতাই" বলিয়া আকুলি বিকুলি করিতেছে। ঐ দেখ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যকে "ভগবান" বলা হইয়াছে বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া "বিষ্ণু, বিষ্ণু" বলিতেছেন। ঐ দেখ গঙ্গাতীরে "নিমাই" আমাদের বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ পদধূলি লইয়াছে বলিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন। ভাইরে! তুলাদণ্ডের যে অংশ ভার-বিশিষ্ট হয় তাহা নীচে নামিয়া পড়ে—লঘু অংশই উপরে থাকে,—মেয়েরাও বলে "বড় হ'বিতো ছোটহ"। অতএব ভাই তোমাদের ঐ "গুরুভাব" বিশুদ্ধ নহে; উহা একটি সাংঘাতিক মোহ—ধ্বংসের প্রশস্ত পথ। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের অশেষ-কৃপাপাত্র কোন ভক্তের শ্রীমুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম—এস্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। "কোন ব্যবসায়ী গুরুর এক বিশ্বাসী, সরল, ভক্তিমান রাজা শিষ্য ছিলেন। অর্থাদি বাহ্য সম্পত্তি ও প্রীতি-ভক্তি প্রভৃতি আন্তরিক সম্পত্তি দিয়া শিষ্য গুরুদেবের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ক্রমে সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান রাজার উপর শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ হইল। রাজার হৃদয়ে 'আমি কে—কোথা হইতে আসিয়াছি?' ইত্যাদি তত্ত্ব-প্রশ্ন উত্থিত হইয়া রাজার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—প্রাণে যেন বড়ই অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। রাজা গুরুদেবকে ইহার প্রতীকার করিতে প্রার্থনা করিলেন।

গুরুদেব নানাবিধ ব্যয়-সঙ্কুল ধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজার অশান্তি দূর হইল না। অবশেষে রাজা অশান্তি পীড়নে অস্থির হইয়া বিরক্ত মনে গুরুকে বলিলেন "দেখ, ঠাকুর! তুমি যা বলিয়াছ সবই করিয়াছি; আমাকে শান্তি দাও। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে আমাকে শান্তি না দিলে তোমার মস্তক-ছেদন করিব।" এই বার গুরুদেবের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণীকে সব বলিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন যায়—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দেহ মাত্র অবশেষ হইল। মৃত্যুর জন্য শেষদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন মাত্র। এই ব্রাহ্মণের একটি মাত্র পুত্র ছিল; সেটী জন্ম হইতেই উন্মাদ; এখন সে যুবক,—গতি-বিধির স্থিরতা নাই—কখন কখন বাড়ী আসে মাত্র। ব্রাহ্মণের এই অবস্থায় সে বাটী আসিয়া পিতামাতাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কারণ

জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না; পরে উন্মাদের আগ্রহ দেখিয়া ও পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থের মত কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাকে সমস্ত বলিলেন, পুত্র আশ্বাস দিয়া বলিল "আচ্ছা চিন্তা নাই আমি রাজাকে শান্তি দিব।" জনকজননী প্রথমে তাচ্ছিল্য করিলেন; পরে পুত্রের যুক্তি পূর্ণ অনেক আশ্বাসবাণী শুনিয়া অগত্যা তাহার উপরই নির্ভর করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঐ উন্মাদ একগাছি শক্ত দড়ি হাতে লইয়া পিতাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইল। রাজা প্রথমে উন্মাদের কথায় উপেক্ষা করিলেন; পরে তাহার সুস্থ ব্যক্তির মত কথাবার্ত্তায় কিছু বিশ্বাস হইল। অতঃপর সেই উন্মাদ দড়ি হাতে লইয়া রাজাকে ও পিতাকে সঙ্গে করিয়া একজনশূন্য সুবৃহৎ প্রান্তরে লইয়া গিয়া দুইটি বৃক্ষে পিতা ও রাজাকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একটু সরিয়া গিয়া রাজাকে বলিল মহারাজ! আমার পিতাকে বলুন "ঠাকুর! আমার বাঁধন খুলিয়া দিন"। রাজা তাহাই করিলেন। তখন সে পিতাকে বলিল "আপনি উহার উপযুক্ত উত্তর দিন"। পিতা বলিলেন "বৎস আমি কিরূপে তোমার বন্ধন খুলিব? আমি যে নিজেই বাঁধা আছি।" উন্মাদ বলিল "এখন বল দেখি তোমাদের বাঁধন কে খুলিতে পারে?" উভয়ে বলিলেন "তুমি পার"। তখন উন্মাদ পিতাকে বলিল "দেখ বাবা! গুরুগিরি ব্যবসা ভাল নয়। যে নিজে বাঁধা, সে পরের বাঁধন খুলিবে কি করিয়া? রাজার মত সরল-উৎসাহী বিশ্বাসী শিষ্যের নিকট গুরু সাজা তোমার ভাল হয় নাই। কারণ মুক্তি কি তাহা তুমিই জান না"। রাজাকে বলিল "দেখ রাজন্! তোমার মত শান্তি-প্রয়াসী উদ্যমী ভক্তিমানের দেখিয়া শুনিয়া গুরু করা উচিত ছিল। এই বলিয়া সেই ছদ্মবেশী মুক্ত পুরুষ রাজার কর্ণে কি জানি কি শান্তি-মন্ত্র দিয়া উভয়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া উধাও হইয়া কোন্ দেশে পলায়ন করিল। রাজাও সেই মন্ত্র-সাধনায় পরমাশান্তির আস্বাদ পাইলেন।

নিত্যভক্তচরণাশ্রিত।
শ্রীঃ—

নিত্যলীলা।

বন্দনা।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল (চৌতাল।)

প্রণমামি নিত্যগোপাল নারায়ণ নিরঞ্জন,
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ দেব নাদি-নান্ত সনাতন॥
জ্ঞানানন্দ অবতার, ভালে বিন্দু ইন্দ্বাকার,
শিরসি ভ্রমরী-নাদ ওঙ্কার
শব্দব্রহ্ম-প্রকাশক।
অক্রোধী পরমানন্দ, শরণাগত-জন-আনন্দ,
ভকত বৎসল অধম তারণ,
সত্য-প্রেম-প্রদায়ক।
গৌরবরণ-প্রকৃতি-অঙ্গ, ওরূপ স্বরূপে নাচে ত্রিভঙ্গ,
শ্যামানন্দ চাহে সদাসঙ্গ
মকরন্দ কণারুণ॥

আমার প্রথম অনুরাগাবস্থায় কিছু দিন যাবৎ আমি গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ

করিয়াছিলাম। সেই সময়ে সন ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে একদিন অতি প্রত্যুষে উভয়ে কা ঘাটে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম একটি লোক নর্দ্দমায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আর দুইজন লোক তাহাকে সময়োচিত সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া রাস্তার উপরে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; এবং গালাগালি করিয়া বলিতেছে "চল বেটা মাতাল, আজ তোকে পুলিশে না বাড়ী দিয়ে ছাড়চিনে।" মাতাল সভয়ে আমাদের পানে দৃষ্টিপাত করিলে আমি সম্মুখীন হইয়া বলিলাম "কেন মশায় এঁকে পুলিশে দিতে চাচ্ছেন?" তাঁহারা বলিলেন 'মশায় এ লোকটা বেজায় মাতাল। রোজ রোজ মদ খেয়ে রাত্রে হল্লা করে, দোর ঠেলে না হয় কারো দরজায় কি নর্দ্দমায় পড়ে থাকে। বেটা নিদ্রার ব্যাঘাত দিয়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে; পুলিশে দিতেই হবে।" "চল বেটা চল" বলিয়া দুইজনে মাতালের হাত ধরিয়া রাস্তার উপরে তুলিলেন, মাতালকে সুশ্রী ও কালা পেড়ে কোঁচান ধুতি পরা দেখিয়া আমার ভদ্র লোক বলিয়া বোধ হইল।

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মাতালকে অব্যাহতি করিয়া দিলে, গুরুদেব আমায় বলিলেন "তুমি এঁকে চান করিয়ে এঁর বাড়ী দিয়ে আসতে পারবে?" আমি বলিলাম এঁর বাসা কোথায়? গুরুদেব—"বোধ হয় নিকটেই কোন স্থানে হতে পারে। এঁর জ্ঞান এসে চ একটু পরেই জিজ্ঞাসা কল্লে বোধ হয় বলতে পারবেন" 'যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি গঙ্গার এক ঘাটে মাতালকে লইয়া গেলাম। মাতালের অঙ্গে দ্বিতীয় আবরণ ছিল না এবং পায়েও জুতা ছিল না। আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া একেবারে গঙ্গায় ফেলিলাম। গুরুদেব গঙ্গাতীরে পাদচরণ করিতে লাগিলেন। আমি মাতালের সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া দিয়া মস্তকে অঞ্জলি অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলাম মাতালের চৈতন্য হইয়াছে। সে নিজেই নিজের মস্তকে জল সেচন করিতেছে। সেই সময়ে পার্শ্বে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ স্নান করিতেছিলেন তাঁহাদের গায়ে জল ছিটাইবে বলিয়া আমি মাতালকে সাবধান হইতে বলিলাম তখন মাতাল আপন কটিদেশ হইতে উপবীত বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম "আপনি ব্রাহ্মণ?" সেই ব্রাহ্মণ তখন আমারদিকে ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া মুচকি মুচকি হাসিয়া অস্ফুটস্বরে মন্ত্র বলিতে বলিতে যজ্ঞোপবীত মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তাই দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন সোপবীত ব্রাহ্মণকুমার মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণ বিধিমত স্নানান্তে শুচি হইয়া সাশ্রুনয়নে অধৃত বচনে বাম হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া বলিলেন, "সত্য বলুন, আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কে? যিনি আমায় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিলেন তিনি কে? আমার উপনয়ন সময়ের অধীতবিদ্যা যাহা ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিস্মৃত ছিলাম আজ হঠাৎ যিনি আমার মস্তিষ্কে পদাঘাত করিয়া সেই বিদ্যা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি কে? যিনি আমার হৃদয়সরসে হংসবৎ অনাহত-পদ্মাসিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ দিব্যমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন তিনি কে? যিনি কলনাদিনী পাপতোয়া ভাগীরথী গর্ভে জ্যোতির্ম্ময়রূপে আমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তিনি কে, এবং কোথায়, বলুন! নচেৎ এই মুষ্টিতেই (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) আপনার মুণ্ড-

পাত করব।" আমি রোমাঞ্চিত হইয়া মৃদু ভাবে বলিলাম "তা মন্দ কথা নয়, আমার কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের বিধান এখন আপনি আমলে আনিতে পারেন বটে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি ভয় করেন কাকে?" ব্রা—"এই মুহূর্ত্তে কাহাকেই নয় ইহার পূর্ব্বে কর্ত্তাম এক জনকে।" আমি—"কাকে"। ব্রা—"আমার গৃহলক্ষ্মীকে।" আ—"কমলা দেবী গৃহলক্ষ্মীকে! ব্রা—'কমলা চঞ্চলা বড় একখানা আমার মনে কখন আসে টাসে না মশায়. আমার সহধর্ম্মিণী গৃহলক্ষ্মীকে সর্ব্বদা ভয় কর্ত্তাম। আ—আর এই কালীঘাটে কালীমাকে ভয় কর্তেন না?" ব্রা—"না, আমি যে সেই মায়ের ছেলে, মায়ের কাছে ছেলের আদর বেশী, আব্দার বেশী, তিনি আমাকে কখন লাল চক্ষু দেখান নাই।" আ—"আচ্ছা আপনার গৃহলক্ষ্মীকে ভয় কর্ত্তেন কেন"? ব্রা—"আমার স্বেচ্ছাচারের বাধক বলিয়া"। আ—"স্বেচ্ছাচারকে পাপ বলিয়া কি কোন দিন আপনার ভয় হয় নাই?" ব্রা—'পাপের বোধই আমার নাই, ভয়ত পরের কথা। পাপের বোধ থাকলেত এত দিন পুণ্য সঞ্চার কর্ত্তাম।" আ—"পাপের বোধ নাই থাক, তবে পুণ্য যে কি তা আপনার বোধ ছিল?" ব্রা—"হাঁ, সাধ্য থাকিতে জীবকে কষ্ট না দেওয়াই যে পুণ্য ত বুঝতাম" আ—"তবে যথেচ্ছাচার দেখাইয়া আপনার পরিবারবর্গকে কষ্ট দিতেন কেন?" ব্রা—"আমি ভাবতাম জীবের ইচ্ছা মৃত্যু। এবং কষ্টই মৃত্যুস্বরূপ হইয়া জীবকে দুঃখ দেয়। সুতরাং জীব আপন ইচ্ছারবশে থাকিয়া কষ্টকে কষ্ট বলিয়া স্বীকার না করিলেইত সব গোল চুকিয়া যায়। তাহা হইলে অন্যের যথেচ্ছাচারে অনায়াসেইতো সন্তুষ্ট থাকিতে পারে।" আ—"তবে আপনিও প্রমোদ কাননের আকাশ কুসুম সৌরভ-মদে মত্ত না হইয়া আপন মনসকল কষ্ট ইচ্ছা দ্বারা অস্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন ত? তাহ হইলে স্বেচ্ছাচার, ভোগ-বিলাস আপনার অনায়াসেই ত্যাগ হইয়া যাইত। এবং জীবের মৃত্যুই যে জীবাত্মার মলিনতা, তাহাকে ইচ্ছা দ্বারা বর্দ্ধিত না করিয়া আপনি সুখী হইতে পারিতেন ত?" ব্রা—"আপনার গুরু কে? দয়া করিয়া কি একবার তাঁহার দর্শন দেওয়াইতে পারেন না? আমি বলিলাম "যিনি নিত্যনিরঞ্জন পরমাত্মাস্বরূপ সেই নিত্যগোপাল ওরফে শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ মহারাজ তিনিই আমার গুরুদেব! অধুনা তিনিই গুপ্তাবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ ইহাই আমি স্বীকার করি। উপস্থিত তিনিই আপনার জীর্ণ দেহতরীর ভবপারের কর্ণধার।" এই কথা বলিতে না বলিতে গুরুদেব আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ শুষ্কাস্থিত মাংস পিণ্ডবৎ ধুম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ আমি ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তুলিলাম। সেই ঘাটে যে সমস্ত লোক স্নান করিতেছিলেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া পরস্পর নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া গুরুদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভিড় দেখিয়া গুরুদেব স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইলে আমরাও তাঁহার পশ্চাদনুধাবন করিলাম। পরে তিনি একটি নির্জ্জন বিটপীতলে শ্যামলক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি থাক কোথায়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "আমার বাড়ী ভিন্ন জেলায়, কর্ম্মোপলক্ষে ভবানীপুরে বাসা, উপস্থিত আজ সাত দিন ঐ অবিদ্যা মন্দিরে ছিলাম। আপনার কৃপায় সে স্থান হইতে উদ্ধার হইয়া এই নিত্য সাগরে ঝাঁপ দিতে সমর্থ

হইয়াছি। প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শরণ লইলাম। এই বলিয়া গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিলেন। গুরুদেব বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে, তোমার ভয় নাই, এখন তুমি বাসায় যাও"।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

ওঁ রাধা গোবিন্দাভ্যাং নমঃ।

মায়া, যোগ, জ্ঞান ও অহঙ্কার

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)।

নাস্তি মায়াসমং পাপং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।
ইতি ঘেরণ্ড সংহিতায়াম্।

এ জগতে মায়ার সমান পাপ, যোগবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবল, জ্ঞান অপেক্ষা পরম বন্ধু এবং অহঙ্কারের মত প্রবল বৈরী আর নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়চতুষ্টয়ের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল মাত্র মায়ার স্বরূপই প্রকটিত হইল।

মায়া বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে মায়া কাহাকে বলে, মায়া কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, ইহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় বলা উচিত। শাস্ত্রে ও আছে ;—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিদ্
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥"
ইতি প্রাঞ্চঃ।

অর্থাৎ যে কোন শাস্ত্র বা কার্য্য করিবার প্রারম্ভে যে পর্য্যন্ত উহাদের প্রয়োজন যথাযথ রূপে ব্যক্ত করা না যায় সে পর্য্যন্ত কেহই উহা সাদরে গ্রহণ করেন না তজ্জন্যই মায়ার স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ২৭ অধ্যায়ঃ।

মা শব্দ মোহার্থ বাচক এবং যা শব্দ প্রাপণবাচক। যাহা মোহ জন্মায় তাহাই মায়া।

দেবী পুরাণ মতে নিম্নলিখিতরূপে মায়ার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা ;—

"বিচিত্রকার্য্যকারণা অচিন্তিতফলপ্রদা।
স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্ত্তিতা।
ইতি দেবী পুরাণে ৪৫ অধ্যায়ঃ।

যাহার কার্য্য ও কারণ অতিশয় বিচিত্র, যাহা অসম্ভাবিত-ফল প্রদানকারিণী এবং যাহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের মত অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাই মায়া।

নাগোজী ভট্টের মতে "বিসদৃশপ্রতীতি সাধনং মায়া" অর্থাৎ বিসদৃশ বোধের সাধনই মায়া।

কেহ কেহ মায়াকে "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া" এইরূপ বলিয়া থাকেন।

শ্রীভাগবতে নিম্নলিখিতরূপে মায়ার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে যথা ;—

সৃষ্টিকালে ভগবান্ আদৌ মায়াং প্রকাশয়ামাস। সা দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা কার্য্যকারণরূপাচ। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। তস্যা মায়ায়া মহত্তত্বং জাতং। তস্মাদহঙ্কারঃ। তস্মাৎ পঞ্চভূতম্, তস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ডম্।

ইতি ভাগবতমতম্।

সৃষ্টিকালে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর মায়ার প্রকাশ করেন। সেই মায়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের অনুসন্ধানরূপিণী কার্য্যকারণময়ী, সত্ত্বরজস্তমোগুণ স্বরূপা। মায়ার শক্তি দ্বিবিধ ; আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়া হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চভূত হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

এ দৃশ্যমান জগতে মায়ার শক্তি অতুলনীয়। মায়াবদ্ধ জীব ঐহিক সুখ প্রত্যাশায় কিনা করিতে পারে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সমভাবে সাধনাই সাধারণ মানবের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য। কিন্তু মায়াক্লিষ্ট জীব প্রায়শঃ ধর্ম্ম ও মোক্ষকে বহুযত্ন-সাধ্য মনে করিয়া ধর্ম্ম-মোক্ষানুকুল কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়েন না। তজ্জন্যই শ্রুতি মুক্তি-পথ-ভ্রষ্ট-ভ্রান্ত-মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ;—

"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
য একোহংশক্তঃ স জনোজঘন্যঃ।"

ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনটিকে সমভাবে সেবা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে মানব ইহাদের একটিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার পথে ধাবিত হয় সে অতি হেয়।

মোহাচ্ছন্নহৃদয় জীবমাত্রই বাসনার দাসানুদাস ; মায়ামুগ্ধ জীবের অস্তিত্ব সূর্য্যাস্তের ন্যায় সহসা অনন্তকাল-গর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। মায়ার শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যাতে প্রতিফলিত হইয়া দ্বিবিধ ফল প্রসব করে ; জীবমাত্রই মায়া রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

এ বিচিত্রময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যখনই যে দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই সেইদিকে প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব অচিন্ত্য লীলালহরী আমাদিগের মনোময়-ভাব-সাগর উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অনন্তগুণ ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে থাকে।

আমরা মায়ামুগ্ধজীব বলিয়াই জাগতিক দৃশ্যদর্শনে সমধিক স্পৃহান্বিত। আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই আমরা জীব পদবাচ্য কিন্তু এ জগৎকে (গচ্ছতীতি জগৎ) গমনশীল বুঝিয়া যিনি বাহ্যবস্তুর উপর কেবল ভগবানের প্রভাব বা সত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি জীব নামে অভিহিত হইলেও ভগবানের নিত্যানন্দধাম-প্রার্থী একজন সাধক, তাহার ভাবরাজ্যে নিত্য কত শত শত নব নব ভগবৎপ্রেম উদিত হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বদর্শী করিয়া তুলিতেছে। সাধারণ জীব যাহাকে চন্দনতরু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতেছেন, ভগবৎপ্রেমিক হয়ত তাহাকে আবার বিষবৃক্ষজ্ঞানে পরিহার করিতেছেন ; নগণ্য জীব যাহাকে উন্নতির সোপান জ্ঞান করিতেছেন, ভগবদ্ভক্ত তাহাকে হয়ত অবনতির মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তজ্জন্যই জীবমাত্রই বলিতে প্রয়াসী যে এরূপ বৈষম্যের প্রকৃত কারণ কি? "কারণাৎ কার্য্য-গুণা আরভন্তে" কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় ; কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি কখনই সম্ভবেনা। কাজেই এ স্থলে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের কারণ সুধীজন, প্রমুখে সবিশেষ উল্লেখ পূর্ব্বক দেখাইতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, মায়ার

আধিপত্য বলেই জীব ভগবৎ প্রেমে অনাসক্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে। মায়া অবিদ্যা পথে প্রধাবিত হইলে প্রায়শঃ কুফল সমুৎপাদন করে। এই অবিদ্যাময়ী মায়া যাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যপ্রদর্শনকারিণী, তাহারা জাগতিক বস্তুনিচয়ে ভগবৎ সত্তার উপলব্ধির পরিবর্ত্তে সর্পেতে রজ্জুভ্রম কিম্বা বর্ণশূন্য আকাশে নীলিমা ভ্রমের ন্যায় ভ্রমক্রমে স্বকপোল-কল্পিত বহুপ্রকার অনর্থজালে আবদ্ধ হয়েন ও পরিণামে চরম অশান্তি ভোগ করেন। মায়াবদ্ধ জীব স্বকীয় অনিষ্টের পথে সর্ব্বদা অগ্রগামী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে মহর্ষি কপিল সাংখ্যসূত্রে বলিয়াছেন ;—

অহিনির্ব্বয়নীবৎ

কোনও সর্প তাহার পরিত্যক্ত নির্ম্মোক (খোলস) মমত্বজ্ঞানে মুখদ্বারা গ্রহণকরতঃ স্বগর্ত্তে লইয়া যাইয়া আহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মহর্ষি কপিল উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন:— সর্প যেমন স্বকীয় শরীর হইতে ত্বক্ (খোলস) ত্যাগ করিয়াও মমেদং শরীরম্ ইহা আমার শরীর এইরূপ মমতায় বদ্ধ হইয়া মুখদ্বারা ত্যক্ত ত্বক্ গ্রহণ করিয়া নিজগর্ত্তে লইয়া যায় এবং অবশেষে সাপুড়ে দ্বারা ধৃত হয়, সেই প্রকার বদ্ধ জীব ইহা আমার ইহা আমার এইরূপ আমিত্ব জ্ঞানে যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করেন উক্ত বিষয়ই পরিণামে বিনাশের বা মুক্তির প্রতিকূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (পূর্ব্বোক্ত সূত্রের নানা প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল না)।

অতএব ইহা স্থিরীকৃত হইল যে মায়ামুগ্ধ জীব অবিদ্যার প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়া জাগতিক বস্তু নিচয়ের উপর সূক্ষ্মদৃষ্টি বা পর্য্যবেক্ষণ (Observation) করিতে না পারিয়া যাহা বাহ্যিক হৃদয়ঙ্গম করেন তাহা সর্ব্বথা মিথ্যা। মিথ্যাজ্ঞানের কারণ এক মাত্র অবিদ্যাময়ী মায়া।

পক্ষান্তরে মায়া জ্ঞানপথে অগ্রগামিনী হইলে জীব মাত্রই তত্ত্বদর্শী হইয়া থাকেন, কারণ পরমতত্ত্ব-প্রকাশিকা শক্তির বিকাশই-জ্ঞানের প্রধানতম ধর্ম্ম। আবার জ্ঞানাবির্ভাবের কারণ সাধু সঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কেই অবলম্বন করিয়া ধাবিত হয়। কিন্তু যে মায়া জ্ঞানোৎকর্ষসম্পাদনে প্রকটিত হয় তাহা জীবের উন্নতির হেতু; আর অবিদ্যাবৃদ্ধিকল্পে যে মায়ার আবির্ভাব তাহা জীবের চরম দুঃখের নিদান।

একজন সন্তরণপটু এবং একজন সন্তরণানভিজ্ঞ লোক যদি দৈবক্রমে জলমগ্ন হয় তাহা হইলে যেমন সন্তরণপটু জলনিমগ্ন না হইয়া বরং জলের উপর ভাসমান থাকে, সন্তরণ বিদ্যাবলে পারে অবতীর্ণ হয় এবং অপর সন্তরণানভিজ্ঞ ব্যক্তি জলে পতিত হওয়া-মাত্র জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে তদ্রূপ জীব মাত্রই মায়া দ্বারা সংলিপ্ত থাকিলেও কেবল কর্ম্মসংযুক্ত জ্ঞান বলে মায়াতে আবদ্ধ না হইয়া মুক্তির অনুকূল পথে চলিতে থাকে আবার অবিদ্যার আশ্রয়ে সেই জীবই পাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী বিদ্যারত্ন,
কাব্যব্যাকরণতীর্থ

বৈষ্ণব-অপরাধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর) ।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

শচী মাতার এই অপরাধ কত সামান্য তাহা চৈতন্য-ভাগবতকার বর্ণন করিয়াছেন। আমরা উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম :—

"মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥

*　*　*

না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই।
এই পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি ॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
কে বলে অদ্বৈত -দ্বৈত এ বড় গোসাঞি ॥

*　*　*

সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি ॥

*　*　*

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধে কর যেন সাবধান ॥

পাঠক ! শচী মাতার এই অপরাধ কত সামান্য তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এ সম্পর্কে কোন সমালোচনা করিব না। চৈতন্য ভাগবত-কার ইহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিব—

মনে মনে গনে আই হইয়া সুস্থির।
অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বোলয়ে মনে মহা দুঃখ পায়ে ॥

*　*　*

ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥
না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই।
এ হো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোসাঞি ॥

সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
কে বলে অদ্বৈত—দ্বৈত এ বড় গোসাঞি
চন্দ্র সম এক পুত্র করিলা বাহির।
এ হো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥

*　*　*

সবে এই অপরাধ আর কিছু নাঞি।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি ॥

*　*　*

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান ॥

কবি বৃন্দাবন দাস "শচীদেবীর বৈষ্ণব-অপরাধ খণ্ডন" উপাখ্যান লিখিতে গিয়া উপসংহারে পাঠককে সুমধুর ভাষায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনপ্রাণ শীতল হয়। মনে লয় ভক্তকবির চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ি—চরণধূলী মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হই ! যাঁহারা সৎ তাঁহারা অপরকে সৎ পথে চালিত করিতে কতই না প্রয়াস পায় ! কবি বলিতেছেন ;—যাহার রসনা বৈষ্ণব-নিন্দায় কলুষিত তাহার পাপের খণ্ডন নাই। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার পক্ষসমর্থন করিবারও লোক এ সংসারে অতি বিরল। বৈষ্ণব-নিন্দুকের আশ্রয়দাতাকেও সুচতুর কবি

স্তর্ক করিতে বিরত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, নিন্দুকের আশ্রয়দাতাও এ পাপের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন না। এক মাত্র অধিকার ভেদেই পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে (১)। বিশেষ অধিকারী ব্যক্তিই নিত্যানন্দ প্রসাদে পাপ-মুক্ত হইয়া থাকেন (১)। পক্ষান্তরে অনধিকারী ব্যক্তি আশ্রিত নিন্দুকসহ পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। দীন হীন প্রবন্ধ লেখক ধর্ম্ম কথা কিছুই বলিতে চাহেন না; তিনি বিষয়-মদে মত্ত এবং সংসার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কীট মাত্র। দীনতা প্রদর্শন হেতু তাঁহার এই উক্তি নহে—ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখিতে যাইয়াই কম্পিত অন্তরে এই সরলতা ব্যক্ত করিলেন। এ স্থলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একথাও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি যে, অধুনা কোন কোন লেখককে সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর হইয়া একে অন্যের প্রতি নিন্দাবাদ করতঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রদর্শিত পথের অবমা না করিতেছেন দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। বস্তুতঃ এবম্বিধ লেখক যদি কোন ধর্ম্মপত্রিকায়—অপরকে নিন্দা করিয়া স্বীয় রচনাচাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন তবে তদপেক্ষা গভীরতম দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা তাঁহাদের নিকট এবং আমাদের প্রিয় পাঠকগণের সম্মুখে বৈষ্ণব কবির একটি চমৎকার উক্তি উপস্থাপিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"নিত্যানন্দ প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে" ॥

(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড)।

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

(১) কিরূপ অধিকারী বৈষ্ণবনিন্দা করিলেও কোন অপরাধ হয় না শাস্ত্রপ্রমাণসহ তাহার উল্লেখ করিলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইত। আমাদের বিবেচনায় কোন ভক্তই ভক্তদ্রোহ বা ভক্তনিন্দা অপরাধ হইতে অব্যাহতি পান না তবে স্বীয় কুকর্ম্মজনিত অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইলে যখন ঐ অপরাধ খণ্ডন জন্য করযোড়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শরণাপন্ন হন তখনই দয়াল নিতাইএর দয়ায় তাঁহার সেই অপরাধ মোচন হয় মাত্র সেই জন্যই বোধ হয় বলা হইয়াছে—

"নিত্যানন্দ প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।"

সম্পাদক।

॥গৌরাঙ্গদর্শন॥*

আশা মিটিল, প্রাণ মাতিল,
হেরিয়া চরণ দুটী।
রূপ হেরিয়া, আপনা ভুলিয়া,
চরণ কমলে লুটী॥
পুলকে অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে,
পশিল কি যেন ভাব।
চক্ষে চাহিয়া, মাতিল হিয়া,
পূর্ণ যেন কি অভাব॥
ভুলিনু বিশ্ব, মধুর হাস্য,
নেহারি তোমার মুখে।
সর্ব্ব-সমক্ষে, ধরিতে বক্ষে,
চাহিল হৃদয় সুখে॥
চঞ্চল চিতে, বাহু বাড়াতে,
প্রাণে হইল বাসনা।
ভীত অন্তরে, ডাকি কাতরে,
করহ পূর্ণ কামনা॥
মানস চক্ষে, ওরূপ লক্ষে,
এতদিন পূজে ছিনু।
প্রত্যক্ষে হেরি, রূপ মাধুরী,
পুলকিত হ'ল তনু॥
বাল-চপল, আঁখি যুগল,
চঞ্চল-পদ স্থির।
ইত, চারু-শোভিত,
সুন্দর বদন ধীর॥
ভূষিত স্বর্ণে, বিবিধ বর্ণে,
চারুবাস পরিয়াছ।
দিব্য মন্দিরে, রত্ন আধারে,
ভক্ত-সেবা লইতেছ।
দেখি এবেশ, পাইনু ক্লেশ,
তুমি কাঙ্গালের ধন।

দীন দয়াল, ভক্তবৎসল,
(তব) নিজজন দীনজন।
দীনতা ভিক্ষা, তোমারি শিক্ষা,
রাজ-বেশে ভয় পাই।
দূর হতে দেখি, ভয়ে ভয়ে ডাকি,
নিকটেতে যেতে নাই।
তোমার লীলা, ভক্ত সনে খেলা,
দর্শন-স্পর্শন সেবা।
দুয়ারে দাঁড়াই, কিছুই না পাই,
ভক্তি-তত্ত্ব-সমুত্তবা।
হেরিতে তোমা, দিতে হয় জমা,
দর্শনী, একি বিপদ।
দ্বারেতে দ্বারী, পথ রুদ্ধ করি,
কেমনে হেরিব পদ।
একি বিচার, দীন অবতার,
তোমার জনমভূমি।
করুণা করে, এস বাহিরে,
মিনতি করি চরণে।
এস চলিয়া, দূরে ফেলিয়া,
রতন-ভূষণ-সাজ।
ধূলি মাখিয়া, হৃদয় খুলিয়া,
বসহে হৃদয়-মাঝ।
করহে নৃত্য, মধুর তত্ত্ব,
জুড়াক তাপিত প্রাণ।
করুণা দিয়া, সঙ্গে খেলিয়া,
দূর কর অভিমান।
ছাড় ছলনা, ভক্তে ভুলনা,
পাইয়া ভোগ-বিলাস।
কাতর ডাকে, চিত্ত পুলকে,
চিরদাস হরিদাস।

দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর বংশীয়—শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

* মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে

মা-হারা সন্তান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

মা! একবার দেখা দাও। আমি এমন ক'রে ভেসে ভেসে আর কতকাল বেড়াব মা। সংসার ছাড়িলাম, সন্ন্যাসী হ'লাম, মনে ভাবিলাম বহির্জ্জগৎ প্রমাদ-পূর্ণ; মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ বড় স্বার্থপর; তাই নিঃসঙ্গ হইলাম;—মনোরাজ্যে যাত্রা করিলাম। এই আশা মা! সেখানে প্রতারণা নাই, স্বার্থপরতা নাই। একবার হৃদয়-রাজ্যে তোমাকে খুঁজিয়া দেখিব, যদি তোমার দেখা পাই। মাগো! এখানে কি তোমার দেখা পাব? আমার কি আশা পূর্ণ হবে মা? এ কি মা! এখানে যে বড় অরাজকতা। ছয়টা দস্যু আমার সব লুটে খেল মা! এমন সোণার রাজ্য যে ছারখার করেছে। এ রাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকে যে নরক চিত্র! মা! আর বুঝি তোমার দেখা পেলাম না। হৃদয়ের স্তরে স্তরে যতদূর দেখি সমুদয় যে আত্মবঞ্চনার অলন্ত আলেখ্য। আমি যে আত্মহত্যা ক'রে বসে আছি মা! এ আত্মঘাতী কি তোমার দেখা পাবে? মা! শুনেছি তুমি শুভঙ্করী; আবার তুমিই ভয়ঙ্করী। তাই বলি মা দনুজদলনি! তুমি অসি হস্তে রণোন্মাদিনী বেশে আমার মনোরাজ্যের এই দস্যুগণকে দলন কর। মা! এ মনোরাজ্য ত' তোমারই। মা! রাজরাজেশ্বরি! তোমার রাজ্য তুমি অধিকার কর। মা! যে ভাবেই তোমার ইচ্ছা হয় একবার আমায় দেখা দাও। মা! তুমি না সর্ব্বব্যাপিনী? তবে তোমার দেখা পাইনা কেন মা! গুরুমুখে শুনিয়াছি, মা! তুমি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র কমনীয় কুসুমে আছ আবার অতি বড় ভাস্বর সৌরমণ্ডলেও আছ। তুমি শুচিতে আছ, তুমি অশুচিতেও আছ! তুমি সর্ব্বভূতে আছ তথাপি আমি তোমায় দেখিতে পাইনা কেন মা? তুমি কখনও জননীস্তনে দুগ্ধরূপে জীব পোষণ কর; কখনও মহাকালের হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে পলকে প্রলয় কর। বল মা! কেবল আমিই তোমাকে দেখ্‌তে পাই না কেন? আমার নয়নে একি ঘোর তমঃ আবরণ দিয়াছ মা! দয়া ক'রে আমার আবরণ খুলে দাও। তোমাকে দেখ্‌তে চাই মা অনেক পদার্থে; কিন্তু আবার কি ধাঁধাঁয় পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই। তাই তোমাকে মা মা ব'লে ডাক্‌ছি। মা! তুমি কি কাণে শোন না? এত ক'রে ডেকে মরি মা! তবু দেখা দেওনা কেন? ছেলে ল'য়ে কত তামাসা ক'রছ মা! আমাকে কখন ও গজ, কখনও বাজী কখনও সরীসৃপ, কখনও পক্ষী এইরূপ আশিলক্ষ বার তো সং সাজালে মা! ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলকুমার বসু। বেরেলি।

ত্রুটি স্বীকার।

গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে ছাপাখানার গোলযোগে কার্ত্তিক মাসে শ্রীপত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। আগামী মাসে যথাসময় যাহাতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তজ্জন্য সাবধান হইব। আশাকরি এবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি।

সম্পাদক।

ও নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৮৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, অগ্রহায়ণ। { ১১শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত

জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

ফকির।

যাহার পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর তিনিই ফকির। ফকির বেফিকির। স্রোতস্বিনীতে যে তৃণ ভাসিতেছে, তাহাকে স্রোতাস্বিনী যথা ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে সেই স্থানেই যায়। ভাসিয়া যাইবার সময় তাহার নিজের কোন চেষ্টা থাকে না। প্রকৃত ফকির পরমেশ্বরের, আল্লার বা খোদার ইচ্ছাস্রোতে

বিনীতে তৃণের ন্যায় ভাসিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে পরমেশ্বরের ইচ্ছা যাহা করে তিনি তাহাতেই সম্মত। তাঁহার নিজের কোন চেষ্টা নাই।

ক্ষমা।

নিজ সন্তানের কত অপরাধ মার্জ্জনা করা হয়। শিষ্যও এক প্রকার সন্তান। শিষ্যেরও বহু অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। অজ্ঞান বশতঃ অপরাধ হইয়া থাকে। সেই জন্য অপরাধ মার্জ্জনীয়। অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্যই ভগবান ক্ষমা সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরাধ মার্জ্জনা করিবার একেবারে প্রয়োজন না হইলে ক্ষমারও অস্তিত্ব থাকিত না। অপরাধের জন্যই ক্ষমা রহিয়াছে। সেইজন্য অপরাধ ক্ষমা করা উচিত। জগতে অপরাধ যদি না থাকিত তাহা হইলে জগতে ক্ষমাও থাকিত না। অপরাধ আছে তাই ক্ষমাও আছে।

দয়া।

যদি তুমি বল তোমার দয়া আছে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার বোধ হইয়া থাকে তুমি যাহাদের প্রতি দয়া করিয়া থাক তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। যাহার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা আছে, তাঁহার মধ্যে যে দয়া আছে সে দয়া তাহার নিজের নহে, তিনি তাহাই বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহার বোধ হইয়া থাকে সে দয়া দয়াময় হরির দয়া। তাঁহার বোধ হইয়া থাকে দয়াময় হরি তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া অন্য কত লোককে দয়া করিয়া থাকেন।

যাঁহার মধ্যে দয়া আছে, সে দয়া তাঁহার নিজের নহে। সেইজন্য দয়া থাকিলে তাঁহার অহংকার হওয়া উচিত নহে। যাঁহার মধ্যে দয়া আছে, তিনি নিজেও ভগবানের। সেইজন্য তাঁহাতে যে দয়া আছে সেই দয়াও ভগবানের।

সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতে শ্রীকৃষ্ণই ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। শাক্ত ধর্ম্মও ধর্ম্ম, সৌরধর্ম্মও ধর্ম্ম, গানপৎ ধর্ম্মও ধর্ম্ম, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই ধর্ম্ম সেই জন্য বলা যাইতে পারে শাক্তধর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জন্য বলা যাইতে পারে শৈবধর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জন্য বলা যাইতে পারে সৌরধর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জন্য বলা যাইতে পারে গাণপৎ ধর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জন্য বলা যাইতে পারে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে নিজেই নরনারায়ণ মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

তিনিই নরনারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি কেবল মাত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অবণীতে অবতীর্ণ হন এবম্প্রকার বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কথিত গীতার ঐ শ্লোকে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ সর্ব্বধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তাঁহার পক্ষে জগতের সর্ব্ব জাতিই আপনার। জগতের সর্ব্ব জাতি তাঁহার সৃজিত বলিয়া জগতের সর্ব্বধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। সেই জন্য সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার ক্ষমতা কেবল মাত্র তাঁহারই আছে। সেই জন্য তিনিই সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি নানা দেশের নানা মহাপুরুষগণের মধ্যদিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। তিনি গৌরাঙ্গ অবতারেও সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। সে অবতারেও তৎকর্ত্তৃক কোন ধর্ম্মের হানি করা হয় নাই। তিনি উদার ভাবে যবন হরিদাস প্রভৃতি নীচ কুলোদ্ভব মহাত্মাগণকে পর্য্যন্ত আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ভগবান গুণগ্রাহী বলিয়া অতি নীচ কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে, তিনি তাঁহাকেও পদাশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার রামাবতারে সে বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তিনি রামাবতারে নিষাদ কুলোদ্ভব ভক্তিমান গুহকের সহিত পর্য্যন্ত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রবণা শবরীকে যে অমানুষী দয়া করিয়াছিলেন যাঁহারা বাল্মিকীয় রামায়ণ, মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং ভবিষ্যপুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই সে বিষয় অবগত হইয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্র বুঝিবার জন্য দিব্যজ্ঞান যাঁহার অবলম্বন হইয়াছে তিনিই বুঝিয়াছেন কোন অধম কুলোদ্ভব ব্যক্তিরও বিষ্ণুভক্তি হইলে, তিনিও অতি উচ্চ জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। তিনিই বুঝিয়াছেন মহাপুরাণ বা পঞ্চমবেদ মহাভারতানুসারে ঐ প্রকার ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপক সর্ব্বদেশের পরমেশ্বর সর্ব্বদেশের ভক্তবৃন্দকেই শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদেশের সর্ব্বধর্ম্মেরই সংস্থাপক। সেই জন্য সর্ব্বধর্ম্মই তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, শৈবধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, সৌরধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম, গাণপৎধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। জগতে যত ধর্ম্ম আছে সে সকল ধর্ম্মই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। পরে জগতে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় নানা দেশের মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যত ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে, যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে আমাদিগের বিবেচনায় সে সকলের প্রত্যেক ধর্ম্মও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। সেই জন্য সে সকল ধর্ম্মের উদ্দেশেও প্রণাম করি। পরমেশ্বর ধর্ম্মরাজ। শিবরূপী পরমেশ্বরের ধর্ম্মই বাহন। পরমেশ্বর শিবকৃষ্ণই ধর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। স্বয়ং শিব কৃষ্ণই ধর্ম্ম চালাইবার কর্ত্তা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শাক্তের শক্তি। সে সম্বন্ধে গায়ত্রী তন্ত্রে এবং গৌতমীয় তন্ত্রে প্রমাণ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শৈবের শিব। সে সম্বন্ধেও গায়ত্রী তন্ত্রে প্রমাণ আছে। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণই গণেশ। সে সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ উৎকল খণ্ডে বিশেষ প্রমাণ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সূর্য্য। সে সম্বন্ধে আদিত্যপুরাণে প্রমাণ আছে। অতএব সেই জন্যই বলা যাইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শাক্তধর্ম্ম রক্ষা করেন। অতএব সেই জন্যই বলা যাইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শৈবধর্ম্ম রক্ষা করেন। অতএব সেই জন্যই বলা যাইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গানপৎধর্ম্ম রক্ষা করেন। অতএব সেই জন্য বলা যাইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সৌরধর্ম্ম রক্ষা করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শ্রীবিষ্ণুর প্রকাশ। অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণু। অতএব সেই জন্য বলা যাইতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণবধর্ম্ম রক্ষা করেন। নানা শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। যাঁহারা পরমেশ্বর মানেন, তাঁহাদের ধর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেন।

রূপ ও স্বরূপের অভেদত্ব।

বীজ আর বৃক্ষ যে ভাবে অভেদ এবং এক সেই ভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। বীজ যেন শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং তন্মধ্যস্থ অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষ যেন কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে পরস্পর অভেদ তদ্বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল বলা প্রসিদ্ধ আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং

। ঐ প্রকার বলায় শ্রীকৃষ্ণের শরীর এবং কৃষ্ণের অভেদত্ব যে আছে তাহা বুঝিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। যেরূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফলের অভেদত্ব বুঝিবার সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। বলিতে হইলে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ফল বলিতে হয়। বলিতে হইলে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শরীর এইরূপই বলা হইয়া থাকে। অথচ স্বরূপত কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শরীর পরস্পর অভেদ। সেই জন্যই কোন কোন ভক্তিশাস্ত্র মতে শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলাও হইয়াছে। ঐ প্রকার বলায় কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত কৃষ্ণের অভেদত্ব উদাহৃত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ।

অন্ধকার মধ্যস্থিত দ্রব্য নিচয় স্পর্শ করা যাইতে পারে। অন্ধকার মধ্যগত দ্রব্যনিচয় দর্শন করা যায় না। অন্ধকার অপসৃত হইলে, সে সমস্ত দর্শন করা যায়। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হইলে তবে সৎ, চিৎ এবং আনন্দকে দর্শন করা যায়। অজ্ঞানের লেশ-মাত্র থাকিতে সচ্চিদানন্দকে দর্শন করা যায় না। দিব্যজ্ঞানই সচ্চিদানন্দ দর্শন করিবার চক্ষু। দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সদাকার ব্রহ্ম দর্শন করা যায়, দিব্যজ্ঞান প্রভাবে চিদাকার ব্রহ্ম দর্শন করা যায়, দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আনন্দাকার ব্রহ্ম দর্শন করা যায়। বৃক্ষ যখন অব্যক্ত ভাবে বীজ মধ্যে থাকে তখন বৃক্ষকে নিরাকারই বলিতে হয়। বৃক্ষ ব্যক্ত হইলে তাহাকেই আকার বলা যাইতে পারে। সচ্চিদা-নন্দ অব্যক্ত ভাবে থাকিলে, তাঁহাকে নিরাকার বলা যায়। তিনি ব্যক্ত হইলে তাঁহাকেই আকার বলা যায়। তিনি ব্যক্তরূপে সদাকার, চিদাকার এবং আনন্দাকার হন। নিরাকার সচ্চিদানন্দকে দিব্যজ্ঞান দ্বারা কেবল মাত্র অনুভব করা যায়। আকার সচ্চিদানন্দকে দিব্যজ্ঞান প্রভাবে দর্শন করা যায়, স্পর্শন করা যায়। সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তিনি নিরাকারও বটেন, তিনি সাকারও বটেন এবং তিনি আকারও বটেন। তিনি প্রকৃত নিরা-কারবাদীর পক্ষে নিরাকার, তিনি প্রকৃত সাকার-বাদীর পক্ষে সাকার, তিনি প্রকৃত আকারবাদীর পক্ষে আকার। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ব্রহ্ম কি না হইতে পারেন? জীবগণ যাহা অসম্ভব বিবেচনা করে, সচ্চিদানন্দ কর্তৃক তাহাও সম্ভব হইতে পারে। অসম্ভবকে সম্ভব করি-বার ক্ষমতা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরেরই আছে। সেই জন্য তিনি উপাসকদিগের রুচি অনুসারে নিরাকার, সাকার এবং আকার। তিনি জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞেয়, সাধকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় এবং অজ্ঞানীর পক্ষে অজ্ঞেয়। তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহার যে প্রকার ভাব তিনি সেই ব্যক্তির সেই প্রকার ভাবানুসারে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি স্বয়ং নরনারায়ণ অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

ভক্তি।

দ্রব্য সকলের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্যই উত্তম নহে। দ্রব্য সকলের মধ্যে কত দ্রব্য অনুত্তমও বটে। কোন উত্তম দ্রব্যকে জানিতে হইলে, যেরূপ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তদ্রূপ কোন অধম বিষয়কে জানিতে হইলেও

তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদ্যপি বিষকেও জানিতে হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিষকে বিষ বলিয়া জানিলে, তবে সেই বিষকে বিষ বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে। কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানই তদ্বিষয়ক বিশ্বাসের কারণ হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ক জ্ঞানই তিনি কি এবং কি প্রকার তাহা বুঝিবার কারণ হইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তিনি কি এবং কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারিলেই তিনি যাহা, তাহা বিশ্বাস করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। তিনি যাহা, তাহা বিশ্বাস হইলেই তাঁহার প্রতি নির্ভর হইয়া থাকে, তাঁহার প্রতি নির্ভর হইলেই তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্য তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে, কোন প্রকারেই সে শ্রদ্ধা ভক্তির লোপ হইতে পারে না। কিন্তু কেবল মাত্র ভগবদ্বিষয়িনী মহিমা শ্রবণ ও পঠন দ্বারা তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে সে শ্রদ্ধা ভক্তির লোপ কোন কারণে হইলেও হইতে পারে। তুমি এক ব্যক্তির মহিমা শ্রবণে যদ্যপি তাঁহার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদ্যপি কোন ব্যক্তি তোমাকে বুঝাইয়া দেন যে তুমি সে ব্যক্তি সম্বন্ধে যে মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলে, তাহা সত্য নহে তাহা হইলে সে ব্যক্তির প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা ও অভক্তি হইতে পারে। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীভগবানের প্রতি কোন ব্যক্তির কেবল মাত্র শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণজনিতা শ্রদ্ধা ভক্তির কি প্রকারে তিরোধান হইতে পারে, তাহা বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধা আছে। সেই জন্য কেবল মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার মনে ভগবান সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হয় এবং সেই বিশ্বাসজনিত তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি হয় সেই শ্রদ্ধা ভক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তবে ভগবানের প্রতি তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস হইয়া থাকে তাহা কোন কারণেই বিচলিত হয় না। সেই বিশ্বাসবশতঃ শ্রীভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া থাকে তাহাও বিচলিত হয় না।

শ্রীভগবান এরূপ অত্যাশ্চর্য্য মনোহর পদার্থ যে তাঁহাকে জানিলে স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হইয়া থাকে।

যে জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানকে জানা হয়, তাহাই দিব্যজ্ঞান। সেই দিব্যজ্ঞানবশতঃ শ্রীভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধা হয় তাহাই দিব্য-জ্ঞানাত্মিকা শ্রদ্ধা। সেই দিব্যজ্ঞান বশতঃ শ্রীভগবানের প্রতি যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহাই দিব্যজ্ঞানাত্মিকা ভক্তি। পূর্ব্বে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে যে সেই জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির লোপ হয় না। অতএব সাধকের সেই ভক্তিই প্রার্থনীয়। শ্রীভগবানে একবার সেই ভক্তি হইলে অন্য কোন সামান্য ব্যক্তির প্রতি আর সেই শ্রেণীর ভক্তি হইতে পারে না। শ্রীভগবানে একবার জ্ঞানাত্মিকা শ্রদ্ধা হইলে অন্য কোন সামান্য ব্যক্তির প্রতি আর সেই শ্রদ্ধা হয় না। যিনি শ্রীভগবানকে জানিয়াছেন তাঁহার কেবল শ্রীভগবানেই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। যে হেতু অত্যাশ্চর্য্য সর্ব্বসদ্‌গুণের আকর, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই ভুবনমোহন শ্রীভগবানকে জানিলে তাঁহার প্রতি চিরকালের জন্য চিত্ত আবদ্ধ হয়, তাঁহার প্রতি চিরকালের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে। সেই দৃঢ় বিশ্বাস হইতে কোনক্রমেই বিচলিত হইতে হয় না। সেইজন্য সেই বিশ্বাসকেই অটল বিশ্বাস বলা যায়। শ্রীভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস হইলে তবে তাঁহার প্রতি দিব্য জ্ঞানাত্মিকা শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলি প্রকৃত শ্রদ্ধাভক্তি সহজে লাভ করা

যায় না। সেইজন্যই ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থনিচয়ে ভক্তির দুর্লভতা সূচিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তির অপার মহিমা জন্যই শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া জগৎকে ভক্তিস্রোতে ভাসাইয়াছিলেন। ভক্তিদেবীর অপার মহিমা জন্যই নারদসূত্র নামক ভক্তি-বিষয়ক দর্শনশাস্ত্রে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তির অপার মহিমা জন্যই শাণ্ডিল্য-সূত্র নামক ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্রে ভক্তির মহীয়সী মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তির অপার মহিমা জন্যই পূর্ব্বতন অনেক আচার্য্য মহাপুরুষগণই ভক্তিভাবাশ্রয়ে শ্রীভগবানকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ভক্তির অপার মহিমা জন্যই শিবাবতার পরমহংস শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভক্তি-ভাবে আপ্লুত হইয়া তাঁহার পরমভক্তিভাজন শ্রীহরিদেবকে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থ সূচনায় এই প্রকারে প্রণাম করিয়াছিলেন—

"শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহং॥"

ভক্তির অপার মহিমা জন্যই ঐ শিবাবতার শঙ্কর ভগবতের পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস গোবিন্দপাদাচার্য্য তাঁহার অদ্ভুত অদ্বৈতানুভূতি নামক গ্রন্থারম্ভেও শ্রীবল্লভ শ্রীহরিদেবকে বিশেষ ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্লোক দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে ভক্তিগদগদ স্বরে প্রণাম করিয়াছিলেন সেই শ্লোক লিখিত হইতেছে—

"স্বর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিম্
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি॥

জীবের দাসত্ব।

প্রকৃত প্রভু যিনি তিনিই স্বাধীন। জীবের প্রকৃত প্রভুত্ব নাই। সেইজন্য সে স্বাধীন নহে। সেইজন্য জীব অপ্রভু। সচ্চিদানন্দ প্রভু। সচ্চিদানন্দের সর্ব্বভূতের উপর প্রভুত্ব আছে। সেইজন্য অনেক মহাত্মার মতে তিনিই কেবল মহাপ্রভু। সেই মহাপ্রভু সচ্চিদানন্দই চৈতন্য। তিনি ব্যতীত সমস্তই অচৈতন্য। তাঁহার কৃপায় যাঁহারা সচৈতন্য তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ভাগ্যবান।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় যাঁহাদের দিব্য-জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাকে চৈতন্যদাস বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই আপনাকে প্রভু অথবা মহাপ্রভু বোধ করেন না। যে সমস্ত জীবের অহংকার আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাকে প্রভু বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করে অথবা সমর্থ হইলে পরিচিত করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাকে অদাস বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃত-পক্ষে তাহারা সকলেই যে দাসবৃত্তিসম্পন্ন তাহা একবারও মনোমধ্যে আলোচনা করে না। তাহাদের সকলেরই সেবা-বৃত্তি প্রধান অবলম্বন, তাহা তাহারা একবারও মনোমধ্যে ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই যে আত্মসেবাপরায়ণ তাহা তাহারা জানিয়াও স্বীকার করে না। জগতে এরূপ কোন জীব নাই, যাহাকে আত্মসেবায় রত থাকিতে না হয়। মুখ প্রক্ষালনাদি দ্বারা আত্মসেবা করিতে হয়, স্নান-দ্বারা আত্মসেবা করিতে হয়, গাত্রাদি মার্জ্জন দ্বারা আত্মসেবা করিতে হয়, পদপ্রক্ষালন দ্বারা আত্মসেবা করিতে হয়, বস্ত্র পরিধান অথবা অন্য কোন প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার দ্বারা আত্মসেবা করিতে হয়। অন্যান্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারাও আত্মসেবা করা হয়। একেবারে আত্ম-সেবা না করিলে জীবের জীবন ধারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য আত্মসেবার বিশেষ প্রয়ো-

হইয়া থাকে। অনেক জীবকে

আত্মসেবা ব্যতীত অন্যান্য কত জীবেরও সেবা করিতে হয়। পিতা মাতা শুশ্রূষা দ্বারা আপনার পুত্র কন্যাগণেরও সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রকন্যাগণ আপনাদিগের পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন। পত্নী আপনার স্বামীর সেবা করিয়া থাকেন। অনেক জীবকেই আপনাদিগের ভ্রাতা ভগ্নিগণেরও শুশ্রূষা দ্বারা সেবা করিতে হয়। অনেক জীবকে তাহাদের কত পীড়িত আত্মীয় স্বজনবর্গেরও সেবা করিতে হয়। প্রত্যেক গুরুভক্ত জীব আপনার গুরুদেবেরও সেবা করিয়া থাকেন। কোন জীবই সেবাবলম্বন ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। সর্ব্বজীবই সেবাবলম্বী। তাহাদিগের মধ্যে ইচ্ছা করিলে কেহই সেবা পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক জীবই সেবক। সেবকই দাস। সেইজন্য প্রত্যেক জীবই দাস। জীবের জীবত্ব থাকিতে সে কি প্রকারে প্রভু হইবে? কোন্ জীব ষড়্‌রিপুর দাস নহে? কোন্ জীব ক্ষুধাতৃষ্ণাদির দাস নহে? জীবত্ব থাকিতে দাস্য পরিহার করা যায় না। জীবত্ব থাকিতে দাস্য পরিহার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক জীবই অন্ততঃ আত্মদাস বটে। প্রত্যেক জীবই অন্ততঃ আত্মসেবক বটে। সেইজন্য কোন জীবই বলিতে পারে না যে সে আত্মদাস নহে। সেই-জন্য কোন জীবই বলিতে পারে না যে সে আত্ম-সেবক নহে। প্রত্যেক জীবই যদ্যপি সত্য কথা কহে, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবকেই আত্মদাস্য স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেক জীবই দাস বলিয়া সে 'শিবোঽহং' বলিয়া 'সোঽহং' বলিয়া, আত্মপরিচয় দিবার পক্ষে উপযুক্ত নহে। তাহার ঐ প্রকার মিথ্যা প্রয়োগ অযুক্তিসঙ্গত। কোন দাস যদ্যপি আপনাকে প্রভু বলিয়া পরিচিত করে অথবা ঐ প্রকার পরিচিত করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দাসেরই বিনয়, নম্রতা এবং দীনতা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। যে দাস প্রাধান্য-প্রিয় তাহার হৃদয়ে বিশেষ অহঙ্কার আছে। দাস যত অহংকার পরিত্যাগ করে তাহার ততই মঙ্গল হইয়া থাকে, তাহার ততই উন্নতি হইয়া থাকে। যে দাস অহংকার পরিশূন্য দাস-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তাহারই বিশেষ মহত্ত্ব আছে। সেই ব্যক্তি উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে। সমস্ত জীবগণের মধ্যে প্রত্যেক জীবকেই দাসাখ্যা দ্বারা আখ্যাত করা যাইতে পারে। সেই জন্য সর্ব্বজীবই এক সার্ব্বভৌম দাস-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রকৃত কথায় কেহই প্রভু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণেও অবগত হওয়া যায় যে নিজে পরমেশ্বরই প্রভু এবং মহাপ্রভু। তদ্ব্যতীত অন্য কেহ প্রভুও নহেন, মহাপ্রভুও নহেন। সেইজন্য অন্য কাহারও নিজের প্রভুত্ব নাই। যে জীবে যে পরিমাণে প্রভুত্ব আছে তাহা তাহার নিজের নহে, তাহাও সেই পরম প্রভু পরমেশ্বর হইতে লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক রাজারই বহু কর্ম্ম-চারী ভৃত্য সকল আছে। প্রত্যেক রাজা তাঁহার সেই সকল কর্ম্মচারী ভৃত্যগণের মধ্যে যাহাকে যে পরিমাণে প্রভুত্ব দিয়াছেন, তাহার সেই পরিমাণেই প্রভুত্ব আছে। সে ব্যক্তি আপনার প্রভু রাজার নিকট হইতে যে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সেই প্রভু রাজা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি মহাপ্রভু পরমেশ্বর তিনি সর্ব্ব-ভুবনের সর্ব্বরাজগণেরও অধীশ্বর। সেইজন্য তিনি সর্ব্বরাজগণেরও রাজা। সর্ব্বরাজগণের যে সকল ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সে সকল ক্ষম-তাও সেই রাজরাজেশ্বর সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই পরমেশ্বর মহারাজা হইতেই

প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই মহাপ্রভু পরমেশ্বর তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিজ প্রদত্ত প্রভুত্ব সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক জীবকে দাস্যাদি নির্ব্বাহ জন্য যে ক্ষমতা দিয়াছেন তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিলে সে ক্ষমতাও গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার কৃপায় যে জীব যে পরিমাণে প্রভুত্ব পাইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে প্রকৃত প্রভুত্ব কোন জীবেরই নাই। সেইজন্য কোন জীবেরই আপনাকে প্রভু বলিয়া পরিচিত করা উচিত নহে। মনের অগোচর পাপ নাই বলা হয়। জীব যে প্রভু নহে তাহা কি জীব জানে না? তাহা বুঝিবার জন্য কি প্রভু পরমেশ্বর জীবের জন্য কোন উপায় করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন! জীব নিজ অহংকারবশতঃ সেই উপায় অবলম্বনে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে না। জীব নিজ অহংকারবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিলেও অন্যের নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হয় না। ঐ প্রকার প্রকাশ করিতেও তাহার লজ্জা বোধ হইয়া থাকে। জীব এমনই অদ্ভুত জন্তু।

জীবের যে সম্পূর্ণ অধীনতা রহিয়াছে তাহা কি জীব বুঝিতে পারে না? জীব যে অধীন, জীব যে প্রকৃত স্বাধীন নহে, তাহা জীবকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন হয় না। জীব নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির পর্য্যন্ত অধীন। জীব শোক-দুঃখের অধীন। জীব কত প্রকার বাসনার অধীন। জীবের কত প্রকার অধীনতা! জীব যে প্রভু নহে, তাহা পরমেশ্বর জীবকে বিশেষতঃ ঐ সকল দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইতেছেন। তথাপি কোন জীব আপনাকে প্রভু মনে করিলে, তদ্দ্বারা তাহার নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়া থাকে। যে যাহা নহে সে আপনাকে তাহা বিবেচনা করিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা তাহার প্রত্যবায় হইয়া থাকে। প্রভুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। তাহা লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। সর্ব্বজীবেরই প্রভু পরমেশ্বর। সেইজন্য সর্ব্বজীবেরই দাস্যভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। কোন জীব তাহার ব্যতিক্রম করিলে তাহার মহাপরাধ হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রত্যেক জীবই যেন আপনাকে কৃষ্ণদাস বোধ করেন। শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণই ব্রহ্ম। সেই কৃষ্ণেরই নানারূপ, সেই কৃষ্ণেরই নানা শক্তি, সেই কৃষ্ণেরই নানা গুণ, সেই কৃষ্ণেরই নানা নাম। সেই কৃষ্ণই গোপাল। সেই কৃষ্ণই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। সেই কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু, সেই কৃষ্ণই রামাদি নানা অবতার। সেই জন্যই জীব গোপালদাস বটে, ভগবান্‌দাসও বটে, বিষ্ণুদাসও বটে, রামদাস প্রভৃতিও বটে। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নানা নামানুসারে জীবগণেরও নানা নাম হইতে পারে। প্রকৃত কথায় কোন জীবই অভগবানদাস নহে। যে সকল জীব আপনাদিগকে ভগবানদাস বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের প্রত্যেকেও ভগবান্‌দাস। ভগবানদাস যদ্যপি আপনাকে ভগবান্‌দাস বলিয়া স্বীকার না করে তাহা হইলে তাহার অপরাধের সীমা থাকে না! দাসের দাস্যের সহিত শ্রদ্ধাভক্তির সংস্রব থাকিলেই দাসের সেই দাস্য বিশেষ আদরের হয়, দাসের সেই দাস্যই বিশেষ গৌরবের হয়। দাসের সেই দাস্যেরই বিশেষ মহিমা।

অহংকার পরিহারপূর্ব্বক কি প্রকারে বিশুদ্ধ দাস ভাবাবলম্বিত হইতে হয়, জীবের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণহরি তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারে জীব-শিক্ষার্থে বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই দয়াময় ভগবান্

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টান্তানুসারে প্রত্যেক জীবেরই আপনাকে কৃষ্ণদাস বোধ করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত। তাহাদের প্রত্যেকেরই কৃষ্ণদাসের লক্ষণ সকল প্রাপ্তি জন্য গুরু-রূপী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করা উচিত—নিবেদন করা উচিত। তাঁহাদিগের প্রতি সেই গুরুর কৃপা হইলে তাঁহারা অবশ্যই কৃষ্ণদাস রূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগের অবশ্যই কৃষ্ণদাসোচিত শ্রদ্ধাভক্তি লাভ হইবে। অবশেষে তাঁহারা বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমে পর্য্যন্ত মগ্ন হইতে পারিবেন।

চাপ্‌রাস।*

কোন একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি শিব-মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ছয়টী দ্বারে ছয়টি দ্বারী আছে। তুমি যে দ্বার দিয়া সেই শিব-মন্দিরে ঢুকিতে যাইতেছ কোন দ্বারীই তোমাকে সেই মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিতেছে না। তাহারা বলিতেছে যে তোমার (জ্ঞান) চাপরাস্ না দেখিলে আমরা তোমায় ছাড়িতে পারিতেছি না। তখন তোমার কাছে জ্ঞানরূপ চাপরাস্ নাই অতএব তুমি ঢুকিতে পারিতেছ না। অনেক চেষ্টার পর নিরুপায় হইয়া হতাশ-অন্তঃকরণে দয়াময় গুরুদেবের কাছে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি যখন বলিলে দয়াময় গুরুদেব! আমায় জ্ঞান চাপরাস্ দিন, নচেৎ আমি ঐ শিব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। তখন দয়াময় গুরুদেব সকরুণ নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—হাঁসিতে হাসিতে তোমাকে চাপরাস্ পরাইয়া দিয়া বলিলেন যাও এইবার ঐ শিব-মন্দিরে যাও—ঢুকিতে পারিবে। কিন্তু তখন তোমার আর ঐ শিব-মন্দিরে যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তখন তুমি বলিলে দয়াময় গুরুদেব আমি এতকাল মায়াঘোরে নিদ্রিত ছিলাম তাই আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। প্রভু আমার সে ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, আর আমার ঐ শিব-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু আপনিই জগতের সারাৎসার সদাশিব। আজ আপনার কৃপায় আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত! প্রভু, আমি এখন দেখিতেছি, এই চরাচর বিশ্বে একমাত্র আপনিই অধিষ্ঠিত। হায়! প্রভু! এতদিন আমি তোমায় চিনি নাই! তোমার কৃপা না হইলে জগত তোমায় চিনিবে কি ক'রে? এস ভাই সব! আজ আমরা সকলে মিলিয়া দয়াময় **জ্ঞানরূপ শ্রীজ্ঞানানন্দের** কাছে—জ্ঞান চাপ-রাস্ চাহিয়া লই। ভাই, আমরা ষড়রিপুর অধীন। ভাই, শ্রীগুরুকৃপা বিহনে আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিব? তাই বলিতেছি—ভাই সব! করুণাময় গুরুদেবের শরণাপন্ন হই, আর আমাদের জ্ঞান-চাপরাসের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

যোগাচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ অবধূত দেব আমাদের কি আশ্বাসবাণী দিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

সমুদ্রে রত্ন আছে তুমি জানিলেও তুলিতে পার না। তুমি রত্ন তুলিতে জান না, নিজে তুলিতে গেলে সেই রত্নাকরে ডুবে মরিবে,

* একটি বালক-ভক্তের লেখা। প্রথম সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় সম্পাদকের মন্তব্য দেখুন

কিম্বা কোন হিংস্র জল-জন্তু তোমাকে খেয়ে ফেল্‌বে। মরিবে অথচ রত্ন পাবে না। তাহার বড় বড় তরঙ্গ দেখে তোমার তাহাতে ডুবিতে সাহস হবে না। ভবসাগরে জ্ঞান-রত্ন আছে ; তোমার দয়াময় গুরুদেব যদি তোমাকে তুলে এনে দেন তাহা হইলেই তুমি তাহা পাবে। গুরুর শরণাপন্ন হও আর তোমাকে জ্ঞান-রত্নের জন্য ভাবিতে হইবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রতিবাদ। ১

শ্রীশ্রীমদ্ অবধূতাচার্য্য জ্ঞানানন্দ দেবের শ্রীচরণাম্বুজাশ্রিত ভক্তগণের সমীপেষু—

মহোদয়গণ !

আপনাদের পরিচালিত শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার মহৎ উদ্দেশ্য ইতি পূর্ব্বে কতিপয় ভক্ত-বীর ঋষিকল্প বিজ্ঞব্যক্তির নিকট অবগত হইয়া আমি উক্ত পত্রিকা গ্রহণে অতিশয় অভিলাষুক হইয়াছিলাম এবং ভগবৎকৃপায় গত ভাদ্র মাসে উক্ত পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্তও হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমগ্রই আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। উক্ত পত্রিকায় শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের কথিত উপদেশাবলী বড়ই নীতি-পূর্ণ, ভক্তিরসাত্মক ও সর্ব্বদর্শন সম্মত। আশা করি উক্ত মহাত্মার উপদেশরত্নরাশি ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধমুখে প্রকটিত করিয়া বিজ্ঞলেখকগণ, মাদৃশ জন-সাধারণের ধর্ম্মানুরাগবর্দ্ধনকল্পে ও জাতীয় চরিত্র গঠনে সাহায্যকরতঃ সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হউন।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তচ্চালিত পত্রিকায় লেখকগণের প্রতি যেরূপ

(১) শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্মে প্রকাশিত আমাদের ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত কিঙ্করগুলির রচিত প্রবন্ধাদি ঠাকুরের সম্প্রদায়-সম্মত। তবে কোন কোন স্থলে অধিকারী ভেদে একটু ইতর বিশেষ হয় মাত্র। যে স্থলে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই মতভেদ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে সম্পাদক দ্বারা উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে "মতামতের জন্য লেখক দায়ী।" বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্পাদকের কোনরূপ মন্তব্য নাই সুতরাং উক্ত বৈরাগ্য প্রবন্ধ অন্ততঃ সম্পাদকের অনুমোদিত বুঝিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রতিবাদের বিষয়ের অভাব জগতে থাকে না তবে প্রতিবাদটি যথাশাস্ত্র হইলেই আনন্দের বিষয় হয়।

বৈরাগ্য প্রবন্ধের নিম্নে যে ফুটনোট প্রভৃতি দেওয়া আছে তাহাও উক্ত প্রবন্ধ লেখকের অনুমোদিত সুতরাং উক্ত ফুটনোটের সহিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই আর প্রতিবাদের আবশ্যক হয় না বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ যথাযথ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উহার অনুশীলন করিয়া উভয় লেখকের যথাশাস্ত্র প্রীতিকোজ্জ্বল মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাউক।

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সার্ব্বজনিক প্রীতির অনুকূল ও সমীচীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিজ্ঞলেখকগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ সম্পাদকের মন্তব্যের উপকারিত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনধিকার-চর্চ্চা দোষে স্বপ্রবন্ধ কলুষিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বিধানে যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তদ্রূপ ভারতবর্ষে অল্পলোকই বিদ্যমান আছেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি প্রভৃতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া হিতোপদেশ দিতেন। উক্ত মহাত্মা এতাদৃশ বহুদিব্যগুণে ভূষিত ছিলেন বলিয়াই আজও তিনি সর্বসাধারণের পূজার ও ভক্তির পাত্র। প্রত্যুত যতদিন ভারতবর্ষে ধর্ম্মালোচনা থাকিবে, যতদিন হিন্দু-ধর্ম্ম-মহিমা-সুধাংশু দিব্যজ্ঞানালোকে সনাতন-ধর্ম্মসেবকগণের হৃদয়রাজ্য আলোকিত ও পুলকিত করিতে থাকিবে, যতদিন যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য, মহামুনি পতঞ্জলি, বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, বুদ্ধ প্রভৃতির অমূল্যরত্ন-প্রতিম-উপদেশ ভারতীয় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক রক্ষাকবচ স্বরূপে সাদরে গৃহীত হইতে থাকিবে; ততদিন শ্রীশ্রীমদ্ অবধূতাচার্য্য জ্ঞানানন্দ দেবের কথা, তদীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সেবকগণও জনসাধারণের চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবেই থাকিবে। উক্ত মহাত্মার নিকট হইতে বহু ধর্ম্মশীলানারী এবং শিক্ষিত ভদ্রলোক দীক্ষিত হইয়া স্বাত্মোন্নতি প্রত্যক্ষ-করতঃ আত্মাকে কৃতকৃত্য মনে করিতেছেন।

"শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকায় কোন সম্প্রদায় বিশেষের গ্লানিসূচক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না" ইহা আমরা সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য হইতে সুবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। পরন্তু উক্ত পত্রিকায় কোন লেখক বৈরাগ্যশীর্ষক প্রবন্ধে যেরূপ নারীচরিত্রে দোষারোপ করিয়া লেখনী চালাইতেছেন তাহা কি বিজ্ঞলেখকের সম্প্রদায়-ভুক্তা ভক্তিমতী নারীবৃন্দের ও সাধারণের হৃদয়ে মর্ম্মঘাতী শেলরূপে বিদ্ধ হইয়া অত্যধিক অশান্তি উৎপাদন করিতেছে না? উক্ত প্রকার লেখনী সঞ্চালনের ফলে কি অশান্তির বিষময়ছায়া ধর্ম্ম-শীলা নারীবৃন্দের বিবেক-জ্ঞানোচ্ছাসিত-সমুজ্জ্বল-বদনমণ্ডলে একবার নৈরাশ্য কালিমার সৃষ্টি করিবে না?

শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের ভক্তবৃন্দের মধ্যে যিনি স্ত্রীলোকদিগের অসন্তোষোৎপাদনে সমধিক ইচ্ছুক তিনি যে বাস্তবিক শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ দেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদের বৈপরীত্য ঘটাইতে কৃতসংকল্প ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ বৈরাগ্যশীর্ষক প্রবন্ধটি "ক্রমশঃ" প্রকাশিত হইবে বুঝিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

অবশ্যকর্ত্তব্যতা আমাকে প্রতিবাদিরূপে বিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপনীত করি-তেছে। আশা করি সুধীজনসমাজে আমার কথিত বিষয়গুলির তাৎপর্য্যার্থ যথাযথরূপে নির্ণীত হইবে। হৃদয়ের ব্যাকুলতা জ্ঞাপনে সমুৎসুক হইয়াই "বৈরাগ্য" প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈরাগ্য।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জ্ঞানপয়োধি-সমুত্তরণেচ্ছু মানবগণ যতই কেন অগ্রসর হউক না কেন তাহাদের প্রতি পদে পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে বুদ্ধিভ্রম ঘটিবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। ভগ-বৎ কৃপাব্যতীত তাহাদের বুদ্ধির জড়তা, বিবেক অনুপ্রাণিত শক্তির অপ্রকাশ ও অন্তরায়, তাহা-দের অলক্ষ্যে শত শতবার উপস্থিত হইতে পারে

ক্ষণকালের মধ্যে একটি বিশাল মরুভূমি সাগরাকারে একটি বৃহৎ সাগর মরুভূমিরূপে পরিণতি হইতে পারে। কাহার কিরূপে পরিণতি সময়ান্তরে ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? ঐ যে দেখিতেছি বর্ত্তমানে বহু হিন্দুগণ স্বকীয় আত্মরক্ষার বর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মত্যাগকরতঃ অকালে কালের কবল গ্রাসে পতিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিতেছেন হয়ত উঁহারা আবার সময়ে ভগবৎ কৃপায় অতি মহান্ অতি উচ্চভাব লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইবেন। আবার হয়ত কত শত শত জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, যোগী সময়ান্তরে অতি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ বিষয়ে লিপ্ত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। ভগবানের অত্যদ্ভুত সৃষ্টিরহস্য কে বুঝিতে পারে? ভগবান স্রষ্টা; জীব সৃষ্টপদার্থ; জীব যাহা করে তাহা ভগবানের ইচ্ছা সমুদ্ভূত। (২) প্রত্যুত জীবশক্তির কোন অস্তিত্ব নাই। তজ্জন্যই সাধকগণ সর্ব্বজীবে ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন।

"যদান কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বা এব সুখাদিশঃ॥
ইতি বিষ্ণুপুরাণম্।

অর্থাৎ যখন জীব সর্ব্বভূতের উপর পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমদৃষ্টিপাত করেন বা সমদর্শী হয়েন তখন সেই ব্যক্তির সর্ব্বদিকই সুপ্রসন্ন।

উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ কেমন সুসঙ্গত কেমন আনন্দদায়ক, কেমন বিবেক-প্রণোদিত!

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে পণ্ডিতগণ যে শঙ্করকে "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ" অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শিব বলিয়া থাকেন তিনি কেন নারীচরিত্রে পুনঃ পুনঃ দোষারোপ করিয়াছেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরদানচ্ছলে আমরা বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া বৈরাগ্য লেখকের সন্দেহ দূর করিব।

শাস্ত্রে আছে;—

"কেবলং শ্লোকমাশ্রিত্য বিচারং নৈব কারয়েৎ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ কোন শ্লোক বা মহাজন বাক্যের শব্দার্থমাত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিবে না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মনাশ হয়।

কাজেই দেখিতে হইবে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য যে ভাবে যে মতের পোষকতা করিয়া নারীসংসর্গত্যাগের কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কেবল শ্লোকের শব্দার্থ ব্যাখ্যা করিলেই শ্লোকের অর্থ নির্ণীত হয় না। জন্য জনক সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক শ্লোকার্থের ব্যুৎপত্তিলাভ আবার সকলের পক্ষে সুকঠিন।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও একদিন নারী-

(২) সমস্ত জীব নহে। শ্রীভগবানের নিত্যধামের নিত্যসিদ্ধ ভক্তগুলি অথবা যে সকল সৌভাগ্যবান জীব আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সমস্ত ভার অর্পণ করেন তাঁহারাই যে যে কর্ম্ম করেন তাহাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা-সমুদ্ভূত অন্যথা অধার্ম্মিক, ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিক জীবকুল যে সমস্ত পাপাদি-কর্ম্মে আসক্ত উহা ঈশ্বর ইচ্ছা স্বীকার করিলে পাপ, পুণ্য ও কর্ম্মফলাদির বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না। শাস্ত্রমতও বোধ হয় তাহা নহে। সুপবিত্র বারাণসীধাম প্রভৃতি স্থানের শিবোঽহং-বাদ এবং ঘোর বিষয়াসক্ত জীবকুলের ঈশ্বর ইচ্ছায় সমস্ত কর্ম্ম করা প্রভৃতি ভ্রান্তমতে জগৎ সমাচ্ছন্নপ্রায় এবং তজ্জনিত বসুন্ধরা পাপভারে প্রপীড়িত। "ত্বয়া হৃষীকেশ" ইত্যাদি বচন ভক্তপক্ষে প্রযোজ্য। সাধারণ জীবপক্ষে শ্রীগীতোক্ত "যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদি প্রযোজ্য। খৃষ্টান-শাস্ত্রও জীবের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) স্বীকার করেন।

(৩) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে নারীগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অসাধারণ রমণী—তিনি জগতে অবশ্য পূজনীয়া; লেখকও তাহা অস্বীকার করেন না—সাধারণ কামিনীকুলই তাঁহার আলোচ্য। "আমাদের ঠাকুরের (?) একটী উপমা আছে যথা—শ্রীভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কি সকল শূকরই প্রণম্য?

গর্ভ (৩) হইতে ভূপতিত হইয়া এ ভারত-ভূমিকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং আরও কত শত সহস্র জ্ঞানী, বিজ্ঞানী স্ত্রীলোক হইতেই উৎপন্ন হইয়া স্রষ্টার অচিন্ত্য অব্যক্ত প্রভাব দেখাইয়াছিলেন। অতএব এস্থলে একটু সবিশেষ অনুধাবন করতঃ বিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

শঙ্করাচার্য্য "মণিরত্নমালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী" নরকের দ্বার কি? "নারী।" ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? নারী শব্দ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে নারী দ্বারা মানুষ যত মুগ্ধ হয় পার্থিব অন্য কোন বস্তুতে মানব সেরূপ মুগ্ধ হয় না! (৪) কাজেই পুরুষের অত্যধিক মোহৎপাদন দর্শনে নারী নরকের দ্বার বলিলেও সমস্ত বাহ্য মোহের অনুকূল বিষয় মাত্রকেই নরকের দ্বার বলা হইল। আর নারীকে নরকের দ্বার বলিলেও যে বিষয়ানুরক্ত পুরুষ নরকের দ্বার নয় ইহা ত শঙ্করাচার্য্য লিখেন নাই, তবে কি প্রকারে নারীর প্রতি বৈরাগ্যলেখকের রোষ দৃষ্টি পতিত হইল?

বিশেষতঃ ইহা শিষ্যদিগের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে গুরুর উপদেশ মাত্র। আরও একটি কথা এই যে ভগবান স্বয়ং ভূভারহরণার্থে ও জীব শিক্ষাচ্ছলে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ চরিত্র দেখাইয়াছেন তাহা কি জীবের অনুকরণীয় নহে? অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু

(৪) বাস্তবিক তাহাই সত্য। পুরুষের পক্ষে নারী যে অতিশয় মোহিনী সে বিষয় সন্দেহ কি? সাধারণ পুরুষ-জীব এই মায়াশক্তিরূপিণী রমণীদেহে যে অত্যন্ত আসক্ত তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রীভগবানের ইচ্ছায় রমণীদেহের শক্তিই এইরূপ; তাহাতে বুদ্ধিমতী, সাধ্বী, ভক্তিমতী রমণীর দুঃখের কারণ কি? পুরুষ স্ত্রী উভয় দেহই পরস্পরের আকর্ষণের হেতু তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবে কামিনী-মোহে তাৎকালিক পুরুষ-জীব জগৎ একেবারে উন্মত্ত অন্তঃসারশূন্য ও সম্পূর্ণ ভগবদ্বিমুখ দেখিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পুরুষশিষ্যগণকে উপলক্ষ্য করিয়া সংসারাসক্ত পুরুষজীব গুলির প্রধান মোহ কামিনী-আসক্তি দূর করিয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যবান পুরুষের প্রতি কামিনী-সঙ্গ পরিহার জন্য শুধু শঙ্কর উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে;" "অগ্নির নিকট ঘৃতের অবস্থান;" "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা নজানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" "মায়া না মেয়ে সব দিল খেয়ে" "মেয়েও কখন বৈরাগী নয় যদি হয় তো সে মেয়ে নয়।" সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদিবা সুতং—ক্লিদ্যতি (?) নারীনাং সত্যং সত্যং হি নারদ" "শাস্ত্রে নৃপে যুবত্যো চ কুতো বশীত্বং ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্রবাক্য ভগববাক্য ও মহাজন বাক্য প্রচলিত আছে। শঙ্করও যে কেবল একস্থলে মোহান্ধ পুরুষজীবগণকে নারী-পরিহার উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে; মণিরত্নমালা নামক ঐ পুস্তিকাতেই অনেক স্থলে ঐ উপদেশ আছে যথা-সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা? স্ত্রী। (সুরার মত অন্য কোন বস্তু মোহ উৎপাদন করে? স্ত্রী) কিমত্র হেয়ং: কনকঞ্চ কান্তা। (কোন বস্তু হেয়? কনক এবং কান্তা)

প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমস্ত কো বা? প্রাপ্তো ন মোহঃ ললনাকটাক্ষৈঃ (প্রাজ্ঞ, ধীর এবং সমদর্শন কে? যিনি ললনাকটাক্ষে মোহিত হন না)

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা? নার্য্যাপিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ (বিজ্ঞ অপেক্ষা মহা বিজ্ঞাতম কে? পিশাচী নারী দ্বারা যিনি বঞ্চিত হন না) এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন নারী মাত্রকেই পিশাচী বলা হইল; পিশাচীও নারী দেবীও নারী, বঞ্চনা পিশাচীর কার্য্য দেবীর নহে।

কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং? হি নারী। (প্রাণীগণের মহ বন্ধন কি?—নারী।)

জ্ঞাতুন্ন শক্যং চ কিমস্তি সর্বৈঃ? যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং। (পুরুষের)? পক্ষে কি জানা কঠিন? নারীর মন ও চরিত্র।

বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী—(অবিশ্বাসের যোগ্য কে)?—নারী।

চৈতন্যদেব, গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়াছিলেন (৫) বিশেষতঃ চৈতন্যদেব মাতার অনুরোধে দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও চৈতন্যদেব সন্ন্যাস লইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নারীর নিকট ভিক্ষাগ্রহণ নিমিত্ত হরিদাসের মুখ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন না কিন্তু তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের পরও স্বকীয় মাতার (৬) নিকট আসিয়া কত বিনীতভাবে তাঁহাকে মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে নারীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোন কার্য্য পরিলক্ষিত হয় না। শাস্ত্রকারগণ সন্ন্যাসগ্রহণের পর নারীর সংস্পর্শে থাকা অতীব দোষজনক বলিয়া বর্ণনা করিলেও নারীর প্রতি দ্বেষ করার কথা লিখেন নাই (৭) এবং প্রাচীন মুনিগণও নারীর প্রতি দ্বেষ করেন নাই। আর যে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে ভূয়ো ভূয়ো নারী গর্হা বর্ণিত হইয়াছে তিনি একদিন রতিশাস্ত্র শিক্ষা নিমিত্ত শ্মশানস্থ মৃত রাজদেহে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীর সংসর্গে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন, এ ঘটনাটি কি বৈরাগ্য লেখকের স্মরণ নাই? (৮) যদি শঙ্করাচার্য্য সমস্ত নারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ লিখিতেন তাহা হইলে মুনিগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া তারা, মন্দোদরী, দময়ন্তী প্রভৃতির নামোচ্চারণ করিতে অনুশাসন

ত্যজ্যং সুখং কি? স্ত্রিয়মেব সম্যক্। (কোন সুখ ত্যজ্য?—কামিনী-সঙ্গ-সুখ।)

কিন্তুবিষত্বাতি সুধোপমং? স্ত্রী। (কোন বিষ অমৃততুল্য বোধ হয়?—স্ত্রী। সুতরাং এস্থলে বৈরাগ্য প্রবন্ধ লেখকের দোষ কি? কামিনীই যে পুরুষ জীবের সংসারাসক্তির একটি (অথবা একমাত্র) মূল শিকড় সে বিষয় কি আর প্রশ্ন আছে? ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে। বৈরাগ্য ও সংসারাসক্তি যে পরস্পর বিরোধী তাহাও বোধ হয় কেহই অস্বীকার করেন না;—বিরাগীশিরোমণি পরমযোগী মহাদেবকে সংসারী করিবার জন্য আদর্শরমণী পরমসতী জগজ্জননী গৌরীর আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং বৈরাগ্য পন্থা ও সংসারাশ্রম পন্থা পরস্পর ভিন্ন বলিতেই হইবে। তাহা হইলে নবীন সাধককে বৈরাগ্য পন্থা উপদেশ করিতে হইলে কামিনী-সঙ্গ-গর্হা উপদেশ না দিলে উপায় কি? ঐ প অপক সাধকের সমক্ষে সংসারবাসনা, কামিনী সম্ভোগাদির প্রশংসা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি? তবে আর লেখকের অপরাধ কি? তবে সাধারণ রমণীজাতির স্বরূপ বর্ণনা শুনিয়া ভক্তিমতী বা জ্ঞানবতী অসাধারণ রমণীরত্নকুল অসন্তুষ্ট হইবেন কেন? শ্রীভগবানের সৃষ্ট জগতে প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণ রমণীগণের প্রকৃতি অপ্রসংশনীয় বলিয়া অপার্থিব রমণীরত্ন তাহা হইবেন কেন? পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের মত ভক্তবর গুহক অস্পৃশ্য চণ্ডাল কুলে এবং ব্রহ্মার অবতার হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীনন্দনন্দন গোপকুলে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কি ঐ সমস্ত জাতির পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে? সুতরাং শ্রীভগবানের কতকগুলি শ্রীচরণকিঙ্করী রমণীকুলে জন্মগ্রহ করেন বলিয়া কি সমগ্র রমণীসমাজ পূজনীয়া? বিষের প্রাণনাশিনী শক্তির ন্যায়, সুধার সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় রমণীদেহের প্রকৃতিগত দোষগুণ অস্বীকার করা যায় কিরূপে? তর্কচ্ছলে যদি স্বীকার করা যায় যে রমণীজাতি অতি হেয়—ঘৃণিত তথাপি তৎকুলে জন্মজন্য ভক্তরমণী যবন হরিদাসের ন্যায় শ্রীহরির অশেষ কৃপাই অনুভব করিবেন এবং ঐ ঘটনা সাধারণ নারীকুলের পক্ষে একটি স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কারের বিষয় না হইয়া আশার বিষয় হওয়া উচিত নয় কি? আমাদের লেখক উক্ত প্রবন্ধে ভক্তিমতী, জ্ঞানবতী, পতিব্রতা রমণীগণকে লক্ষ্য করেন নাই—সাধারণ বিষয়-কলুষিত অবিদ্যাকিঙ্করী কামিনীকুলই তাঁহার উদ্দেশ্য নতুবা ঐ লেখক বেশ জানেন যে পূর্ব্বোক্ত রমণীরত্ন আমাদের পরম পূজনীয়া। অর্দ্ধনারীশ্বর শ্রীশ্রীগুরুদেবের দক্ষিণপদ-তরণী তাঁহার পুরুষ দেহী কিঙ্করগণের ও বামপদ তরণী রমণীদেহ ধারিণী সেবিকাগণের আশ্রয়-ভূমি। লেখক তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার ভ্রম হইবে কেন?

(৫) বুদ্ধদেব ও চৈতন্যের নাম উল্লেখ থাকার বৈরাগ্য লেখকের পক্ষে প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া সহজ হইবে কারণ উহারা বিবাহিত অলৌকিক-সাধ্বী পত্নীও পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাধারণ জীবজগৎ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও সংসারাশ্রমে

করিলেন কেন ? (৯) যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় তাহার নিকট নারী নরকের দ্বার হইতে পারে সত্য প্রত্যুত যে জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়াদি তৎপর তাহার নিকট নারী মাতৃরূপিনী সাকারেশ্বরী। (১০) এ সংসারে যাহার যেমন ভাব তাহার তেমনই লাভ। উপসংহারে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে যেমন অবোধ বালক স্বভাব-চাঞ্চল্য বশতঃ সমীপবর্ত্তিনী নদীতে যাইয়া ডুবিয়া মরিতে পারে এই আশঙ্কায় বালকের পিতা বালককে "নদীর পারে ভূত আছে" প্রভৃতি বলিয়া বালকের ভয়োৎপাদন করেন, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্যও সন্ন্যাসী ও মুমুক্ষগণের পতনাশঙ্কায় পুনঃ পুনঃ স্ত্রী গর্হা খ্যাপন করিয়াছেন (১১) বাস্তবিক যাহার দ্বেষ আছে তিনি সন্ন্যাসী পদবাচ্য নহেন। (১২)।

আর আমরা সকলেই সংসারধর্ম্মে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতেছি, আমাদের মুক্তি-পথ পাপ সঙ্কীর্ণ হইলেও আমরা ভগবানের কৃপার পাত্র নহি আমাদের ভগবদ্দর্শনলাভ হইবে না (১৩) ইহা কে বলিতে পারেন ? স্ত্রীলোক না থাকিলে ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যও বা কিরূপে

অবস্থান প্রভৃতির সহিত আপনাদের তুলনা করে উহা যে গর্হিত তৎসম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরের উপদেশ দ্রষ্টব্য। পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ গৃহস্থ ছিলেন সেরূপ গৃহস্থ হওয়া কি জীবের পক্ষে সম্ভব ? ঐরূপ জীবনী জীবের মঙ্গল জন্য জীব জগৎ সমক্ষে বিশুদ্ধ পূর্ণ আদর্শ স্থাপন মাত্র। একটি দূতমুখে একজন সামান্য প্রজা কর্ত্তৃক বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্ত্যন্তর সীতা দেবীর বিশুদ্ধ চরিত্র বিষয়ে কঠোর সমালোচনা অবগত হইয়া মর্ম্মগ্রন্থিচ্ছেদন পূর্ব্বক অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও প্রজারঞ্জন জন্য ঈদৃশ পত্নী-পরিত্যাগ কি জীবের সাধ্যায়ত্ত ? বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে কি বিশুদ্ধ চতুরাশ্রম আছে ? শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট গৃহাশ্রম কোথা ? এখন কি আর পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা আছে ? শাস্ত্রীয় অর্থ অনুযায়ী পতি-পত্নী কোথায় ? বর্ত্তমান যুগে যে প্রায় সবই "স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ।" সুতরাং আমাদের মত ভ্রষ্টাশ্রমীর পক্ষে আদর্শ-চরিত্র নরশ্রেষ্ঠগণের সংসারাশ্রমের তুলনা করা আত্মবঞ্চনা নয় কি ? বিষয়াসক্ত জীবগণ জনক ঋষির সংসারাশ্রমের তুলনা দিলে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তিরস্কার করিয়া বলিতেন "ত্রিকালের মধ্যে একমাত্র জনক ঋষি নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এত খ্যাতি আর তোদের দেখ্‌ছি ঘরে ঘরে জনক।"

(৬) মাতার নিকট আসিয়াছিলেন পত্নীর নিকট নহে।

(৭) জীবমাত্রের প্রতি দ্বেষ নিন্দনীয় শুধু নারী কেন ? দ্বেষ যে একটি মানসিক রিপু। তবে স্বরূপ বর্ণনায় অনেক স্থলে দোষের বর্ণনা বাধ্য হইয়া করিতে হয় এস্থলেও তাহাই হইয়াছে আলোচ্য বিষয় বৈরাগ্য-প্রশংসা সুতরাং তদ্বিরোধী কামিনী আসক্তির নিন্দা অবশ্যম্ভাবী। অমানিশার নিন্দা না হইলে কৌমুদীস্নাত রজনীর প্রশংসা করা কিরূপে সম্ভব ? তবে শেষ অবস্থায় হয় বটে "ধর্ম্মায় নমঃ অধর্ম্মায় নমঃ" সেটি চরম অবস্থা তখন আর সমালোচনাদির অবস্থা থাকে না।

(৮) বিভূতিভূষণ শঙ্করের পক্ষে সবই সম্ভব। জীবের উহা অনুকরণীয় নহে কারণ জীব "সিদ্ধির ঝুলি" পাইবে কোথা ? ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণে জীবের পক্ষে কেবল "বস্ত্রহরণ লীলার" অভিনয় সম্ভাবনা হইবে কারণ "গোবর্দ্ধন ধারণ" লীলার অভিনয় তো সহজ নয়। তাহা কেন ? পূর্ণশঙ্কর সদাশিবের বক্ষবিহারিণী-কাল-কামিনী ; শিরবাসিনী-কলনাদিনী-মন্দাকিনী ; অঙ্কশোভিনী-জগজ্জননী কাত্যায়নী।

(৯) ঐটী শঙ্কর প্রদর্শিত বিধি নহে। অন্য শাস্ত্রকার নির্দ্দিষ্ট সংসারাশ্রমীজনের পক্ষে একটী নিত্যকর্ম্ম মাত্র। নারী সম্বন্ধে শঙ্করশিক্ষা ত্যাগী পুরুষের পক্ষে।

(১০) অতিসত্য কিন্তু বৈরাগ্য সাধক বা সন্ন্যাস-সাধকের পূর্ণ ইন্দ্রিয় জয় সিদ্ধি কিরূপে সম্ভব ?

(১১) অতি সত্য। (১২) দ্বেষ কেন ? রমণী সঙ্গ বিরতির উপদেশ। সাধক সন্ন্যাসীর প্রতি উপদেশ সিদ্ধাবস্থার জন্য নহে।

(১৩) শতকরা ৯৯ স্থলে শাস্ত্রোক্ত সংসারধর্ম্ম পালন হইতেছে না—হইতেছে কেবল "কাম কাঞ্চন সেবা।" সর্ব্বদোষনাশিনী ভগবদ্ভক্তি হৃদয়ে থাকিলে জীব নিশ্চিন্ত নতুবা ঈশ্বর লাভ কিরূপে সম্ভব ?

চলিতে পারে এ প্রশ্নও আমাদের চিন্তাকুল হৃদয়ে সময়ে সময়ে স্থান পায়। (১৪)।

সংপ্রতি বৈরাগ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়-গুলির কিয়দংশের মীমাংসা করা যাইতেছে,

১। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন "মেয়ে মানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয় তবুও কোন মতে তাকে বিশ্বাস করিবে না"। উপরোক্ত উপদেশ দ্বারা বিজ্ঞ পাঠকগণ কি বুঝিতে পারেন? প্রকৃত যিনি ভক্তিমতী নারী ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা বিশ্বাস করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি তাচ্ছিল্য বোধ করিতে হইবে? কোন শাস্ত্র গ্রন্থে কি ইহার কোন প্রকার আভাস আছে? (১৫)।

দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই সাধু পুরুষের অমূল্য উপদেশের ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া লোক সমাজে তাঁহাদিগের উদারতার লাঘব করিতে বসিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উপদেশে বাহিরে ভক্তি এবং অভ্যন্তরে মলিনতাযুক্ত স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে ইহাই আমাদের জ্ঞান। (১৬)।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইবে ভয়ে বৈরাগ্য লেখকের সর্ব্বাংশের অর্থ ত্রুটি দেখাইতে পারিলাম না। (১৭) সময়ান্তরে পরিত্যক্ত বিষয়ে সবিশেষ লিখিব। বৈরাগ্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া এবং স্ত্রী প্রশংসা জ্ঞাপন করিয়া আজকার মত ক্ষান্ত হইব। (১৭)।

বৈরাগ্য প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথমে বৈরাগ্য লেখক লিখিয়াছেন "বিরাগ শব্দ "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া "বৈরাগ্য" শব্দটী হইয়াছে; বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক! (১৮) বিরাগ শব্দ "ষ্ণ্য" প্রত্যয় করিয়া "বৈরাগ্য" এই শব্দটী হইয়াছে। বিরা-গের ভাবই বৈরাগ্য। শাস্ত্রকারগণ বৈরাগ্যের যেরূপ লক্ষণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লি[illegible] হইতেছে।

---

(১৪) জীবরূপী সৃষ্টিকর্ত্তাগণ কিন্তু ব্রহ্মার প্রতি করুণাবশতঃ জীবসৃষ্টি করেন না। অদম্য-কামপ্রবৃত্তি-বশেই বর্ত্তমানকালে জীবের জীব-সৃষ্টি নয় কি? বর্ত্তমান-কালে শাস্ত্রোক্ত বৈধকামে ক'টি জীবের উৎপত্তি? মায়া-মুগ্ধ বিষয়াসক্ত কোন কোন জীব সন্ন্যাসাশ্রমের বিরোধী হইয়া বলেন বটে, "যদি সবাই সন্ন্যাসী হবে তবে ব্রহ্মার সৃষ্টী কি লোপ হবে?" ইহাতে কোন একটি ভক্ত রোখের ভান করিয়া বলেন "বাপুহে ছাড় সংসার, হও সন্ন্যাসী; ব্রহ্মার সৃষ্টিলোপের জন্য যদি কোন পাপ হয় তাহা আমার হইবে।" সন্ন্যাস কি মুখের কথা? সংসারাসক্তিত্যাগ কি সহজ কাণ্ড?

(১৫) বৈরাগ্য প্রবন্ধের ফুটনোটেই তাহা সুব্যক্ত আছে। ঐরূপ ভক্ত রমণীকে অবশ্যই শ্রদ্ধা বিশ্বাস করিতে হইবে কিন্তু স্ত্রী দেহ জন্য পুরুষ ভক্ত তাঁহার সহিত বেশী মাখামাখি করিবেন না কারণ উক্ত "ভক্ত-রমণীর ভক্তি প্রভৃতি পুরুষভক্তের তাঁহার প্রতি আসক্তির হেতু হইয়া" পরিণামে মায়া প্রতাপে কোন বিপরীত ফল না হয়। ঠাকুরের সেই [illegible]।

(১৬) অতি সত্য। পূর্ব্বোক্ত কারণও বটে

(১৭) বৈরাগ্য লেখকের সর্ব্বাংশে অর্থ ত্রুটী নাই। তিনি অধিকাংশ স্থলে নিজের মত বেশী কিছু দেন নাই; শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। ঐ সকল স্থলে শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্যই ত্যাগলিপ্সু সাধকগণের প্রতি কামিনীকাঞ্চন নিন্দা পূর্ব্বক বৈরাগ্য উপদেশ। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং ঐ সকল স্থল পাঠ করিলেও লেখকের সহিত একমত হইবেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে এই ঘোর কলি-যুগে সাধারণ স্ত্রী জাতির প্রশংসা করিবার যো নাই। জগজ্জননী হৈমবতীর মুষ্টিমেয় কৃপাপাত্রী ব্যতীত ঘোর কলিযুগের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র বড়ই তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন যথা "স্ত্রিয়ো প্রায়শঃ ভ্রষ্টাঃ স্যুঃ" ইত্যাদি। সাধারণ পুরুষকেও শাস্ত্র বলেন "স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ।"

(১৮) এই ভ্রম প্রদর্শনটি বিজ্ঞতা হয় নাই। তর্কস্থলে ভ্রম স্বীকার করিলেও ইহার উত্তরে বলা যায় জীবদেহ ভ্রমের অতীত নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ বহু-তর পণ্ডিতের রচনায় সামান্য বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ দোষের অভাব দেখা যায় না। এ স্থলের অশুদ্ধিটী [illegible]খকের কৃত কি না বলিবার উপায় নাই কারণ তাঁহার

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা-
বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥
ইতি পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদঃ।

দৃষ্টঃ (ইহৈবোপলভ্যমানঃ স্রক্‌চন্দন বনিতাদিঃ) অনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ স্বর্গাদিরানুশ্রবিকঃ, তয়োঃ (দ্বয়োরপি বিষয়য়োর্নশ্বরত্বদুঃখাদি দোষদর্শনাৎ) বিতৃষ্ণস্য (নিস্পৃহস্য) যা বশীকারসংজ্ঞা (মমৈবৈতে বশ্যা নাহমেতেষাং বশ্য ইতি জ্ঞানং) বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ দৃষ্টবিষয় স্রক্ চন্দন বনিতাদি ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয় স্বর্গাদি, এতদুভয় বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া (২১) "উপরোক্ত বিষয় আমার বশীভূত, আমি উহাদের বশীভূত নই" এইরূপ জ্ঞানকেই বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য লক্ষণে বিষয় মাত্রই পরিহরনীয় বলা হইয়াছে ; তাই বলিয়া কাহাকেও নিন্দা করা হয় নাই। (২২) বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য কিরূপে সমুদ্‌ভূত হয় তৎসম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রবৃত্তির টীকাতে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে যথা ;—

পুরুষঃখলু বৈরাগ্যান্ মোক্ষশাস্ত্রে প্রবর্ত্ততে। বৈরাগ্যঞ্চ দ্বেষাগ্নাৎ। শোকাদিনা বা জন্মান্তরীয় দুরিত ক্ষয়াদ্বা।

পুরুষ বৈরাগ্যহেতু মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নে তৎপর হয়। সেই বৈরাগ্য শোকাদি দ্বারা বা জন্মান্তরীয় পাপক্ষয়দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। (২৩)

শ্রুতি বলেন ;—

"যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥
ইতি শ্রুতিঃ।

যেদিন জীব বিষয়ে বিরক্ত হয় সেই দিনই বিষয় ত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে। বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও পাপ জনকত্ব দোষ বিদ্যমান আছে বলিয়াই বিষয় বৈরাগ্যের প্রতিকূল (২৪) বৈরাগ্যারম্ভের প্রথম অবস্থা হইতে উহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত চারিপ্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অবস্থা যতমান্, দ্বিতীয়াবস্থা ব্যতিরেক, তৃতীয়াবস্থা একেন্দ্রিয়, চতুর্থাবস্থা বশীকার। চিত্তের বিষয়ানুরাগনাশে চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান বৈরাগ্য (২৫) কোন্ কোন্ বিষয়ে আসক্তি লোপ পাইল এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুরাগ প্রবল বা সজীব থাকিল তাহা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়া সজীব বা প্রবল বিষয়গুলিকে দুর্ব্বল বা দগ্ধ করিবার প্রয়াসের নাম ব্যতিরেক। (২৬)

স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানে আমাদের নিকট নাই। সম্পাদকদ্বয়, প্রবন্ধপ্রতিলিপিকারী, কম্পোজিটর, প্রুফসংশোধনকারী প্রভৃতির হস্তের মধ্য দিয়া লেখকের লেখাগুলিকে যাইতে হয় সুতরাং ঐ ভ্রম কাহারকৃত বলিবার উপায় নাই। শ্রীপত্রিকার সর্ব্বপ্রকার ভ্রমাদির জন্যই সম্পাদক দায়ী সুতরাং অপর সকলে অস্বীকার করিলে আমি ঐ ভ্রম আমার স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত আছি।

(১৯) শাস্ত্রী মহাশয়তো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে "স্রক চন্দন বনিতা প্রভৃতি বিষয়ে নশ্বরত্ব, দুঃখ আদি দোষদর্শন জন্য বিতৃষ্ণ" হইতে হয়। তবে বৈরাগ্য লেখকের বনিতা-দোষ-বর্ণনা-জন্য কি অপরাধ হইয়াছে ? শ্রীশঙ্করও বলিয়াছেন "সংসারসুখে দোষমনুসন্ধীয়তাং।" দোষদর্শন, নিন্দা, গর্হা শব্দগুলি কি এক অর্থবাচক নহে ?

(২১) (২২) বিতৃষ্ণা ও পরিহারের অন্তর্নিহিত কারণই দোষদর্শন বা গর্হা। প্রশংসনীয় বিষয় পরিত্যাজ্য হইবে কেন ?

(২৩) বৈরাগ্য লেখকও তাহা অস্বীকার করেন না কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরের স্পষ্ট লিখিত উপদেশও তাহাই।

(২৪) বৈরাগ্য লিপ্সু পুরুষ সাধকের পক্ষে রমণীই প্রধান বিষয় নয় কি ?

(২৫) তবে লেখকের বৈরাগ্য প্রবন্ধটি "যতমান বৈরাগ্য উপদেশ নয় কেন ? কোন বিষয়ে অনুরাগ নষ্ট করিতে হইলে উহার দোষদর্শন অবশ্যম্ভাবী।

(২৬) তাহা হইলে উক্ত প্রবন্ধটি "ব্যতিরেক বৈরাগ্য উপদেশও" বটে। পুরুষদেহধারী নবীন সাধকের পক্ষে "সজীব" ও "প্রবল বিষয়" কি ? কামিনী নহে কি ? প্রবন্ধটি সেই আসক্তি "দগ্ধ করিতে প্রয়াস" নয় কি ?

যখন চিত্ত কোন বিষয়েই অনুরক্ত হয় না কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহা জন্মে তখন তাহা একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলিয়া কথিত হয়। ইহাই বৈরাগ্যের তৃতীয়াবস্থা। তৎপর যখন বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুলি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তখনই বৈরাগ্যের পূর্ণতা হইয়াছে বলিয়া দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন (২৭)।

তৎপরই পতঞ্জলি বলিতেছেন ;—

"তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি সমাধি পাদঃ।

পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হইতে তাদৃশ পরমবৈরাগ্য সমুৎপন্ন হয়। এবং উক্ত অবস্থাই সমাধির প্রকৃষ্টতম কাল। (২৭) নারী-দিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল ;—

১। "সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যাচ সর্ব্বথা হিতকারিণী।
অসাধ্বী বৈরিতুল্যাচ শশ্বৎ সন্তাপ দায়িকা ॥"
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণপতিখণ্ডে ২ অধ্যায়।

পতিব্রতা নারী (২৮) মাতৃতুল্যা এবং মানবের সর্ব্বপ্রকারেই হিতকারিণী আর অসাধ্বী নারী শত্রুতুল্যা সন্তাপদায়িণী (২৯)।

২। "স্বামি সাধ্যা চ যা নারী
কুলধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং
যাতি নিশ্চিতম্ ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে।

যে স্ত্রী স্বামীর আরাধনায় এবং কুলধর্ম্ম-পালনে সভয়ে রতা, সে নারী স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (৩০)।

৩। পদে পদে শুভং তস্য যঃ
স্ত্রী মানঞ্চ রক্ষতি।
অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ৩২ অধ্যায়।

যে স্বামী স্ত্রীর মান রক্ষা করে তাহার পদে পদে শুভ হয়, যে পুরুষাধম পদে পদে স্ত্রীকে অবমাননা করে পতিব্রতা পার্ব্বতী দেবী তাহার অমঙ্গল বিধান করেন।

(২৭) উহা "সিদ্ধ-বৈরাগ্যাবস্থা" সাধকাবস্থা নহে।

(২৮) অতি সত্য। লেখকও অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী-নিন্দার লক্ষ্য সাধারণ রমণী। সাধ্বী যে "সাবিত্রী অংশ" "জগজ্জননী অংশ" "লক্ষ্মী অংশ" তবে "চন্দনং ন বনে বনে"। কিন্তু শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত হইলে তখন এই রমণীরত্নও পড়িয়া থাকে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু নিজ জীবনের প্রতিও আস্থা থাকে না। সাক্ষ্য—শ্রীচৈতন্য, শ্রীবুদ্ধদেব। তখনকার ত্যাগ বিচার পূর্ব্বক নহে।

(২৯) শাস্ত্র অনুসারে এই সংখ্যাই অধিক। অবশ্য ঐরূপ পুরুষও যথেষ্ট। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছেন বনের যেমন শিকারীর পদতলে প্রাণ দেয় (সাধারণ) পুরুষও তদ্রূপ সুন্দরী যুবতীর পদতলে প্রাণ দেয়। "ভাষায় স্ত্রৈণ বলিয়া একটি শব্দ আছে" ঐ শব্দ-বাচ্য পুরুষ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

(৩০) কেহই অস্বীকার করিবেন না কারণ শাস্ত্র-বাক্য ও যুক্তিযুক্ত কিন্তু বিশেষণ গুলি বড়ই দুর্লভ অনেকস্থলে "কুলধর্ম্মের" অভাব।

(৩১) বৈরাগ্য প্রবন্ধে স্ত্রী গর্হা যেমন সমগ্র রমণী কুলের প্রতি যোজ্য নহে তদ্রূপ নারীসম্মাননা সমগ্র নারী সাধারণের প্রতি হইলে শাস্ত্রমর্য্যাদা থাকে না শাস্ত্রে "সারঞ্চ স্ত্রীতাড়নং" উপদেশও আছে। যেগুলি জগ-দম্বার সুসন্তান সেইগুলির অবমাননায় পর্ব্বতনন্দিনী অসন্তুষ্টা নতুবা যে "সতী" বা "সাধ্বী" নামের কলঙ্ক তাহার শাসনেই জগন্মাতার উপদেশ ; কারণ শাস্ত্র সমূহ তাঁহারই সম্পত্তি। শান্তস্বভাব কতকগুলি ভক্তের প্রতি তাঁহাদের পত্নীর উগ্রভাব শ্রবণে ঠাকুর কখন কখন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে ইঙ্গিতে বলিতেন "ওগো কখন কখন কিছু কিছু উত্তম মধ্যমও আবশ্যক হয়।" পরমহংসদেবেরও তাহাই মত। পুত্র কন্যাদির ন্যায় পত্নীও স্বামীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন তাহাতে প্রীতির ব্যাঘাত ঘটে না।

স্ত্রীলোকেরা যে পূর্ব্বে এদেশে সম্মানের পাত্রী ছিলেন তাহার প্রমাণ বেদে মনুসংহিতায় ও পুরাণে (৩২) জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে উপরোক্ত শাস্ত্ররাশির অভিমতগুলিই কেবল লিখিত হইল। বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না।

৪। মনু কহেন;—স্ত্রীলোক যথার্থ পবিত্র। স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী উভয়েই সমান। যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্তা, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমানা থাকেন। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই শুদ্ধা, যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান, সেখানে দেবতারা তুষ্ট থাকেন। যে স্থানে স্ত্রীলোক অসম্মানিত সেখানে সকল ধর্ম্মের ভ্রষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রীলোক পূর্ব্বে "ভবতি" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। (৩২)।

৫। রাজা যুধিষ্ঠির আপন কিঙ্করীকে "ভদ্রে" বলিয়া ডাকিতেন। (৩)

৬। ভরত বনস্থিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্মানপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাক তো? (৩২)।

৭। যখন যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজ্যে দুঃখিনী অঙ্গনারা তো উত্তমরূপে রক্ষিতা হয়, ও রাজবাটীতে স্ত্রীলোকেরা তো সম্মানপূর্ব্বক গৃহীতা হয়? (৩২)।

৮। ভীষ্ম কহেন,—মাতা ইহ ও পরলোকের মঙ্গলকারিণী, পীড়িত ও দুঃখিত স্বামীর স্ত্রী অপেক্ষা রত্ন নাই। স্ত্রী পরম ঔষধ। আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী নাই। (৩৩) (ইতি পরীক্ষা)।

শাস্ত্রকারগণ আবার বিশেষরূপে কি বলিয়াছেন তাহাও নিম্নে পাঠ করুন।

৯। "বনেঽপি দোষা প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

বঙ্গানুবাদ যথা;—বিষয়রাগি জনের বনে বাস করিয়াও বহু দোষ সমুৎপাদিত হয়। গৃহে থাকিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করাই পরম তপস্যা। যিনি বিষয়রাগশূন্য হইয়া কেবল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত তাঁহার পক্ষে গৃহই তপোবন সদৃশ। (৩৪)

১০। নিম্নলিখিত গল্পটিও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রামাণ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে:—

কথিত আছে যে একদা বিদুষী পণ্ডিত মীরাবাই সনাতন গোস্বামীর দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষায় তাহার বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সেবকদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি বিদুষী মীরাবাইএর মনোভাব সনাতন গোস্বামীকে জানাইলে তিনি বলিলেন—"আমি পুরুষ হইয়া কখনও নারীর মুখ দর্শন করিব না," কাজেই উঁহাকে বল, "এ আশ্রমে আপনি পুনরায় আসিয়া সেবকগণের ও আমার তপোবিঘ্ন করিবেন না। মীরাবাই পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনে

(৩২) কেহই অস্বীকার করেন না। তবে "সে রমাও নাই সে অযোধ্যাও নাই।" মনুসংহিতা ও পুরাণে বিশ্বাস কয়জনের আছে? হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন শুনিলে বাবু মহল হাসিয়া উঠেন। সে সকল স্থলেও স্ত্রীসম্মানেরও অভাব নাই, প্রায় সকলেই ফৌজদারী আসামী। কলির লক্ষণই "স্ত্রীবশাঃ।"

(৩৩) "পত্নী" হইলে তাহাই বটে কিন্তু এ যুগে যে শতকরা ৯৯টি "পেত্নী।" এখন যে প্রায়ই "ভূত ও পেত্নীর" সংসার। সুতরাং অনেক স্থলে "রাম" নাম স্মরণ পূর্ব্বক পলায়নই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়। বাবুর বেতন পোনের টাকা কিন্তু প্রতিমাসে এক টাকার "সুবাসিত তরল আলতা" অবশ্য চাই। হা জগদীশ! মহাপ্রলয়ের আর বাকী কত দিন?

যৎপরোনাস্তি ব্যথিতা হইয়া সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "গোঁসাই জি? আমি জানিতাম এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানই স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর স্বামী, ভগবান্ ব্যতীত সমস্তই স্ত্রী-জন; এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া এবং আপনাকে সপত্নী ভাবিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনি ভগবানের পুরুষত্ব অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।" মীরাবাইএর এইরূপ ভক্তি-নীতিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া সনাতন গোস্বামী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সাশ্রুনেত্রে ভাবে বিভোর হইয়া বিদুষী মীরাবাই'র সহিত সাক্ষাৎ করতঃ নিজ দোষের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। (৩৫)

১১। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই অত্যধিক চরিত্রহীন, (৩৬) ধৈর্য্যহীন; ইহার প্রমাণ বিরল নহে। নারী যে ভ্রষ্টাচারিণী হয়, পুরুষের অত্যাচার উহার বলবৎ কারণ। (৩৬) মদ্য পান করিলে নেশা হয়, যে পান করে তাহার অজ্ঞতাই মদ্যপানে উত্তেজিত করে, বাস্তবিক মদ্যের কোন দোষ নাই; (৩৭) কাজেই স্ত্রীলোকের প্রতি দোষ দেওয়া পাপজনক ও বিজ্ঞপুরুষের পক্ষে স্ত্রীগর্হ খ্যাপন অত্যন্ত অসঙ্গত। (৩৮)

১২। কত শত সহস্র সতী নারী পতির বিচ্ছেদ অসহ্য বোধে পতির সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত জ্বলন্তঃ চিতায় স্ব স্ব দেহ হাস্যমুখে লোলজিহ্ব বহ্নির কবলায়িত করিয়া পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কই কোন পুরুষ ত স্ত্রীর জন্য সেরূপ করেন নাই! তথাপি স্ত্রী-নিন্দা করা কি পুরুষের শোভা পায়? (৩৯)।

১৩। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যোগিগণ স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু শিষ্যদিগের মনের চাঞ্চল্য বিদ্যমান, তাহারা কেবল শিক্ষার্থী; তাহাদের পতনাশঙ্কা আছে; (৪০) আবার ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠা মোক্ষজিজ্ঞাসু নারীকে "পুরুষের সংসর্গে থাকিলে বিপদাপন্ন হইবে" এরূপও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝায় যে উপরোক্ত উপদেশ ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। প্রত্যুত নারী বা পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া দোষ খ্যাপন করেন নাই। যদি তাহাই করিতেন তাহা হইলে নারী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়া

---

(৩৪) অতি সত্য। (৩৫) অতিগূঢ়তত্ত্ব। সাধারণ জগতের পক্ষে নহে।

(৩৬) অনেকাংশে সত্য হইলেও বিস্তর মতভেদ আছে। ধৈর্য্যাদি প্রকৃতি দত্ত গুণ—সাধন অর্জ্জিত নহে। অষ্টগুণ কামাদিও প্রকৃতিদত্ত দোষ।

(৩৭) মদ্যে দোষ আছে বই কি। নতুবা মদ্যপানে জীব উন্মত্ত হয় কেন? জীবের অজ্ঞতায় পান করায় উন্মত্ত করে না—দ্রব্য শক্তি অর্থাৎ মদ্য দোষেই উন্মত্ত করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে দোষও আছে গুণও আছে; সুব্যবহারে গুণ অসদ্ব্যবহারে দোষ। সর্পবিষেরও সদ্ব্যবহার আছে। মঙ্গলময়ের কোন সৃষ্টিই নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলজনক নহে।

(৩৮) লেখক কেবল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। এ সকল স্থলে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই তাহাই। তবে অসাধারণ রমণীরত্নের প্রতি উহা প্রয়োজ্য নহে।

(৩৯) অতি সত্য। আহা সেই স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দর্শন কি আর বর্ত্তমান রমণীকুলের অদৃষ্টে ঘটে না ঘটিবে? দর্শন তো দূরে কথা শ্রবণ পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছে। সেগুলি যে আমাদের জগজ্জননীর অংশীভূতা জননী বিশেষ। এমন কোন্ নরাধম পাষণ্ড বর্ত্তমান যে জননী নিন্দা করিবে? কিন্তু সেই সঙ্গে বরাহ মূর্ত্তির উদাহরণটিও স্মর্ত্তব্য। আত্মার আদর গুণের আদর দেহের নহে। এখন যে অধিকাংশ "মাকাল ফল।"

(৪০) অতি সত্য। তবে আর প্রতিবাদ কিসের; এক্ষেত্রেও যে তাহাই ত্যাগসাধনেচ্ছুর প্রতি উপদেশ। যাহার সংসর্গ নিষেধ তাহা (অন্ততঃ সেই ক্ষেত্রে) অবশ্য দূষ্য—নিন্দনীয়।

ধনাদি নানাপ্রকার বিষয়, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রভৃতির দোষ বর্ণনা সেই স্থানেই হইল না কেন? (৪১)। বিষ ভক্ষণে প্রাণ নাশ হয়, বিষ প্রাণ-নাশক বলিলেও বিষ স্বয়ং হস্ত-পদাদি সঞ্চালন-পূর্ব্বক কাহাকেও নাশ করে কি? (৪২) সেইরূপ নারী নরকের দ্বার বলিলেও নারী কি বাস্তবিক পুরুষকে আহ্বান করিয়া নরকের পথে লইয়া যায়! (৪৩) ভাবুকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। শঙ্করাচার্য্য যদি নারীগণের প্রতি উপদেশ দিতেন তবে সে স্থলেও তাঁহার বলিতে হইত "পুরুষ নরকের দ্বার" (৪৪)।

১৪। যেহেতু স্ত্রী-গর্ভ হইতে মানবের উৎপত্তি, অতএব মানব মাত্রেরই স্ত্রী-চরিত্রে দোষ-খ্যাপন করিলে মহাপাতক হইবে। (৪৫)।

ইতি ভারত বিখ্যাত কোন সাধু।

যাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তিনি স্ত্রীকে কখনও পাপচক্ষে দেখিতে পারেন না। তজ্জন্যই কোন সমদর্শী ভক্ত সাধক কবি গাহিয়াছেন;—

"যদি গিরি গহ্বরে রহরে ওরে নর!
যদি পরিধান কর অজিন অম্বর॥
যদি অঙ্গে বিভূতি করহ লেপন।
যদি সর্ব্বশাস্ত্র তুমি কর অধ্যয়ন॥
যদি তুমি প্রতিদিন কর গঙ্গাস্নান।
যদি তুমি কর সদা ভক্তি রস পান॥
যদি তুমি কর সদা দরিদ্রেরে দান॥
যদি তুমি সুপণ্ডিত হও জ্ঞানদানে।
যদি তুমি মহামান্য হও ধনে মানে॥
যদি তুমি কর সদা অতিথি সেবন।
যদি কর মরুভূমে সরসী খনন॥
যদি তুমি প্রাণপণে কর যোগাভ্যাস।
যদি তুমি কর সদা সাধু-সঙ্গে বাস॥

(৪১) তাহাও হইয়াছে। ঐ মণিরত্নমালাতেই লিখিত আছে "কেশত্রবঃ। নিজেন্দ্রিয়ানি" শত্রু কে? নিজের ইন্দ্রিয়। "পাশোহি কো? যো মমতাভিমানঃ।" সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি? মমতা এবং অভিমান। "মুর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ। মুর্খ কে? যে বিবেক বিহীন। দিবাং ব্রতং কিঞ্চ সমস্ত দৈন্যং। দিব্য ব্রত কি? সকলের নিকটই দীনতা ইত্যাদি।

(৪২) বৈরাগ্য প্রবন্ধে চেষ্টা পূর্ব্বক বিষের নিকট গমনই নিষেধ উপদেশ করা হইয়াছে। বিষের পা নাই তা সঞ্চালন করিবে কিরূপে? কিন্তু তথাপি বিষ যে প্রাণ-হারক ইহা স্বীকৃত।

(৪৩) যায় বই কি? যাহারা নিশাকালে কলিকাতা প্রভৃতি নগরের পথে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন "হাঁ যায়"। কতশত কোমলমতি দেব-বালকের সর্ব্বনাশ হয়। আলু উৎকৃষ্ট তরকারি কিন্তু একটু পচিলে সর্ব্বাংশ পরিত্যাজ্য। শাস্ত্রোক্ত সতী-লক্ষণ ভূষিতা নারী পরম পূজ্যা কিন্তু সতীত্ব বিহীনা বা পতিভক্তি শূন্যা হইলে উহার তুল্য ঘৃণিত পদার্থ জগতে আর নাই।

(৪৪) অতি সত্য। (৪৫) মাপ করিবেন সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। শাস্ত্রবাক্য নহে। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। অথবা উক্ত সাধুর উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বরাহ অবতারের উদাহরণ প্রয়োজ্য। আমার গর্ভধারিণী পূজনীয়া কিন্তু মাতাও স্ত্রী, পত্নীও স্ত্রী, সাধ্বী ও স্ত্রী, গণিকাও স্ত্রী, স্বামীঘাতিনীও স্ত্রী, পুত্রঘাতিনীও স্ত্রী, তস্করীও স্ত্রী সুতরাং সকলের পক্ষে ঐ নিয়ম খাটে না। তবে পরম সিদ্ধাবস্থায় কোন বস্তুই নিন্দনীয় বোধ হয় না; শুধু স্ত্রী কেন? তখনই বুঝি। "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম।" (৪৬) অতি সত্য। (৪৭) তাহা কেন হইবে? শাস্ত্র-প্রমাণ হাস্যোদ্দীপক কেন হইবে? শাস্ত্রপ্রমাণ অবনত মস্তকে অবশ্য স্বীকার্য্য। ধর্ম্মভীরু মনুষ্যের ইহাই লক্ষণ। (৪৮) না তাহা নহে। (৪৯) আপত্তি নাই।

(৫০) উপসংহারে বক্তব্য এই যে লেখকের অসংখ্য ধর্ম্মভগিনী তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ধার্ম্মিকা ভক্তরমণীর নিন্দা তিনি নিশ্চয়ই করেন নাই তবে তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার একমাত্র উপদেশ বিষয়পরিহার। এই বিষয়ের মধ্যে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদেহ ও রমণীর পক্ষে পুরুষদেহ সর্ব্বপ্রধান। লেখক পুরুষ ও ত্যাগপন্থী সন্ন্যাস চিহ্নধারী

যদি তুমি ত্যাগ কর বিষয় বাসনা।
যদি তুমি নাম রসে রসাও রসনা॥
কিন্তু যদি থাকে তব অন্তরে ছলনা (ক)।
এ সব তোমার তবে কি ফল বল না॥
মলরাশি পরিপূর্ণ কলস যেমন।
গাত্র ধৌত করি কর চন্দন লেপন॥ (৪৬)

(ক) ছলনা = শাঠ্যম্ তৎপর্য্যায়ঃ—কপটঃ ব্যাজঃ দম্ভঃ উপাধিঃ জন্ম, কৈতবং, কুসৃতিঃ, নিকৃতিঃ, চিত্তকৌটিল্য।

বৈরাগ্য লেখক যে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা স্ত্রীগর্হখ্যাপন করিয়াছেন তাহা অতি হাস্যো-দ্দীপক। (৪৭) কেননা বৈরাগ্য লেখকের উল্লিখিত শ্লোক গুলির তাৎপর্য্যার্থ অন্যরূপ (৪৮) বৈরাগ্য লেখক জানিতে চাহিলে বারান্তরে সবিশেষ লিখিব (৪৯) ইত্যলং পল্লবিতেন।

ভগবচ্চরণাম্বুজ সহায়ৈকধন
শ্রীরমণীভূষণ (৫০) শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন,
কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ।

সুতরাং বিধি অনুসারে কোন কামিনীকে তিনি প্রত্যক্ষ উপদেশ দিতে পারেন কি না জানি না। সম্ভবতঃ প্রবন্ধটি তাঁহার মানসক্ষেত্রে সমুদিত বৈরাগ্যলিপ্সু কোন নবীন প্রবর্ত্তকতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ জীবের প্রতি উপদেশ সুতরাং তাঁহার উপযোগী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন; এরূপ স্থলে সাধারণ রমণী আসক্তির নিন্দা অনিবার্য্য তজ্জন্য আশা করি আমাদের পূজনীয়া ধর্ম্মভগিনীগণ ও ধর্ম্মসর্ব্বস্ব সাধ্বী রমণীকুল অসন্তুষ্ট হইবেন না। পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতাও পুত্রকে অসঙ্গত পুত্রবধুসান্নিধ্য নিষেধ করেন।

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" একথা কে অস্বীকার করিবে?

* শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠে আমরা বড়ই সুখ পাইলাম কারণ উহার অনুশীলন ছলে আমাদের আরও অনেক ধর্ম্মালোচনা হইল। বাদ প্রতিবাদে প্রকৃত তত্ত্ব বাহির হয়। শাস্ত্রও বলিয়াছেন "তাশরস্তকাক্ষুসন্ধাারতাং।" তবে তার্কিক যদি বিবেকবিস্মৃত হইয়া কেবল জয়াকাঙ্ক্ষারূপ ঘৃণিত বাসনার বশবর্ত্তী হন তবে তাহাদের তর্ক ধর্ম্মানুমোদিত নহে। তাঁহাদের নিকট আমরা বিনা বাক্যব্যয়েই পরাজয় স্বীকার করি।

(৫০) শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের আত্মীয়—পর নহেন। তিনি রমণীভূষণ। আশা করি তাঁহার গৃহ জগদম্বার কৃপা-প্রাপ্ত জগজ্জননীর অংশীভূত একটি রমণীরত্নে সমলঙ্কৃত সুতরাং রমণীভূষণ মহাশয় বহুব্রীহি হইলে আমাদের আপত্তি নাই নতুবা তাঁহাকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ হইতে অনুরোধ করিতাম।

সম্পাদক

নিত্যগোপালো জয়তি

ধর্ম্ম পত্রিকায় ২৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "প্রতিবাদ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। * উক্ত 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধের লেখক আবেগময়ী লেখনীতে প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত কোনভক্ত আশঙ্কা করেন যে হয়ত উক্ত লেখকের ভাষা কএকটী বিশেষ আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক প্রকাশ করিতে পারে নাই তজ্জন্য ঐ কয়টীস্থলে আরও একটু বিশদভাবে বর্ণনার আবশ্যক।

* শ্রীশ্রীদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রীমৎ হরিপদানন্দের প্রবন্ধ ও উপদেশ অবলম্বনে লিখিত। স্থানে স্থানে তাহারই ভাষা অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সম্পাদক।

১। লেখক লিখিয়াছেন—"সত্য-সত্য-সত্যই আমরা "সহজীয়া"। ঐ ভাষাটী "ব্যাজ-সত্য" কিন্তু ভয় হয় সাধারণে বুঝিতে না পারিয়া আমাদের পরম নিষ্ঠাবান, অপূর্ব্ব-সংযমী, অদ্ভুতত্যাগী শ্রীশ্রীগুরুদেবকে বিকৃত, সহজীয়া সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্রও পক্ষপাতী মনে করেন। লেখকের উক্ত "ব্যাজ সত্য" ভাষার অর্থ এই যে প্রকৃত ধর্ম্ম পিপাসু সাধকের পক্ষে ধর্ম্মলাভ পরমকারুনিক গুরুদেবের কৃপায় অতি সহজ। আমাদের ঠাকুর আকুমার সন্ন্যাসী, অলৌকিক-ত্যাগী, অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠাবান—একটি উদাহরণ দিই:—ভূমিতে কোন বস্তু পতিত হইলে গঙ্গা-জলে ধৌত না হইলে ঠাকুর তাহা স্পর্শ করিতেন না।

লেখক লিখিয়াছেন—"আমরা কেহ মাছের ঝোল ভাত খাই ইত্যাদি" ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ আমাদের ঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনার অঙ্গ! মৎস্য মাংস তো দূরের কথা মন হইতে সমগ্র সংসার-বাসনা দূর করিতে না পারিলে শ্রীভগবান লাভ হয় না ইহাই আমাদের ঠাকুরের মত। তবে সাধন ভজনের অঙ্গীভূত শাস্ত্রোক্ত কোন আচারেরই তিনি নিন্দা করিতেন না, বরং শাস্ত্রোক্ত সমস্ত মতই তিনি সমর্থন করিতেন। মৎস্য মাংস-ত্যাগী সাত্ত্বিক আচারী যোগী-ঋষি-সন্ন্যাসী চরিত্র তিনি যে খুব ভাল বাসিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে তাঁহার যে সকল ভক্ত মৎস্য মাংস ভোজী—অথবা স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারাশ্রমী তাঁহারাও তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হন নাই। আমাদের মহাপ্রভুর এতই দয়া যে ঐ উভয় শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে তাঁহার কৃপা বিতরণে বিন্দু-মাত্রও ইতর বিশেষ লক্ষিত হয় নাই। শাস্ত্রোক্ত সংসারাশ্রমী ভক্তের কথা দূরে থাকুক ঠাকুরের করুণা সম্বন্ধে কত কত কুক্রিয়াশীল মহা পাপা-চারীও ভাসিয়া গিয়াছে। এতদিন আর্য্যশাস্ত্রে শুনিয়াছিলাম শ্রীভগবান ভক্তবৎসল কিন্তু আমাদের পতিত পাবন শ্রীভগবানের এক নূতন বিশেষণ বাহির করিয়াছেন—"অভক্ত-বৎসল"।

৩। লেখক লিখিয়াছেন—"ঘর যুবতীর কোল ইত্যাদি।" পাঠকগণ যেন ঐটী আমাদের ঠাকুরের উক্তি মনে না করেন। লেখকও তাহা বলেন নাই। ঐটী প্রবাদমূলে পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ-উক্তি—সংসারাসক্ত—কামকাঞ্চন-নিরত পতিতজীবের প্রতি সেই পরমকারুণিকের "অভয়বাণী।" রমণী-সঙ্গ আমাদের ঠাকুর প্রদর্শিত সাধন অঙ্গ নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার মত। তবে পতিতজীবের প্রতি কৃপাবান কৃপাবতী আমাদের পরম পিতামাতা হরগৌরী-প্রদর্শিত যদি কোন পন্থা থাকে তাহারও তিনি নিন্দা করিতেন না—তাহাও তিনি "না" বলিতেন না। অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা—রোগ বিশেষে ঔষধ—ইহাই আমাদের ঠাকুরের মত। রমণী সঙ্গ প্রশংসনীয় না হইলেও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিবাহিত নরদম্পতী ঠাকুরের যুগল চরণে আশ্রয় পাইতেন। আমাদের কাঙ্গালের ধন স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কোন শিষ্যকে ঘৃণা করিতেন না এবং মহাত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহাশ্রমী বৈধস্ত্রীসঙ্গী ভক্তদম্পতি এই উভয়ের হস্তেই আমাদের দয়াময় শ্রদ্ধার সহিত সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি আমাদের করুণাসাগর জগদ্গুরু শাস্ত্র অনুসারে পতিত পতিতাকেও চরণদানে সঙ্কুচিত হন নাই।

৪। লেখক লিখিয়াছেন—"আমরা সম্মান-প্রাপ্তির ভয়ে ভক্তচিহ্ন ধারণ করি না ইত্যাদি"। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন ভক্তচিহ্ন ধারণের উদ্দেশ্য সম্মান গ্রহণ। সাধুবেশী অসুর-গণের ঐরূপ উদ্দেশ্য প্রকৃত সাধক বা ভক্ত যে বেশ ধারণ করেন তাহা তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ

সুতরাং অবশ্য গ্রহণীয়। তবে কুলটা কামিনী (১) জারপ্রীতি প্রকাশ হইলে যেমন লজ্জিতা হয় ঠাকুরের ভক্তগণও বেশভূষায় ভক্তি প্রকাশে বোধ হয় সেইরূপ সঙ্কুচিতা হন। তাই বুঝি ঠাকুরের অধিকাংশ গৃহস্থ ভক্তের কোনরূপ বাহ্য বেশ দেখিনা। তাই বলিয়া বেশগ্রহণ যে ঠাকুরের মত-বিরোধী তাহা নহে—কোন কোন ভক্তের গলদেশে তুলসীমালাও দেখিয়াছি—কাহারও কাহারও গলে রুদ্রাক্ষও দেখিয়াছি—যে সকল ভক্তকে ঠাকুর প্রকাশ্যভাবে সন্ন্যাস পরিব্রজ্য বা ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন তাঁহাদিগকে গৈরিক পরিধানের আদেশও করিয়াছেন—ঠাকুরের নিজের গুরুদত্ত গৈরিক কৌপীন এখনও বর্ত্তমান।

৫। লেখক লিখিয়াছেন—"আমরা কেহ শাক্ত, কেহ শৈব ইত্যাদি।" ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা কোন সম্প্রদায়িক ভাবের অন্তর্গত আমার বোধ হয় শ্রীহনুমানের—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামকমললোচনঃ॥

এই ভাবটী কতকটা আমাদে উপাসনার মত। সংক্ষেপতঃ আমরা সর্ব্বধর্ম্মী এই সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ আমার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে গেলে ঠাকুরের শ্রীউক্তি ব্যতীত উপায় নাই—তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে অতএব জিজ্ঞাসু মহাত্মাগণ আমাদের ঠাকুরের "সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার" নামক গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সর্ব্বধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে পারিবেন।

লেখক শ্রীগীতা হইতে যে "কামোঽস্মি" বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা আমাদের ঠাকুর তাঁহার ভক্তিযোগদর্শন নামক গ্রন্থে ৮৭ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। সময়ান্তরে ঐ শ্লোকটীর অনুশীলন এই শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আকাঙ্ক্ষাবান সাধক উক্ত গ্রন্থরত্ন অলোচনা করিয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করিবেন। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন—জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু শ্রীজ্ঞানানন্দ নাথ। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন আমরা শিবাবতার মহাত্মা গোরক্ষনাথ-প্রবর্ত্তিত "নাথ সম্প্রদায়।" লেখকের "নাথ" শব্দের অর্থ "প্রভু", "ভর্ত্তা", "মহারাজ" "প্রাণেশ্বর" "পতি"। নাথ শব্দের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি নাথ্ ধাতু (প্রভু হওয়া) +অ—ক। আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে আমরা "ঋষভ পন্থী"। ভগবান ঋষভদেব অবধূত ছিলেন। ঋষভদেবের সন্ন্যাসের নাম কেবলানন্দ। আমাদের সম্প্রদায়ের একটী নামাবলী-পরিচয় (Geneological Table) আমাদের ঠাকুর শ্রীহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আমাদের "ঠাকুরের অলৌকিক প্রেম, অসাধারণ ঐশ্বর্য্য, ভাব মহাভাব ও সমাধি প্রভৃতি যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই ভক্তিতে অবনতকন্ধর হইয়াছেন। তাঁহার ভাবে ভোরা প্রেমময় ছবি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সেই স্বর্ণকান্তি, গৌরপ্রতিমা এইরূপ দিব্যভাবে বিভোর হইয়া অব ত বেশে কখন ধরনী পর্য্যটন করিতেন। যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সতত আত্মাতেই ক্রীড়া করিতেন তাঁহার বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা ছিলনা। তাঁহার লীলার শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি এই বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমাদের ঠাকুরের 'মত' আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে শ্রীভগবান লাভ করিতে হইলে জীবকে কামকাঞ্চনতো- দূরের কথা সমগ্রজগ দেহমন প্রাণ সমস্তই উৎসর্গ

(১) কুলটা কামিনীর (পরব্যসনী নারী) সহিত গুপ্ত সাধকের উপমা শাস্ত্র-সম্মত।

সম্পাদক।

করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও তাঁহার অভয়বাণী হে মায়াচুগ্ধ, কামকাঞ্চনাসক্ত কলিহত দুর্ব্বলজীব ঐ সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান ভজনের শক্তি তুমি কোথায় পাইবে? কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইও না—তোমার কিছুই শক্তি নাই ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া—অকপটে দীনভাবে গলবসনে শ্রীগুরুর শ্রীপাদতলে পতিত হইয়া সজল নয়নে বলিতে থাক প্রভুহে "ত্রাহি মাম্ ত্রাহিমাং ত্রাহি মাম্।" আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না (করিবে কোথা হইতে? শক্তি কই? পার কর!) দেখিবে স্পর্শমনিস্পর্শে তোমার ঘৃণিত লৌহময় দেহ অচিরাৎ স্বর্ণ কান্তি ধারণ করিয়াছে তোমার সমস্ত ভাবনার অবসান হইয়া গিয়াছে। অনন্ত মহান গুরুদেব শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ মহারাজের ভাবজলধির সম্যক ইয়ত্তা করিতে যাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবদেহীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার শ্রীচরণ কৃপায় আমরা যত শক্তিই লাভ করিনা কেন সেই পূর্ণানন্ত দেবের পূর্ণভাব ব্যক্ত করিবার সময় আমাদের হৃদয়রাণী সেই শক্তিদেবী শক্তি শূন্যা। অতএব তত্ত্ব-পিপাসু অকপট সাধকমহাশয়গণ তাঁহার রচিত—"সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার" "সিদ্ধান্ত দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ-রত্নের সম্যক অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর মত জগতে প্রবর্ত্তিত কোন ধর্ম্মের মতের বিরোধী নহে। শ্রীপত্রিকায় তাঁহার ভাবসমুদ্রের কিঞ্চিৎ আভাষ দিব মাত্র।

সম্পাদক।

ত।

(রাগিণী ঝিঁঝিট—একতালা।)

সারাদিন আমি, পথে পথে সখা
তোমারেই শুধু খুঁজেছি।
আমি দূর হ'তে দূরে, বহু দূরে দূরে
পথ ভুলে ঘুরে মরেছি।
আজি শ্রান্ত হৃদয়ে ক্লান্ত পরাণে,
(এই) পথ মাঝে বসে পড়েছি;
(আজি) গোধূলি লগনে পরাণ-রতনে
এতদিনে দেখা পেয়েছি।
(মম) মরমের ব্যথা জানাব বলিয়ে
মুখপানে চেয়ে র'য়েছি;
(তুমি) চরণ রাখিবে বলিয়া সখা হে,
হৃদয়-আসন পেতেছি।

প্রীতি-উপচারে সাজাইয়া ডালা
(তব) চরণের তলে রেখেছি;
(আমি) সারা জীবনের গাঁথা প্রেমমালা
তোমারই কারণে এনেছি।
প্রাণের অর্ঘ্যটি দিব পদে ব'লে
বহুদূর হ'তে এসেছি;
তুমি লও বা না লও, দূরে ফেলে দাও
আমিত তোমারে দিতেছি।
(তুমি) ঘৃণা যদি কর, ভাল নাহি বাস,
(আমি) প্রাণভরে ভাল বেসেছি;
(ওই) চরণ হেরিয়া মরিব বলিয়া
সব ছেড়ে হেথা এসেছি।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ।

আশ্রয়।

এই জগতে দুইটী সংজ্ঞা বর্ত্তমান আছে, যথা ;—আশ্রয় ও আশ্রিত। এই জীব-জগতের আশ্রয় কে? জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কাঁহার আশ্রয় লইয়া আমরা এখানে বাস করিতেছি? দেহাভিভূত এই প্রপঞ্চময় জগতের আধার, বিশ্রাম আশ্রয় কোথায়? এই তত্ত্ব সম্যক প্রকারে অনুভূত হইলে মানব ক্রমোন্নতির সহিত সর্ব্বোচ্চ-স্তরে আরোহণপূর্ব্বক দেহাদি সর্ব্ববিধ তত্ত্ব পরিহার পুরঃসর পরমাশ্রয়ীভূত পরম সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করে ও অবিদ্যা-মায়া-সম্ভূত সর্ব্বাবস্থা দূরীভূত হয়; কিন্তু কোন্ বিশদ উপায় অবলম্বিত হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থানিচয় সংঘটিত হয় তাহাই এখন আলোচ্য বিষয় হইতেছে।

জীব নিত্যআশ্রিত সুতরাং পরিস্ফুটরূপে চিত্তবৃত্তি তদ্‌ভাবাপন্ন করিতে হইলে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য কি? শাস্ত্র বলেন—"কর্ত্তব্যঃ মহদাশ্রয়ঃ।" এই মহান্ আশ্রয় দ্বারা আশ্রয় আশ্রিত পরিশুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়। এই মহান আশ্রয় দ্বারা "একাংশেন স্থিতো জগৎ" সম্যক প্রকারে জানিতে পারা যায়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ দ্বারা "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই মৌলিক শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব অনুভব হয়। এই মহৎ কে? এই জীব-জগৎ যাহা অবিদ্যা মায়ার পূর্ণাধিকার দ্বারা সুখ দুঃখে জড়িত তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া দিব্য অবস্থা দান করিয়া থাকেন তিনি কে? যিনি একমাত্র ভব-জলধি পারের উপায় স্বরূপ তিনি কে? যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই তিনি কে? তিনি গুরু-ব্রহ্ম। সর্ব্বতত্ত্বের পর তত্ত্ব। অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম। এই মহৎ আশ্রয় ও মহৎ-কৃপা বিনা অবস্থা-নির্ব্বিশেষে কোন বস্তু লাভ করিবার অন্যবিধ উপায় নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন :—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে—উক্ত হইয়াছে :—"হে রহূগণ! মহৎ পাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা এবং তত্তৎ দেবতার উপাসনা দ্বারা ও জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।"

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

হে পিতঃ! বিষয়াভিমানরহিত মহত্তমদিগের চরণ রেণু দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয় তাবৎ ইহাদিগের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না ; যাহার ফল সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি।

শ্রীগুরুগীতা বলেন :—

"জ্ঞানং বিনা মুক্তি-পদং লভতে গুরুভক্তিতঃ"
সুতরাং মহতোমহীয়ান্ শ্রীগুরুর আশ্রয় সংযত-চিত্তে নিরভিমান হইয়া গ্রহণ কর। প্রাণ সেই শ্রীপদে অবিরত তৈলধারার ন্যায় যোজনা কর, দেখিবে মহদাশ্রয়ে তোমার হৃদয়ে মহান্ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবেক-বৈরাগ্য, শুদ্ধ-ভক্তি প্রীতিফল উদয় হইয়াছে।

যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব তাঁহার কৃত নিত্যগীতিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন

বহু জন্মার্জ্জিত কত কুকর্ম্ম-সংস্কারে,
রয়েছে মালিন্য কত জীবের অন্তরে,
রয়েছে কত বন্ধন, তাহে দারুণ-অজ্ঞান,
করুন কৃপাতে তিনি বন্ধন-ছেদন ;
অজ্ঞানের তিরোধান—হউক মোচন।
তাঁহার চরণামৃত করে মুক্তিদান,
অপূর্ব্ব প্রভাব তাঁর আশ্চর্য্য আখ্যান,
ভব-সিন্ধু শুষ্ক হয়, মন হয় জ্ঞান-ময়,
তাঁহার প্রভাবে হয় দিব্য উদ্বোধন,
তাহা দিব্য-সুখ-ময় শান্তির কারণ।

এই গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র অভেদ। শ্রীগুরুর আশ্রয় সম্বলিত কৃপা দ্বারা তিনের একত্ব সম্যক প্রকারে উপলব্ধি হয় ও তিনিই যে আদি, মধ্য ও অন্ত তাহা পূর্ণভাবে জানিতে পারা যায়। তাঁহার দিব্য সস্নেহ করুণা-কণা দ্বারা আয়াস-সাধ্য সাধনা ব্যতিরেকেও সহস্রার যে গোলক তাহাতে গমন করিতে পারা যায়। এমন দিব্য-সুখময় শান্তি-প্রদ দেশ লাভ করিতে সকলেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত নহে কি ?

Imitation of Christ বলেন—**They that perfectly despise the world, and study to live with God under holy descipline, experience the divine sweetness that is promised for those who forsake all ; and such clearly see how grievously the world is mistaken and how many ways it is deceived.**

এই হেতু কায়মনোবাক্যে সংসার বাসনা ত্যাগ-পুরঃসর অনিত্য বিষয়ানন্দে মগ্ন না হইয়া ও মায়া কুহকিনীর ফাঁদে না পড়িয়া নিত্য শান্তি-প্রদ পদ অবলম্বন কর। সর্ব্বকালেই সেই নিত্য-নিরঞ্জন বিনা অন্য উদ্ধার-কর্ত্তা কেহই নাই, প্রকৃষ্টরূপে তাহাই ভাবনা কর। আর যাহাতে শুদ্ধা-ভক্তিলাভ হয় তাহার জন্য অহরহঃ স্থির-চিত্তে প্রার্থনা কর—যে শ্রদ্ধা-ভক্তি শুদ্ধ-প্রেমেরই কারণ হইয়া থাকে। অহরহঃ সেই নিত্য-নিরঞ্জন-পদে প্রণত হও—হতাশ টুটিয়া গিয়া আশার আশা সর্ব্বতোভাবে উদয় হইবে। এই নিত্য-নিরঞ্জনই এই সর্ব্ববিধ তত্ত্বের জননী-স্বরূপা ; তিনি সর্ব্বকালে এই জ্ঞানময় তত্ত্বের প্রসবিনী হইয়া যোগমায়া, যোগশ্রেষ্ঠা, যোগরাণী-স্বরূপে জীবকে পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের সহিত সংযোগ করাইতেছেন। এই নিত্য-নিরঞ্জনই জীবের পরম প্রকৃষ্ট-বান্ধব।কেন না আপৎ কালে অর্থাৎ জীব যখন অবিদ্যামায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিত্যানিত্য বিবেক-শূন্য হয় ও পরমব্রহ্মতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া সংশয় ও অবিশ্বাস আবরণে আবৃতি-নিবন্ধন অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে তখন সেই দয়াল নিত্য-নিরঞ্জনই সেই সমস্ত দুর্নিবার পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ; সুতরাং সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সারভূত নিত্য-নিরঞ্জনই সর্ব্ব-কালের ও সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্থল। এই আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য যাহাতে অদম্য বাঞ্ছা সর্ব্বদা প্রাণে উদয় হয় তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য ও গ্রহণীয়।

এই গুরুই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলেন যথাঃ—

গুরু কৃষ্ণ এক হন শাস্ত্রের প্রমাণ।
গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন জীবেরে॥

শাস্ত্র বলেন—"যো গুরুঃ সঃ হরিঃ স্বয়ং"। যিনি হরি তিনিই কৃষ্ণ, যিনি হরি তিনিই কালী। যিনি হরি তিনিই পরমব্রহ্ম, সুতরাং আমরা সেই নিত্য আশ্রয় শ্রীগুরু শ্রীহরির অভেদত্ব বোধক ভাব গ্রহণপূর্ব্বক যেন চির-আশ্রিত হইয়া বাস করিতে পারি ইহাই সেই নিত্যনিরঞ্জন পদে অহরহঃ প্রার্থনা।

নিত্য-পদাশ্রিত—
শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

পতিত-পাবন

(ওগো) পতিত পাবন নামটী তোমার
বড়ই লাগে ভালো।
ওই নামেতে আঁধার হৃদে জ্বলে আশার আলো।
যখন ভাবি আমার বুঝি
আর নাহি গো কেউ,
(যখন) ভগ্ন আমার তরির গায়ে
লাগে দারুণ ঢেউ;
আগল বিহীন শূন্য ঘরের
মলিন প্রদীপ হায়,
ঘোর বাতাসের আঁচটা লেগে—
নিভ্‌তে যখন চায়;
(যখন) আশা ভরসা যুক্তি করে
হৃদয় আমার যায়গো ছেড়ে
একলা যখন ব'সে ব'সে গণি মনের ব্যথা,
পতিত-পাবনরূপে তুমি দাও হে দেখা সেথা।

আপনি তোমার আসন পেতে
আপনি তুমি ব'স তাতে
কতই যেন জানা শুনা
কত দিনের সাথী;
যেন আমার কতই নিজের
কতই ব্যথার ব্যথী,
(আমি) দুঃখের জ্বালায় মরি কেঁদে
তুমি আমার গলা ছেঁদে
চোকের জলটী মুছিয়া দিয়ে
বল হেসে হেসে
"কেঁদনা আর ভয় কি তোমার
আমি তোমার পাশে॥"

— বি, এ, বি, টি,

মা।

মা! একবার আয় মা! আমরা ডাকি না ব'লে, ডাক্‌তে জানি না ব'লেই কি তুই আস্‌বিনা? কৈ জগতের কোন মায়েরইতো এমন স্বভাব দেখি না! আমরা যে মায়ের উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার স্নেহে, যত্নে এত বড় হইয়াছি, সে মায়ে নাকি তোরই শক্তির অনুমাত্র বিকাশ, কিন্তু তা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তা হ'লে তো আমার পার্থিব জননী অপেক্ষা তোর স্নেহ মমতা অনেক বেশী হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বেশী হওয়া দূরের কথা, আমার পার্থিব জননীর মধ্যে যে স্নেহ ভাল বাসা দেখিতে পাই, তোমাতে তাহাও দেখিনা আমার পার্থিব জননী আমাকে একদণ্ড না দেখলে থাকিতে পারে না একদণ্ড কাছে না এসে থাকিতে পারে না, আর তুমি মা আছ কি না তাহাও বুঝিলাম না; কেবল শুনি তুমি জগজ্জননী। এ জগতের সকলেরই মা তুমি, কিন্তু তোমার ব্যবহারে যাহা দেখি তাহাতে তুমি, মা কি বিমাতা কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি মা হ'লে কি এমন ক'রে আমাদিগকে ফেলে, আমাদিগকে ভু'লে থাকৃতে পার্‌তে? কেহ কেহ বলেন আমরা তোমাকে ডাকৃতে পারিনা ব'লে;

তুমি দেখা দাওনা; কিন্তু বল দেখি মা! জগতে কোন্ মা সন্তানের ডাকের অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে? মাকে আবার ডাক্‌ব কেন? সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা তো মায়ের স্বাভাবিক; আমরা ডাকি বা না ডাকি, মা আমাদিগকে ছেড়ে থাক্‌বেনা এই তো মায়ের স্বভাব জানি; তবে মা! তোমার স্বভাব কেমন তুমিই বল্‌তে পার। তুমি আমাদের মা! তুমি আমাদের কাছে থেকে সকল আব্দার সহ্য করবে; আমরা যাহাতে বিপথগামী না হই সর্ব্বদা কাছে থেকে দেখ্‌বে, আর তোমার সঙ্গে দেখাই নাই; বলি এ তোমার কেমন স্বভাব মা? কতকগুলি খেলনা দিয়ে ভুলাইয়ে আড়ালে ব'সে ব'সে রঙ্গ দেখ্‌ছ? আমরা খেলানা ল'য়ে ভুলে আছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমার কাজে ব্যস্ত আছ। তোমার অশান্ত ছেলে গুলিই দেখ্‌ছি ভাল তাহারা তোমার খেলনাতে ভুলে না; খেল্‌তে দিলেই খেলনা ছেড়ে অম্‌নি কান্না ধরে; কাজেই সেখানে আর তোমার সঙ্কেত খাটে না, বাধ্য হ'য়ে তাকে কোলে কোলেই রাখিতে হয়। কি করব তোমার এতো সামান্য খেল্‌না নয়, এ খেল্‌নায় এম্‌নি শক্তি সঞ্চারিত যে খেলিতে আরম্ভ করিলে, মা তোমার কথা পর্য্যন্ত ভুল হয়। যাহা হউক মা! অনেক দিন খেলিলাম, এখন আর খেল্‌না দিয়ে ভুলায়ে রেখ না; এখন একবার ফিরে চাও মা! এখন একবার কাছে এস মা!

নিত্যময়ী মা!

আমি তোমার মহিষাসুরবধের দশভূজা মূর্ত্তি দেখিতে চাই না, আমি তোমার নৃমুণ্ডমালিনী কালা করালিনী মূর্ত্তি দেখিতে চাইনা, আমি তোমার ব্রজে বনমালী মূর্ত্তি দেখিতে চাইনা, আমি দেখতে চাই তোমাকে আমার মায়ের মত মা। লোকে বলে তুমিই নাকি মা পুরুষ এবং প্রকৃতি, তোমার নাকি অনন্ত নাম, অনন্ত ধাম; নিতাই গৌর রাধাশ্যাম, আল্লা, যিশু, সীতারাম সকলি নাকি তুমি—তা হওনা কেন, আমার তা দেখবার কোন আবশ্যক নাই, আমার কাছে তুমি মায়ের মত মা হ'য়ে এস, আমি জানি তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। জগতে ঘরে ঘরে মা ও ছেলে যে ভাবে আছে, আমি তোমাকে ল'য়ে সেই ভাবে থাক্‌বো, তেম্‌নি ক'রে মা মা বলে কাঁদ্‌ব, মা মা বলে ডাক্‌ব, তেম্‌নি তোমার মুখ দেখে সব দুঃখ ভুল্‌ব, আবার মা মা বলে কোলেও উঠব। আস্‌বেনা মা? কেউ বলে তোমার দেখা পেতে হ'লে নাকি অনেক সাধন ভজন করিতে হয় অনেক কঠোর তপস্যা করিতে হয়, এ আবার কি কথা? মাকে দেখার জন্য আবার সাধন ভজন। সবই উল্টা কথা, আমরা দেখি, মা নিজেই সন্তানকে দেখ্‌বে ব'লে কত ব্যাকুল। কোন ছেলে যদি বহুদিন বিদেশে থাকে, আর মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তবে মা পাগলিনীর মত নিজেই সন্তানের নিকট চলিয়া যায়, এবং সন্তানের চাঁদ মুখ দেখে প্রাণ জুড়ায়। এইতো জানি মায়ের রীতি মা! তুমি জগজ্জননী হইয়া কি তোমার সমস্তই বিপরীত? শুনি সন্তানের প্রতি তোমার নাকি যত স্নেহ ভালবাসা এমন আর কারও নাই, এ সব কি মিথ্যা কথা? এ সমস্ত কি খোষামুদি কথা নাকি? মা! তোমাকে যে লোকে কেন দয়াময়ী বলে তাহা তুমিই বল্‌তে পার। যে মায়ের সঙ্গে জন্মাবধি দেখা নাই সেই মা আবার দয়াময়ী! সেই মায়ের নাকি সন্তানে অতুলনীয় স্নেহ! বুঝতে পারলাম না। তবে বুঝি মা আড়ালে থাকিয়া সন্তানের প্রতি সর্ব্বদাই করুণা দৃষ্টি নিয়োজিত রাখিয়াছ? পার্থিব জননী যেমন সন্তানকে খেল্‌তে দিয়া অন্য কাজে যায় কিন্তু সন্তানের

প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, তুমিও বুঝি তাই গোপনে থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতেছ? মা! পার্থিব জননী ক্ষণকালের জন্য খেলা দিতেছে বটে আবার পরক্ষণেই আসিয়া কত আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। কিন্তু মা! তোমার খেলা খেল্‌তে গিয়ে যে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা হইবার উপক্রম হইল, ক্রমেই যে ভীতি উৎপাদনকারী ঘোরতর অন্ধকারের সমাগম হইতে লাগিল, অথচ এ পর্য্যন্ত তুমি আসিলে না; সন্তানের খবরও নিলে না। মাগো! তোমাকে যে যতই বলুক্ না কেন, আমাদিগকে এরূপ তোমার ভুবনভুলান খেলায় মোহিত ক'রে রাখায় তোমাকে কিছুতেই ভাল বল্‌তে পারি না। এ ভাব মায়ের স্বভাব বিরুদ্ধ। মাগো! আমরা তোমার সন্তান বটে, কিন্তু তোমার এই ভবখেলার রহস্য ভেদ করা তোমার করুণা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই দেখিতেছি। তাই মা বলি, খেলা কর কিন্তু যাহাতে তোমার দয়াময়ী মা নামের কলঙ্ক হয় তাহা করিও না। তোমার নামে কলঙ্ক হইলে যে তোমার সন্তান আমাদের মনেও দারুণ আঘাত লাগিবে মা। মাগো! একবার আমার স্নেহময়ী দীনদয়াময়ী মায়ের মত মাতৃভাবে আমাকে দেখা দেও, আমি একবার প্রাণ ভ'রে তোমাকে দেখি আর প্রাণভ'রে মা মা বলে ডেকে তোমার অভয় কোলে উঠি।

শ্রীনিত্য-পদাশ্রিত
বিনয়।

গুরু-পীঠ।

বৈরাগ্য শ্রীশ্রীগুরুকৃপা-লব্ধ বস্তু। তাঁহার সুকোমল হস্তস্থিত মধুর আকর্ষণ-রজ্জুই বৈরাগ্য। বিষয় বিঘূর্ণিত হৃদয়ে যখন শ্রীগুরুদেব বৈরাগ্যরূপ স্বর্ণশৃঙ্খল বন্ধন করেন, এবং মৃদু মৃদু আকর্ষণ করেন তখন অজানিত ভাবে বিষয় বিষবৎ বোধ হয়; দেহ রক্ষার্থ যথোচিত বিষয় গ্রহণও কণ্টক বিদ্ধের ন্যায় বোধ হয়। মোহমুগ্ধ কোটী সংস্কারাবদ্ধ দাম্ভিক জীবনও দীনাতিদীনভাবাপন্ন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দয়াল গুরু বিবেক দ্বারা উন্মুক্ত হৃদয়ে বৈরাগ্য বাতি জ্বালিয়া দেন। সেই আলোকে জীবনের যাবতীয় ময়লা মাটী যেখানে যাহা লুক্কায়িত থাকে সে সকল নয়ন পথে সমুদিত হইয়া নিরন্তর শ্রীশ্রীমূর্ত্তির ঘনীভূত স্মৃতি দ্বারা অনুতাপ অনলে ভস্মীভূত হইতে থাকে; বহু জন্মার্জ্জিত স্তূপীকৃত জঞ্জাল বিদূরিত হইয়া যায় এবং বিবেক বৈরাগ্যের সমান সমাবেশে পরিমার্জ্জিত হইয়া হৃদ্‌মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপবেশনোপযোগী পবিত্র শান্তি-আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার আবির্ভাবের আভাসেই সে শ্রীচরণ-পদ্ম-গন্ধে প্রাণ মন মাতোয়ারা হইয়া পরাভক্তি রসে বিগলিত হয়, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে শুদ্ধা-প্রীতি-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া শ্রীশ্রীদয়ালগুরুর দিব্য আসন অপূর্ব্ব সাজে সজ্জীভূত হয়; তখন সেই হৃদয়োদ্যানের নিত্য নব নব পুষ্প চয়ন করিয়া তাঁহারই অবিরাম স্মৃতি সূত্রে বিচিত্র মাল্যগ্রন্থন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচরণে অর্পণ ও শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়া তাঁহার নিত্যভক্ত দিব্যরাজ্যে দিব্যসুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। জয় জয় গুরু নিত্যগোপাল! আদ্যন্ত মধ্যে প্রভু তোমারই অসীম কৃপা জয়যুক্ত হইতেছে!!

নির্ম্মলাবালা রায়।

ভ্রাতৃ-স্নেহ

গঙ্গা বক্ষে দুই ভাই গেছে অতি ভোরে ;
হঠাৎ ভীষণ জোয়ার আসিয়া সজোরে,—
দু'ভায়ে ভাসা'য়ে হায়, নিয়ে গেল দূরে :—
গঙ্গা বক্ষে দুই ভাই হাবু ডুবু করে।
সহসা নাবিক এক তরণী বাহিয়া—
নিকটে কনিষ্ঠ ছিল, তার কাছে গিয়া—
কহিল, "উঠগো তুমি তরণী উপরে
এনেছি আমরা তরী, তোমাদের তরে।"
তরী ঠেলে ফেলে দিয়ে কহিল নাবিকে,
"দাদা মোর আছে দূরে যাও সেই দিকে।"
নাবিক কহিল তারে "উঠ আগে তুমি,
অবশ্য এখনি তারে উঠাইব আমি।"
কনিষ্ঠ কাঁদিয়া কহে "ত্বরা করি যাও—
বিলম্বে দাদার প্রাণ পাও কিনা পাও।"
উপায় নাহিক হেরি নাবিক তখন,
দ্রুত বেগে জ্যেষ্ঠ পানে করিয়া গমন,
কহিল,—"এনেছি তরী উঠগো উপরে
ভয় নাই, মোরা সবে, লয়ে যা'ব তীরে।"
মিনতি করিয়া জ্যেষ্ঠ কহিল তা'দিকে,
"ঐ যে ডুবিছে ভাই, যাও ওই দিকে।
নিজ প্রাণ নাহি চাহি যদি বাঁচে ভাই,
ত্বরায় যাও গো সবে ভাই বুঝি নাই।"
কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের তরে তরী দিল ঠেলে ;
কাঁদিয়া কহিল জ্যেষ্ঠ, "ভা'য়ে লহ তুলে"
এই রূপে দুই ভাই যায় ডুবে জলে
ভ্রাতৃ-স্নেহ-পরাকাষ্ঠা দেখায়ে ভূতলে।
ভ্রাতৃ-স্নেহ হেরি সবে হইল বিস্মিত।
দয়াল নাবিক হ'ল প্রেমে বিগলিত॥
ত্বরা করি রক্ষা করি জ্যেষ্ঠের জীবন।
আসিলেন তরি সহ কনিষ্ঠ-সদন॥
হেরিয়া সোদরে সেই নাবিকের কোলে।
আনন্দে ভ্রাতার আঁখি পূর্ণ অশ্রু-জলে॥
অপূর্ব্ব বলেতে হ'ল দেহ বলবান।
তরীর মধ্যেতে উঠি হ'ল অধিষ্ঠান॥
দুই ভাই পড়ে সেই নাবিকের পায়।
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা ভূমে গড়ি যায়॥
জগতের দুঃখে যার কাঁদে মন প্রাণ।
সেই ত ভকত শ্রেষ্ঠ সেই ভাগ্যবান॥

শ্রীজগদিন্দ্র নারায়ণ হালদার।

বৈরাগ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

গত আশ্বিন মাসের শ্রীপত্রিকায় বৈরাগ্য প্রবন্ধের লেখক একস্থানে (২৩৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন। "প্রকৃত বৈরাগী * * * সদাশিব জ্ঞানানন্দ হইয়াছেন।" এই উক্তিতে কেহ যেন মনে না করেন "প্রকৃত বৈরাগ্যলাভ হইলেই জীব "সদাশিব জ্ঞানানন্দ" হইতে পারেন। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য শ্রীভগবান সদাশিব জ্ঞানানন্দের এই ছয়টী ঐশ্বর্য্য। সুতরাং জীব ঐ ছয় ঐশ্বর্য্যের একটি মাত্র অর্থাৎ বৈরাগ্য পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিতে পারিলেও (জীবের পক্ষে পূর্ণ মাত্রায় বৈরাগ্য লাভ সম্ভব কিনা তাহাও বিশেষ সন্দেহ) তিনি সদাশিব জ্ঞানানন্দের কেবল একটী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন মাত্র। সুতরাং উক্তরূপ সিদ্ধ

রাগী "জ্ঞানানন্দ দাস, জ্ঞানানন্দ পুত্র অতএব নানন্দ" হইতে পারেন লেখকের বোধ হয় হাই অভিপ্রায়। শ্রীবৈকুণ্ঠে ঠাকুরের লীলা-সহচর সকল দাসই চতুর্ভুজ কিন্তু তাঁহারা বিষ্ণু দাস, বিষ্ণু নহেন। "সিংহের সন্তানও সিংহ।" তবে ছোট সিংহ; শক্তিতে অনেক প্রভেদ

সম্পাদক

মা-হারা সন্তান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

কত সাজে তোমার খেলারপুতুল হ'য়ে নাচিলাম মা! আর আমাকে ল'য়ে কত খেলা খেল্‌বে? এ সংসার বিদেশে আর কত দিন প্রবাসে থাকিব মা?

মা! একদিন গুরুমুখে শুনিয়াছিল'ম তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই। তুমি একরূপে ক্ষুধা আর একরূপে ভোজ্য। এই দুইরূপের সমাবেশ ক'রে মা! তুমি আমার জীবন রক্ষা করছ। জীবন কি মা! সেও তো তুমি। আবার শ্রান্তির পর তুমিই আমার আরাম-দায়িনী নিদ্রা। মা! তুমিই আমার পিপাসা, তুমিই আমার পিপাসার জল। তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা। মা! তুমিই আমার ক্ষমা, তুমিই আমার ধৃতি; তুমিই আমার অনুরাগ, তুমিই আমার বিরাগ। মা! তুমি আমার বুদ্ধি, তুমিই আমার প্রাণ। মা তুমিই সন্ধ্যা, তুমিই দিবা, আবার তুমিই রাত্রি। মা! তুমি কখনও ত্রিগুণময়ী, কখনও ত্রিগুণাতীতা। মা গো! তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই আমার আনন্দ।

তোমার জিনিষ তুমি লও কেবল আমায় একবার দেখা দাও। তোমার রাঙ্গা চরণ দুখানি একবার দেখে লই। মা! আর সেই সঙ্গে একবার প্রাণভরে 'মা ব'লে ডেকে লই। তুমি বিশ্বম্ভরী, আবার তুমিই শাকম্ভরী। হে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি! একবার দেখা দাও মা! আমি তোমাকে আর কিছু বল্‌বো না; আর কিছু চাইব না। কেবল মা ব'লে ডাক্‌ব আর তোমার রাঙ্গা চরণ দু'খানি দে'খে আমার চির-দিনের আশা পূর্ণ কর্‌ব। মা অন্নপূর্ণে! তোমার এই কাঙ্গাল সন্তানের আশা কি পূর্ণ হ'বে?

গীত।

(পার কি পার কি চিনিতে-সুর)।

ভাবনা কি আছে তরিতে ভব তরিতে।
ত্বরিতে কররে নির্ভর গুরুপদ তরীতে॥
বিশ্বাস মাস্তুল কর, প্রেমের বাদাম ধর;
ক'রোনা বিলম্ব তাতে ভক্তি হাল বাঁধিতে॥
অনুরাগ সুব তাস, মিলিবে ছেড়' আশ;
গাহিবে নামের সারি ভজন সাধন দাঁড়ীতে॥
উঠিলে ঝড় তুফান, হ'ওনারে হতজ্ঞান;
গুরুপদে মন প্রাণ ভু'লনারে সঁপিতে॥
কবে হবে নির্দ্বন্দ্ব, দাস মাবানন্দ।
নিনা মাঝী জ্ঞানানন্দ পারেনা আর চলিতে॥

ভক্তকৃপাভিক্ষু—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু।
বেরিলি।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম

বা

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

মাসিক-পত্রিকা।

"একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন;—তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।"

[সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার,—৬৪।৩।]

১ম বর্ষ। } শ্রীশ্রীনিত্যাব্দ ৬০। সন ১৩২১, পৌষ। { ১২শ সংখ্যা।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের

উপদেশাবলী।

আত্মজ্ঞানী।

কোন ব্যক্তির মস্তকের কেশ ও গাত্রের লোম সকল ছেদন করিলে যেমন কোন ক্ষতি হয় না তদ্রূপ কেহ আত্মজ্ঞানী পুরুষের নিকট বহুকাল বাসান্তে স্থানান্তরিত হইলে তিনি কোন ক্ষতি বোধ করেন না।

অদ্বৈত তত্ত্ব।

(ক)

কোন কোন আর্য্যধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিজ নিজ ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীগণের অর্চ্চনা নিষিদ্ধ। তাঁহাদের পক্ষে স্বসাম্প্রদায়িক ব্যতীত অপরাপর

সাম্প্রদায়িকগণের সংসর্গ করাও নিষিদ্ধ। কারণ আর্য্যদিগের নানা শাস্ত্রোক্ত নানাপ্রকার ধর্ম্মমত বিদ্যমান আছে। তাঁহারা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ী-দিগের সংসর্গ করিলে মহা গোলযোগে পড়িতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগের পক্ষে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ীর সংসর্গ বিষয়ে নিষেধ আছে। আর্য্যদিগের সমস্ত শাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবণে আরম্ভকদিগের নানাত্ব প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একজন মহাপরিপক্ক ভক্ত সেই নানাত্বে অভেদত্ব দর্শন করিয়া বিমোহিত হন, আনন্দিত হন।

নারদপঞ্চরাত্রের তৃতীয় রাত্রোক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংকর্ষণশক্তি সরস্বতী, গদাধরশক্তি দুর্গা, খড়্গীশক্তি সতী, শঙ্খীশক্তি চণ্ডী, হলী-শক্তি বাণী, সত্যশক্তি বুদ্ধি, জনার্দ্দন শক্তি উমা উল্লিখিত হইয়াছেন। সরস্বতী এবং বাণী পরস্পর অভেদ। সরস্বতী একাধিকও নহেন, অথচ উক্ত গ্রন্থে সংকর্ষণশক্তি সরস্বতী এবং হলীশক্তি বাণী বলা হইয়াছে। গদাধরশক্তি দুর্গা এবং জনার্দ্দনশক্তি উমা বলা হইয়াছে। আমরা জানি গদাধর এবং জনার্দ্দন পরস্পর অভেদ। উভয়েই বিষ্ণুর দুই পৃথক্ নাম মাত্র। উমা এবং দুর্গা এক শক্তিরই নাম। উমা বা দুর্গা শিবের শক্তি। একাধিক উমা বা দুর্গাও হন নাই। সুতরাং উপরোক্ত নারদপঞ্চরাত্রের বর্ণনানুযায়িক গদাধর বা জনার্দ্দন এবং শিব পরস্পর অভেদ। কারণ প্রসিদ্ধ নানা শাস্ত্রানু-সারে উমা বা দুর্গা শিবশক্তি ব্যতীত অপর কাহারো শক্তি নহেন। তিনি দুর্গা বা উমা মূর্ত্তিতে গদাধর বা জনার্দ্দনশক্তি হইলে অনে-কের বিবেচনায় তাঁহাতে ব্যভিচার দোষ আরো-পিত হয়। সেইজন্য জনার্দ্দন, গদাধর এবং শিবের পরস্পর অভেদত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত।

(খ)

বাইবেলে একস্থানে বলা হইয়াছে "God is Spirit." ঐ গ্রন্থের অপর এক স্থলে বলা হইয়াছে "The Spirit of God moved on the waters?" Spirit অর্থে শক্তি। "God is Spirit" বলিলে, শক্তিমান্ ঈশ্বর বা God ও তাঁহার শক্তি বা Spirit পরস্পর অভেদ বুঝিতে হয়। "The Spirit of God moved on the waters?" বলিলে বুঝি শক্তি ও শক্তিমান এক নহে। উভয়ে পার্থক্য আছে বুঝিতে হয়।

অদ্বৈত তত্ত্ব বা ঐক্য।

ঐক্যই সুখশান্তির কারণ। অনৈক্য অসুখ ও অশান্তির কারণ। বেদান্তশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ঐক্যস্থাপনা দ্বারা অনৈক্য নিরাকরণ করা। জনকজননীর পঞ্চজন সন্তান থাকিলে, তাহারা সকলেই বিচার করিলে বুঝিতে হইবে পরস্পর অভিন্ন। গ্রন্থাবলী হইতেও দ্বৈতবাদের পরিপোষক শ্লোক সকল আমাদের নানা প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং পরেও সক্ষম হইতে পারি। ত্রিকালদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জানিতেন যে জগতে কোন সময়ে অদ্বৈতবাদের মধ্যেও দ্বৈতবাদ দেখাইতে হইবে, তিনি জানি-তেন যে বর্ত্তমানকালে দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ও প্রদর্শন করিতে হইবে। সেইজন্যই সেই পরম কারুণিক শঙ্কর ভগবান্ ঐ প্রকার সমন্বয় করি-বার উপযোগী শ্লোক সকলও কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত গ্রন্থ সকলে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আত্মা।

সত্য যাহা, তাহাই আত্মা। আত্মা অজড়। আত্মা চৈতন্য। আত্মা চৈতন্য এইজন্য আত্মার নকল হইতে পারে না। আত্মা আসল। এই-

জন্য আত্মার নকল হইতে পারে না। আত্মা সত্য। এইজন্য আত্মার নকল হইতে পারে না। আত্মা সত্য এইজন্য আত্মার ছবি হইতে পারে না। সত্য অদ্বিতীয়। সেইজন্য সত্যের অনুকৃতি নাই, সেইজন্য সত্যের প্রতিকৃতি নাই।

যাহা সত্য, তাহা এক, তাহা অদ্বিতীয়। তাহার মতন অন্য কোন পদার্থ সৃজিত হইতে পারে না। তাহার তুল্য অন্য কিছু নাই।

যাহা চিত্রিত করা হয়, তাহা আর চিত্র এক পদার্থ নহে। যাহা বর্ণনা করা হয়, তাহা আর তাহার বর্ণনা এক পদার্থ নহে।

যাহা চিত্রিত করা যায়, তাহা প্রকৃতি অথবা প্রাকৃত।

যাহা বর্ণনা করা যায়, তাহা জড়। যাহা বর্ণনা করা যায় তাহা প্রকৃতি অথবা প্রাকৃতিক। জড় প্রাকৃতিক। সেইজন্য জড় বর্ণনা করা যায়।

ব্রহ্ম।

অনেক শ্রুতিমতে ব্রহ্মকে আত্মা বলা হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্তদর্শন প্রভৃতি অদ্বৈতমতের গ্রন্থাবলী মতেও ব্রহ্মই আত্মা। ঐ সকল গ্রন্থমতে আমি-আত্মাই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় কি প্রকারে বলা যাইবে? আমি যে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহি তাহা কি আমি বুঝিতেছি না? আমি যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা কি আমি বুঝিতেছি না? তবে ব্রহ্মকে কি প্রকারেই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যাইবে? আমি যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা আমাকে কোন ব্যক্তি বুঝাইলে, তবে কি তাহা আমি বুঝিব? আমি যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা যে আমি নিজেই বুঝিতেছি। অতএব আমি আপনাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করিব? কোন অদ্বৈতমতপ্রতিপাদক গ্রন্থমধ্যস্থিত প্রমাণ দ্বারা আমাকে তুমি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিলেই বা আমি তাহা স্বীকার করিব কেন? কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থসকলের প্রমাণ দ্বারা তুমি আমাকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিলে আমি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইব না। কারণ জ্ঞান দ্বারা আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমি সগুণ-সক্রিয়। তুমি-আত্মাও কি আপনাকে সগুণ-সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছ না? শ্রুতিবেদান্তমতে তুমি-আত্মাও ব্রহ্ম, তিনি-আত্মাও ব্রহ্ম। তুমিও নিজেকে সগুণ-সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছ, তিনিও নিজেকে সগুণ-সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছেন। তবে ব্রহ্মকে তুমিই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিতেছ কি প্রকারে? তিনিই বা ব্রহ্মকে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলিবেন কি প্রকারে? আমার, তোমার এবং তাঁহার সগুণত্ব এবং সক্রিয়ত্ববশতঃ ব্রহ্মেরও সগুণত্ব এবং সক্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে হেতু নানা শ্রুতিমতানুসারে, বেদান্তদর্শনানুসারে এবং বিবিধ অদ্বৈতমতের গ্রন্থনিচয় মতে আমার, তোমার এবং তাঁহার ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব বা ঐক্য আছে। সেইজন্য আমার, তোমার এবং তাঁহার সগুণত্ব এবং সক্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মেরও সগুণত্ব এবং সক্রিয়ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

ব্রহ্মের সাকারত্ব।

বায়ু নিরাকার। অথচ বায়ু নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। শব্দ নিরাকার। অথচ শব্দ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। মন নিরাকার। অথচ মন নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। প্রত্যেক মনোবৃত্তিও নিরাকার। অথচ তাহাদিগের মধ্যে কোনটীই নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। প্রত্যেক মনোবৃত্তিই সগুণ-সক্রিয়। বুদ্ধিও নিরাকারা। অথচ তাহাও

সগুণা এবং ক্রিয়া সম্পন্না। জীবাত্মাও নিরাকার। অথচ তাহাও সগুণ-সক্রিয়। অন্যান্য অনেক প্রকার নিরাকারও বর্ত্তমান আছে সে সকলের মধ্যে কোনটীও নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নহে। সে সকলের মধ্যে প্রত্যেকটীও সগুণ-সক্রিয়। তবে ব্রহ্ম নিরাকারকেই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা হয় কেন? তবে আত্মা নিরাকারকেই বা নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা হয় কেন? শ্রুতিবেদান্তাদি মতে আমিই ত আত্মা, শ্রুতি-বেদান্তাদি মতে তুমিই ত আত্মা, শ্রুতি-বেদান্তাদি মতে তিনিই ত আত্মা। আমি-আত্মা যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা আমি বুঝিতেছি। তুমি-আত্মা যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা তুমিও বুঝিতেছ। তিনি-আত্মা যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা তিনিও বুঝিতেছেন। তবে আত্মাকে কি প্রকারে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায়? বেদান্তাদিমতে আমি-আত্মাই ব্রহ্ম, বেদান্তাদি মতে তুমি-আত্মাই ব্রহ্ম, বেদান্তাদি মতে তিনি-আত্মাই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মেরই বা নির্গুণত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব আছে ইহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? সেইজন্য ব্রহ্মকেই বা কি প্রকারে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় বলা যায়? আমি, তুমি এবং তিনি-আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদত্ব আছে বলিয়া ব্রহ্মকেও সগুণ-সক্রিয় বলিতে হয়। আমিও সাকার, তুমিও সাকার এবং তিনিও সাকার। আমিও সগুণ-সক্রিয়, তুমিও সগুণ-সক্রিয় এবং তিনিও সগুণ-সক্রিয়। পূর্ব্বদৃষ্টান্ত সকল দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যিনি সাকার, তিনিই সগুণ-সক্রিয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মও যে সগুণ-সক্রিয়, তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মেরও যে আমি, তুমি এবং তিনির সহিত অভেদত্ব আছে, তাহাও প্রমাণ করা হইয়াছে। অতএব সেইজন্য আমি, তুমি এবং তিনির ন্যায় ব্রহ্মও যে সাকার তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে?

বেদ ও বেদ্য।

সমস্ত শাস্ত্রের মূল বেদ। উত্তমরূপ সংস্কৃত ভাষা জানিলেই বেদে অধিকার হয় না। উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য সাহায্যে বেদাধ্যয়ন এবং বেদ সকলের সমস্ত শব্দের অর্থবোধ হইলেই প্রকৃত বেদজ্ঞান হয় না। দিব্যজ্ঞানী গুরুর সাহায্যে যখন প্রত্যেক বেদের মর্ম্মার্থ বোধ হয়, তখনই বেদে অধিকার হইয়া থাকে, তখনই প্রকৃত বেদজ্ঞান হইয়া থাকে। বেদজ্ঞান হইলে, তৎ-সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানও হইয়া থাকে। বেদই বেদ্য ব্রহ্মকে অবগত হইবার প্রধান অবলম্বন। ব্রহ্মই বেদ্য। বেদদ্বারা তাঁহাকেই জ্ঞাত হইতে হয়। ব্রহ্ম যেমন নিত্য তদ্রূপ বেদও নিত্য। বেদ যদি অনিত্য হইতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিত্যসত্য ব্রহ্মকে অবগত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যেমন অন্ধকার সাহায্যে আলোক দর্শন হয় না তদ্রূপ অনিত্য সাহায্যেও নিত্যকে অবগত হওয়া যায় না। নিত্যব্রহ্মকে অবগত হইতে হইলে অনিত্য অব্রহ্ম দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না। নানাশাস্ত্রানুসারে বেদও অনিত্য অব্রহ্ম নহে। নানা শাস্ত্রানুসারে বেদ অপৌরুষেয়। নানা শাস্ত্রানুসারে বেদকেই শব্দব্রহ্ম বলা হয়। সেইজন্য নিত্যবেদই নিত্যব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন? কোন মূঢ়ব্যক্তিরই বেদে অধিকার নাই। দ্বিজত্বের পরে বিপ্রত্ব লাভ না হইলে বেদে অধিকার হয় না। শাস্ত্রানুসারে বিপ্রত্বের পরে তবে যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। নিরালম্বোপনিষদের মতে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণত্ব যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন। সেইজন্য তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

ব্রহ্ম।

শ্রুতি এবং অদ্বৈতমত প্রতিপাদক অনেকগ্রন্থে নিত্যব্রহ্মকে পুরাণ বলা হইয়াছে। পুরাণ উপাধি বিশিষ্ট কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থও আছে। সেইসকল গ্রন্থ ঐ নিত্যব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিয়াই সেই সকলকে পুরাণ বলা হইয়াছে। সে সকলের প্রত্যেকখানিই সেই নিত্যব্রহ্মের এক এক প্রকার বিকাশ। প্রত্যেক পুরাণই অক্ষর-ব্রহ্ম বা শব্দ-ব্রহ্ম।

আত্মানুভূতি ও আত্মপ্রেম।

অনুভব দ্বারা নিরাকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে। নিরাকার দৃশ্য নহেন। সাকারও দৃশ্য নহেন। আকার দৃশ্য। আকার জড়। আকারে নিরাকার চৈতন্যের প্রভাব ব্যক্ত হইলে, আকার সচেতন হইয়া থাকে।

শ্রবণও অনুভব দ্বারা করা হইয়া থাকে। স্পর্শনও অনুভবাত্মক।

আপনাতে যখন ব্রহ্মানুভব হইতে থাকে, তখন যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দের নামই ব্রহ্মানন্দ। সে আনন্দের তুলনা নাই। সেই আনন্দজনিত যে শান্তি বোধ হইতে থাকে, তাহাও অনুপমা! ঐ প্রকার শান্তি সম্ভোগ কালে প্রাকৃত অহংকার ও মমতা থাকে না। তখন কাহাকেও আপনার বোধ হয় না। তখন কাহাকেও পর বোধ হয় না। তখন পরাপরের পরবর্ত্তী হইতে হয়। তখন আপনাকেও কাহারও আত্মীয় কিম্বা বন্ধু বা অন্য কোন সম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হয় না। তখন কেবল অদ্বৈততত্ত্বের স্ফুরণ হইতে থাকে।

মধু পাইবার জন্য মধুকর কতই ভ্রমণ করে। মধুকর মধু পাইলে আর তাহার ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় না। তখন সে মনোনিবিষ্ট করিয়া মধুপান করিতে থাকে। তখন মধু পানেই তাহার আগ্রহ এবং একাগ্রতা হইয়া থাকে। তখন তাহার অন্য কোন চিন্তাই থাকেনা। পরিব্রাজক আত্মপ্রেম নামক মধু পাইলে, আর তিনি ভ্রমণ করেন না। তখন তাঁহার আর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছাও হয় না। তখন তিনি আত্ম-প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া সুস্থির হন। তখন তাঁহার আত্মপ্রেমরূপ মধুসম্ভোগেই আগ্রহ এবং একাগ্রতা থাকে। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন। সে অবস্থায় তাঁহাকে আত্মারাম অবধূত বলা যাইতে পারে।

অবধূত।

যাঁহার অন্তঃকরণ প্রাকৃত জল দ্বারা ধৌত হয় নাই তিনিই অবধূত। যিনি আত্মজ্ঞান নামক অপ্রাকৃত জলদ্বারা ধৌত হইয়াছেন তিনিই অবধূত। অবধূত কেবলাত্মা। তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে যোগ নাই। সেই জন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক বিকারও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি প্রাকৃত ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সেইজন্য তিনি প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ। সেইজন্য জীবের আবরণে অবস্থান করিলেও তিনি অজীব। তিনি দেহে অবস্থিত হইলেও তিনি বিদেহী। যেহেতু দেহ সত্বেও আত্মজ্ঞানবশতঃ তাঁহার বিদেহকৈবল্য লাভ হইয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের যোগ হইলে তাহাকে জীব হইতে হয়। যখন পুরুষের প্রকৃতির সহিত কোন সংস্রব থাকেনা তখনই পুরুষকে পুরুষোত্তম বলা যায়। তখনই তাঁহাকে কেবল বলা যায়। যিনি কেবল তিনিই অবধূত। অবধূত সন্ন্যাসী। আত্মজ্ঞানই সন্ন্যাসীর আশ্রম এবং বিশ্রাম স্থান।

যিনি নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়ই নিশ্চিন্ত এবং শান্ত। গুণকর্ম্মের নিরোধ হইলে আর চিন্তা এবং অশান্তি থাকে না।

পরমহংস।

কোন জড়ই কোন প্রকার কর্ম্ম করেনা। সেইজন্য প্রত্যেক জড়ই নিষ্ক্রিয়। চৈতন্য এবং চেতনদ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক চেতনের কর্ম্ম করিবার কারণও চৈতন্য। চৈতন্য-বলেই জীব নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। কোন জীবই কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। কর্ম্মশূন্য জীব নাই, কর্ম্মশূন্য জন্তু নাই। দেহ-বিশিষ্ট দণ্ডী পরমহংসগণও নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারাও অকর্ম্মী নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই নিষ্ক্রিয় নহেন। তবে প্রকৃত পরমহংসত্ব লাভ হইলে কোন প্রকার কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগকেও কর্ম্ম করিতে হয়। অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেও অসমর্থ এবং অসক্রিয় বলা যায় না। তাঁহাদিগের অদ্বৈতজ্ঞান প্রভাবে নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্বকর্ম্ম করিবারই ক্ষমতা হইয়া থাকে। সেইজন্যই কোন কর্ম্ম তাঁহা-দিগের বাধক হইতে পারে না। সেইজন্য তাঁহারা কর্ম্মী হইয়াও অকর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অযাচক ও অযাচিত বৃত্তি।

যাঁহার ভোগবিলাসে প্রবৃত্তি নাই, তিনিই অযাচিত বৃত্তি অবলম্বনে সমর্থ। ভোগবিলাসে প্রবৃত্তি থাকিতে প্রকৃত অযাচিত বৃত্তি অবলম্বিত হইতে পারে না।

আহার করিবার প্রয়োজন থাকিতে, কোন পানীয় পান করিবার প্রয়োজন থাকিতে অযাচিত বৃত্তি হইতে পারে না।

যিনি অযাচিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কেহ তাঁহাকে কিছু দিলে, তিনি তাহা সঞ্চয় করেন না।

যাঁহার কোন বস্তুতে প্রয়োজন নাই তিনিই যাজ্ঞা করেন না। যাঁহার প্রয়োজনাভাব কেহ তাঁহাকে কিছু দিলে, তিনি তাহা সঞ্চয়ও করেন না। তাঁহার সঞ্চয় করিতে ইচ্ছাই হয় না।

দিব্যজ্ঞানের আবশ্যকতা।

সন্দেহ ভঞ্জন জন্য দিব্যজ্ঞানই অবলম্বন। দিব্যজ্ঞান দ্বারা সন্দেহভঞ্জন হইয়া থাকে। দিব্য-জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিরাকৃত হইয়া থাকে। দিব্য-জ্ঞান দ্বারা মোহ অপসারিত হইয়া থাকে। পূর্ণ দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষের কোন সন্দেহ নাই। যিনি সন্দেহের সহিত দিব্যজ্ঞানের সম্পর্ক আছে স্বীকার করেন, দিব্যজ্ঞান যে কি বস্তু তদ্বিষয়ে তাঁহার ধারণা হয় নাই। সন্দেহের সহিত অজ্ঞানের সম্বন্ধ। কোন মহাত্মার মতে সন্দেহও অজ্ঞানের অংশ, সন্দেহও অজ্ঞান হইতে বিকা-শিত। সন্দেহ দূর করিবার জন্য দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মোহ দূর করিবার জন্য দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মোহ যে অজ্ঞানের অন্তর্গত। আপনাতে দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ না হইলে, মোহের তিরোধান হয় না।

দীক্ষা।

যাঁহার গুরুলাভ হইয়াছে, সেই গুরুকৃপায় তাঁহারই দীক্ষালাভ হইয়াছে। যিনি গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যদ্যপি কেহ বলেন, দীক্ষা গ্রহণের পরেও পুনর্দীক্ষা গৃহিত হইতে পারে তাহা হইলে আমরা তাঁহার সে কথা স্বীকার করি না। আমরা জানি একবার দীক্ষা গ্রহণ হইলে, পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞান লাভ হইলে পুনর্ব্বার তাহা লাভের প্রয়োজন

হইবে কেন? দীক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। দীক্ষা জ্ঞানদায়িনী শক্তি। অতএব দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হইলে, পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হইবে কেন? আমাদিগের বিবেচনায় ঐ প্রকার প্রয়োজন হইতেই পারে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে যেমন ভোজনের প্রয়োজন হয় না তদ্রূপ দীক্ষা দ্বারা একবার জ্ঞানলাভ হইলে পুনর্ব্বার সেই দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার জলের প্রয়োজন কি? দীক্ষা প্রসূত জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার দীক্ষার প্রয়োজন কি? দীক্ষা দ্বারা একবার জ্ঞানলাভ হইলে, পুনর্ব্বার সে জ্ঞানের অভাব হয় না! সেইজন্য দীক্ষা দ্বারা পুনর্ব্বার জ্ঞানলাভের প্রয়োজনও হয় না। সেইজন্য পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণের প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। দিব্যজ্ঞানই পরমজ্ঞান। তাহা একবার লাভ হইলে পুনর্ব্বার নষ্ট হয় না। যেহেতু তাহাতে নিত্যত্ব বিদ্যমান আছে। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে, সমস্ত সংশয় নিরাকৃত হইয়া থাকে। সংশয় নিরাকৃত হইলে অবিশ্বাসের অস্তিত্বও লুপ্ত হইয়া থাকে। অজ্ঞানের সংশয় এবং অবিশ্বাসের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহার দিব্যজ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত সংশয় এবং অবিশ্বাসের কোন সংস্রব নাই! যাঁহার অজ্ঞান নাই, তাঁহার নিরানন্দও নাই। অজ্ঞানের সহিত নিরানন্দ এবং অশান্তির বিশেষ সংস্রব। দিব্যজ্ঞানের সহিত নিরানন্দ এবং অশান্তির সংস্রব নাই। তাহা দ্বারা পুরুষ নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

সম্বন্ধ।

প্রধানতঃ সম্বন্ধ দ্বিপ্রকার। এক প্রেমাত্মক সম্ব „ এবং অপর অপ্রেমাত্মক সম্বন্ধ। দ্বিপ্রকার জড়ের যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাই অপ্রেমাত্মক সম্বন্ধ। দুই অজড় সাকারের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাই প্রেমাত্মক সম্বন্ধ। প্রেমাত্মক সম্বন্ধ আবার বহু প্রকার। প্রত্যেক প্রেমাত্মক সম্বন্ধই ভাব দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাবাবলম্বন ব্যতীত কোন প্রকার প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে না। এক প্রকার ভাব দ্বারা সকল প্রকার প্রেমাত্মক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক প্রেমাত্মক সম্বন্ধের ভাবই বিভিন্ন। বাৎসল্য ভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। অনেকের মতে সেই সম্বন্ধকে স্নেহ-ভাবাত্মক সম্বন্ধ বলা যায়। সখ্যভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। দাস্যভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। মধুরভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। ভ্রাতৃভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। স্বসৃভাব-দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। মাতৃভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। পিতৃভাব দ্বারাও প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে। অন্যান্য প্রেমাত্মক ভাব সকল দ্বারাও নানা প্রকার প্রেমাত্মক সম্বন্ধ সকল হইতে পারে। সেইজন্য ভাব এবং সম্বন্ধের একপ্রকারতা স্বীকার করা যায় না। শ্রীভগবানের সহিত নানাভাব দ্বারা নানা প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে।

প্রেম।

(১)

মনুষ্যের মধ্যে যে প্রেম আছে, তাহারই শ্রীভগবানের প্রতি উদ্রেক হইলে, সেই প্রেমকেই দিব্যপ্রেম, পবিত্র প্রেম এবং শুদ্ধপ্রেম বলা যাইতে পারে।

প্রেম একই সত্য। কিন্তু একই প্রেমাত্মক নানা ভাবানুসারে সেই একই প্রেমের

নানাপ্রকার বিকাশ। সকল প্রকার প্রেমাত্মক ভাবই শ্রীভগবানের প্রতি হওয়া উচিত। যাঁহার শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিতে কোন প্রেমাত্মক ভাব আছে, তাঁহার প্রেমই অশুদ্ধ প্রেম, তাঁহার প্রেমই ব্যভিচার দোষে দূষিত।

(২)

যাঁহার কেবলমাত্র নিজ প্রেমাস্পদের সুখে সুখবোধ হয়, তাঁহার প্রেমও স্বার্থবিরহিত নিষ্কাম প্রেম নহে। নিজ প্রেমাস্পদের সুখে যাঁহার সুখবোধ হয় তাঁহার সেই সুখবোধই পরমলাভ। তাঁহার নিজ প্রেমাস্পদের সুখে ত সন্তোষ ও তৃপ্তি হয়? সুতরাং প্রেমাস্পদের সুখে নিজসুখ হইবে ইহাই তাঁহার কামনা। সুতরাং তাঁহার প্রেমকেও নিষ্কাম প্রেম বলা যায় না। যাঁহার নিজ প্রেমাস্পদের দুঃখে দুঃখ বোধ আছে, তাঁহার নিজ প্রেমাস্পদের সুখে সুখবোধও আছে।

(৩)

প্রত্যেক সম্বন্ধই প্রেমাত্মক। প্রেমের সহিত নানা প্রকার ভাব সকলের সম্বন্ধ আছে। যাঁহাদিগের ভগবানের সহিত বৃন্দাবনীয় পঞ্চভাবাত্মক সম্বন্ধ আছে তাঁহারাই ধন্য। ঐ বৃন্দাবনের পঞ্চভাবের আভাস ভাবসকল দ্বারা মনুষ্য সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চভাব ব্যতীত একের সহিত অন্যের কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না। ঐ পঞ্চভাব ব্যতীত একের সহিত অন্যের প্রেম হইতে পারে না।

(৪)

মন রজ্জু। আত্মা ঘড়া বা কলসী। বিবেক কর্ত্তরী। ঐ তিন দ্রব্য আশ্রয়ে সচ্চিদানন্দ নামক খর্জ্জুরবৃক্ষ হইতে প্রেমরস আহরণ করিতে হয়।

(৫)

শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি প্রদত্ত হউক। ভক্তগণের প্রতি কেবলমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি দেয়। কারণ শ্রীভগবান ব্যতীত সকল প্রেমাস্পদই বন্ধন। নানাভক্তে প্রেম হইলেও অনেকগুলি বন্ধন হয়। ঐ প্রকার হইলে নিজের স্বাধীনতা থাকেনা, যথা ইচ্ছা তথা গমন এবং বাস করার পক্ষে বিঘ্নজনক হয়। কেবলমাত্র শ্রীভবানের প্রতি পূর্ণপ্রেম থাকিলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। কারণ তিনি সর্ব্বত্রেই আছেন এবং প্রকৃত প্রেম তাঁহার প্রতি থাকিলে তিনি সর্ব্বত্রেই প্রাপ্য হইতে পারেন।

(৬)

বিরহ বশতও ব্যাকুলতা হয়, ভয় বশতও ব্যাকুলতা হয়। ভয়ের ব্যাকুলতা বিরহের ব্যাকুলতার মতন নহে। বিরহের ব্যাকুলতার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ভয়ের ব্যাকুলতার সহিত সে সম্বন্ধ নাই।

প্রেমবশত বিরহ বোধ হইয়া থাকে। প্রেম না থাকিলে বিরহ বোধ হইতে পারে না।

প্রেমাস্পদের জন্য বিরহবশতঃ ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। প্রেমাস্পদ সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলে বিরহ বোধ হয় না এবং প্রেমাস্পদের জন্য বিরহজনিত ব্যাকুলতাও হয় না।

মহাভাব।

শিশুর মনোভাব অস্ফুট ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। মহাভাবের কোন এক অবস্থায় মহাপুরুষ মহাভাবুকের অলৌকিক মনোভাব সকল কোন লৌকিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং সেই সকলও অস্ফুট ভাষায় প্রকাশিত হয়। অথচ সে সকলের অস্ফুটতা প্রযুক্ত জনসাধারণের বোধগম্য হয় না। অস্ফুট ভাষায় শিশু নিজ মনোভাব সকল প্রকাশিত করিয়া যেমন পরমানন্দিত হয় তদ্রূপ মহাভাবাবস্থায় মহাভাবুকও হন।

শিশুর নিজ মনোভাব শিশু সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না বলিয়া তাহার মনে নিরানন্দ হয় না এবং সে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক রূপে নিজ মনোভাব সকল ব্যক্ত করিতে পারে না তাহার তাহাও বোধ থাকে না এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যও থাকে না। প্রকৃত মহাভাবুকের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রকার হয়।

বাৎসল্য ভাব।

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা। সমস্ত নরক হইতে তিনিই ত্রাণ করিতে পারেন, এবং ত্রাণ করিবার যোগ্য ব্যক্তিদিগকে তিনিই সমস্ত নরক হইতে ত্রাণ করেন। পুন্নামক নরক হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণই ত্রাণ করেন। সেই জন্য পুত্র অর্থে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা যায়। পরম স্নেহময়ী যশোদা কৃষ্ণকেই পুত্র বলিতেন এবং তাঁহার কৃষ্ণকেই পুত্র বলিয়া বোধ ছিল। সেইজন্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহময় সুমধুর বাৎসল্য ভাবও ছিল। অবতীর্ণ কৃষ্ণকে তিনি পুত্র কৃষ্ণ বলিয়া অবধারণা করিতেন।

হরে কৃষ্ণ বলিলে হরের শক্তি দুর্গারও নাম করা হয়। কারণ হর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হরা। সেই হরা শব্দের সম্বোধনে হরে। গৌতমীয় তন্ত্রের মতে দুর্গা-কৃষ্ণ অভেদ। সেইজন্য হরেকৃষ্ণ বলিলে হরের শক্তি দুর্গানামও করা হয়। সেই-জন্য অন্তিমকালে শাক্ত বৈষ্ণব উভয়েই হরেকৃষ্ণ বলিতে পারেন। সেইজন্য হরেকৃষ্ণ শাক্ত বৈষ্ণব উভয়েরই সদ্গতির কারণ।

সেই ব্যক্তির হস্তে পবিত্র বস্তু প্রদান করিতে হয়, যে ব্যক্তি তাহার পবিত্রতা বুঝে। যে সেই পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র না করিবে তাহার হস্তেই সেই পবিত্রবস্তু দিতে হয়। পবিত্রস্থান সম্বন্ধেও ঐ কথা। পবিত্র স্থানে গমন করিয়া যে ব্যক্তি সেই স্থানের মর্য্যাদা রক্ষা না করে, তাহাকে সেই পবিত্র স্থানে লইয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য। পৃথিবী-মধ্যে প্রত্যেক তীর্থই অতি পবিত্র।

পাপক্ষয়ের উপায় ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার সহিত হরিনাম জপ, হরির নিকট প্রার্থনা হরিসংকীর্ত্তন করিলে আশু পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

অনেক পাপ করার জন্য অনুতাপ হইলে, সেই অনুতাপ বশতঃ মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা স্থায়ী হইলে মুক্তির উপায় অবধারিত হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে পরমেশ্বরকে দর্শন করা যায়। ১।

পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে বারম্বার ডাকার নামই জপ। ২।

পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে পরমানন্দ এবং পরমা শান্তি লাভ হইয়া থাকে। ৩।

ঐ শবের কর্ণ আছে। কিন্তু শব কর্ণ থাকিতেও শ্রবণ করে না। ঐ শবের চক্ষু আছে। কিন্তু শব চক্ষু থাকিতেও দর্শন করেনা। ঐ শবের জিহ্বা আছে; কিন্তু ঐ শব জিহ্বা থাকিতেও কথা কহিতে পারে না। তাই বলি কেবল কর্ণ থাকিলেই শ্রবণ করা যায় না। তাই বলি কেবল চক্ষু থাকিলেই দর্শন করা যায় না। তাই বলি কেবল জিহ্বা থাকিলেই কথা কহা যায় না। জীবনীশক্তির সহিত ঐ সমস্তের সম্বন্ধ থাকিলেই ঐ সমস্ত কার্য্য করে। তোমার কর্ণ

আছে তবে তুমি ঈশ্বরের কথা শোন না কেন? ঈশ্বরের কথা শ্রবণ সম্বন্ধে তোমার কর্ণ যে শবের কর্ণের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই তুমি ঈশ্বরের কথা শোন না। তোমার ত চক্ষু আছে তবে ঈশ্বর-দর্শন করনা কেন? ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে তোমার চক্ষু যে শবের চক্ষু। তাই তুমি ঈশ্বর দর্শন কর না। তোমার অজ্ঞান বশত তোমার জিহ্বা শবের জিহ্বার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই তুমি ঈশ্বর কি প্রকার বলিতে অক্ষম। সেইজন্যই তুমি তাঁহার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি শব। ঈশ্বর স্বয়ং অশব।

সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা-শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহনাং ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

আয় সবে ভাই, আনন্দে মাতিয়া,
হেরিগে শ্রীগুরুপদ।
ভবারাধ্যধন, ও পদ্মকমল,
হৃদয়-আনন্দ-প্রদ॥
সোণার বরণ, চরণ-দুখানি,
মরি মরি কিবা শোভা!
কত শশী আসি, নখরে উদয়,
মুনিজন-মনলোভা॥
চরণ-আলোকে, আলোকিত সব,
নাহি কোথা অন্ধকার।
জগত হাসিছে সে প্রেম-আলোকে,
আহা কত শোভা তার॥
কত যোগী-ঋষি, ও চরণ লাগি,
নিয়ত নয়ন মুদি।
আছে ধ্যানে বসি, দিবস-রজনী,
আশাতে হৃদয় বাঁধি॥
বারেক হেরিলে, ও রাঙ্গাচরণ,
শোক,তাপ দূরে যায়।
ভাব, মহাভাব, প্রেম ভক্তি আদি,
সকলি প্রকাশ পায়॥
পুলকে পূরিত, হয় দেহ-প্রাণ,
প্রেমাশ্রু নয়নে বহে।
"জ্ঞানানন্দ"-ময়, হেরে সে সকলি,
প্রেমানন্দে সদা রহে॥
ও পদ্ম-কমল মধুপানতরে,
কত শত ভক্ত অলি।
তৃষিত হইয়ে, ধাইতেছে সদা,
পড়িছে প্রেমেতে ঢলি॥
নিত্য-পদ-মধু, পান করে যেই,
জনম সফল তার।
লভি নিত্য-ধন, থাকে সে মাতিয়া,
চাহেনা কিছু সে আর॥
এ ভবের মাঝে, গুরুপদ বিনে,
কি ধন আছয়ে বল।
যে ধন লভিলে, মিটে সব আশা,
তুচ্ছ হয় মোক্ষ-ফল॥
শ্রীগুরুচরণ, শান্তি-নিকেতন,
চির-শান্তি তা'তে আছে।
দেখেছে যে জন, ধন্য সেই জন,
ধন্য ধন্য ভব-মাঝে॥
শ্রীগুরুচরণে, সর্ব্বতীর্থ আছে,
জানিহ ভকতগণ

সর্ব্ব-দেব-দেবী, আছে ও চরণে,
নহেত সামান্য ধন ॥
বারেক হেরেছে, সে চরণ যেবা,
দূরে গেছে সব জ্বালা ।
জনম-মরণ, ঘুচে গেছে তার,
নিত্যানন্দে করে খেলা ॥
হেন গুরুপদ, ভুলিও না কভু,
রাখ সদা হিয়া মাঝে ।
অতি সযতনে, হৃদয়-আসনে,
সাজাও সুন্দর সাজে ॥
আয় সবে মিলি, সুগন্ধ কুসুমে,
সাজায়ে শ্রীগুরুপদ ।
প্রাণ ভ'রে হেরি, ওরূপ-মাধুরী,
প্রেমে হ'ব গদ গদ ॥
নানাবিধ ফুল, চন্দনে মাখিয়ে,
দিব হে রাতুল পায় ।
হবে দিব্য শোভা, সে চারু-চরণে,
হেরিব সকলে তায় ॥
দেহ, মন, প্রাণ, কুল, শীল, মান,
সঁপে দিয়া শ্রীচরণে ।
'নিত্যদাস' হ'য়ে, রব চিরকাল,
শ্রীনিত্য-ভকত-সনে ॥

ব্রহ্মা আদি দেবে, যে চরণ তরে,
করে সদা অভিলাষ ।
আমি হীন-মতি, সে চরণ-গুণ,
প্রকাশিতে করি আশ ॥
বামনের আশা, চাঁদ ধরিবারে,
পঙ্গুর লঙ্ঘিতে গিরি ।
তেমতি আমার, এ সব বাসনা,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ॥
তবে যদি পাই, ভক্ত-পদধূলি,
ভক্ত-জন-আশীর্ব্বাদ ।
কি না হ'তে পারে, তাঁদের কৃপায়,
নিশ্চয় মিটিবে সাধ ॥
নিত্য ভক্ত-পদ, আমার সম্বল,
সাধন-ভজন-সার ।
স্মরিয়া সে পদ, করিনু কীর্ত্তন,
গুরু-পদ ভবসার ॥
নাহিক শকতি, নাহিক ভকতি,
কিছু নাহি মুই জানি ।
যা কিছু লিখিনু, তাঁহার কৃপায়,
নমি নমি অন্তর্য্যামী ॥

ভক্ত-পদাকাঙ্ক্ষী—নিত্যদাস ।

"জয় গুরু ।"

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ।]

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের সন্নিকটে রামচন্দ্র সাহার ভাড়াটে বাড়ীতে ঠাকুর যখন থাকেন তখনকার মূর্ত্তি অপূর্ব্ব-দর্শন ; একখানি রাঙ্গাপেড়ে বস্ত্র অর্দ্ধখানি পরিধান করিয়াছেন ও অর্দ্ধখানি গলায় জড়াইয়া বক্ষস্থল ঢাকা ; এই ভাবে বস্ত্র পরার ভঙ্গী ; ভুবনমোহন রূপ ; দুধে আলতায় মিশাইলে যেরূপ রং হয় সেই রকম রং ; হস্ত-পদতল রক্তবর্ণ ; লাবণ্য ফাটিয়া পড়িতেছে ; অহর্নিশি প্রেমে গর-গর ; মাতোয়াল ; প্রেমে সর্ব্বদাই চক্ষু রক্তবর্ণ ও নয়ন-ধারা

অবিশ্রান্ত প্রবাহিত। আবার দেখি—বিনয়ের খনি; হাঁসি-মুখে সুধামাখা কথা; সে কথাতে মন, প্রাণ, আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সেই মন-প্রাণ-সুশীতল-করা আমাদের ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপালের কাছে ভক্তগণ একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব দিন চাঁদ কাজীর সমাধি-দর্শনের প্রস্তাব ছিল; কালী বাবু (কালী মাষ্টার Steamer Station Master) আসিয়াই ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন; ঠাকুর বলিলেন—"এই যে মাষ্টার মহাশয় এসেছেন"। তারপর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"নৌকা প্রস্তুত"; অমনি ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দও গাত্রোত্থান করিলেন; ঠাকুরের সঙ্গে চাঁদ-কাজী দর্শনোপলক্ষে নবদ্বীপ-ভ্রমণ! ভক্তগণের মনে আর আনন্দ ধরে না; ঠাকুর গঙ্গাতীরে যাইতে লাগিলেন; সঙ্গে ডাক্তার দেবেন বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, কালী বাবু, (কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়), কালী মাষ্টার, বিধু, দৈবচরণ, সতীশ বাবু, নগেন দাদা ও আমি। মেয়েদের মধ্যে নিত্যকলী ঠাকুরাণী ও বড় পিসি মা প্রভৃতি। সকলেই গঙ্গাতীরে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম; মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল; নৌকার মধ্যে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকা মায়াপুরের দিকে চলিয়াছে; কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ-অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইতে লাগিল। ভক্তগণ সকলেই হরিনামে মত্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে কালীদাস প্রভৃতি জন কএক ভক্ত প্রেমে গর গর; মাতোয়াল; ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাঁসিতেছেন, কেহ অশ্রু-পুলকাঙ্কিত-দেহ; কে কাহাকে ধরে! নৌকা টল্‌মল্ করিতে লাগিল; নৌকা-মধ্যে ২।১ ঝলক্ জলও উঠিল মাঝি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর মহাশয় গো আপনারা স্থির হয়ে বসুন, স্থির হয়ে চলুন।" কিন্তু কে কাহার কথা শুনে! সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। আমার কিন্তু সেই সময়ে একটি কথা মনে হইতেছিল; সেটি এই—"মহাপ্রভুর নৌকাযোগে ছত্রভোগ হইতে দক্ষিণ দেশে যাওয়া সম্বন্ধে যেরূপ চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণনা আছে সেই ভাবটি পুনঃপুনঃ বর্ত্তমান সময়ে উদ্দীপন হওয়ায় বড়ই আনন্দলাভ করিতেছিলাম। যাহা হউক এইরূপ আনন্দ করিতে করিতে নৌকা যাইয়া মায়াপুরের ঘাটে পঁহুছিল। তৎপরে নৌকা হইতে সকলেই তীরে নামিলাম। এবং সকলেই চাঁদকাজীর সমাধি দর্শনে চলিলাম! প্রথমে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করা হইল; সেখানে ঠাকুর বেশিক্ষণ থাকিলেন না; দর্শনান্তে সকলেই চাঁদ কাজির সমাধি-দর্শনে চলিতে লাগিলাম। ভক্তগণপরিবেষ্টিত শ্রীনিত্যগোপাল ধীরে ধীরে আনন্দ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে একটা খুব মোটা গাব গাছ আছে; তৎসন্নিকটে ২।১টা তমাল বৃক্ষও আছে; সেই স্থানটি বল্লাল দীঘির উত্তর দিকে; তৎপূর্ব্ব-দিকে চাঁদকাজীর আম-বাগান; পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর সাবেক খাদ; এই স্থানে আসিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন; বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল; অঙ্গের জ্যোতি ও লাবণ্য শতগুণে বৃদ্ধি হইল; আরও দেখিলাম—"ঠাকুরের দেহ অষ্ট-সাত্ত্বিকে ব্যাপ্ত; অশ্রুধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; সর্ব্বশরীরে পুলক; সর্ব্বাঙ্গ হিমাঙ্গ হইয়াছে; নয়নের দৃষ্টি স্থির-মৃতদেহের ন্যায়; জন কএক ভক্ত হাত ধরাধরি করিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; পাছে ঠাকুর পড়িয়া যান; আমি ঠাকুরের নাড়ী দেখিলাম; নাড়ী নাই; ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া এমনই কেমন একটা জ্ঞান সকলেরই হইয়াছিল—ঠাকুরের সমাধি দেখিলে বুঝিতে

পারিতাম ঠাকুর কি ভাবে সমাধিস্থ; দেখিলাম ঠাকুরের দেহ যেন জ্যোতি-জমাট-মূর্ত্তি আর সেই জ্যোতি-মধ্যে গৌরাঙ্গ যেন ঝলক দিতেছেন; তখন ঠাকুরের মুখপানে তাকাইয়াই অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; মনে হইল এই তো গৌর; আনন্দে কাঁদিয়া সেই স্থানে ঢলিয়া পড়িলাম; কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেল; ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন; দেখিলাম ঠাকুরের অত্যন্ত আনন্দ হইয়া বালকের ভাব হইল; বালক যেমন নূতন স্থানে যাইতে কখন ধীরে ধীরে চলে, কখন ছুটে ছুটে চলে, সেই রকম ঠাকুর ছুটোছুটি করিতে লাগিলেন; আর হাঁসি; একটু ছুটিয়া যান আর হাঁসি; এইরূপ আনন্দ করিতে করিতে ও হাঁসিতে হাঁসিতে ঠাকুর ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া চাঁদ কাজীর সমাধি-স্থলে আসিয়া পঁহুছিলেন। চাঁদ কাজীর সমাধির উপর খুব মোটা খুব বড় একটা কাষ্ঠ-মল্লিকা পুষ্পের বৃক্ষ।প্রায় দুই কাঠা জমি ব্যাপিয়া আছে! ঠাকুর চাঁদ কাজীর সমাজের উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ আবিষ্ট হইলেন; মেয়েদের মধ্যে জনৈক মহিলা উত্তর পূর্ব্ব ধারে কাষ্ঠমল্লিকা বৃক্ষের একটা মোটা ডালে হস্ত দিয়া আবিষ্ট হইলেন; চক্ষে ধারাও বহিতে লাগিল; যেমন অনেক দিনের পরে সন্তানকে পাইয়া আনন্দে মায়ের নয়নে জল আইসে ও সন্তানের অঙ্গে হস্ত-মার্জ্জনা করেন তাঁহার অবস্থা সেইরূপ উপলব্ধি করিলাম আর আর ভক্তেরা হাততালি দিয়া হরিবোল হরিবোল করিতে করিতে সমাধি পরিক্রম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে হঠাৎ দেখি ঠাকুর হস্ত উত্তোলন করিয়া অভয় মুদ্রা দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়াছেন ও বাম হস্তে বরমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন বামহস্ত খানি বক্ষস্থলের নিকট অর্দ্ধ-প্রসারিত হত; নয়নে ধারা বহিতেছে; অঙ্গ খুব জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে; অস্ফুট স্বরে কি কহিতেছেন বুঝা গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ বৃক্ষ হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া অজস্র পুষ্প পড়িতে লাগিল; বৃক্ষ হইতে এত পুষ্প পড়িল যে সে গুলি সংগ্রহ করিলে ১০।১২ ঝুড়ির কম নহে। আমার মনে হইল চাঁদ কাজী অনেক দিনের পরে ভক্ত-সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে পাইয়া পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। এই ভাবটি মনে হইল অমনি বড়-পিসীমা বলিয়া উঠিলেন "দেখ দেখ চাঁদ কাজী কেমন পুষ্পদ্বারা ঠাকুরকে অর্চ্চনা করিলেন। সে ফুল পড়ার ভঙ্গী এক চমৎকার! সকলের মনেই চমৎকার ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল; সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন; কেহ বা কাঁদিতে লাগিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ দৈব-যোগানুযোগে এক দল কীর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। আর সব যায় কোথা! বাপরে বাপ্! সে যে কি আনন্দ-ব্যাপার আমার লেখনী সে ভাব বর্ণনে অক্ষম। যে দিকে চাই সেই দিকেই লোকে লোকারণ্য; হিন্দু-মুসলমানে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যস্থলে ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ালা; করি-শাবক-শুণ্ডের-ন্যায় স্বর্ণ-বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া কখন উদ্দণ্ড নৃত্য; কখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য; ঠাকুর কখন নৃত্য করিতে করিতে কাহাকেও স্পর্শ করিতেছেন, সে অমনি কাঁদিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; ক্ষণকালের মধ্যে সেই স্থানটি যেন আনন্দময় হইয়া গেল; হিন্দু, মুসলমান সকলেই দ্রবীভূত হইয়া গেলেন; সেই দিন হরিনামে মুসলমানের চক্ষেও জল দেখিয়াছিলাম। পরে হরিলুটের ছড়াছড়ি করাইয়া ঠাকুর স্থির হইলেন; কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল; পরে সকলেই ঠাকুরের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল; চাঁদ কাজীর বংশাবলির মধ্যে একজন—তাঁহার নাম জানি না

—তিনি আসিয়া ঠাকুরকে "সেলাম" করিয়া বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; ঠাকুর তাঁহাকে কোল দিয়া কৃতার্থ করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ

কেশবানন্দ অবধূত।

শ্রীগুরু-স্তোত্র

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রভো! দেখা'য়েছ এ (ই) অন্ধ নয়নে
তোমার বিভূতি এ তিন ভুবনে,
দেখেছি তোমায় চন্দ্রমা তপনে,
তুমি হে সর্ব্ব, সর্ব্ব-মূলাধার।

সর্ব্ব ঘটে তুমি, তুমি হে সকল,
অন্তরে বাহিরে তুমিই কেবল,
সর্ব্ব জয়ী তব চরণ-কমল,
তুমিই বিশ্বের আধেয় আধার॥

তোমাতেই এই বিশ্ব চরাচর,
তব অনুগামী যত নারী নর,
সেই ধন্য যেই তোমার কিঙ্কর,
ত্রিতাপের জ্বালা সে জন জানে না।

তব পদে যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়,
তোমায় পাইতে সতত সে ধায়,
ষড়্-রিপু তার অনুগত হয়,
তব নাম যার সতত সাধনা॥

হে নিত্যগোপাল! দয়াময় গুরো!
অভক্ত-বৎসল করুণা-সাগর,
সুদুর্লভ প্রেমা-ভকতি বিতর,
কে বুঝিবে তোমা(য়) হে মহিমাময়?

মহাভাব-মাখা মদনমোহন,
তোমা হেরি হয় ভ্রম বিমোচন;
শান্তি-সুধা সেই করে আস্বাদন,
হৃদমাঝে যেই তোমারে পায়।

নির্ম্মলাবালা রায়।

বালক ভাব।

মনুষ্য-জীবনে সাধারণতঃ চার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়! বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। আবার এই বাল্যাবস্থার মধ্যে একটি শৈশবাবস্থা আছে; এই শৈশবাবস্থার পর যখন শিশু কেবল মাকেই যথাসর্ব্বস্ব জানে, সেই অবস্থাকেই আমি বালক ভাব নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পবিত্র বাল্য-ভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের অনেক শিখিবার আছে। বালক সরলতা, উদারতা নম্রতা ও নির্ভরতার আদর্শ। বালকে কামের আধিপত্য নাই; প্রায় সমস্ত রিপুগণই বালকের নিকট আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন। শত শত সুন্দরী স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিলেও মন ক্ষণকালের জন্যও চঞ্চল হয় না; বালক স্বভাবতঃ

সরল; বালক সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। আমার প্রাণের ঠাকুর (শ্রীশ্রীগুরুদেব) বলিয়াছেন,—**"ঈশ্বরের নিকট যাইবার কুটিলতা ও প্রবঞ্চনা পথ নহে। তাঁহার নিকট যাইবার সুপ্রশস্ত পথ সরলতা।"**
তিনি আরও বলিয়াছেন :—

শারীরী তপস্যা মধ্যে রয়েছে আর্জ্জব,
আর্জ্জব বিনা কেমনে পাইবে কেশব?
যে জন পায় আর্জ্জব, ধন্য সেই জন।
পূর্ণ আর্জ্জব বিকাশে, বালক স্বভাবে,
আর্জ্জব পাইতে হবে শুদ্ধ বাল্য-ভাবে,
সেই ভাব লভিবারে কররে যতন।
পাইলে সে ভাব যাবে কামের পীড়ন;
হইবে পরমহংস নর-নারায়ণ
অদ্বৈত-জ্ঞান-ভজন ভাতিবে তখন।
(নিত্যগীতি)।

তা হ'লে আমাদের একমাত্র নিজ-জন শ্রীভগবানের নিকট যাইতে হইলে সেই দিব্য-বালক-ভাবের অধিকারী হইয়া দিব্য-সরলতা লাভ করিতে হইবে। জগতে দেখিতে পাই মায়ের নিকটই বালকের বালক ভাবের পূর্ণ-বিকাশ, সেইজন্য আমি অদ্য এই বালক-ভাবের প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীভগবান্‌কে মাতৃভাবে লাভ করার অনুকূলেই ২।৪ কথা লিখিব।

আমাদের সেই পতিত-পাবনী জগজ্জননীর কোলে যাইতে হইলে আমাদিগকে বাল্যভাবের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। যতদিন আমরা তাহা পারিব না, যতদিন আমরা বালকের মত "মা" "মা" ডাকিতে না শিখিব, ততদিন মা লুকায়েই থাকিবেন। মাকে লাভ করিতে হইলে বালক হইতে হইবে। বালক যেমন সুখে, দুঃখে, আপদে, বিপদে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় মা বিনে জানেনা, বালক যেমন অভাব অভিযোগ মাকে জানায়, বালক যেমন বিপদে পড়িলে প্রাণপণে কেবল মা মা বলিয়া চীৎকার করে, আমরা যতদিন সেইভাব অবলম্বন করিতে না পারিব ততদিন মায়ের দেখা পাওয়া সুকঠিন। বালকের আত্মবল নাই, বালক জানে আমার মা'ই সর্ব্বস্ব, মা বিনা সে জগত অন্ধকার দেখে, বালক আত্মবল কিছু আছে বলিয়া জানেও না, তাহার বল-ভরসা, সহায়-সম্পদ সমস্তই মা, আমরাও যতদিন ঐ বালকের মত নিজের বল-বুদ্ধি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া করুণা-ময়ী মায়ের উপর সমস্ত নির্ভর করিতে না পারিব ততদিন মাকে লাভ করা সহজ নয়। আমরা শুধু মৌখিক লোক দেখান "মা" "মা" বলে চিৎকার করিলে কি হইবে? মাঝে মাঝে তো মা মা ব'লে ডেকেও থাকি কৈ মা তো আসে না, মা তো এসে একবারও কোলে করে না? ইহার কারণ আমরা ডাকার মত ডাক্‌তে পারি না, আমরা বালকের মত আত্ম-সমর্পণ করিয়া ডাক্‌তে পারি না। যদি ডাকার মত একবার ডাকি তবে কি দয়াময়ী মা আমার থাক্‌তে পারে? জগজ্জননীর স্নেহ মমতার অনেক ভাব আমরা এই পার্থিব জননীর নিকট জানিতে ও বুঝিতে পারি। কেহ কেহ বলেন জগজ্জননীর প্রেরিত ভাব-কণার বিকাশেই পার্থিব জননীর শিশুর প্রতি এই স্নেহ মমতা ভালবাসা; যদি তাহাই সত্য হয় তবে পার্থিব জননীরই সন্তানের প্রতি এত যত্ন, এত আদর, এত স্নেহ, না জানি জগজ্জননীর কত স্নেহ, কত মমতা।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই পার্থিব জননী বালক বালিকাকে নানা প্রকার খেলানা দিয়া ভুলায়ে রেখে নিজের কাজকর্ম্ম করেন, কিন্তু মায়ের দৃষ্টি সর্ব্বদা উহাদের প্রতি নিয়োজিত থাকে। বালক বালিকার মধ্যে যদি কেহ কোন বিপদ-সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠে তবে

মা অমনি সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলে দ্রুত-গতিতে আসিয়া সন্তানকে কোলে করেন এবং পরে দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করেন, আমার মনে হয় আমাদের পরমাজননীও আমাদিগকে সেই প্রকার এ সংসারে নানা প্রকার রং বে-রঙ্গের খেলানা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার করুণা-দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের উপর রহিয়াছে ; যত-দিন আমরা এই খেলানা ল'য়ে ভুলে আছি, ততদিন মা কাছে আস্‌বেন না, যখন খেলা ছেড়ে কাতরে মা মা বলে চিৎকার করিতে পারিব তখন মা অমনি এসে একবারে কোলে কর্‌বেন। কাতর-প্রাণে ডাক্‌লে কি মা থাক্‌তে পারে ? তবে মাকে তেমন ক'রে ডাক্‌তে হ'লে মাকেই যথাসর্ব্বস্ব জানিতে হইবে ; আমাদিগকে বালকের মত হইতে হইবে।

বালক বালিকার খেলিবার সময় বিপদ না না হইলে কাতর প্রাণে মা মা ডাক্ আসে না ; তাই বুঝি জগজ্জননী দয়া করিয়া এই ভব খেলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার আপদ বিপদ রাখিয়া-ছেন ? সেইজন্য বিপদকেও তাঁহার করুণা বলিতে হয়। তাই একজন সাধু গাহিয়াছিলেন—

"বিপদ নইলে জন্মান্ধজীব ডাকে না তোকে,
মা তোর করুণার ফল বিপদ কেবল জাগায়
অবোধ বালকে।"

সন্তান বিপদে পতিত হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া যখন কাতর-প্রাণে মা মা বলে ডাকে তখন মায়ের কি সাধ্য না এসে থাক্‌তে পারে ? এ সম্বন্ধে একটী পার্থিব জননীর দৃষ্টান্ত দিতেছি ; এই ঘটনাটী আমাদের একজন বন্ধু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।

কোন একটী ভদ্রলোকের বাটীতে তাহারা দু-ভাই আছেন। উপস্থিত বাটীতে কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী আছেন। কনিষ্ঠের ২।৩টী সন্তান, কনিষ্ঠের স্ত্রীই উপস্থিত সমস্ত পারিবারিক কার্য্যাদি করেন। একদা কনিষ্ঠের স্ত্রী তাঁহার বালক বালিকাদিগকে বাহিরের ঘরে খেলা দিয়া নিজে রন্ধনাদি কার্য্যে নিযুক্তা হন ; বাহিরের ঘরে তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ ছেলেদের জেঠা মহাশয় বসিয়া কোন কাজ করিতেছেন। ছেলেরা নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া খেলা করিতেছে কখন বা খেলার ছলে মা মা বলেও ডাকিতেছে, মা রন্ধনাদি কার্য্য করিতেছেন বটে কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত নাই সর্ব্বদা ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রহি-য়াছে একটী ছেলে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ অনন্য-শরণ হইয়া মা মা ব'লে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে যেই চীৎকার করা অমনি তাহার জননী আলুলায়িতকেশে পাগলিনীর মত দৌড়িয়া আসিয়াই সন্তানকে কোলে করিলেন তখন মায়ের কোন জ্ঞান নাই, তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর যে ঐ স্থানে আছেন তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন, ক্রমশঃ তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে সসম্ভ্রমে মাথায় কাপড় দিলেন এবং ছেলেকে কোলে করিয়া বাহিরে আসিলেন। যে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আমাদের দেশের নিয়মানুসারে বিশেষ সলজ্জভাবে আসিতে হয়; যাহার সমক্ষে বাহির হইতে হইলেও বিশেষ সতর্কে বাহির হইতে হয়, আজ বাৎসল্য-ভাবে লজ্জা, মান সব ভাসিয়া গেল ; তাই বলি কাতরপ্রাণে ডাক্‌লে কি মা থাক্‌তে পারে ? মা আমার দয়াময়ী ; সন্তানের প্রতি মায়ের যত যত্ন, যত মমতা এত আর কার আছে ? তবে আমরা যে সকল খেলা ল'য়ে ভুলে আছি তাই মা এই অবসরে তাঁহার কতকগুলি কার্য্য করিয়া লইতেছেন ; তাই ব'লে যে মায়ের করুণা-দৃষ্টি আমাদের প্রতি নাই তাহা নহে। তবে অনন্য-শরণ হয়ে ডাকা চাই ; যতক্ষণ আত্মনির্ভরের ভাব আছে, ততক্ষণ মা আমাদিগকে কিছুতেই দেখা

দিবে না এবং বালকের মত না হইতে পারিবে কিছুতেই সে অনন্তশরণভাব আসিবে না তাই বলি আমাদিগকে যে কোন প্রকারে বালকভাব লাভ করিতে হইবে। তবে উপস্থিত কোন্ উপায় অবলম্বনে সেই পরমা জননীকে সম্ভোগ করিবার একমাত্র উপায় বালকভাল লাভ করা যায় ? আমার প্রাণের ঠাকুর (শ্রীশ্রীগুরুদেব) বলিয়াছেন প্রেমে সরলতা, উদারতা, উন্মাদ, মত্ততা, বালকত্ব, পবিত্রতা চিত্তনির্ম্মাল্য, সন্তোষ, সুখ, আনন্দ ও শান্তি আছে, তবে দেখিতেছি প্রেমলাভ করিতে পারিলে অন্যান্য দিব্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যবালকভাবও লাভ করা যায়, ভালবাসার এক নাম প্রেম দেওয়া যাইতে পারে ; সুতরাং জগজ্জননীকে ভালবাসিতে পারিলেই আমরা বালকভাব পাইতে পারি ; ঠাকুর বলিয়াছেন—"কাহার প্রতি কেহ প্রেম স্বেচ্ছায় করিতে পারে না, প্রেমতো স্বেচ্ছাচারের সামগ্রী নয়, যাহার প্রতি প্রেম হয় স্বভাবতঃ হয়, ভালবাসা সাধনায় হয় না ; ভাল-বাসা চেষ্টায় হয় না, ভালবাসা যে স্বাভাবিক তাহা স্বতঃসিদ্ধ ; তাহা ভগবানের প্রতি ভগবানের কৃপায় হয়" তবে কি আমরা মা ভগবতীর কৃপায়ই তাঁহাকে ভাল বাসিয়া সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত বালকভাব লাভ করিব

মায়ের উপর আমাদের একবারেই ভাল-বাসা নাই ইহাও বলিতে পারি না, কেননা মা মা বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ কান্দিয়া উঠে কেন ? মায়ের উপর সন্তানের ভালবাসা অবশ্য স্বাভাবিক তবে মায়ের কি ইচ্ছা যে আমরা সেই ভুবন-মোহিনী জ্ঞানানন্দময়ী মাকে ভুলে গিয়া হা হুতাশে দিন যাপন করি, আমাদের মা আনন্দ-ময়ী, কিন্তু নিরানন্দে দিন কাটাই। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমরা মায়ের যে শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দিন রাত্রি অনিত্য বিষয় লাভের জন্য নিয়ত প্রার্থনা করি, সেই শক্তি-বলেই আমরা মায়ের নিকট শুদ্ধ-প্রেমের জন্য কি প্রার্থনা করিতে পারি না ? আমার মনে হয় যে পর্য্যন্ত আমাদের অন্যান্য অনিত্য বিষয়ের জন্য বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত উহার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধপ্রেমের জন্যও নিয়ত প্রার্থনা করা সঙ্গত।

এই দুর্ল্লভ বালকভাব প্রাপ্ত হইয়া কত যোগী, ঋষি, মহাপুরুষগণ মাতৃভাবে বিভোর হইয়া আছেন ; তাঁহাদের আপদে, বিপদে মা সর্ব্বস্ব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাশয়ের জীবনীতেও ইহা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধন-অবস্থায় এক সময় বালকভাবে বিহ্বল হইয়া হামাগুড়ি দিয়া একটী মাতৃরূপী নারীর স্তন পান করিয়া-ছিলেন। মহাপুরুষদের মধ্যে, সাধকদের মধ্যে এ ভাব বিরল নহে। বালকভাবের উদয় হইলে তাহারা যেন ৫ বৎসরের বালক ভিন্ন আর কেহই নহেন ! তেমনি কথা, তেমনি ভাব, তেমনি সরলতা।

আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবেরও অনেক সময় এই দিব্য বালকভাবের বিকাশ হইত। সমাধি ভঙ্গের পর যখন অর্দ্ধ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মহেশ্বরের মত আঁখি ঢুলু ঢুলু নেত্রে বসিয়া থাকিতেন তখন তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হইত। প্রথমতঃ ২।৩বার বলিতেন, **আমি দুদু খাব না, আমি দুদু খাব না,** আবার ২।১ বার পান করিতেন আর বলিতেন, **"ওমা তুই খা আর আমি খাই,"** এই অবস্থায় দুগ্ধ পান করি-তেন, তখন যেন তিনি ৩।৪ বৎসরের একটী বালক ভিন্ন আর কেহই নন। একদা শ্রীধাম নবদ্বীপে আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব বালকভাবে বিভোর হইয়া অনেক রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া আখুঁটে ধরিলেন **আমাকে কাচাকলা**

সিদ্ধ ভাত দে, নতুবা কিছুতেই আমি খাব না। একেবারে বালকের মত কান্না আরম্ভ করিলেন; কত সাধনা করা গেল, কিছুতেই আহার করিবেন না; কেবল কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন, "**আমাকে কাচা-কলা সিদ্ধ ভাত দে**"; এমন সময় একজন ভক্ত ঠাকুরের ভাব বুঝিতে পারিয়া কৃত্রিম ভয়-প্রদর্শন-ছলে বলিয়া উঠিলেন "কি দুষ্ট ছেলে, ভাত খাবে না, রাত দুপুরে আখুট ধরিয়াছ, শীঘ্র ভাত খাও," যেমন এই বলিয়া রাগ করিয়া উঠিয়াছেন অম্‌নি বালক-ভাবাপন্ন আমার প্রভু তাড়াতাড়ি কত ভীত হইয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন, যেন কত শঙ্কিত-ভাব! তাই বলি মাতৃস্নেহ উপভোগ করিতে হইলে, মায়ের অভয়-কোলে যেতে হ'লে বালকের মত হইতে হইবে। বালকের মত মা-সর্ব্বস্ব বুঝিতে হইবে। নিজের বল-বুদ্ধি সমস্তই মায়ের পদে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। এস ভাই! আজ সকলে মিলে সেই নিত্যময়ী মাকে কেঁদে কেঁদে একবার প্রাণভরে ডেকে এই বলে প্রার্থনা করি যে মাগো! আর কতকাল তোমায় ভুলে থাক্‌ব মা? আর কতদিনে আমাদিগকে বালক সাজাইয়ে কোলে তুলে লইবি মা? দয়াময়ি! একবার দয়া করে আমাদের এ খেলা ভেঙ্গে দেমা! একবার প্রাণ-ভরে মা মা ডেকে তোর অভয় কোলে উঠি। একজন সাধু গাহিয়াছেন—

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকৃতে,
তবে কি মা এমন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থাকৃতে,
পার্‌তে?
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে, আবার
জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে;
তোমায় ডেকে দেখা পাই না তাইতে,
আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে॥
দুখ্‌ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার সুখ পেলে
চুপ করে থাকি, ডাকৃতে।
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা
দেওনা তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয় দয়া ক'রে
দেখা দাও আমাকে।
আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি কেবল
ভুলে যাই নাম ক'র্‌তে॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, মাগো তোমার ছেলে
হ'তো তবে পার্‌তে জান্‌তে,
কাঙ্গাল জোর ক'রে, কোল কেড়ে নিত নাহি
সর্‌তে বল্লে সর্‌তো॥

(কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)।

নিত্যদাস—বিনয়ভূষণ

"শ্রীভক্তপদরেণু।"

দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যে ত্রিচিনপল্লীর নিকট মাণ্ডঙ্গড়িপুর নামক গ্রামে বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের শ্রীবনমালার অংশে "শ্রীভক্তপদরেণু" নামে এক ভক্তরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তামিল ভাষায় ইঁহার নাম "তোণ্ডরাড়ি পোড়ি আলোয়ার"; বাঙ্গালা ভাষায় ঐ শব্দের অর্থ "ভক্ত-

* শ্রীশ্রীমৎ রামকৃষ্ণ শ্রীচরণ-কমল-মধুকর শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ স্বামী-বিরচিত শ্রীরামানন্দ-চরিত অবলম্বনে লিখিত। লেখক।

পাদরেণু"। এই মহাত্মা খৃঃ পূঃ ২৮১৪ সনে ভূমিষ্ঠ হইয়া ধরণীকে পবিত্র করেন। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহে মালা পরানই তাঁহার প্রধান সেবা ছিল সেইজন্য ভক্তেরা তাঁহাকে ঠাকুরের শ্রীবনমালার অংশে অবতীর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সেবাই তাঁহার সাধন-ভজন ছিল। ঠাকুরও তাঁহার সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

কথিত আছে যে একদা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে ঠাকুর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিকট ঐ ভক্তটির অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে "ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে আমার ভক্তের পবিত্র-হৃদয়ের অজস্র প্রেম-প্রবাহের বাধা উৎপাদন করিতে পারে।" শ্রীকমলাদেবী একটু হাসিয়া বলিলেন—"তাহা সত্য, কিন্তু রমণী-কটাক্ষের অসাধ্য কিছুই নাই।" এই কথা বলিয়া ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে আপনার একটী সেবিকাকে মনোহর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সর্ব্বদাই সেই ভক্তবরের নেত্রপথে থাকিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে আদেশ দিয়া মর্ত্তধামে পাঠাইয়া দিলেন। একদা ভক্তবর স্বীয় উদ্যান হইতে বিবিধ কুসুমচয়ন পূর্ব্বক মালা গাঁথিতে বসিয়াছেন এমন সময় সেই কমলা-কিঙ্করী মদন-মোহিনীর ইচ্ছায় ভুবনমোহিনী-বেশে অতি সুন্দর একগাছি মালা হাতে লইয়া ভক্তবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সুমধুর-কণ্ঠে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন—"ঠাকুর! দয়া করিয়া আমার গাঁথা এই মালাটী ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিয়া আমার জন্মসার্থক করাইবেন কি? আমি বিদেশিনী, এই নূতন দেশে আমি আশ্রয়-হীনা। এখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা আছে। আপনি সাধু, আপনি কৃপা করিয়া কিছুদিন আমাকে আশ্রয় দিলে আমার বড়ই উপকার হয়।" ভক্তবর যুবতীর হস্তে কমনীয় মালা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কামিনীর ভক্তি-মাখা হাতের গাঁথা মালা ঠাকুরের গলায় দিবার জন্য আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিলেন। পরে ললনার সকাতর আশ্রয়-প্রার্থনায় তাঁহার সরল-হৃদয় বিগলিত হইল। তাহার প্রার্থনা-পূরণে স্বীকৃত হইয়া, মালাটী ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে যুবতী প্রত্যহ ভক্তবরের ফুলবাগানে জল দেওয়া, ফুল তোলা, মালা গাঁথা প্রভৃতি সেবার কার্য্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কামিনীর সেবানিষ্ঠা, ও সৌজন্য দেখিয়া তাহার প্রতি ভক্তবরের বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইল। শ্রদ্ধারূপিণী মহামায়া ক্রমশঃ আসক্তি-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক অল্পে অল্পে ভক্তবরের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যুবতীর আসক্তি-বন্ধনে ভক্তবরের ইষ্টদেবের প্রীতিবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। ক্রমে রমণী-মোহ ভক্তবরের ইষ্টভক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—তিনি সব ভুলিয়া সেই যুবতী-লাভ বাসনায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। রমা দাসীও সময় বুঝিয়া ভক্তকে আরও অধিকবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্ত অধীর ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। যুবতী-সমক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। রমণী স্বর্ণ-মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। কৌপিন-সর্ব্বস্ব সাধু স্বর্ণ কোথায় পাইবেন? এদিকে রমণী-লাভ-বাসনা হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সাধু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা দূরে থাকুক সে দিন সাধু শ্রীমন্দিরেও গমন করেন নাই। ঠাকুরটী মায়া-দেবীর কার্য্য-দর্শনে মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে একটি স্বর্ণ-পাত্র লইয়া ভক্তের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐটী দান করিয়া আসিলেন। তথাপি ভক্তের চমক ভাঙ্গিল না। রমণী-লাভ-সম্ভাবনায় আনন্দে

অধীর হইয়া স্বর্ণ-পাত্র-হস্তে দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে যুবতী-সকাশে গমন করিলেন—কি দেখিলেন? কপট-চূড়ামণির অপূর্ব্ব খেলা। দেখিলেন রমণী নাই—মদন নাই—মদনমোহন বামে মহাকামের মনমোহিনী। কিশোর-কিশোরী ভক্তবরের দিকে তাকাইয়া মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছেন। সাধুর হৃদয়ে মদন-ভস্ম-লীলার অভিনয় হইল। সাধু প্রথমে লজ্জায় মস্তক নত করিয়া পরক্ষণেই কম্পিত-কলেবরে, করযোড়ে সজল-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন—কথা সরে না—কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল—মনের সাহায্য লইয়া সাধু বলিতে লাগিলেন "দয়াময়! প্রাণনাথ! হৃদয়-সর্ব্বস্ব! এত না হইলে ব্রহ্মাণ্ডের জীব তোমায় ভক্তবৎসল বলিবে কেন? করুণাসাগর! এ নরাধম আজ তোমার করুণা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিবে নাথ? আবার কি এ দুর্ব্বল কিঙ্করকে তোমার মায়ার কোলে ছাড়িয়া দিবে প্রভু?

ভক্তের ভাব-বিগলিত-হৃদয়ের ভক্তি-উপ-হারে প্রত্যক্ষ শ্রীযুগল-মূর্ত্তি পরম প্রীত হইয়া অমৃত-মাখা কথায় তাঁহার আর্ত্তি দূর করিয়া অভয় দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সাধুও সেই দিন হইতে প্রেমোন্মাদ-রূপ আবরণ লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দমনে পরম আনন্দে জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন ধরাধামে অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে শ্রীমদনমোহনের শ্রীনিত্যধামে গমন পূর্ব্বক নিত্য-যুগল সেবায় রত হইলেন। হে অলৌকিক হরিভক্ত ভক্ত-চরণরেণু! এই অধমকে আশী-র্ব্বাদ কর যেন তোমাদের চরণ-রেণুতে আমার অকপট ও অচলাভক্তি থাকে। তোমাদের প্রেম-নিধির প্রেম-সুধাপানে এ চির-পিপাসিত ক্ষুদ্র প্রাণটুকু যেন চিরকালের জন্য বিভোর হইয়া থাকে; এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিভৃত-নিকুঞ্জ-টুকু যেন তোমাদের যুগল-দেবতার বিলাস-ভূমি-রূপে পরিণত হয় আর সেইখানে নিকুঞ্জবিহারী তোমাদের মদনমোহনের উদয় দেখিয়া মদনদেব যেন আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আধিপত্য ছাড়িয়া দিয়া রতি-দেবীকে বামে করিয়া করযোড়ে এক-পাশে দাঁড়াইয়া তোমাদের সঙ্গে শ্রীযুগল-রূপ-মাধুরী-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।

রাগিনী খাম্বাজ—একতালা।

তুমি স্নিগ্ধ যেমন, চাঁদিমা কিরণ,
জোছনা-মাখা নিশায়।
তুমি গম্ভীর যথা নভোমণ্ডল
জলদ-বরবি-কায়॥

তুমি স্থির যেমন বিন্ধ্যাচল,
দীপ্তি তেজো সমান অনল,
কোমল কমনীয় যথা
নবীন কুসুমচয়,—

মম চঞ্চল আঁখি থাকি থাকি থাকি
ও মুখ হেরিতে চায়—
পিয়াসা মেটে না তায়, পিয়াসা মেটেনা তায়,
পিয়াসা মেটে না তায় ॥
তুমি নিত্য নূতন নন্দন-ফুল।
সুচিকণ চারুহার
সুন্দর মনমোহনঠামে মনমথ মনে হয়,
প্রেমের আবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি
অপরূপ শোভা পায় ॥

তুমি হে ভরসা মম, আঁধারে আলোক সম,
উজ্জ্বল-কর হর তিমির বিকাশ জ্যোতি-ঘন;
দিবাকর-কর অমল-ধবল
শশীকলা জিনি শোভে,
আলোর আভায় আঁধার পালায়
দূরে দূরে মনক্ষোভে,—
তুমি শক্তিস্বরূপ তেজ বীর্য্য দুর্ব্বল এ হৃদয়,
তুমি হতাশের আশা অন্তে ভরসা,
প্রণমি অভয় পায় ॥

নিত্যপদাশ্রিত—
গিরীন্দ্রনাথ মিত্র।

আসক্তি।

তীব্র অনুরাগ-বশতঃ আকৃষ্ট হইয়া অতিশয় মনোযোগ-সহকারে সঙ্গ-লাভকে আসক্তি বলে। শ্রীভগবানের প্রতি যে আসক্তি তাহাই শুদ্ধা—নির্ম্মলা—অবিকৃতা। এই আসক্তি জীব কেমন করিয়া লাভ করিতে পারে ও এই আসক্তি লাভ হইলে জীবের অবস্থা কিরূপ হয়, দুর্ব্বাসনাময় এবং সর্ব্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ সংসারে আসক্তি হইলেই বা জীবের পরিণাম কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় ও সেই বিকৃত আসক্তি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই আমাদের এখন পরিজ্ঞাত হইবার একমাত্র প্রয়োজন।

সাধনবলে এই শুদ্ধা আসক্তি লাভ হয়। এই সাধনা সর্ব্ব সময় গুরুপদ-রূপী ঈশ্বর-কৃপা-সাপেক্ষ। মাতৃরূপা আদ্যাশক্তির কৃপা-দ্বারা সর্ব্বজনীন পরাভক্তি লাভ হইয়া অজ্ঞান-প্রসূ অবিদ্যাশক্তি নষ্ট হয় তাহাকেই সার্ব্বভৌম জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি বলে। এই অবস্থায় জীব উপনীত হইলে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হয় ও এই সত্ত্বগুণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হইয়া মন একেবারে বাহ্য-বস্তুর সংস্রব ত্যাগ করে এবং পরাপর পরম প্রেমের বস্তুতে অনুরক্ত হয়। এই আসক্তিই পরানুরক্তি। এই অবস্থাতেই সাধকের সম্মুখে ভক্তি ও প্রীতির দেশ খুলিয়া যায়। ভক্তির আবার নানা দেশ ও নানা পর্য্যায় আছে। ভক্তির অঙ্গ ক্রমশঃ যাজন করিতে করিতে যখন সেই পরম পুরুষে পরমাভক্তি উৎপন্ন হয় তখনই পরমা শুদ্ধাভক্তির দেশে উপনীত হওয়া যায়। এই অবস্থায় তীব্র অনুরাগ-বশে প্রীতির অবস্থা উৎপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্‌কে শান্তভাবে ভজনা করিলে শান্ত ভাবে আসক্তি হয়; তদ্রূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর যে যে ভাবে ভজনা করা যায় সেই সেই ভাবেই একান্ত আসক্তি উৎপন্ন হয়। ভক্তির দেশেও অপরিমেয় আসক্তি উৎপন্ন হয়—প্রীতির দেশেও দিব্য মন-প্রাণ-হরণ-কারিণী

আসক্তি জন্মে। ভগবদ্বিমুখী জনে অবিদ্যা মায়ার সংযোগে এই সর্ব্ব দুঃখের আলয়-স্বরূপ জগৎ-সংসারে ত্রিতাপ-জ্বালায় অভিভূত হয়। এই সুখ-দুঃখ-বিজড়িত সংসারের সমস্ত অবস্থা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন-শীল সুতরাং তাহাতে আসক্তি হইলে হতাশ, দুঃখ, জ্বালা ব্যতীত অন্য কিছু পাইবে না। যে প্রীতিময় বস্তুতে আসক্তিলাভ হইলে দুঃখময় সংসারে অনাসক্তি হয় তাহাই লাভ জন্য একান্ত-মনে প্রার্থনা করিতে যত্নবান হও।

"আসক্তি-লাভ হইলে আসক্তির বস্তুকে লাভ করা যায়" ইহা কেবল শুনিলে কিছুই হয় না। আসক্তি যাহাতে লাভ হয় তজ্জন্য বিশেষ একাগ্রতা দ্বারা চেষ্টিত হইতে হয়। জল পানে তৃষ্ণা নিবারিত হয় একথা কেবল শুনিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয় না—জল পান কর নিশ্চয়ই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। যে আসক্তি-বলে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন, স্পর্শন, ও তাঁহার সেবা লাভ করিতে পারা যায়, যে আসক্তি-বলে জীবের চিত্ত তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে মজিয়া থাকে তাহার জন্য একান্তরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া সেই সেই পথ অবলম্বন কর। সে পথ অনুরাগ—সে পথ পরম-ব্যাকুলতা। শ্রীভগবান্ পরম দয়াল। তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম-লাভের জন্য অনুরাগ-প্রযুক্ত ব্যাকুল হইলে অবশ্যই তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিবেন। তিনি যখন পরম দয়াল তখন আর আমাদের অন্য চিন্তার কি প্রয়োজন আছে? কেবল যত্ন-সহকারে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে ভজনা কর। তাঁহার জন্য পরম ব্যাকুলতাই প্রকৃষ্ট ভজনের অবস্থা। এইরূপ প্রকৃষ্ট ভজনের অধিকারী যিনি হইয়াছেন তিনিই উত্তম—কারণ তিনি প্রেম-বশে প্রাণের প্রীতির বস্তুলাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ও অধৈর্য্য হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

> আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
> মদাদিষ্টানপি স্বকান্।
> ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
> মাং ভজেত স সত্তমঃ।

মৎকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়াও মদাদিষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষ গুণ বিদিত হইয়াও সম্যকরূপে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যিনি আমার ভজনা করেন তিনিই সত্তম।

ভজনকারীর ভজনের অবস্থায় যতই গাঢ়-অনুরাগ-বশতঃ বাহ্যভাবগুলি অন্তর্মুখীন হয় ততই ভাবের দেশ পরিস্ফুটরূপে খুলিয়া গিয়া প্রেমের আলোকে দিব্য-দর্শন ইত্যাদি হইতে থাকে। দিব্যভাবে দিব্যালোকে হৃদয় আলোকিত হইলে তিনি দিব্যরূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকেন। হৃদয় তখন চিন্ময়-ধাম হয়। প্রেমিকের হৃদয়রূপ চিন্ময়-ধামে তখন রাধাশ্যাম উন্নত উজ্জ্বল রস-বিলাস লইয়া যুগল হইয়া বিরাজ করেন।

ভজনকারী তখন আর কিছু চাহে না। কিসে সেই যুগল-রূপের সেবা দ্বারা আনন্দ পাইবে তাহাতেই নিযুক্ত হয়। নিজ-সুখের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-রূপ দর্শন করিয়া সেই সেই ভাবে চিত্ত বিভোর হয়। কায় ও মনের দ্বারা উৎফুল্ল-হৃদয়ে তাঁহাদিগের সুখেই সুখী হয়। সেই সুখ, সেই আনন্দে বিভোর হইলে প্রেমের রাজা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত দিব্যোন্মাদ সম্বলিত পূর্ণভাব ও পূর্ণ রসের আভাস আসিয়া হৃদয়কে নানা ভাব ও রসে বিভাবিত করে। তখন তাহার হৃদয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গীতিতে মাতিয়া যায়। তাহার দিব্যভাবে দিব্যদর্শনে নিম্নলিখিত অবস্থা উৎপন্ন হয় যথাঃ—সে তখন দর্শন করে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে একটী কুঞ্জ—সেই কুঞ্জ কল্পলতাসমূহ দ্বারা আবৃত। ঐ কল্পলতাতে

পুষ্পগণ পরম-সুন্দর-রূপে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সৌরভে চারিদ্দিক আমোদিত; নানা বর্ণে নানা জ্যোতি-বিশিষ্ট ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সেই কুঞ্জ-মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম বিরাজ-মান। দুই জনের অনুপম রূপ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই রূপ দর্শন করিলে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়। শ্যামচাঁদ আমার নূতন মেঘ-স্বরূপ আর রাধারাণী তাহাতে সৌদামিনী—কিম্বা নীলমণি আজ স্বর্ণ-বিজড়িত। কিম্বা পূর্ণচন্দ্র নূতন মেঘের পার্শ্বে প্রকাশিত হইয়া অমৃতের ধারা উদ্গীরণ করিতেছেন। উভয়ে হাসির অমিয়-ধারা পান করিয়া আনন্দে বিহ্বল। রসিক-নাগর শ্রীহরি ও রসিকা কিশোরী আজ রস-সাগরে রসলীলায় মত্ত। শ্যাম-অঙ্গের শোভা রাই-বদনে পড়িয়াছে—এবং রাই-প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে দীপ্তি পাইতেছে (১) এইরূপ পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া রস-রঙ্গে সখীগণ ঠারাঠারি করিতেছেন। কিশোর-শ্যামচাঁদের রূপ অপরূপ আর কিশোরী রাইএর রূপের উপমা নাই। দুইজনের অপরূপ অনুপম রূপে কুঞ্জ আলোকিত। অপরূপ সজ্জা। দুই জনেই পরমানন্দে মাতোয়ারা। যুগল-করে বংশী-ধারণ করিয়া বাদন করিতেছেন। তাহাতে সমগ্র জগৎ আকৃষ্ট, বিমুগ্ধ, স্তম্ভিত! মরি মরি এমন সুন্দর রূপ আর তো কখন দেখিতে পাওয়া যায় না! ইহা দর্শন করিয়া জীব-দেহ ধারণ করা যায় না। আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। সেই জীবের আমিত্ব অপ্রাকৃত রসে ডুবিয়া হারাইয়া যায়। হায় হায়! ভাষা সে মাধুরী বর্ণনে অক্ষম হয়। বদন বাক্-শূন্য হয়; নয়নে স্পন্দন থাকে না। নাসা নিরুদ্ধ-পবন হইয়া যায়; প্রাণ, মন, আত্মা যেন একীভূত একটী জড়পিণ্ড হইয়া এই রস পান করে আর অতিক্ষীণ, অতিমৃদু, অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় অজস্র অনুভব করে "অহো কিং মধুরং কিং মধুরং কিং মধুরং !!"

নিত্যপদাশ্রিত
শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত।

(১) যে সকল সাধক শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-মধুপানে মত্ত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ যাঁহাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব তাঁহারাই এই গুহ্যাতিগুহ্য রসলীলা আস্বাদনে অধিকারী অন্যথা মহৎ অপরাধের আশঙ্কা আছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে সাড়ে তিন জন এই রসে পূর্ণ অধিকারী ভক্ত ছিলেন। সম্পাদক।

মনের প্রতি।

বল মন, কত কাল
থাকিবিরে অচেতন।
দিন তো ফুরায়ে গেল
না ভজি রাধারমণ
কত লক্ষ-যোনি ভ্রমি
মানব জনম পেয়ে।
দুঃখের পাথারে ভাস
শ্রীচরণে না বিকায়ে।
কুবাসনা পরিহরি
এবে শুদ্ধ হও মন।
এখনও যুকতি ধর
ভজ নিত্য-নিরঞ্জন॥

ত্রিভুবন মাঝে সার
সেই রাঙ্গা শ্রীচরণ।
দৃঢ় করি হৃদে ধর
শুনরে অবোধ মন॥
হরি বিনা দুঃখহারী
বল কেবা আছে আর।
জীবনে মরণে হরি
পদযুগ কর সার॥
এ ভব-সংসার মিছা
কেবা তব আপনার।
তুমি কার কে তোমার
কারে বা বল আমার॥
হরিই প্রাণের বন্ধু
প্রাণারাম গুণধাম।
ভজিলে হরির পদ
পূর্ণ হবে সর্ব্বকাম॥
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ
তাহে মন কর আশ।
জনম সফল হবে
কাটিবে করম পাশ॥
অবশ হইও না মন
রসনারে সঙ্গে লহ।
মধুমাখা কৃষ্ণবুলি
বল প্রেমে অহরহঃ॥
বিষম বিষয়-বিষে
কি লাগি দগধি মর।
জুড়াবে ত্রিতাপ-জ্বালা
নাম-সুধা পান কর॥
সুধা ত্যজি বিষে তৃষ্ণা
একি বিপরীত রীত।
বিফলে জনম যায়
ধিক্ তোরে শত ধিক্॥
নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ
সহজ সরল অতি।
ভব পারে হেসে যায়
কি জ্ঞানী কি মূঢ়মতি॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী
ইন্দ্র-নীল-মণি-দ্যুতি।
ত্রিভঙ্গিম পীতবাসা
তনু যাঁর নরাকৃতি॥
সেই কৃষ্ণ কলিযুগে
গৌর-রূপে নদে আসি।
নাচেন ভকত-সঙ্গে
রাধা-প্রেম পরকাশি॥
বিনা মূলে পেয়ে এই
নাম-চিন্তামণি ধন।
ত'রে গেল অবহেলে
অধম পতিত জন॥
ত্রিজগতে নাহি কোথা
শ্রীরাধার প্রেম-সীমা।
কৃষ্ণচন্দ্র যাহে ঋণী
কিবা তার মধুরিমা॥
সর্ব্বকলা সর্ব্বভাব
ধরে রাধা গুণবতী।
জীবে কি জানিতে পারে
সে যে ভ্রান্ত অল্পমতি॥
ভজনের সার-ভূতা
মহাভাব রাধা-রাণী।
কৃষ্ণের সহজা শক্তি
নাম যাঁর আহ্লাদিনী॥
মনরে মিনতি করি
গোপীর শরণ লও।
শ্রীরাধা-গোবিন্দ বলি
গোপী-অনুগতা হও॥
রসরাজ মহাভাব দুই রূপ এক রূপে।
হেররে মানস-পটে ডুবিও না মোহ-কূপে॥

ভক্ত পদাশ্রিতা—
শ্রীমতী শিশুকালী বসু। বেরিলি।

তরু।

সর্ব্বংসহা বসুমতী মাতার সৎসন্তান যদি দেখিতে হয় তবে দেখ তরুগণই ধরণীমাতার সৎসন্তান। তরুণ-তরুতলে তাপিত তনু শীতল হয় না, কিন্তু সেই তরু যখন মহাতরু-রূপে পরিণত হয় তখন তার ছায়া অবলম্বন করিলে, সেই তরু মৃদুমন্দ সমীরণ বিতরণ পূর্ব্বক তরুতল-স্থিত ব্যক্তিকে শান্তিদান করে। গুরু উপদেশ দেন সংসারে যদি সাধু হবে, তা হ'লে তরুর ভাব অবলম্বন কর। সহ্য-শক্তি যদি কোথাও থাকে তো তরুতেই আছে। ঐ তরু পথিকের পক্ষে চন্দ্রাতপও বটে, ছত্রও বটে; কোন কোন তরুর পত্র এতই ঘন-বিন্যস্ত যে সূর্য্যকিরণ সে পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিতে পারে না। এই তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাপে ছায়া, বর্ষায় আবরণ এমন কি ক্ষুধার সময় ফল পর্য্যন্ত দান করিয়া কাননবাসীর ক্ষুধা নিবারণ করে; এই জন্যইত সাধুগণ গাছতলা সার করেন। শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে। এক এক জাতি বৃক্ষ এক এক দেব অবতার। প্রকৃত যদি দেব চরিত্র বুঝিতে হয়, তবে বৃক্ষের দ্বারাতেই বুঝিতে পারা যায়; তুমি বৃক্ষের সহিত যতই অসদ্ব্যবহার কর, কিন্তু বৃক্ষের নিকট হইতে তুমি কখন অসদ্ব্যবহার পাবে না। কাষ্ঠখণ্ড আহরণের জন্য তুমি হয়তো বৃক্ষের বৃহৎ শাখা কর্ত্তন করিতেছ, কুঠার পরিচালনা করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছ, কিন্তু শ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য সেই বৃক্ষের ছায়াই অবলম্বন করিতে হয়, তুমি তাহার একটী শাখা কর্ত্তন করিতেছ সে তোমাকে অন্য শাখাদ্বারা ছায়া দান করিতেছে। পার কি মানব? তোমার এক হস্ত ছেদন করিতেছে, তুমি অপর হস্তে বাধা প্রদান না করিয়া অভয়দান করিতে পার কি? তুমি পার না, পারে কে; যে মানব তরুর ন্যায় সহ্য-শক্তি-সম্পন্ন,—সে মানব কে জান; মানবরূপে দেবতা, সে দেবতা কে তা জান কি? কলিযুগে প্রেমের অবতার, দয়ার অবতার, ভাবের অবতার, গোরা-প্রেম-বিভোরা নিতাই।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

এই লক্ষণ-সংযুক্ত পূর্ণ বৈষ্ণব আমার বাঞ্ছাকল্পতরু নিতাই। সাধনে মানব দেবতা হ'তে পারে, কিন্তু তরু স্বভাবে দেবতা; তাই এক এক তরুতে এক এক দেবতার আবির্ভাব। দুর্গা পূজার সময় নবপত্রিকাতে নব দুর্গার পূজা হয়। অশ্বত্থ স্বয়ং নারায়ণ, তমাল কালিকা, বট মহাকাল, তুলসী বৃন্দা, কুল চণ্ডিকা, এই যে এক এক বৃক্ষে এক এক দেবতার আবির্ভাব বলা হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক ভাবগ্রহণ করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। অশ্বত্থ :নারায়ণ; তাকে নারায়ণ বলা হয় কেন, অশ্বত্থ মহাবৃক্ষ বটে, কিন্তু তাহার ফল কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। এইরূপ সংসারে যাঁরা নিষ্কামভক্ত তাঁরা নারায়ণের কাছে ফল প্রার্থনা করেন না। অশ্বত্থ গাছের কাছে লোক ছায়া চায়; ভক্তগণও নারায়ণের পদপল্লবের ছায়া প্রার্থনা করে। বট মহাকাল, মহাকাল যেমন অনাদি, সেইরূপ বটবৃক্ষও অনাদি বৃক্ষ। এই বৃক্ষের অঙ্গ হইতে শিকড় বাহির হইয়া প্রত্যেকেই মূলরূপে পরিণত হয়। এমন কি পরিণামে কোনটী আদিমূল তাহা নির্ণয় করাই কঠিন; তাই বলি এ অনাদি বৃক্ষ। ভগবান দেখাইয়াছিলেন মহাপ্রলয়ে সবই লয় হয়, কিন্তু বট পত্র লয় হয় না; তাই

ভগবান মহাপ্রলয়ে, মহাকারণ-জলে বটপত্রকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তমালে কালিকা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রমাণ কৃষ্ণলীলা দেখিবার জন্য স্বয়ং কালিকা তমালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণের খে । তমাল-তলে। শ্রীমতীও কৃষ্ণ বিরহে আত্মহারা হইয়া তমালকেই কৃষ্ণব'লে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; "কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ" তাই কৃষ্ণ, কালিকা, তমাল অভেদ। বৃন্দাদেবী তুলসী; কৃষ্ণপদে তুলে দিতে বৃন্দা ভিন্ন কেউ নাই; তাই জীবের অন্তঃকালে ঐ তুলসী তরুতলেই রক্ষা করে। হে তুলসী বৃন্দে! ইহার সাধন ভজন না থাকিলেও তুমি ইহাকে কৃষ্ণপদে তুলে দিও। কুলে চণ্ডিকা; কুলে তুলে দিতে চণ্ডিকা ভিন্ন কে আছে? চণ্ডী মাহাত্ম্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ। ভগবান অসীম মহিমা তরুতে প্রকাশ করিয়াছেন লয়াই দ্বারকায় দেহত্যাগ পূর্ব্বক দেবদারু তরুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুপঞ্জর স্বরূপে সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে নীলাচলে উপনীত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে ধরা দিয়াছিলেন; এখনও পুরাতন তীর্থস্থান দর্শন করিতে হইলে বৃক্ষের দ্বারায় প্রমান করা হয়; গয়ায় অক্ষয়বট, একাম্র কাননে একাম্র বৃক্ষ; এবং যে বৃক্ষ বহু পুরাতন হইয়াছে তীর্থস্থানে সেই বৃক্ষতলকেই ভগবানের বিশ্রাম স্থান বলা হয়; বৈশাখ মাসে দেবতা ভাবে অশত্থ, বট, তুলসী, বিল্বমূলে জলদান করা হয়; তাই আমার নিতাই গৌর জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন যে জীবগণ। তরুকে আশ্রয় কর, তুলসী তরুতলে গড়াগড়ি দাও, বিল্বমূলে অর্চ্চনা কর, বটমূলে ধ্যানকর, আর অশ্বত্থতলে শান্তি লাভ কর। গাছের ছাল পরিধান কর লজ্জাদায় থাকবে না; গাছের ফল ভোজন কর পেটের জ্বালা থাক্‌বে না। বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় লইলে কোন হিংস্রক জন্তুর ভয় থাক্‌বে না। তরু! তাই তোমায় ভালবাসি, তুমি যখন কদম্ব রূপে বৃন্দাবনে বিহার কর তখন যেন বোধ হয় আমার প্রেমেগড়া ছবি রাধাকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গিম ঠামে তোমার তলে বিরাজ কর্‌ছেন, যখন তুমি তমাল-রূপে বৃন্দাবনে বিহার কর, তখন দেখে বোধ হয় রাখালরাজ রাখালগণ সঙ্গে নৃত্য কর্‌ছেন। তোমরা বৃন্দাবনে নিত্য-তরু। অনিত্য তরুর লয় আছে, নিত্য-তরুর লয় নাই, তাই আমরা নিত্য তরু ভাল বাসি। তোমরা নিত্যতরু, আর আমরা পেয়েছি নিত্যবাঞ্ছাকল্পতরু। যদি কেউ তাপিত থাক, এস ভাই নিত্যবাঞ্ছাতরুমূলে এস কায়া শীতল হবে। ছায়ায় কায়া শীতল হবে। যদি ক্ষুধা থাকে ফল পাবে, কিন্তু কর্ম্ম-ফল ভোগ কর্ত্তে হবে না। এই বাঞ্ছাকল্পতরু কে জান? আমার "নিত্যগোপাল"। নিত্য নিত্য যেরূপ ভক্তের হৃদয়ে উদয় হইয়া নিত্যানন্দ দান করিতেছেন, সেই বাঞ্ছাকল্পতরু নিত্যগোপাল, যাঁর কৃপা হইলে সংসার অনিত্য বোধ হয় আমার সেই নিত্যগোপাল বাঞ্ছাকল্পতরু, তাই সেই নিত্যবাঞ্ছাকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ কর—

আর বল "জয় গুরু,
নিত্যবাঞ্ছাকল্পতরু"।

নিত্যপদাশ্রিত,

শ্রীধর্ম্মদাস রায়, বাণীকণ্ঠ।

অনধিকার।

কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা পরাণে আমার ?
শ্রীচরণে অপরাধী
অবিশ্বাসী জন্মাবধি,
আছি ; তব স্নেহে মম কিবা অধিকার ;
দয়ার সে পাত্রী নই
মন তাহা বুঝে কই,
অভিমানে মত্ত ক'রে গর্ব্ব অহঙ্কার ;
দি'ছিলে অমূল্যরত্ন
হেলায় না ক'রে যত্ন,
হারায়েছি এবে হায় অনুতাপ সার !

হইলেও শত দোষী
তবু পদ-অভিলাষী,
পূরাবে না জননি কি বাসনা আমার ?
মা ! মা ! ব'লে ডাকিবার
পেয়েছি যে অধিকার,
নাহি চিনে অজ্ঞ প্রাণে, সে দয়া তোমার।
মনে রেখে দীনে শুধু,
দিও পাদপদ্ম মধু,—
যেন সদা মা ! মা ! ব'লে পারি কাঁদিবার।

অম্বিকাসুন্দরী সেন।

পূর্ব্ব-স্মৃতি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।]

আজ মহাসপ্তমী, শোকে, দুঃখে, উদ্বেগে ষষ্ঠীর রজনী অবসান হইল। ভক্ত-হৃদয়ে যে ভাবী অমঙ্গলের বিষাদছায়া নিপতিত হইয়াছিল মঙ্গলময়ী মায়ের মধুর কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃসূর্য্যালোক-স্পর্শে তাহা বিদূরিত হইল। ভক্তগণ কল্যকার রজনীর বৃত্তান্ত ভুলিয়া গেলেন। ঠাকুর সরল-প্রাণে ভক্তগণকে ভুলাইলেন। আজ মহাসপ্তমী—ঠাকুরকে পূজা করিতে হইবে ; পূজানন্দে ভক্তপ্রাণ নাচিয়া উঠিল। হায় ! মায়াধীশের দুরত্যয়া গুণময়ী মহামায়ার বিষম প্রভাবে ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন না—তাঁহাদের কি ভীষণ দুর্দ্দিন দূরবর্ত্তী।

বাহিরের ঘরে মধুর কীর্ত্তন হইতে লাগিল, কোন কো ভাগ্যবান ভক্ত ঠাকুরকে সাজাইতে লাগিলেন। ভক্তবর বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়াছেন,—

"শত সুধাসার মথি, নবনীত হইল থি
তাহা পুনঃ প্রেমরসে মাজি,
নিরমিল কলেবর, মুনিজন-মনোহর,
নবভাবে নিত্যদেহ সাজি।"

শ্রীঅঙ্গে লাবণ্য ধরিতেছে না, ভক্তগণ তাহাতে পীতবাস পরাইয়াছেন, হস্তে কুসুম-বলয়-কঙ্কন ;—গলে বনফুল-মালা,—মস্তকে কুসুম-কিরীট পরিশোভিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ ! এই রূপ-বর্ণনায় কি দোষ আছে ? যাহারা দেখিয়াছ একবার স্থির-চিত্তে চিন্তা কর, যাহারা এ সময় উপস্থিত ছিলে,—একবার কল্পনা কর ; আর যাহারা দেখ নাই ;—ভাই, আমার

দুর্ভাগ্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

যথা সময়ে ভক্তগণ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। কেহ দেখিতেছেন,—কুসুম-ভূষণ-ভূষিত সাক্ষাৎ মদনমোহন; কেহ দেখিতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ; কেহ দেখিতেছেন বুদ্ধদেব।

কেশবানন্দ বলিলেন—"বাবা আপনাকে বুদ্ধদেবের মত দেখাইতেছে," ঠাকুর মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন,—"তা বেশ।" গৃহে যেন স্নিগ্ধ-নীল-দ্যুতি-বিশিষ্ট সহস্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে! ভক্তগণ মুগ্ধনেত্রে ঐ অপরূপ রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছেন। আহা! মাত্র দুইটী নেত্রে ঐ লাবণ্যছটা দেখিয়াত তৃপ্তি বোধ হইতেছে না? যদি প্রতি লোমকূপে এক একটী আঁখির উদ্ভব হইত তাহা হইলে বা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতাম। ভক্তগণ একে একে শ্রীপাদপদ্মে কুসুমাঞ্জলী অর্পণ করিতেছেন—আর মস্তকে শ্রীপাদস্পর্শ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। আহা! মস্তকত এ সুখস্পর্শ ছাড়িতে চাহিতেছে না। কিন্তু শত শত ভক্ত যে তৃষিত চাতকের ন্যায় ঐ শ্রীচরণ পানে তাকাইয়া আছেন! তাই ভক্তগণ পরার্থ-পরবশ হইয়া মস্তক উত্তোলন করিতেছেন। ভক্তগণের এরূপ স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত চারি-যুগেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—আর এ মহদ্গুণ ভক্তদেহ ভিন্ন কোথায়ইবা আশ্রয় গ্রহণ করিবে। প্রেম-রসময় শ্রীনিত্যগোপাল "নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন" বলিয়া অমৃতময়ী বাণীতে ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই অঞ্জলি দিয়াছেন—কেবল একটী মাত্র ভক্ত এখনও অগ্রসর হইতেছেন না। কেন তিনি এই অপার্থিব আনন্দ লাভে আপনাকে বঞ্চিত করিতেছেন? কেন তিনি ঐ ব্রহ্মবন্দিত শ্রীপাদপঙ্কজে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে এখনও পশ্চাৎপদ? তবে কি তিনি অভক্ত? অসম্ভব। নিত্যপদ-দর্শনে ও স্পর্শনে অভক্ত ভক্ত হয়, অপ্রেমিক প্রেমিক হয়, পাষাণেও কর্দ্দমের সৃষ্টি হয়! তবে তিনি শ্রীপাদপূজায় অগ্রসর হইতেছেন না কেন? পাঠক! ঐ শুন তোমার প্রশ্নের উত্তর—

"কি দিয়ে পূজিব তোমায় হে,
আমার এমন কি ধন আছে,
সবেধন—একমন,
সেও অপবিত্র হ'য়ে গেছে।"

ভক্তবর দীনমনে অশ্রু-জলে বক্ষ ভাসাইয়া গাহিতে লাগিলেন। এরূপ মহদাশ্রয়ে আসিয়াও, ভক্তবর! তোমার এ করুণ বিলাপ কেন? ইহা বিলাপ নয়—ভক্তের স্বভাব-জাত দৈন্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন!

মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে-ছেন—আর হরিদাস নিতান্ত কাতর-ভাবে বলিতেছেন—"কর কি কর কি প্রভু? আমি যে যবন!"

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার ইচ্ছা হয়ত, অঞ্জলী প্রদান করিতে পার"। ভক্তবর দুঃখিতান্ত-করণে উত্তর করিলেন—"এ পাপ-পূর্ণ দেহ লইয়া আপনার ঐ দেব-দেহ স্পর্শ করিবার প্রবৃত্তি হইতেছেনা"।

শ্রীহরিদাস যেরূপ দূরে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির-চূড়া নিরীক্ষণ করিয়াই শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সাধ পরিতৃপ্ত করিতেন—আজ ভক্তবর অন্যের পূজা দর্শন করিয়া নিজের পূজা করিবার [illegible]

ঠাকুরের অনুমতিক্রমে ভক্তগণ প্রণামানন্তর বাহিরে চলিয়া আসিলেন। কল্য মহোৎসব—ভক্তগণ তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মহাষ্টমী—ভক্তগণ মহোৎসবের আয়োজনে—মহাপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। রঙ্গ-

পুরের কোন বিশিষ্ট ভক্তবর মহোৎসব দিবার সংকল্প করিয়াছেন; বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া জনৈক ভক্তকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী সংগৃহিত হইয়াছে।

ভক্তগণ আনন্দে মাতোয়ারা। এই অত্যধিক আনন্দের কোন বিশেষ কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহল, সুমধুর কীর্ত্তনের সুস্বর-লহরী আশ্রম-বাটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

'হলে' অবিরাম কীর্ত্তন চলিতেছে তাহার পার্শ্বেই রন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে দৈবদা, সরিশার সতিশ বাবু প্রভৃতি 'কালী'-তলায় মায়ের পূজা প্রদানার্থ গমন করিলেন। মাকে ছয়টী সুপশু উৎসর্গ করা হইল। তাঁহারা যথাসময়ে মহাপ্রসাদ—সম্ভার লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমে কীর্ত্তন থামিল। ভক্তগণ স্নানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আশ্রমবাটীর অনতিদূরেই পুণ্যতোয়া ভাগিরথী নিত্যপদরেণু-স্পর্শে স্ফীত-বক্ষে প্রবাহিতা। কেহ বা গঙ্গা-স্নানে গমন করিলেন; কেহ কেহ বা সর্ব্বতীর্থ-ময়ী **গুরুকুণ্ডে** স্নান করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নিত্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না; সর্ব্বত্রই মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া তৎকথাপ্রসঙ্গে পরমানন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঠাকুর স্বীয় কক্ষে অবস্থান করিয়া মহোৎসবের সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। কোথাও কোনরূপ ত্রুটীর সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্রেই তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উপলক্ষে ঠাকুর একবার বলিলেন—"আমার ছেলেরা দেখছি নিরাসক্তি—কিন্তু আমি যে পরম "আসক্ত সংসারী" হয়ে পড়েছি। শ্রীশ্রীদেব বুঝি ইঙ্গিতে ভক্তগণের **অনিত্য সংসারে উদাসীনতা** এবং তাঁহার নিজের **"নিত্য-সংসারে** অর্থাৎ অপার্থিব ভক্তসংসারে আসক্তির কথা ব্যক্ত করিলেন! ঠাকুর পূর্ব্বেও বহুবার এই "নিত্য-সংসারের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একদা কোন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন—"আমার পক্ষে কিরূপ সঙ্গ মঙ্গলজনক" তদুত্তরে ঠাকুর সাধুসঙ্গ বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন—"নিত্যভক্তের সঙ্গ পরম-মঙ্গলজনক! ইঁহারা তোমার নিত্যসঙ্গী। ইঁহাদের সহিত তোমার সম্বন্ধ—অক্ষয়, অবিনাশী, নিত্য"।—বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। পাঠক! এইবার ঠাকুরের "সংসারা-সক্তি" বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝুন।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন-মনে কাল কাটাইতেছেন, কখন শ্রীশ্রীদেবকে দর্শন করিতে পাইবেন। ইত্যবসরে জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা ঠাকুর দর্শনে আসুন"। ভক্তগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া দ্রুতগতিতে ঠাকুরের কক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন। সাধারণতঃ ভক্তগণ যে দ্বার দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকেন আজ তাহা বদ্ধ! ভক্তমহিলাগণ ভিতরের যে দ্বার-পথে ঠাকুর-দর্শন করিয়া থাকেন সেই দরজা খোলা হইয়াছে। ভক্তগণ একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। ঠাকুর-ঘরে আলো প্রবেশের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না তাহাতে সম্মুখের যে দ্বার-পথে আলো-প্রবেশ করিবে তাহাও রুদ্ধ করা হইয়াছে। ভক্তগণ বিষন্নমনে ভাবিতে লাগি-লেন—ঠাকুরকে ভাল করিয়া দর্শন করিতে পাইব না। ভক্তগণ! তোমরা কি জাননা

যে তোমাদের শ্রীনিত্যগোপাল স্বপ্রকাশ। সামান্ত সূর্য্যলোকের কি শক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করে? আর তিনি যদি তোমাদিগকে স্বেচ্ছায় ধরা না দিতেন তবে কি সূর্য্যালোক-সহায়ে তাঁহাকে খুজিয়া পাইতে?—তবে জানিয়া শুনিয়া মূর্খতার ভান কর কেন? এটী তোমাদের দোষ নয়—তবে তোমাদের স্বভাবে যে "দিব্য-মাধুর্য্য" নামধেয় একটী বিশেষগুণ আছে এ তাহারই কীর্ত্তি।

ভক্তগণ! নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন—তাহাতে মোহিত হইয়া গেলেন! দেখিলেন তাঁহাদের আদরের ধন, আশ্রিত-বৎসল, অনাথ-শরণ, পাপীর বন্ধু, দীনের সম্বল শ্রীনিত্যগোপাল স্বীয় নবনীত-কোমল-সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-দেহ-দ্যুতিতে সহস্র-শশাঙ্ক-প্রভা মলিন করিয়া পালঙ্কোপরি সমাসীন! মস্তকে কুসুম-কিরীট! মৃদু-মধুর-হাস্ত-বিরাজিত মুখমণ্ডল—পূর্ণতম প্রতিভার লীলা-নিকেতন! প্রেমানুরাগরঞ্জিত নয়ন-কমলে করুণকোমল দয়ার্দ্র-দৃষ্টি। কুসুম-পরিশোভিত প্রশস্ত বক্ষ-স্থলশান্তির বিলাসভূমি! সুবলিত বাহুযুগলে-মূর্ত্তিমান বরাভয়! করাঙ্গুলি-চম্পক-কলিকার লজ্জাস্থল। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ-দেহাবলম্বনে বহু-মূল্য পীত-পট্টবাস লজ্জায় বিমলিন। ভক্ত-বাঞ্ছিত ব্রহ্মাদি-বন্দিত শ্রীচরণতল যদিও অলক্ত-রাগে রঞ্জিত নহে, তথাপিও মন্দার-কুসুম-প্রভাকে পরাজিত করিয়াছে। চরণ-নখর-রাজ অকলঙ্ক-শশাঙ্ককেও লজ্জিত করিয়া আশ্রিতজনে ভক্তি-প্রেম-সুধা-রাশি বিতরণ করিতেছে। ভক্তগণের আর ক্ষোভ রহিল না—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, শ্রীনিত্যগোপালরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখের দিকে বামপার্শ্বে হরিশরণানন্দ চন্দন-স্নাত তুলসী এবং পুষ্পসম্ভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হরিশরণানন্দ! তুমিই ভাগ্য-বান! শ্রীনিত্যচরণে যে কুসুমরাশী অর্পিত এবং বিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাদের পুষ্প-জীবন সার্থক করিবে, ভক্ত এবং প্রেমিকগণ যে কুসুমরাশী শ্রীনিত্যপাদারবিন্দে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে—সেই কুসুম-সম্ভার লইয়া!—হরিশরণানন্দ! তুম দণ্ডায়-মান!—তোমাহ'তে ভাগ্যবান আর কে আছে? দেখিও, পাত্র শেষ করিও না, এ অভাগার জন্য দয়া করিয়া একটী মাত্র ফুল রাখিও। যদি দিন পাই—শ্রীনিত্যচরণে অর্পণ করিয়া জীবনের একমাত্র পিপাসার চিরশান্তি করিব।

ঠাকুর ইচ্ছা করিয়াছেন—ভক্তগণকে কুসুম-মালা পরাইবেন এবং স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিবেন। ঠাকুর বহুসংখ্যক মালা রামদাদার হস্তে প্রদান করিয়া ভক্তগণকে পরাইয়া দিতে বলিলেন।

এখন তিনটি কাজ উপস্থিত; পূজা, মাল্যার্পণ, প্রসাদ বিতরণ। স্থির হইল—ভক্তগণ অগ্রে অঞ্জলি প্রদান করিবেন। রামদাদা সঙ্গে সঙ্গে মালা পরাইবেন, তৎপর ঠাকুর শ্রীহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিবেন। (ক্রমশঃ)

উপেন।

অভেদ-তত্ত্ব।

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।]

হরিরূপধরং লিঙ্গং লিঙ্গরূপ-ধরো হরিঃ।
ঈষদপ্যন্তরং নাস্তি ভেদকৃৎ পাপমশ্নুতে ॥
অনাদি নিধনে দেবে হরিশঙ্করসংস্থিতে।
অজ্ঞান-সাগরে মগ্না ভেদং কুর্ব্বন্তি পাপিনঃ ॥
'লিঙ্গরূপী' মহাদেব ধরে হরি-রূপ।
হরিরূপী জগদীশ শিব-স্বরূপ ॥
হরি আর মহাদেবে নাহি ভেদ-লেশ।
ভেদজ্ঞানে হয় ভাই পাপ সবিশেষ ॥
দেব-দেব মহাদেব অনাদি-নিধন।
'কেশব-শঙ্কর' তিনি একত্র মিলন ॥
অজ্ঞান-সাগরে মগ্ন পাপীদের দল।
'হরি-হরে' ভেদ ভাবি যায় রসাতল ॥
যো দেবো জগতামীশঃ কারণানাঞ্চ কারণং।
যুগান্তে জগদত্তোতক্রুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ ॥
রুদ্রোবৈ বিষ্ণুরূপেণ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
ব্রহ্মরূপেণ সৃজতি তদন্তেব স্বয়ং হরিঃ ॥
যেই জগদীশ সর্ব্ব-কারণকারণ।
রুদ্ররূপে সেই করে জগৎ ভক্ষণ।
সেই রুদ্র বিষ্ণুরূপে পালিছে সংসার ॥
ব্রহ্মারূপে গড়ে পুনঃ করয়ে সংহার।
হরি শঙ্করয়োর্মধ্যে ব্রহ্মণশ্চাপি যো নরঃ।
ভেদকৃন্নরকং ভুঙক্তে যাবদাচন্দ্রতারকং ॥
হরং হরিং বিধাতারং যঃ পশ্যেদেকরূপিণং।
স যাতি পরমানন্দং শাস্ত্রাণামেষঃ নির্ণয়ঃ ॥
বিরিঞ্চি কেশব শিব এই তিনরূপ।
ভিন্ন ভিন্ন দেব নহে, একই স্বরূপ ॥
অভিন্ন স্বরূপ-তত্ত্বে এই ভেদ জ্ঞান।
যেই করে, তার হয় নরকে প্রয়াণ ॥
হরিহর চতুর্ম্মুখ একেরই বিকাশ।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু তিনটি বিলাস ॥
এই জ্ঞান যার হয় সেই ভাগ্যবান।
পরম আনন্দ পায়, শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যো বিষ্ণুং ভজতে সদা।
শিবং বা পূজয়েন্নিত্যং তত্রসন্নিহিতো হরিঃ ॥
শিবপূজাপরোবাপি হরি-পূজাপরোঽপিবা।
যত্রতিষ্ঠতি তত্রৈব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ ॥
কায়মন-বাক্যে করে হরির ভজনা।
অথবা করয়ে নিত্য শিব-আরাধনা ॥
এইরূপ শিবভক্ত কিম্বা হরিদাস।
ত্রিভুবন মাঝে ভাই যথা করে বাস ॥
কমলা সহিত সেই কমলার পতি।
আর দেবগণ তথা করেন বসতি ॥
হরিরূপী মহাদেবঃ শিবরূপী জনার্দ্দনঃ।
ইতি লোকস্য তে নাথ নতাস্মি জগতাং গুরুম্ ॥
হরিরূপধারী কভু ভোলাদিগম্বর।
কভু হররূপে হেরি হরিবিশ্বম্ভর ॥
লোকনাথ দেবদেব জগতের গুরু।
প্রণাম করিনু ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ॥
তিলতৈলেন সংস্নাপ্য বিষ্ণুং বা শিবমেব বা।
সযাতি তত্তৎসারূপ্যং কুলত্রিতয়-সংযুতঃ ॥
তিলতৈল দিয়া যেই সাধক-রতন।
হরি বা হরের মূর্ত্তি করয়ে সেবন ॥
তিন-কুল-সহ সেই হরিহর-দাস।
সারূপ্য-মুকতি লভি করয়ে বিলাস ॥
পদ্ম-পুষ্পেণ যো বিষ্ণুং শিবং বার্চ্চতি মানবঃ।
স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলত্রিতয়-সংযুতঃ ॥
কমল-কুসুমে যেই ভাগ্যবান নর।
অর্চ্চনা করয়ে হরি কিম্বা দিগম্বর ॥
শ্রীহরির দয়া আর শিবের কৃপায়।
তিন-কুল-সহ বিষ্ণুধামে বাস পায় ॥

অৰ্চ্চিতং শঙ্করং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুংবাপি নমেৎতুষঃ।
স বিষ্ণুভবনং প্রাপ্য বসেদব্দশতং নৃপঃ॥
পূজিত কেশব-মূর্ত্তি হেরি যেই নর।
অথবা অর্চ্চিত-লিঙ্গ প্রভু মহেশ্বর॥
হেরি ভক্তি-ভাব-ভরে করয়ে প্রণতি।
শতবর্ষ বিষ্ণুলোকে তাহার বসতি॥
শিবং বিষ্ণুঞ্চ সংপূজ্য প্রস্থপুষ্পৈর্ম্মনোহরৈঃ।
শমীপুষ্পৈশ্চ রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
শিবলিঙ্গ আর লক্ষ্মী-পতির মূরতি।
পূজা করে যেই নর করিয়া ভকতি॥
প্রস্থ আর শমী পুষ্প দেয় উপহার।
সর্ব্ব অভিলাষ পূরে অচিরে তাঁহার॥
শিবনিন্দা পরাণাঞ্চ বিষ্ণুনিন্দারতাত্মনাং।
সৎ কথানিন্দকানাঞ্চ নেহামুত্রচ নিষ্কৃতিঃ॥
দেবদেব মহাদেব শিবের নিন্দন।
অথবা বিষ্ণুর নিন্দা করিমূঢ়গণ॥
কুৎসা করি সাধু-ভাব, সাধু-ব্যবহার।
অধঃপাতে যায়, কভু না পায় নিস্তার॥
পূজয়স্ব হরং বিষ্ণুমেকবুদ্ধ্যা মহীপতে।
ভেদকৃদ্ ব্রহ্মহত্যা-নামযুতাযুত দুষ্কৃতং॥
শিবএব হরিঃ সাক্ষাদ্ধরিরেব শিবঃ স্বয়ং।
তয়োরন্তরকৃদ্যাতি নরকান্ কোটি কোটিশঃ॥
হরিহর এক, দুই নহে কদাচন।
অভেদ ভাবিয়া নৃপ করহ পূজন॥
হরিই সাক্ষাৎ হর, শিবই কেশব।
অপূর্ব্ব অভেদ-তত্ত্ব কর অনুভব॥
ভেদ-জ্ঞানে হয় শুন রাশি রাশি পাপ।
ভোগ হয় কোটী কোটী নরকের তাপ॥
মম মূর্ত্তিরং শম্ভুং যজ স্তোত্রৈঃ স্বশক্তিতঃ।
স তে সমস্ত-শ্রেয়াংসি বিধাস্যতি ন সংশয়ঃ॥
অহমপ্যাত্রিজানাথং যজামি প্রত্যহং নৃপ।
তস্মাদারাধয়েশানং স্তোত্রৈঃ স্তুত্যং সুখপ্রদং॥

অনাদি-নিধনো-দেবঃ সর্ব্বকাম-ফল-প্রদঃ।
ত্বয়া সংপূজিতো রাজংস্তব শ্রেয়ো বিধাস্যতি॥
কহেন শ্রীহরি ভক্ত ভগীরথ প্রতি।
শুন মহাভাগ হ'য়ে অবহিত মতি॥
আমারই অপর মূর্ত্তি বিভূতি-ভূষণ।
ভক্তিভরে কর তুমি তাঁহার বন্দন॥
আমিও তাঁহার পূজা করি অনুক্ষণ।
অতএব কর তুমি তাঁর আরাধন॥
অনাদি-নিধন-দেব করুণা-নিদান।
অবশ্য করিবে তব মঙ্গল বিধান॥
নারায়ণাচ্যুত জনার্দ্দন কৃষ্ণ-বিষ্ণো পদ্মেশ পদ্মজনিত শিব শঙ্করেতি।
নিত্যং বদন্ত্যখিল-লোক-হিতাঃ প্রশান্তা দূরাদ্ভটা ত্যজত তে তত্র ন মেহস্তি শিক্ষা॥
পাষণ্ড-সঙ্গ-রহিতান্দ্বিজভক্তিনিষ্ঠান্
সৎসঙ্গলোলুপপরাংশ্চ তথাতিথেয়ান্।
শম্ভৌহরৌচ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ জনানাম্॥
একদা ডাকিয়া দূতে কহিলা শমন।
শুন এক কথা মোর ওহে দূতগণ॥
নারায়ণ জনার্দ্দন হরি মুরহর।
স্বয়ম্ভু কেশব শূলী হে শিব শঙ্কর॥
যাঁহার রসনা নিত্য করয়ে কীর্ত্তন।
তাঁহার নিকটে কভু ন ক'র গমন॥
দূরহ'তে তাঁরে সদা ক'র পরিহার।
হরি-শিব-ভক্তে মোর নাহি অধিকার॥
পাষণ্ডের সঙ্গ যেই করয়ে বর্জ্জন।
দ্বিজভক্তি হয় যাঁর অঙ্গের ভূষণ॥
সাধু সঙ্গে বাস যাঁর প্রাণের পিয়াস।
অতিথি সেবায় যাঁর পরম উল্লাস॥
হরি আর মহাদেবে ভেদ-বুদ্ধিহীন।
কভু নহে সেই মোর শিক্ষার অধীন॥

প্রকাশক—শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস।